ঈমান ও ইসলাম

ঈমান ও ইসলাম

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
গবেষণা বিভাগ

ঈমান ও ইসলাম
পৃষ্ঠা ঃ ৩০৮
ইফাবা গবেষণা ঃ ৬৭
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২০৫৯
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.৫১
ISBN ঃ 982-06-0670—X

গ্রন্থস্বত্ব
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ২০০৪
চৈত্র ১৪১০
মুহররম ১৪২৫

প্রকাশক
পরিচালক, গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

পরিমার্জনে ঃ এ. টি. এম. সালাহ উদ্দিন লস্কর

মুদ্রণ ও বাঁধাই
এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

প্রচ্ছদ
জসিম উদ্দিন

মূল্য ঃ ৬২.০০ (বাষট্টি) টাকা মাত্র

IMAN O ISLAM : Written by some research scholars, Published by Director Research, Department of Research Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka- 1207. February 2004

E-mail : info @ islamicfoundation-bd.org
Website : www. islamicfoundation-bd.org

Price : Tk. 62.00 ; US Dollar : 2.00

মহাপরিচালকের কথা

ইসলাম আল্লাহ্ প্রদত্ত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম কোন অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম নয়। এটি একটি পরিপূর্ণ এবং শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে শান্তি, আর এর ব্যাপক অর্থ হচ্ছে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে আত্মসমর্পণ করা। হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে যত আম্বিয়ায়ে কিরাম দুনিয়ায় আগমন করেছেন তাঁরা সবাই ইসলামের পয়গাম নিয়ে এসেছেন। রাহ্মাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাধ্যমে ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত যে দীন বা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এনেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে।

ইসলাম হচ্ছে আলো, এই আলো মানবতাকে শিরক, কুফর ও বিদ্'আত-এর পাপ ও পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করে। এই আলো মানুষকে সত্য সুন্দর সিরাতুল মুস্তাকীমে পরিচালিত করে। ইসলাম দুনিয়ার জীবনে মানুষকে কল্যাণের দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। একমাত্র সঠিক সত্য ও এ দীন মানুষকে অসত্য ও অন্যায় থেকে ন্যায় ও সত্য পথে পরিচালিত করে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে, "সত্য সমাগত মিথ্যা দূরীভূত, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই।" (১৭ ঃ ৮১)

ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর অন্যতম ও প্রধান স্তম্ভ হচ্ছে ঈমান। ইসলামে প্রবেশ করার স্বর্ণতোরণ হলো ঈমান। আর ঈমান আনার সঙ্গে ৩টি বিষয় জড়িত ঃ ১. অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস, ২. মুখে স্বীকার করা ও ৩. আমলে পরিণত করা।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক "ঈমান ও ইসলাম" শিরোনামের সঙ্কলন গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। মহান আল্লাহ্ আমাদের সবার কর্মপ্রচেষ্টা কবূল করেন। আমীন!

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

মানুষের দুনিয়াবী কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তি ও নাজাতের একমাত্র পথ ইসলাম। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ করেছেন ঃ

"হে ঈমানদারগণ। তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে দাখিল হও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করোনা।" (২ ঃ ২০৮) আল্লাহ্ পাক বিশেষ করে ঈমানদার বান্দাদের সম্বোধন করে এ আয়াতে কারীমায় ইসলামে পরিপূর্ণভাবে দাখিল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধি-বিধান ও আদেশ নিষেধ নিষ্ঠার সাথে পালন করা এবং প্রেরিত সর্বশেষ নবী রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুপম জীবনাদর্শের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করা অবশ্য কর্তব্য।

কলেমা, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদ বা স্তম্ভ। ঈমানের মূল কথা অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার এবং সে অনুযায়ী আমল করা। ঈমানের ৭৩টির অধিক শাখা রয়েছে। ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত আছে। ঈমানের সহজ বর্ণনা পাওয়া যায় 'ঈমানে মুফাস্‌সালে'। যেমন ঃ

''আমি ঈমান আনলাম আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, আখিরাত ও তাকদীরের ভাল-মন্দ সবকিছু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় হয়-এর উপর এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়ার উপর"।

উক্ত মৌলিক বিষয়গুলোর উপর দৃঢ় বিশ্বাস ব্যতীত কাউকে ঈমানদার বলা যাবে না। যিনি এগুলো আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করবেন তাকেই একমাত্র মু'মিন বলা হবে। মূলত ঈমান হলো ইসলামে প্রবেশের স্বর্ণতোরণ। ঈমান ব্যতীত ইসলামে প্রবেশের কল্পনাও করা যায় না। ঈমান ব্যতীত পাহাড় পরিমাণ আমলেরও সামান্যতম মূল্য নেই।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় ঈমান ও ইসলাম বিষয়ের উপর অনেকগুলো মূল্যবান প্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত ও সমাদৃত হয়েছে। এ প্রবন্ধগুলোকে 'ঈমান ও ইসলাম' শিরোনামে সংকলন আকারে প্রকাশ করা হলো।

এসব প্রবন্ধের লেখক, রিভিউয়ার ও সম্পাদককে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। এ গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে যাদের সহযোগিতা পেয়েছি তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। গ্রন্থে মুদ্রণ পর্যায়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটা স্বাভাবিক। সহৃদয় পাঠক আমাদের তা জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

গ্রন্থটি প্রকাশ পর্যায়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকার দীর্ঘদিনের সংগ্রহ থেকে প্রবন্ধ বাছাই, বিষয় ভিত্তিক বিন্যাস ও সম্পাদনা সংক্রান্ত কাজ নিম্নবর্ণিত কমিটি সম্পন্ন করেছেন।

বিষয় ভিত্তিক বিন্যাস ও সম্পাদনা কমিটি

মুহাম্মদ নুরুল আমিন	সভাপতি
এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম	সদস্য
ড. মুশতাক আহমদ	সদস্য
মোঃ সাইফুল ইসলাম খান	সদস্য
আবদুল মুকীত চৌধুরী	সদস্য সচিব

গ্রন্থনা কমিটি

মোঃ বজলুল করিম
মোঃ আইয়ুব আলী
মোঃ নজরুল ইসলাম
মোঃ হাবিবুর রহমান

এছাড়া প্রবন্ধগুলোর কপি প্রস্তুত করাসহ ও অন্যান্য কাজে সহযোগিতা প্রদান করেছেন কাজী সানাউল্লাহ্ ও মোঃ ফজলুর রহমান এবং মুদ্রণ তত্ত্বাবধানে ছিলেন এ.বি.এম. সালাহউদ্দিন লস্কর।

এ গ্রন্থ থেকে পাঠক সমাজ উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করবো। আল্লাহ্ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে তাঁর দরবারে নাজাতের ওসীলা হিসাবে কবূল করুন। আমীন!

পরিচালক
গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

লেখকমণ্ডলী

মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান

অধ্যাপক শাইখ আবদুর রহীম

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান

ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ❑ অনুবাদ : অধ্যাপক আবদুল গফুর

মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী (র) ❑ অনুবাদ : আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী

মুহাম্মদ আতাউর রহিম ❑ অনুবাদ : অধ্যাপক আবদুল গফুর

ড. এ. এম. রাহাত ❑ অনুবাদ : অধ্যাপক মহিউদ্দীন আহমদ

মোহাম্মদ জাফর পাহলোয়াদী ❑ অনুবাদ : মোহাম্মদ সাদেক

ড. সিকান্দার ইব্রাহিমী

ড. মাযহার উদ্দীন সিদ্দীকী

সৈয়দ আজীজুর রহমান

ড. মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক খতিবী ও আহমদ আলী

গাজী ওমর ফারুক ও মোঃ মহিব্বুল ইসলাম

মুহাম্মদ রুহুল আমীন ও এ. কে. এম. নুরুল আলম

মতিউর রহমান নীলু

মুহাম্মদ মূসা

সূচিপত্র

ঈমানের প্রকৃতি : একটি দার্শনিক পর্যালোচনা—১১
অধ্যাপক আনিসুজ্জামান

ওহী ও ঈমান—৪৪
মতিউর রহমান নীলু

অপরাধ প্রতিরোধে ঈমানের ভূমিকা—৬০
মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

ইসলামের জীবন দর্শন—৮১
ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ❑ অনুবাদ : অধ্যাপক আবদুল গফুর

ইসলাম ও কুফরের মানদণ্ড—৯৪
মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী (র) ❑ অনুবাদ : আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী

একত্ববাদ ও খ্রীষ্টধর্ম—১১৪
মুহাম্মদ আতাউর রহিম ❑ অনুবাদ : অধ্যাপক আবদুল গফুর

ইসলামে পরকাল বিশ্বাস —১২৩
মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

তাকদীর ও কর্মের স্বাধীনতা—১৫০
অধ্যাপক শাইখ আবদুর রহীম

ইসলাম ও ফিত্‌রাত—১৬০
মুহাম্মদ জাফর পাহলোয়াদী ❑ অনুবাদ : মোহাম্মদ সাদেক

মানব ধর্ম আল-ইসলাম—১৮৪
মুহাম্মদ রুহুল আমীন ও এ. কে. এম. নূরুল আলম

সালাতের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ এবং পূর্ণতা—১৯২
অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান

সালাত ও যাকাত এবং উহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক—২০২
অধ্যাপক শাইখ আবদুর রহীম

যাকাতের তাৎপর্য ও বিধান— ২০৯
মুহাম্মদ মূসা

রোযার মাস রমযান— ২২৮
ড. এ. এম. রাহাত ❑ অনুবাদ : অধ্যাপক মহিউদ্দীন আহমদ

কুরবানী ঃ ইতিহাস ও তাৎপর্য—২৩৬
সৈয়দ আজীজুর রহমান

হজ্জ ঃ একটি পবিত্র বিশ্ব অনুষ্ঠান—২৪০
ড. সিকান্দার ইব্রাহিমী

বিদ্'আত ঃ তাত্ত্বিক পর্যালোচনা—২৪৭
ড. মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক খতিবী ও আহমদ আলী

ফাত্‌ওয়া : তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ ও বাংলাদেশ প্রসংগ—২৭৩
গাজী ওমর ফারুক ও মোঃ মহিব্বুল ইসলাম

ইসলামে তালাক ব্যবস্থা—২৯১
ড. মাযহার উদ্দীন সিদ্দীকী

ঈমানের প্রকৃতি ঃ একটি দার্শনিক পর্যালোচনা*

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান

ইসলাম ধর্মের দু'টি দিক আছে ঃ একটি বিশ্বাসগত (আকীদা) ও অপরটি ব্যবহারিক (আমল)। মহানবী (সা)-এর জীবদ্দশায় এমন কি খুলাফা-ই-রাশেদীনের প্রাথমিক দিকেও ইসলাম ধর্মের মৌল বিশ্বাস নিয়ে তেমন কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নি। যারা ইসলাম গ্রহণ না করতো, তারা একটি নূতন ধর্মমত হিসেবেই এর বিরোধিতা করতো। অপরদিকে, যারা মুসলমান হতো, তারা সরল বিশ্বাসে ইসলামের সব বিধান মেনে নিতো। কখনো কারো মনে কোন প্রশ্নের উদয় হলে সরাসরি মহানবী (সা)-কে বা বিজ্ঞ সাহাবীদের জিজ্ঞেস করে তার সমাধান করা হতো। পরবর্তীকালে ইসলাম যখন একটি বিজয়শীল শক্তি হিসেবে ক্রমাগত একটার পর একটা ভূখণ্ড জয় করতে শুরু করে, তখন থেকে মুসলমানরা বিজিত দেশসমূহের ধর্মবিশ্বাস, দার্শনিক চিন্তাধারা, আচার আচরণ লক্ষ্য করতে থাকে। তা'ছাড়া, মুসলমানরা যে কেবল রাজ্যই জয় করছিল, তা-ই নয়, বিজিত দেশসমূহের বিপুল সংখ্যক জনগণ ইসলাম ধর্মও গ্রহণ করছিল। বিজিত অঞ্চলসমূহের শাসন পরিচালনার জন্য বিপুল সংখাক 'আরব বংশোদ্ভূত মুসলমানকে সেসব এলাকায় পাঠানো হচ্ছিল। নতুন পরিবেশ, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস ও জীবনাচার এদের অনেকের মধ্যেই নানাবিধ কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করছিল। অপরদিকে, নতুন বয়'আত প্রাপ্তরা মুসলমান হলেও তাদের অনেকেই পূর্ব বিশ্বাস ও আচরণের প্রেক্ষিতে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও আচার আচরণকে পুনর্মূল্যায়ন করতে উৎসাহ অনুভব করছিল। এমন একটি ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে রূঢ় বাস্তববাদী ইসলাম সম্বন্ধে নানাবিধ দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক প্রশ্ন দেখা দেয় এবং এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তরকে কেন্দ্র করে ইসলামের একক প্রবাহের মধ্যে বিভিন্ন স্রোতধারা তথা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।[১]

বস্তুত ঈমান (বিশ্বাস)-এর সঠিক অবস্থান এবং 'আমল (কর্ম)-এর সাথে তার

---

* [প্রবন্ধটি ইফা পত্রিকা ১৯৮৬ ও ১৯৮৭ সন ২৬ বর্ষ ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা থেকে সংগৃহীত]

১. বর্তমান প্রবন্ধের পাঠকের ইসলামী সংস্কৃতি ও দর্শনের প্রাথমিক জ্ঞান রয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়েছে। পাদটীকার সংখ্যার ক্ষেত্রে অনাকাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধি রোধ করার জন্য ধর্মীয় বরাত ইচ্ছাকৃতভাবেই হ্রাস করা হয়েছে। অধিকন্তু, প্রবন্ধকারের ধারণা দার্শনিক আলোচনায় ধর্মীয় উদ্ধৃতি ও প্রাধিকারের প্রাবল্য থেকে যুক্তির প্রাধান্যই অধিকতর কাম্য।

সম্পর্ক কি--এ জাতীয় প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই সাহাবী পরবর্তী যুগে সর্বপ্রথম মুসলিম সমাজে ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের সূচনা হয়। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই প্রশ্ন আসে ঃ ঈমান কি? ঈমান ও ইসলাম কি একই জিনিস (অভিন্ন)? যদি এক না হয়, তা'হলে এ দু'টির মধ্যে সম্পর্ক কি? ঈমান আগে না ইসলাম আগে? এদের মধ্যে কোন্টি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদার পরিচায়ক? বিশ্বাসের সাথে কর্মের সত্যিকার সম্পর্ক কিরূপ? ঈমান কি কেবল একটি ঘোষণার নাম না প্রতি মুহূর্তে লালন করার মতো একটি মানসিক অবস্থার ভাষাগত প্রকাশ? ঈমানের অবস্থা কি সৃষ্টি করা যায়? অর্থাৎ কোন লোক কি চেষ্টা করে ঈমানদার হতে পারে এবং এর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিতে পারে? ঈমানের ফল হিসেবে কেউ কি আবশ্যিকভাবে বেহেশত দাবি করতে পারে? 'কুফর'-এর সৃষ্টি কিভাবে? ঈমান কি স্থিতিশীল কিছু না এর হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে? কবীরা গোনাহ [এমন পাপ যা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ] করা কি ঈমানের পরিচায়ক? কোন অবস্থায় একজনকে 'কাফির' বলা যায়? ঈমানের অবস্থা সম্পর্কে মুসলিম ধর্মতত্ত্বে এমনি ধরনের অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। এতে আমার বিবেচনায় উল্লেখিত প্রশ্নগুলোই প্রধান ও নীতি নির্ধারণ প্রকৃতির। বাংলা ভাষায় ইসলাম ধর্মের ভিত্তি ঈমান সম্পর্কিত এমন মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ দার্শনিক পর্যালোচনা হয়নি। সাধারণ ধর্মবিশ্বাসীদের অনেকের কাছেই উল্লেখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর সুনিশ্চিত এবং মীমাংসিত। কারো কারো কাছে এ ধরনের প্রশ্ন ধর্মবিশ্বাসের জন্য ক্ষতিকর; তাই এ ধারা আলোচনায় তাঁরা শংকিত হন। অনেকেই এসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে নিস্পৃহ; তাঁরা সরল বিশ্বাসে [তাঁদের ধারণায়] যা বিশ্বাস করার তা বিশ্বাস করেন এবং সাধ্যানুযায়ী কাজ করেন। এর অতিরিক্ত কিছু জানতে চাওয়াকে তাঁরা সযতনে অবদমন করেন এবং এসব প্রশ্ন উত্থাপনকারীদের বিরক্তিসহকারে এড়িয়ে চলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসু মনের কাছে এগুলো মুসলিম দর্শনের চিরায়ত প্রশ্ন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে লব্ধ জ্ঞানের আলোতে এদের পুনর্মূল্যায়ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমান প্রবন্ধে আমি বিভিন্ন ধর্মতাত্ত্বিকের মতাবলীর বিস্তারিত পর্যালোচনার পরিবর্তে এসব প্রশ্নের মধ্যে যেগুলো দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, তাদের সাধারণ দিকের মধ্যেই আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো।

ঈমানের সংগঠন

ঈমানের আবশ্যকীয় উপাদান কি বা ঈমান কি কি উপাদানে গঠিত---এ নিয়ে ধর্ম-তাত্ত্বিকদের মধ্যে প্রচুর মতবিরোধ আছে। তবে বিভিন্ন তাত্ত্বিকের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, ঈমানের মধ্যে তিনটি উপাদান রয়েছে, যথাঃ (১) মৌখিক স্বীকৃতি ও সাক্ষ্য (ইক্‌রার/ শাহাদত); (২) আন্তরিক বিশ্বাস ও জ্ঞান (তাস্‌দিক/ মা'রিফাত) এবং (৩) বাহ্যিক কাজ (আমল)। ঈমানের আসল বুনিয়াদ কোনটি এবং অন্যান্য উপাদানের সাথে সেটির সম্পর্ক কিরূপ, এ সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। এখন

আমরা এ সম্পর্কীয় প্রতিনিধিত্বশীল মতগুলো উল্লেখ করবো। কারামাতীয়ারা ঈমানের প্রথম উপাদানটি অর্থাৎ মৌখিক স্বীকৃতির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। পক্ষান্তরে, জাহমিয়ারা শুধুমাত্র আন্তরিক বিশ্বাসকেই ঈমানের সমার্থক মনে করেছে। মু'তাযিলারা মৌখিক স্বীকৃতি ও আন্তরিক বিশ্বাসকে স্বীকার করেছে; কিন্তু বাহ্যিক কর্মের ওপরই তারা বেশী জোর দিয়েছে। ইবনে হাযাম ও ইবনে তাইমিয়ার মতে, আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতির ন্যায় বাহ্যিক কর্মও ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আহ্লে-সুন্নাত আল-জামা'আতের দু'দল অর্থাৎ আশ'আরীয়া ও মাতুরীদী উভয় সম্প্রদায়ের তাত্ত্বিকগণই কর্মের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন; তবে ঈমানের মূল অন্তরে—এটি তাঁরা মনে করেন। এজন্য ঈমান সর্বদাই অন্তরে লালন করতে হবে। ইমাম আযম আবূ হানীফার মতে মৌখিক স্বীকৃতি ও প্রকাশ এবং আন্তরিক বিশ্বাস--উভয়ই একই সাথে জরুরী। অন্তরে বিশ্বাস না করে কেবল জান-মালের নিরাপত্তার জন্য বা অন্য কোন পার্থিব কারণে বাহ্যিকভাবে ঈমানের স্বীকৃতি দিলে বা কিছু আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করলে মু'মিন হওয়া যায় না। পবিত্র কুরআনের পরিভাষায় এমনি ধরনের লোকদের 'মুনাফিক' নামে অভিহিত করা হয়েছে।[২] অপরদিকে, কেবল অন্তরে সত্যজ্ঞান ও বিশ্বাস থাকাই ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ এরূপ জ্ঞান ও বিশ্বাস মহানবী (সা)-এর জীবদ্দশায় অনেক ইয়াহূদী, খ্রীস্টান ও সাধারণ মক্কাবাসীর ছিল। কিন্তু তাদের ঈমানের স্বীকৃতি আল্লাহ্ তা'আলা দেন নি।[৩]

ঈমানের সৃষ্টি

ঈমান সম্পর্কিত আলোচনায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো ঈমানের উৎপত্তি কিভাবে? এটি কি মানুষের প্রয়াস নিরপেক্ষ আল্লাহ্র এক ধরনের কৃপা বিশেষ, না মানুষের সচেতন ইচ্ছা প্রয়াসের ফল? বিভিন্ন চিন্তাবিদ নানাভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছেন। মুসলিম ধর্মতত্ত্বে ঈমান যে মানবীয় প্রচেষ্টার ফল [কাস্‌বী তথা মাখলূক]- এ মতবাদের পরিপোষক হচ্ছে মু'তাযিলা সম্প্রদায়। তারা আল্লাহ্র ন্যায় বিচারের ব্যাপারে ছিল আপোষহীন। মহান আল্লাহ্ পরিপূর্ণ ন্যায়বিচারক। ঈমান যদি মানবীয় প্রচেষ্টার ফল না হয়ে এককভাবে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত হয়, তাহলে ঈমান না থাকলে একজনকে দোযখের শাস্তি এবং ঈমান হলে বেহেশতের পুরস্কার দেয়াটা নিছক আল্লাহ্র ইচ্ছা-নির্ভর হয়, যার যৌগিক ও স্বাভাবিক ফল হলো আল্লাহ্ ইচ্ছা করেই কিছু সংখ্যক লোকের জন্য বেহেশত ও অপর কিছু সংখ্যক লোকের জন্য দোযখ নির্ধারণ করেছেন। কারণ এখানে মানুষের করণীয় কিছু নেই। মানুষের চেষ্টা আল্লাহ্র নির্ধারিত পরিণতি এড়াতে পারে না। কিন্তু এ হতে পারে না; কারণ এটি

---

২. আল-কুরআন ঃ ৬৩ ঃ ১-৪

৩. ঐ, ২ ঃ ১৪৬. ৬ ঃ ২০

আল্লাহ্‌র ন্যায়-বিচারের ধারণার পরিপন্থী। মানুষ নিজের ইচ্ছায় এবং স্বীয় কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে ঈমান অর্জন বা কুফরী করে এবং সে কারণেই সে পুরস্কারের অধিকারী বা শাস্তির যোগ্য হয়। মু'তাযিলারা উপরোক্ত যুক্তির পাশাপাশি কুরআন ও হাদীস থেকেও তাদের মতের সমর্থনে প্রমাণ দেয়। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ অনর্থক কাউকে শাস্তি দেন না। মানুষ যা অর্জন করে, তা তার কৃতকর্মের ফল। আল্লাহ্ সৎপথ ও পথভ্রষ্টতা স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়েছেন। মানুষ ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন পথ অবলম্বন করতে পারে।[৪] এক বিখ্যাত হাদীসে বলা হয়েছে যে, প্রতিটি মানব শিশুই প্রাকৃতিক বিধান তথা ইসলামের ওপর জন্মগ্রহণ করে। পরিবেশ ও অভিভাবকরাই তাকে পরবর্তীতে ইয়াহূদী, খ্রীস্টান অথবা অগ্নি উপাসকে পরিণত করে।

আহ্‌লে-সুন্নত-এর মধ্যে যিনি ঈমান যে সৃষ্ট—এ মতের প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন, তিনি হলেন বিখ্যাত ধর্মতাত্ত্বিক ইমাম আবুল হাসান আল আশ'আরী (র)। তিনি মনে করতেন, ঈমানকে 'কাস্‌বী' তথা 'মাখলূক' মনে করার অর্থ এ ধারণা সমর্থন করা যে একটি বিশেষ সময়ে মানবীয় প্রচেষ্টার ফলে ঈমানের সৃষ্টি হয়। এর আগে ঈমানের কোন অস্তিত্ব ছিল না। তিনি বলেন, ঈমান সম্পর্কে মু'তাযিলাদের মত বিভ্রান্তিকর। আশ'আরী তাঁর মতের পক্ষে যুক্তি দেয়ার আগে সৃষ্টি বলতে কি বুঝায়, তা স্পষ্ট করতে চান। তাঁর মতে সৃষ্টি হওয়া হলো এমন একটি অবস্থার নাম যখন কোন কিছু অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে ফিরে আসে। এ সংজ্ঞার আলোকে তিনি প্রশ্ন করেন, ঈমানের সৃষ্টি হওয়া বলতে কি আমরা এটা বোঝাতে চাই যে, এমন এক সময় ছিল যখন ঈমান তথা তাওহীদ [আল্লাহ্‌র একত্ব]-এর ধারণা ছিল না? আশ'আরী (র) বলেন, এটি অসম্ভব। জগৎ সৃষ্টির পূর্বে অথবা পরে এমন কোন সময়ে কথা ভাবা যায় না যখন আল্লাহ্‌র একত্বের ধারণা তথা ঈমানের অস্তিত্ব ছিল না। আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের মতই ঈমান অনাদি এবং সে কারণে অসৃষ্ট। তাঁর মতে এমনি অবস্থার [ঈমান যে সৃষ্ট] কল্পনা তাওহীদ তথা ঈমান বিরোধী কুফরীর নামান্তর।[৫]

ঈমানের সৃজন সম্পর্কে আশ'আরীর মতের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মু'তাযিলারা যে অর্থে ঈমানকে মানবীয় প্রচেষ্টা সাপেক্ষ বলেছেন, আশ'আরী (র) সেভাবে বিষয়টিকে দেখেন নি। তিনি ব্যক্তি বিশেষের বাস্তব ঈমান অর্জনের প্রতি লক্ষ্য না করে নযর দিয়েছেন ঈমানের চিরন্তন ধারণার প্রতি এবং সে দৃষ্টিভঙ্গিতেই তাঁর যুক্তি দিয়েছেন। সুতরাং ব্যক্তি মানুষের ক্ষেত্রে ঈমানের উৎপত্তি সম্পর্কীয় পর্যালোচনায় আ'শআরীর

---

৪. ঐ, ২ঃ২৮৬; ৮ঃ৫১; ৩০ঃ৪১; ৪২ঃ৩০; ৭৬ঃ৩ ইত্যাদি।

৫. **Abul Hasan-al Ash`ari, Risalah Fi-al-Iman**, ed. by Spitta (Leipzig. 1876), pp. 138-40. আমি ছাপার সুবিধার জন্য 'আরবী শব্দের diacritical চিহ্ন বাদ দিয়েছি এবং প্রচলিত বাংলা বানানকেই গ্রহণ করেছি।

যুক্তি কোন আলোকপাত করে না।

ব্যক্তির জীবনে ঈমান অর্জনের সমস্যা এবং এর উৎপত্তি সম্বন্ধে যাঁর মতবাদ দার্শনিক দিক দিয়ে প্রাসঙ্গিক এবং তাৎপর্যপূর্ণ, তিনি আহ্‌লে-সুন্নত-এর অপর একজন বিশিষ্ট তাত্ত্বিক ইমাম আবূ মনসুর আল মাতুরীদী (র)। তাঁর মতে ঈমানের অন্তর্নিহিত সত্য অসৃষ্ট, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কোন ব্যক্তি যখন ঈমান আনে বলা হয়, তখন তার মধ্যে যে দু'টি উপাদানের উপস্থিতি দেখা দেয়, যথা- (ক) মৌলিক স্বীকারোক্তি বা সাক্ষ্যদান এবং (খ) আন্তরিক বিশ্বাস, সম্মতি বা জ্ঞান—তা সৃষ্ট। কারণ এ দুটি বিশেষ সময়, স্থান ও ব্যক্তি দ্বারা সীমাবদ্ধ। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র দেয়া তাওফীক ছাড়া কেউ ঈমানদার হতে পারে না, এ কথা অনস্বীকার্য কিন্তু এর দ্বারা ব্যক্তি মানুষের দায়িত্ব লোপ পায় না এবং ঈমান অসৃষ্টের পর্যায়ে পৌঁছে না।[৬] এ সম্বন্ধে ইমাম আযম আবূ হানীফার কথা উল্লেখ করা হয়। তাঁর মতে, মানুষ, মানুষের কাজ, তার মৌখিক স্বীকারোক্তি, জ্ঞান বা আন্তরিক সম্মতি সবই সৃষ্ট। আর যেহেতু ঈমান মৌখিক স্বীকারোক্তি ও জ্ঞানের [তাওহীদের প্রতীতি] সমন্বয়, সেজন্য ঈমান সৃষ্ট।[৭] মাতুরীদী সম্প্রদায়ের সমরকন্দ উপদল [উপরে উল্লেখিত] থেকে এ সম্প্রদায়ের বুখারা উপদল এ ব্যাপারে কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করে। তাদের মতে, ঈমানের মধ্যে দুটো অংশ রয়েছে। প্রথম অংশ হচ্ছে হিদায়েত বা সৎপথ প্রদর্শন। এটি সরাসরি আল্লাহ্ হতে আসে। আল্লাহ্ কাউকে হিদায়েত দান না করলে কেউ ঈমান অর্জন করতে পারে না। ঈমানের মধ্যস্থিত দ্বিতীয় অংশটি সৃষ্ট তথা মানবীয় প্রয়াসের ফল। এটি বাস্তবভাবে যে ব্যক্তি ঈমান অর্জন করে হিদায়েত পেল, তার মানসিক অবস্থা ও মৌলিক স্বীকারোক্তির স্মারক বা প্রতীক।[৮] আমার মতে, শেষোক্ত মতটিই ঈমানের সৃজন সম্পর্কীয় সমস্যার প্রকৃত অবস্থার ভারসাম্যপূর্ণ বর্ণনা।

'কুফ্‌র'-এর সৃষ্টি

ঈমানের সৃষ্টি সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্ত মুসলিম ধর্মতত্ত্বে অপর একটি জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ঈমান আল্লাহ্ পাক সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর ইচ্ছায়ই মানুষ অর্জন করে, এটি তেমন সমস্যার সৃষ্টি করে না এ জন্য যে, ঈমানের পরিণতি শুভ। কিন্তু এর থেকে যে সমস্যাটি বেরিয়ে আসে, তা'হলো 'কুফ্‌র'-এর অবস্থান কি এবং তার উৎপত্তি কিভাবে? যদি স্বীকার করা হয় যে, কুফ্‌রও আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন, তাহলে এ ভাবা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় যে পরম মঙ্গলময় ও দয়াময় আল্লাহ্ কিভাবে

---

৬. **A.J. Wensinck, Muslim Creed** (London : Frankcass and co. Ltd. 1965), p. 128.

৭. Ibid, p. 127-128.

৮. **Bayadi, Isharat al-Maram min Ibarat al-Imam**, (Cairo, 1949), p. 252.

কুফরের মত এমন নিকৃষ্ট জিনিস সৃষ্টি করলেন! আর যেহেতু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হয় না,[৯] সেহেতু 'কুফ্‌র'ও তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। তাই এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন জাগে যে, তিনি কি কোন কোন মানুষের জন্য কুফর পছন্দ করেন? এ ধরনের ধারণা কি আল্লাহ্ তা'আলার পরম নৈতিকতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, এমন কোন ব্যক্তি নেই যে আল্লাহ্‌র হুকুম ব্যতীত ঈমান আনতে পারে।[১০] এখানে এটা স্পষ্ট যে যারই ঈমানদারী হয়েছে, তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়ই সম্ভব হয়েছে।[১১] তাহলে যারা ঈমানদার নয়, তাদের ব্যাপারে কি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন নি? আল্লাহ্ কি চান নি যে তারা ঈমান আনুক? আর প্রকৃত অবস্থা এই যে, আল্লাহ্ চাইলে তারা অবশ্যই ঈমানদার হতো, কারণ আল্লাহ্ যা চান, তা-ই হয়। নভোঃমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে এমন কেউ নেই যে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বাধা দিতে পারে বা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ফলবতী না হোক, এমন কিছু করতে সক্ষম। অথবা অবস্থা কি এই যে, আল্লাহ্ ঈমান ও কুফ্‌রের ব্যাপারে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ দেয়ার পর নির্বিকার অথবা নিস্পৃহভাবে কেবল প্রতিফল প্রদানের জন্য অপেক্ষমান? কিন্তু ঈমানের ব্যাপারে আমরা দেখেছি আল্লাহ্ নির্বিকার নন। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত মানুষের কোন প্রচেষ্টা সফল হতে পারে না। এটা কি কুফরীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়? পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, জগৎ সৃষ্টির পর তিনি বেখেয়াল হয়ে যান নি। পরিকল্পিত পরিচালনা ও নিয়ত পরিবর্তনের মাধ্যমে তিনি জগৎকে সুনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং পরিণামে তাঁর ইচ্ছা ও পরিকল্পনাই বাস্তবায়িত হবে।[১২]

অতএব কুফ্‌রের উৎপত্তি ও কিছু সংখ্যক মানুষের বাস্তবভাবে কাফির হওয়ার বিষয়টিকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করবো? এ সম্বন্ধে মু'তাযিলাদের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁদের মতে আল্লাহ্ তা'আলা কুফর সৃষ্টি করেন নি। কিন্তু আল্লাহ্ কুফ্‌র সৃষ্টি না করলে তা কিভাবে সৃষ্টি হলো, এ সম্বন্ধে তাঁরা কিছু বলেন নি। ইসলাম আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন স্রষ্টায় বিশ্বাস করে না। তাই এককভাবে মানবীয় প্রচেষ্টায় কুফরী অর্জন ইসলামী সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সেজন্য বিভিন্ন তাত্ত্বিক নানাভাবে কুফরের সৃষ্টি ব্যাখ্যা করেছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ "[আমি কি তোমাদের বলে দিব] আল্লাহ্‌র দরবারে এর চেয়ে আর বেশী সাজা পাবে কারা? তারা তো সেইদল যাদেরকে আল্লাহ্ লানত্ দিয়েছেন। যাদের উপরে তিনি অসন্তুষ্ট রয়েছেন। যাদের তিনি বাঁদর শূকরে পরিণত করেছেন এবং তারা 'তাগূত' [আল্লাহ্ বিরোধী শয়তানী শক্তি]-এর পূজারীতে পরিণত হয়েছে।[১৩] মু'তাযিলা বিরোধী চিন্তাবিধগণ এই

---

৯. **আল-কুরআন**, ৬ ঃ ৫৯-৬০; ৯ ঃ ৫১; ৫৭ ঃ ২২; ৭৬ ঃ ৩০ ইত্যাদি।

১০. ঐ, ১০ ঃ ১০০

১১. ঐ, ১০ ঃ ৯৯

১২. ঐ, ২৩ ঃ ১৭; ৫৫ ঃ ২৯; ৫৭ ঃ ১-৪; ৬১ ঃ ৮-৯ ইত্যাদি।

১৩. ঐ, ৫ ঃ ৬০; কুরআন শরীফের অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি হাকীম আবদুল মান্নান অনূদিত বাংলা

আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, আল্লাহ্ কুফর সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্ কুফর সৃষ্টি করেন নি, এ মতের পরিপোষকরা বলেন, এ আয়াত থেকে আল্লাহ্ কুফর সৃষ্টি করেছেন প্রমাণিত হয় না। বরং আল্লাহ্র স্পষ্ট নিষেধ সত্ত্বেও অপকর্মে লিপ্ত হওয়ায় আল্লাহ্ তাদের নিকৃষ্ট বাঁদর ও শূকরে পরিণত করেছেন এবং তাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করার জন্য অনুরূপ শব্দ ব্যবহার করেছেন। যদি আল্লাহ্ নিজেই কুফ্র সৃষ্টি করতেন এবং তাদের জন্য তা নির্ধারণ করে তাদের শাস্তি দিতেন ও অসন্তোষ প্রকাশ করতেন, তাহলে তা স্ববিরোধিতা ও আল্লাহ্র ন্যায়বিচারের ধারণার পরিপন্থী হতো।

এ পর্যায়ে আমরা দ্বিতীয় যে প্রশ্নের সম্মুখীন হই, সেটি মুসলিম ধর্মতত্ত্বের অন্যতম আর একটি জটিল প্রশ্ন। যেহেতু আল্লাহ্ একমাত্র স্রষ্টা এবং যদি আল্লাহ্ কেবল ভাল কিছুই সৃষ্টি করেন, তাহলে শয়তান, কুফ্র, দোযখ, নিষিদ্ধ কাজ [মুনকারাত ও মা'সিয়াত] কে সৃষ্টি করেছে? এখানে এসে কঠোর মু'তাযিলাপন্থী চিন্তাবিদগণ নীরব হয়ে গেছেন। সুন্নাত আল-জামা'আতের ভাষ্য অনুযায়ী অশুভের দ্বিতীয় স্রষ্টা নেই; তাঁদের মতে সৃষ্টি করা এবং মানুষের জন্য তা নির্ধারণ করা এক জিনিস নয়। উল্লেখিত জিনিসগুলো তিনি ঠিকই সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু শয়তানের অনুসরণ, কুফর অবলম্বন ও নিষিদ্ধ কাজ করার মাধ্যমে দোযখের প্রতি গমন মানুষের জন্য নির্ধারণ তো করেন নি বরং এর বিপরীত আদেশ দিয়েছেন এবং সমস্ত অশুভ তৎপরতায় তিনি অসন্তুষ্ট হন বলে জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া যেহেতু কোন কাজ হয় না, তাই যখন কেউ কুফর বা অসিদ্ধ কাজ করার জন্য অগ্রসর হয়, তখন তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার সে কাজ করার ক্ষমতা বহাল রাখেন এবং মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অসাড় করে দেন না।[১৪] কারণ যদি তিনি কেবল ভাল কাজ করার সময় ক্ষমতা দেন আর খারাপ কাজ করার সময় সে ক্ষমতা প্রত্যাহার করে নেন, তাহলে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতার স্বাধীনতায় ক্রমাগত হস্তক্ষেপ করা হয় এবং সৃষ্টির মাঝে মানুষের যে অবস্থান তা পরিবর্তিত হয়ে মানুষ আর এক ধরনের ফেরেশ্তায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। বস্তুত এতে মানুষের পার্থিব জীবন অচল হয়ে যেত এবং আল্লাহ্র মানুষ সৃষ্টির পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতো। সেজন্য আল্লাহ্ তা'আলা একদিকে যেমন কুফ্র, শয়তান দোযখ ও নিষিদ্ধ কাজ সৃষ্টি করেছেন, অপরদিকে তেমনি কিতাব ও নবী পাঠিয়ে ভাল ও মন্দের বিস্তারিত বর্ণনা সম্বলিত তাঁর বিধান প্রেরণ করেছেন এবং সব কিছুর প্রতিফল স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি ভাল কাজের আদেশ দিয়েছেন, তাতে সন্তুষ্ট হন বলেছেন এবং তার শুভ পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে,

---

তরজমাকে সামনে রেখেছি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি আমার আরবী জ্ঞান ও নিজস্ব অভিমতকেই গুরত্ব দিয়েছি বেশি।

হাকীম আবদুল মান্নান ঃ কোরআন শরীফ বাংলা তরজমা (ঢাকা ঃ তাজ কোং লিং, ১৯৬৯)

১৪. ঐ, ৩৬ ঃ ৬৬-৬৭।

খারাপ কাজ নিষিদ্ধ করেছেন এবং তার অশুভ পরিণতির কথা মানুষকে স্মরণ করিয় দিয়েছেন। আর এভাবেই এ জড় জগতের সাময়িক পরিমণ্ডলে প্রতিকূল পরিবেশ ও বিপরীত-ধর্মী আদেশ নিষেধের মাধ্যমে তিনি মানুষের পরীক্ষা করতে চান, কে বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল হিসেবে প্রত্যাবৃত্ত হয়।[১৫] অধিকন্তু, ভাল-মন্দ, শুভ-অশুভ, এগুলো মানুষের জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহ্‌র কাছে সব কিছুরই নিজস্ব অবস্থান আছে। কিন্তু তিনি সকলের সব ধারণার বহু উর্ধ্বে ও সব কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।[১৬]

ঈমান ও ইসলাম

ঈমান ও ইসলাম সমার্থক না পৃথক? ঈমান আগে না ইসলাম আগে? কোন্‌টি অধিকতর মর্যাদা ও সম্মানের পরিচায়ক? ঈমান যদি বিশ্বাসের ব্যাপার হয়, তাহলে ইসলাম কি কর্মের নির্দেশক? ইসলামে বিশ্বাস ও কর্মের সম্পর্ক কিরূপ? কর্ম ছাড়া কি বিশ্বাস হতে পারে? বিশ্বাসহীন সদাচারের গুরুত্ব কতদূর? মুসলিম ধর্মতত্ত্বে এ ধরনের সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে নানাবিধ পর্যালোচনা করা হয়েছে। ঈমান ও ইসলাম যেহেতু ইসলাম ধর্মের একদম বুনিয়াদী জিনিস, তাই মহানবী (সা)-এর জীবদ্দশায়ই এ সম্পর্কিত বেশ কিছু মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। পবিত্র কুরআন এবং হাদীসেও এ সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে বর্ধিষ্ণু মুসলিম সমাজ ও জাতি নূতনভাবে এ সমস্যার সম্মুখীন হয়। মহানবী (সা)-এর জীবিতাবস্থায় তাঁর প্রিয় সহচররা তাঁর কাছ থেকে যা শুনতেন, তা-ই বিশ্বাস করতেন এবং তাঁর ইঙ্গিতই তাঁদের জন্য আদেশের অধিক ছিল। মুসলিম সমাজে বিশ্বাস ও কর্মের মধ্যে তখন কোন অসঙ্গতি বা অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হতো না। সালাতের কথা বলা হোক, কি সিয়াম, কি জিহাদ--শতকরা একশত জন নারী-পুরুষই বিশ্বাস ও আচরণে পূর্ণ সমর্পিত ছিলেন। যারা কোন ইসলামী বিধান পালনে উপযুক্ত কারণ ব্যতীত কোন প্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন করতো, 'মুনাফিক' বা কপট বিশ্বাসীর আখ্যা নিয়ে তারা মুসলিম সমাজ হতে অবলীলাক্রমে বহিষ্কৃত হয়ে যেতো।[১৭] কিন্তু পরবর্তীকালে অবস্থার পরিবর্তন হতে আরম্ভ করে। মুসলিম সমাজে আচরণে শৈথিল্য দেখা দেয়। বিশ্বাসে দুর্বলতা আসে। নতুন বংশধররা এবং নও-মুসলিমরা যেন অনেক কিছুকেই বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে পারছিল না। এমন কি পবিত্র কুরআনের একই আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়েও বিভিন্ন বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদের অন্ত ছিল না। মহানবী (সা)--এর হাদীসকেও বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছিল। অধিকন্তু মুসলিম জাতি এমন অনেক নতুন সমস্যার ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছিল, যার কোন হুবহু উত্তর পবিত্র কুরআন ও হাদীসে পাওয়া

১৫. ঐ, ২ ঃ ১৫৫; ২ ঃ ২১৪; ৬৭ ঃ ২ ইত্যাদি।

১৬. ঐ, ৫৯ ঃ ২৩; ৬৪ ঃ ১ ইত্যাদি।

১৭. ঐ, ৯ : ৭৬-৭৭; ৯৪-৯৭; ৬৩ : ১-৩ ইত্যাদি।

যাচ্ছিল না। তদুপরি ভিন্ন সংস্কৃতি ও দর্শন বিশেষ করে গ্রীকদর্শন, প্রাচ্যের পারস্য ও ভারতীয় জীবনধারা অনেক ব্যাপারেই ইসলামের নূতন ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন দাবী করছিল। অনেক প্রশ্নের সাথে ইসলামের ভিত্তি ঈমানের ব্যাপারেও প্রশ্ন দেখা দেয়। পরিস্থিতি এ পর্যায়ে উপনীত হয় যে, ঢালাওভাবে তখন আর মুনাফিক বলে এই শৈথিল্যপরায়ণ, সন্দিগ্ধ ও জিজ্ঞাসু জনতাকে চিহ্নিত করা যাচ্ছিল না। কারণ এসব লোক বাইরের কেউ ছিল না। এরা মুসলিম সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল এবং তারা নিজেরাও সেভাবেই তাদের পরিচয় দিতো। নানাভাবে এ সমস্যাকে দেখা এবং সে হিসেবে ব্যাখ্যা দেয়া ও সমাধান নির্দেশ করা যেতে পারে। এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সমস্যাটি বহুমাত্রিক এবং এর গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক রয়েছে। তবে আমরা এখানে কেবল দার্শনিক দিকটি নিয়েই পর্যালোচনা করবো।

একটি বিখ্যাত হাদীসে ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অন্যতম একটি হচ্ছে ঈমান বা আল্লাহ্‌র একত্ব ও মহানবী (সা)-এর প্রেরিত পুরুষ হওয়ার সাক্ষ্য। অন্য চারটি সালাত, সিয়াম, হজ্জ ও যাকাত।[১৮]

লক্ষণীয়, এখানে ইসলামকে ঈমান হতে ব্যাপক অর্থে নেয়া হয়েছে এবং ঈমানকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত অন্যতম একটি স্তম্ভ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইসলামের অন্তর্ভুক্ত অন্য চারটি স্তম্ভ বিভিন্ন মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মের নির্দেশক। আল-আশ'আরী প্রমুখ চিন্তাবিদগণ এ হাদীসের উপর তাঁদের মতবাদ স্থাপন করে ইসলাম যে ঈমান হতে ব্যাপক এবং অধিকতর মর্যাদার পরিচায়ক, তা ব্যক্ত করেছেন।[১৯] বাকীল্লানীর মতে, ঈমান ইসলামের একটি অংশ। ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ করা। এমন প্রতিটি কাজ যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং তাঁর অনুগত হয়, তা-ই ইসলাম। এজন্য ঈমান ইসলামের একটি উপাদান বা অংশ [খিসাল] এ অর্থে প্রত্যেক মুসলিমই মু'মিন; কিন্তু প্রত্যেক মু'মিন পূর্ণ মুসলিম নয়। কারণ শুধু বিশ্বাস করলেই মুসলমান হওয়া যায় না, এ জন্য আমলেরও প্রয়োজন। সুতরাং ইসলাম কেবল ঈমানের থেকে ব্যাপকই নয়, বরং তার থেকে উত্তমও বটে।[২০] এ ব্যাখ্যা ইবনে তাইমিয়ার মতের বিপরীত এবং তাঁর মতে ভ্রান্ত। তিনি মনে করেন, কেউ আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করবে, অথচ সে অনুযায়ী কাজ করবে না—এটা স্ববিরোধী। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করবো। পবিত্র কুরআনেও আশ'আরী ও বাকীল্লানী প্রমুখ এর মতের সমর্থন পাওয়া যায়। আল্লাহ্ পাক ঈমানদারদের লক্ষ্য করে বিভিন্ন আদেশ দিয়েছেন।[২১]

১৮. বুখারী শরীফ, ঈমান অধ্যায়।

১৯. A.J. Wensinck, **Muslim Creed**, ch. II for details.

২০. Cf. Idid, pp. 138-39.

২১. আল-কুরআন, ২ঃ১০৪; ২ঃ১৫৩; ২ঃ১৮৩ ইত্যাদি।

এবং তাঁদের ইসলামের মধ্যে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রবেশ করতে বলেছেন।[22] সুতরাং এ সব আয়াত ও হাদীস দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম ঈমান হতে ব্যাপকই শুধু নয়, শ্রেষ্ঠতরও বটে।

অন্যদিকে অপর একটি বিখ্যাত হাদীসে [যা হাদীস-ই-জিব্‌রীল নামে পরিচিত] ঈমানকে ইসলাম থেকে ব্যাপক ও উচ্চতর মর্যাদার পরিচায়ক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত জিব্‌রীল (আ) মুসলমানদের দীন বা ধর্ম শেখানোর জন্য এ হাদীসে ইসলাম, ঈমান, ইহ্‌সান প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদী ধারণা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।[23] দীনের তিনটি প্রধান স্তর দেখানো হয়েছে। প্রথম হচ্ছে ইসলাম, তারপর ঈমান এবং সর্বশেষে ইহসানের স্তর। ইহসান সবচেয়ে উচ্চে। সুতরাং ইহসানের মধ্যে ঈমান অন্তর্ভুক্ত, আবার ঈমানের মধ্যে ইসলাম অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম থেকে ঈমান যে উচ্চতর, এমন ধারণার সপক্ষে পবিত্র কুরআনের আয়াত উল্লেখ করা হয়। আল্লাহ্ পাক বিভিন্ন আদেশ পালন করার প্রেক্ষিতে উল্লেখ করেছেন, মুসলমানদের মধ্যে কারা ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী আর কারা তদ্রূপ নয়।[24] নব বায়'আতপ্রাপ্ত বেদুঈনদের একটি দল মহানবী (সা)-এর কাছে এসে ঈমানের দাবি করলে আল্লাহ্ তা খণ্ডন করে বললেন, তারা এখনও মু'মিন হয়নি, মুসলিম হয়েছে মাত্র।[25] এসব আয়াত ও হাদীসের ভিত্তিতে আগেই উল্লেখ করেছি, ইমাম ইবনে তাইমিয়া প্রমুখ মনে করেন, ঈমান ইসলাম হতে ব্যাপক ও উচ্চতর মর্যাদার পরিচায়ক। তাঁর মতে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে যেখানে ঈমানকে শর্তহীনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে ঈমানের মধ্যে ইসলাম অর্থাৎ বাহ্যিক আমল [কর্ম] অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে যেখানে ঈমান ও ইসলামকে একই সাথে বা পাশাপাশি ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে ঈমান আভ্যন্তরীণ বিশ্বাস এবং ইসলাম বাহ্যিক আমলের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন এক হাদীসে বলা হয়েছে, ইসলাম বাহ্যিক ব্যাপার আর ঈমান হলো আন্তরিক বিশ্বাসের প্রতীক।[26] ইবনে তাইমিয়ার মতে, বাকীল্লানী প্রমুখের মত সত্য হতে পারে না। এটি কুরআন ও হাদীসের মূল শিক্ষার পরিপন্থী। তিনি বলেন বাকীল্লানীর ব্যাখ্যায় ঈমানকে ইসলামের একটি অংশে পরিণত করা হয়েছে। এ ব্যাখ্যা যদি সত্য হয়, তা হলে সব ধরনের আনুগত্যমূলক ক্রিয়াদি ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সে কারণে ঈমানের পরিসীমার বাইরে চলে যায়। ফলে সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ঈমান হতে বাদ পড়ে যায়। অধিকন্তু, যদি ঈমান ইসলামের অংশ হয়, তাহলে কোন ব্যক্তি ঈমানকে

---

২২. ঐ, ২ : ২০৮

২৩. **মুসলিম শরীফ**, ঈমান অধ্যায়।

২৪. **আল-কুরআন**, ৩৩ ঃ ২৩; ৪৯ ঃ ১৫, ১৭ ইত্যাদি।

২৫. ঐ, ৪৯ ঃ ১৪-১৫

২৬. A.J. Wensinck, **Muslim Creed**, p. 23.

পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করে ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী হলেও বলা হবে যে, সে কেবল ইসলামের একটি অংশকে বাস্তবায়িত করেছে এবং তাকে পূর্ণ মুসলিমও বলা যাবে না; কারণ সে পূর্ণ ইসলামকে বাস্তবায়িত করে নাই। সুতরাং কেউ আল্লাহ্‌র মানদণ্ড তথা ঈমানের দাবীতে সত্য হলেও বাকীল্লানী (র) প্রমুখের কাছে সে পূর্ণ মুসলিম বলে পরিগণিত হবে না। ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন, এটা যে কতটা উদ্ভট, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।[২৭]

মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিকদের ঈমান ও ইসলামের পারস্পরিক অবস্থান মর্যাদাগত দ্বন্দ্বের এ বিপরীত স্রোতের মধ্যে যিনি তৃতীয় ধারার সৃষ্টি করলেন, তিনি হলেন বিখ্যাত চিন্তাবিদ নাজম-উদ্দীন আল-নাসাফী মাতুরীদী (র)। তাঁর মতে ঈমান ও ইসলাম আসলে একই জিনিসের দু'টো নামমাত্র। অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি ভেদে নামকরণের এ পার্থক্য দেখা দেয়।[২৮] এ মতের সমর্থক তাত্ত্বিকদের মতে কুরআন ও হাদীস গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে, সেখানে ঈমান ও ইসলামকে অধিকাংশ সময় সমার্থক, কখনও বা একে অপরের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও শব্দ হিসেবে এ দুটি এক নয়; কিন্তু ব্যবহারিক দিক দিয়ে এদের মধ্যে গভীর সাজুয্য বিদ্যমান এবং একটা ছাড়া অপরটির অবস্থান ভাবা যায় না। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে কখনোই এটি বোঝানো হয় নি যে, একজনের ঈমান আছে, অথচ সে মুসলিম নয় অথবা একজন মুসলিম; কিন্তু মু'মিন নয়। অথচ পরবর্তীকালে অধিকাংশ ধর্মতাত্ত্বিক এমনভাবে যুক্তি দেয়ার চেষ্টা করেছেন, যাতে একটি হতে অপরটিকে স্বতন্ত্রভাবে দেখায় এবং সে হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবস্থান নিরূপণের সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং ঈমান ও ইসলাম শব্দ ও ধারণাগত দিক দিয়ে অভিন্ন না হলেও ব্যবহারগত দিক দিয়ে একটি যে অপরটি হতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে অবস্থান করতে পারে না, এ অর্থে তারা অবিচ্ছেদ্য।[২৯]

ঈমান ও ইসলাম যে ব্যবহারিক দিক দিয়ে সমার্থক, এ মতের অপর একজন পৃষ্ঠ-পোষক হচ্ছেন ইবনে হাযাম। তাঁর মতে, ঈমান ও ইসলাম শব্দ দুটোকে সাধারণ আরবী ভাষায় শব্দ হিসেবে দেখলে এদের আসল তাৎপর্য এবং ব্যবহারিক সম্পর্ক উপলব্ধি করা যাবে না। সাধারণ আরবী অভিধানে এরা দুটো পৃথক শব্দ, এতে কোন সন্দেহ নেই। সাধারণ আরবীতে ঈমান বলতে আন্তরিক বিশ্বাস এবং ইসলাম বলতে আত্মসমর্পণ বোঝায়। এ সমর্পণ আন্তরিক না হয়ে জানমালের নিরাপত্তা বা পার্থিব সুবিধার জন্যও হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এদের নতুন

---

২৭. Ibn Taymiyyah, **Kitab-al-Iman**, (Damascus, 1961), pp. 129-33

২৮. Najm al-Din-al Nasafi, **al-Aqaid al-Nasafiyyah** with Taftazani's Commentary, (Cario, 2nd ed, 1939), pp. 450-53.

২৯. Ibid. p. 453.

তাৎপর্যমণ্ডিত করেছেন। তিনি তাঁর প্রতি আস্থাশীল হয়ে তাঁর পূর্ণ বিধান স্বেচ্ছায় মেনে নেয়ার অর্থে এ শব্দ দু'টোকে ব্যবহার করেছেন। অবশ্য সব সময়ই যে এই নব ব্যঞ্জনায় এ শব্দ দুটো পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে, এমন নয়; সাধারণ অর্থেও এদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, যেমন উল্লেখিত বেদুঈনদের প্রসঙ্গে।[৩০]

ঈমান ও ইসলামকে ব্যবহারিক দিক দিয়ে অভিন্ন না ভাবলে আমরা ঈমান [বিশ্বাস] ও আমল [কর্ম]-এর সম্পর্ক এবং একের অবর্তমানে অপরটির সংঘটনকে কুরআনী দৃষ্টি-ভঙ্গীতে সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি না। পবিত্র কুরআনে অনেক সদানুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। যদি এমন কোন ব্যক্তি যে আল্লাহ্ ও রাসূল তথা ইসলামের মৌল বিশ্বাস বিষয়ে আস্থাশীল না হয়, সে যদি তেমনি ধরনের কোন সদানুষ্ঠান—এমন কি অনেকগুলো সৎকাজ সম্পাদন করে, তাকে কি আমরা মুসলিম তথা মু'মিন বলতে পারি? নিশ্চয়ই তাকে মু'মিন বলা যাবে না এবং একই কারণে তাকে মুসলিমও বলা যাবে না। কুরআনের দৃষ্টিতে বিশ্বাসহীন সৎকর্মের কোন পারলৌকিক পুরস্কার নেই [আর ইসলাম ও ঈমানের চূড়ান্ত লক্ষ্য পারলৌকিক মুক্তি ও আল্লাহ্র সন্তোষ নিশ্চিত করা।] এখন প্রশ্ন হতে পারে, যদি বিশ্বাসহীন সৎকর্মের কোন মূল্য না থাকে, তাহলে সৎ-কর্মহীন বিশ্বাসের [আমলহীন ঈমান] কি কোন গুরুত্ব আছে? এ প্রশ্ন নিয়ে ধর্মতাত্ত্বিকদের মধ্যে প্রচণ্ড মতবিরোধ আছে। এখন আমরা বিশ্বাস ও কর্মের সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা করবো।

বিশ্বাস ও কাজ

একদিকে মুরজিয়া সম্প্রদায় বিশেষ করে জাহম ইব্ন সাফওয়ান প্রমুখ চিন্তাবিদে.. ভাষ্যে ঈমানকে কেবলমাত্র আন্তরিক বিশ্বাসে পর্যবসিত করা এবং কর্মের উপর কোন প্রকার গুরুত্ব আরোপ না করা, অপরদিকে খারিজী, জাহিরিয়া, মু'তাযিলা প্রমুখ সম্প্রদায়ের শুধুমাত্র বাহ্যিক কাজের উপর মাত্রাতিরিক্ত জোর দেয়াকে কেন্দ্র করে মুসলিম ধর্মতত্ত্বে ঈমান ও আমলের পারস্পরিক সম্পর্ক ও গুরুত্ব নিয়ে নতুনভাবে চর্চা শুরু হয়। মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা আমলের সাথে ঈমানকে একীভূত করে দেখে সেভাবে মানুষের পরিণতি নির্ধারণ করছিল, পরবর্তীতে তারা 'ওয়াইদিয়া' (সতর্ককারী) নামে পরিচিতি লাভ করে। কর্মের সাথে মানুষের পারলৌকিক মুক্তির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে অনেক আয়াতের সাথে পবিত্র কুরআনের নিচের আয়াতটির উপর তারা গুরুত্ব আরোপ করে ঃ 'এ সমস্ত লোকের চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম, কারণ এটাই তারা [তাদের কাজের দ্বারা] অর্জন করেছে'।[৩১] তাদের মূল

৩০. Ibn-Hazm, al-Fisal fi al-Milal (Cairo : Md. Amin al-Kanji), 1317 A.H.) IV. pp. 226-27.

৩১. আল-কুরআন, ১০ ঃ ৮

বক্তব্য ছিল কাজই হচ্ছে ঈমানের মূল স্তম্ভ। কাজ ছাড়া ঈমানের কোন অস্তিত্ব নেই। একটি গোনাহ্‌র কাজ মানুষকে চিরদিনের জন্য জাহান্নামে নিয়ে যাবে এবং কাফিরদের সাথে সে অবস্থান করবে। অপরদিকে, একটি সৎকাজ করতে না পারাই ঈমান হারানো বা ঈমান অস্বীকার করার শামিল।[৩২] ওয়াইদিয়াদের ঈমান ও আমলের এ ব্যাখ্যা মানুষকে সম্পূর্ণ হতাশ ও ভীতিগ্রস্ত করে তোলে। একমাত্র নিষ্পাপ নবীগণ ব্যতীত অন্যদের পক্ষে ঈমানদার হওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। নবীদের নিষ্পাপ হওয়া সম্বন্ধেও কেউ কেউ প্রশ্ন তোলে।[৩৩] এমতাবস্থায় সারা জীবন সৎকাজ করেও কেউ ঈমানদার হওয়ার আশা করতে পারে না। কারণ ভবিষ্যতে হয়তো কোন খেয়ালের ভুলে, প্রতিকূল পরিবেশে, প্রলোভনে বা ভীতিতে তার কোন গোনাহ্‌র কাজ হয়ে যেতে পারে। ওয়াইদিয়াদের এ ধরনের ব্যাখ্যা মানব প্রকৃতি, কুরআন হাদীসের মূল শিক্ষার বিরোধী। তাদের ব্যাখ্যায় আল্লাহ্‌র ক্ষমা, মানুষের অপরাধ স্বীকার ও আল্লাহ্‌র প্রতি প্রত্যাবৃত্ত হওয়া [তাওবা ও ইসতিগফার] এবং পবিত্র কুরআনের ঈমান ও আমলের পার্থক্যকরণকে মূল্যহীন করে ফেলে। একটা গোনাহ্‌র কারণে সারা জীবনের সব সৎকাজ বাজেয়াফ্‌ত করে দেয়া আল্লাহ্‌র ন্যায়বিচারক হওয়া এবং আল্লাহ্‌র আযাবের উপর তাঁর রহমত যে বিজয়ী—এ মৌলিক ধারণারও বিপরীত। এ সম্বন্ধে আমাদের অভিমত হলো, ঈমান ও আমলের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। তবে আমল ঈমানের সাংগঠনিক অংশ নয়। সে জন্য ঈমান ও আমল এক করে দেখা যেমন সঙ্গত নয়, আবার আমল বাদ দিয়ে পূর্ণ ঈমানের ও আমলের দাবিও গ্রহণযোগ্য নয়।

বিশ্বাসের সাথে কাজের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ব্যাখ্যায় হাসান বসরী, ইবনে হাযাম ও ইবনে তাইমিয়ার মত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আমরা এখন সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করবো। হাসান বসরীর মতে ঈমান কোন হাল্‌কা জিনিস নয় বা এটি লোক দেখানোর মতও কিছু নয়। বরং এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ভারী জিনিস, যা গভীর ও ঐকান্তিক অনুভূতির সাথে বিশ্বাস করতে হয় এবং সতর্কতার সাথে সে অনুযায়ী কাজ করতে হয়।[৩৪] ইবনে হাযামের মতে আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি বা সাক্ষ্যের মতই ঈমানের আবশ্যিক দাবি হলো ঈমান অনুযায়ী কাজ করা। সব ধরনের আল্লাহ্‌-ভীতিমূলক কাজই ইসলাম এবং যেহেতু ইসলাম ও ঈমান ব্যবহারিক

৩২. Shahrastani, **Nihayah-al-Iqdam**, ed. by Alfred Guillaume (London, 1934). p. 474.

৩৩. A.S. Tritton, **Muslim Theology** (West port, Connecticut, Hyperion Press, Inc, 1981). pp. 8, 24, 45, **passim**.

৩৪. Abdal Qahir Al-Baghdadi, **Usul-al-Din**, (Istambul, 1928), pp. 250-51.

দিক দিয়ে সমার্থক, সেজন্য সব ধরনের আল্লাহ্-ভীতিমূলক কাজই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত তাঁর যুক্তির পক্ষে তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াত উল্লেখ করেন, যেখানে জাগতিব মতদ্বৈধতায় মহানবী (সা)-এর মধ্যস্থতা যদি কেউ অগ্রাহ্য করে, তাহলে তার ঈমানের দাবী যে গ্রহণযোগ্য নয়, তা বলা হয়েছে।[৩৫] তিনি বলেন, কারো মধ্যস্থতা মানা আন্তরিক বিশ্বাস বা মৌখিক স্বীকৃতি হতে সম্পূর্ণ পৃথক। অথচ পবিত্র কুরআন মহানবীর (সা) এ ধরনের মধ্যস্থতা না মানলে ঈমানের দাবী অগ্রাহ্য করে। এর থেকে বোঝা যায়, ইসলামী বিধান মত সব ধরনের কাজই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।[৩৬] ইবন তাইমিয়ার মতে আন্তরিক ও মৌখিক স্বীকৃতি একজনকে মুসলমান করতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ঈমানদারে পরিণত করে না। ঈমানের দাবি অনুযায়ী কাজ না করলে কেউ সত্যিকার মু'মিন হতে পারে না। তাঁর মতে অন্তর যেমন বিশ্বাস করে, তেমনি অন্তরের কতকগুলো কাজও আছে। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে সর্বাধিক ভালবাসা, তাঁদের বিধানকে আন্তরিকভাবে পছন্দ করা, আল্লাহ্‌কে সর্বাধিক ভয় করা, আল্লাহ্‌র উপর একান্তভাবে নির্ভর করা, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অপছন্দনীয় জিনিসকে অপছন্দ করা এবং তাঁদের ভালবাসার জিনিসকে ভালবাসা প্রভৃতি মানসিক কাজগুলো ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এগুলো ঈমানের আভ্যন্তরীণ দিক। দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েও বাহ্যিকভাবে ঈমানের কাজ করতে হবে। তিনি মনে করেন, ঈমান যদি গভীরভাবে অন্তরে প্রবেশ করে, তাহলে সে অনুযায়ী কাজ না হয়ে পারে না।[৩৭]

বিশ্বাস ও কর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন ধর্মতাত্ত্বিকের মত আমরা এতক্ষণ পর্যালোচনা করেছি। তাঁদের তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি যদি আমরা বৃহত্তর মুসলিম সমাজের বাস্তব জীবন ধারার প্রতি লক্ষ্য করি, তাহলে দেখবো, মুসলমানদের বিশ্বাস ও কর্মের মাঝে বিরাট বৈপরিত্য ও ব্যবধান বিদ্যমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের মুসলমান বলে মনে করে এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও পরকালীন মুক্তির আশা রাখে। এটি আত্মপ্রবঞ্চনা না এর কোন ভিত আছে? গোনাহ্ করা সত্ত্বেও কি একজনকে মুমিন বা মুসলিম বলা যায়? বস্তুত ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ কোন ইসলামী বিধান লংঘন করে, তার পরিণতি কি—আমরা এখন তা নিয়ে আলোচনা করবো।

ঈমান ও আমলের সম্পর্ক আলোচনার সময় আমরা দেখেছি এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত রয়েছে। কিন্তু সেখানে আমলের প্রকৃতি তথা আল্লাহ্‌র হুকুম সম্পর্কে, তার শ্রেণীভেদ এবং ক্রমানুযায়ী গুরুত্ব নিয়ে কোন পর্যালোচনা হয়নি। বস্তুত আল্লাহ্‌র দু'ধরনের হুকুম রয়েছে। এক প্রকার ঃ আদেশসূচক, তিনি কতগুলো কাজ করতে এবং কতগুলো

৩৫. আল-কুরআন, ৪ ঃ ৬৫

৩৬. Ibn-Hazm, **Al Fisal** IV, pp. 225-26.

৩৭. Ibn-Taymiyyah, **Kitab-al-Iman**, pp. 221-22.

জিনিস অন্তরে পোষণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। দ্বিতীয় প্রকার ঃ নিষেধমূলক, তিনি অনেকগুলো কাজ করতে এবং অনেকগুলো জিনিস অন্তরে পোষণ করতে নিষেধ করেছেন। এর মাঝামাঝি রয়েছে আরও কতগুলো এমন প্রকৃতির জিনিস, যাদের কিছু সংখ্যককে তিনি উৎসাহিত ও অপর কিছু সংখ্যককে নিরুৎসাহিত করেছেন। সাধারণভাবে তাঁর স্পষ্টভাবে নিষেধকৃত জিনিস করা এবং আদেশকৃত কাজ না করাকেই গুনাহে কবীরা বলা হয়। গুনাহে কবীরার বিপরীতে রয়েছে সগীরা গুনাহ। তবে ক্রমাগত সগীরা গুনাহ করলে তা কবীরায় পরিণত হয়ে যায়।[৩৮] গুনাহে কবীরার উল্লেখ পবিত্র কুরআনেই রয়েছে।[৩৯] গুনাহে কবীরার বিবরণ বিভিন্ন হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে।[৪০] তবে স্থান, কাল এবং প্রশ্নকারীর জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। বিভিন্ন আয়াত এবং হাদীসের সামগ্রিক বিবেচনায় কবীরা গুনাহের দীর্ঘ তালিকা প্রণীত হয়েছে। মু'তাযিলাদের মতে যেসব অপরাধের জন্য শাস্তি বা ভীতির (ওয়াইদ) কথা এসেছে, সেগুলো কবীরা এবং যে সব অপরাধের জন্য শাস্তির কথা নেই, সেগুলো সগীরা। এখানে অবশ্য শাস্তি বলতে ইসলামী আদালত বা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট পার্থিব শাস্তিই (হদ্) বোঝানো হয়নি। পরকালীন তিরস্কারও এর অন্তর্ভুক্ত। কারো কারো মতে যেগুলোর জন্য শাস্তির কথা এসেছে, কেবল সেগুলোই কবীরা নয়, তাদের অনুরূপগুলোও কবীরা। বাগদাদী সম্প্রদায়ের জাফর ইবন মুবাশ্‌শিরের মতে সচেতনভাবে গুনাহের ইচ্ছাই কবীরা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে যে কোন মাসিয়াতের (অপরাধ) কর্তাই মহাপাপী।[৪১] বিশিষ্ট মু'তাযিলা চিন্তাবিদ আল-জুবাইর-এর মতে যদি কেউ গুনাহ্-ই-কবীরা হতে বিরত থাকে, সে তার সগীরা গুনাহের ক্ষমার আশা করতে পারে; কিন্তু গুনাহ-ই-কবীরা এমন যে এর দ্বারা মানুষ তার ঈমানের বিনিময় হারিয়ে ফেলে। কবীরা গুনাহের ইচ্ছা সগীরা; অবশ্য কুফরীর ইচ্ছা কুফরী। আবু হুদাইলের মতে কোন কিছুর ইচ্ছা করা তদনুরূপ কাজ করার শামিল।[৪২] গুনাহে কবীরাকারীদের পরিণতি সম্পর্কীয় বিভিন্ন মতবাদকে প্রধানত পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে ঃ

১. খারিজীদের মত; ২. মুরজিয়াদের মত; ৩. আহলে সুন্নাতের মত; ৪. মু'তাযিলা মত; হাসান বসরী প্রমুখের মত।

১. খারিজীদের মতে গোনাহে কবীরাকারী কাফির; কোন কোন ক্ষেত্রে মুশরিকও।

---

৩৮. Hadith, as quoted by Abu Udhbah, **al-Rawdah al-Bahiyyah**, (Hyderabad, 1904), p. 60.

৩৯. আল-কুরআন, ৪ ঃ ৩১; ৪২ ঃ ৩৬; ৫৩ ঃ ৩২ ইত্যাদি।

৪০. **মুসলিম শরীফ**, ঈমান অধ্যায়।

৪১. Al-Ashari, **Maqaalat al-Islamiyyin**, (Wiebaden : Franz Steiner. Verlag, 1963) p. 270-271.

৪২. Ibid, p. 270.

তবে পরবর্তীকালে খারিজীদের মধ্যে বিভিন্ন উপদলের (ফিরকা) সৃষ্টি হয় এবং কোন কোন উপদল কিছুটা নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে। খারিজীরা মূলত একটি চরমপন্থী রাজনৈতিক সম্প্রদায় এবং পবিত্র কুরআন ও হাদীসে খারিজীদের এ ধরনের মতের সমর্থন পাওয়া যায় না বিধায় এ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা হতে আমরা এখানে বিরত রইলাম।[৪৩]

মুরজিয়ারা ঈমান ও আমলকে সম্পূর্ণ পৃথক মনে করে এবং গুনাহের কারণে ঈমানের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসে না বলে তাদের ধারণা। বস্তুত এ মত কুরআন, হাদীসের শিক্ষা এমন কি সাধারণ মনস্তত্ত্ব বিরোধী। ঈমান থেকে আমলকে পৃথক করার মুরজিয়া এ নীতির ঐতিহাসিক পটভূমি ব্যাখ্যা করলেই তাদের আসল উদ্দেশ্য বোঝা যাবে। উমাইয়া শাসকদের অধিকাংশই আমলের দিক দিয়ে দুর্বল ছিলো এবং তাদের অনেকেই এমন সব কাজ করতো যা স্পষ্ট শরীয়াত বিরোধী। সমাজের বিবেকমান ও দীনদার শ্রেণী তাদের এসব অন্যায় কাজ সমর্থন করতেন না। এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা ঈমানের দাবি বলে মনে করতেন। মুরজিয়াদের অবস্থান ছিল ভিন্ন। তারা ছিল মূলত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সুবিধাবাদী শ্রেণী। তারা বলতো, কাজের সাথে ঈমানের কোন সম্পর্ক নেই। ঈমান অন্তরের ব্যাপার; আর আল্লাহ্ অন্তর্যামী, তিনি অন্তর দেখেন। এ যুক্তিতে তারা শাসক শ্রেণীর সাথে উঠাবসা করতো এবং তাদের দ্বারা উপকৃত হতো। তাদের মধ্যে ধুরন্ধর প্রকৃতির বিদ্বান গোষ্ঠী বাইরে ধর্মের লেবাস পরিধান করতো এবং বলতো শাসকদের সাথে এভাবে মেলামেশার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের নসীহত করা, যদিও তারা নিজেরা জানতো ফাসিকদের সাথে এভাবে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে নসিহত করা ইসলাম অনুমোদিত নয় এবং কালে-ভাদ্রে বিতরিত এ ধরনের নতজানু উপদেশ শাসক ও ধনিকরা গ্রহণ করে না। বরং এতে নসীহত তার মর্যাদা হারিয়ে ফেলে এবং তাদের প্রতি শাসকদের করুণা সৃষ্টিও বৃদ্ধি হয়। বস্তুত পার্থিব সুবিধাবাদকে পাকাপোক্ত করার জন্য তারা ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং কঠোর কর্মবাদী ইসলাম থেকে সৎকর্মকে বিচ্ছিন্ন করে পরিস্থিতিকে জটিল ও ঘোলাটে করে আত্মস্বার্থের জয়গান গাইতে থাকে। মুসলিম বিশ্বে বর্তমানেও কার্যত মুরজিয়াদের অভাব নেই।

গুনাহগারদের সম্বন্ধে আহলে সুন্নাতের মনোভাব বর্ণনা করার আগে ঈমান সম্বন্ধে তাদের ধারণা ব্যক্ত করা প্রয়োজন। এদের মতে ঈমানের তিনটি দিক আছে ঃ (ক) আন্তরিক বিশ্বাস, (খ) মৌখিক স্বীকৃতি, (গ) কার্যে প্রকাশ। সুতরাং যদি কেউ

---

৪৩. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Montgomery Watt, **The Formative Period of Islamic Thought** (Edinburgh : Edinburgh University. Press, 1973), pp. 9-37.

গুনাহকে গুনাহ্ মনে করে অপরাধ করে, তাহলে ঈমানের ঐ অংশে সে ঈমানদার থাকে না—'ফাসিক' হয়ে যায়। আর যদি গুনাহকে হালাল মনে করে তাতে লিপ্ত হয়, তাহলে আশ'আরীয়া এবং মাতুরীদি উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্যমত্যে সে 'কাফির' হয়ে যায়। আশ'আরীর মতে গুনাহগার 'ফাসিক' অর্থাৎ বিশ্বাসী, তবে জাহান্নামে শাস্তির যোগ্য।[৪৪] মাতুরীদির মতে তার পরিণতি অনিশ্চিত। গুনাহের জন্য নিশ্চয়ই সে শাস্তির যোগ্য, তবে ঈমান অন্যান্য সৎ কাজের জন্য সে পুরস্কারেরও আশা করতে পারে। তার পরিণতি আশা ও ভীতির মাঝখানে। চূড়ান্ত নির্ধারক আল্লাহ্ তায়ালা।[৪৫]

মু'তাযিলাদের মতে কবীরা গুনাহ্কারী মু'মিনও নয়, কাফিরও নয়। তার অবস্থান এর মধ্যবর্তী। মু'তাযিলাদের মতে আমল ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং যদি কেউ গুনাহে কবীরার দ্বারা আল্লাহ্র কোন স্পষ্ট আদেশ লংঘন করে, তাহলে সে আর মু'মিন থাকে না। যেমন একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ কোন ব্যাভিচারী ঈমান থাকা অবস্থায় ব্যভিচার করতে পারে না।[৪৬] পরবর্তীকালে মু'তাযিলাদের একটি অংশ এ ধরনের গুনাহ্গারদের 'ফাসিক' নামক একটি তৃতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে। তারা তাদের এ দাবির সমর্থনে কুরআন শরীফের একটি আয়াত উদ্বৃত করেন যেখানে মু'মিনদের বিপরীতে ফাসিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।[৪৭] অমু'তাযিলা চিন্তাবিদদের মতে ফাসিক কোন বিশেষ শ্রেণী নয়। তাঁদের মতে উল্লেখিত আয়াতে ফাসিক কাফির শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁরা বলেন, কুরআন ও হাদীসে ফাসিক আল্লাহ্র হুকুম লংঘনকারীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। কখনও আদেশ অমান্যকারী ব্যক্তি মু'মিন, কখনও বা কাফির। একমাত্র শিরক ব্যতীত ফাসিক সাধারণত মু'মিন শ্রেণীর্ভুক্ত হয়ে থাকে। তাঁরা বলেন, ফাসিকদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা এজন্য সম্ভব নয় যে, পরকালে কেবল জান্নাত ও জাহান্নাম আছে, তৃতীয় কোন স্থান নেই। সেজন্য স্বতন্ত্রভাবে কোন তৃতীয় শ্রেণীতে মানুষকে বিভক্ত করা যায় না। তাই শিরক বর্জিত ফাসিকদের সাধারণভাবে মুমিন শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে ইবনে হাযামের ব্যাখ্যা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে ঈমানের সাথে আমলের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে সে সম্পর্কের প্রকৃতি হলো এমন যে, ঈমান একটি বৃক্ষসদৃশ এবং প্রতিটি নেককাজ তার একটি শাখা স্বরূপ। সুতরাং যখন কেউ কেউ কোন গুনাহের কাজ করে তখন সে সংশ্লিষ্ট ঈমানের শাখাটি ভেঙ্গে ফেলে। তিনি আরও

---

৪৪. **The Encyclopaedia of Islam** (London : Luzac & co., 1960) Vol. I, p. 694.

৪৫. A.J. Wensinck, **Muslim Creed**, pp. 140-41.

৪৬. **মুসলিম শরীফ**, ঈমান অধ্যায়।

৪৭. আল-কুরআন ৩২ ঃ ১৮।

বলেন, সন্দেহাতীতভাবে ফিস্‌ক ঈমান নয় এবং যে কোন গুনাহের কাজ করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তার প্রকৃত ঈমান থাকে না। এভাবে তিনি উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যা করে বলেন, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মু'তাযিলাদের মত গ্রহণযোগ্য নয়।[৪৮]

গুনাহে কবীরাকারী মুনাফিক; আপাতদৃষ্টিতে এ মতটিকে অনেকটা মু'তাযিলাদের মতের কাছাকাছি মনে হয়। কারণ এ মতে গুনাহে কবীরাকারীরা মু'মিনও নয়, কাফিরও নয়, বরং তারা মুনাফিক। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে মুনাফিক শব্দটির বেশ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যারা অন্তরে কুফরী রেখে বাহ্যিকভাবে ঈমানের ঘোষণা দিতো এবং কিছু কিছু ইসলামী কাজ করতো, তাদেরকে মুনাফিক বলা হতো। এরা কাফিরদেরই দলভুক্ত এবং কুরআনের দৃষ্টিতে তাদের থেকে নিকৃষ্ট। এদের স্থান জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে।[৪৯] কিন্তু হাসান বসরী (র) প্রমুখের প্রভাবে পরবর্তীকালে মুসলিম ধর্মতত্ত্বে ব্যবহৃত 'মুনাফিক' শব্দ উল্লেখিত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। অথবা কাফির ও মু'মিন হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তৃতীয় শ্রেণী হিসেবেও তাদের পরিণতি নির্ধারণ করা হয়নি। বস্তুত হাসানের মতে এখানে মুনাফিকের তাৎপর্য ভিন্ন। তাঁর মতে সত্যিকার মু'মিন কখনও আমলের ব্যাপারে অমনোযোগী হতে পারে না। সে মহাপরাক্রমশালী ও কঠোর শাস্তিদাতা আল্লাহ্‌র হুকুমের অবাধ্যতার ভীতিপ্রদ পরিণতি হতে নির্বিকার থাকতে পারে না। বরং তার সাধ্যমত সমস্ত নেককাজ করে এবং তার শক্তির ও চেষ্টার সর্বাধিক ব্যবহারের পরও সে জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে না। এজন্য সর্বদাই একটি অনিশ্চয়তা ও আল্লাহ্‌র ভীতি তাকে তাড়া করে ফেরে। চরম এ মানসিক অনিরাপত্তার মধ্যে আল্লাহ্‌র অপার করুণা ও ক্ষমার আশাই তার একমাত্র সান্ত্বনা। তবে হাসান বসরী (র) কেবলমাত্র বাহ্যিক আমলকেই যথেষ্ট মনে করেন নি। বাহ্যিক আমলের সাথে সাথে তিনি জোর দিয়েছেন মনের ঐকান্তিক অনুভূতি ও স্বচ্ছতার উপর। তাঁর মতে কেবল নিষ্কলুষ অন্তর (কালবে সালিম) থেকে উৎসারিত আমলই আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় হতে পারে। পরকালীন মুক্তি ও আল্লাহ্‌র সন্তোষ ব্যতীত তার কাজের অন্য কোন উদ্দেশ্য হতে পারে না। সুতরাং মানুষের পার্থিব জীবনের উদ্দেশ্য হলো এমন জীবন গঠন করা যাতে সে আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় হতে পারে। তাঁর মতে যারা এরূপ উদ্দেশ্যে জীবন পরিচালিত করে না, বরং পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী সুখ-শান্তি ও সৌন্দর্যের পিছনে পড়ে, দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি কাজের হিসাবের ব্যাপারে অমনোযোগী এবং আল্লাহ্‌র শাস্তির প্রতি নির্বিকার, তাদের অন্তরে ঈমান গভীরভাবে প্রবেশ করেনি। বস্তুত এরা মুনাফিক। তাঁর বিখ্যাত উক্তি ঃ "মু'মিন ব্যতীত আল্লাহকে সত্যিকার অর্থে কেউ ভয়

---

৪৮. Ibn Hazm, **Fisal**, IV. pp. 191, 195.

৪৯. আল-কুরআন, ৪ ঃ ১৪৫

করে না এবং মুনাফিক ব্যতীত তাঁর শাস্তি হতে কেউ নিরাপদ বোধ করে না।"[৫০] হাসান তাঁর সমকালীন মুসলমান সমাজের এক অংশের জীবনধারা দেখে দারুণ ব্যথিত হয়েছিলেন। সত্যিকার মু'মিন ও প্রকৃত কাফিরদের সম্বন্ধে তাঁর কোন উদ্বেগ ছিল না। কারণ তাদের আচরণ বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তিনি গভীরভাবে উৎকণ্ঠিত ছিলেন ঐ সব লোক সম্বন্ধে যারা নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দেয় অথচ নেককাজ করে না; আবার নিজেদের নাজাতের ব্যাপারে নিশ্চিতি বোধ করে। তিনি এই বিভ্রান্ত মুসলমানদের মুক্তির প্রকৃত রাজপথে আনার চেষ্টা করেছেন সারা জীবনব্যাপী।

উপরের আলোচনা এবং মুসলমানদের ব্যবহারিক জীবন থেকে একটি জিনিস স্পষ্ট যে, কর্মের দিক দিয়ে এমন কি আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী মুসলমানদের মধ্যেও বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্যের কারণে মূল পরিণতিতে পরিশেষে চূড়ান্ত পরিবর্তন না হলেও পরকালীন জীবনে মর্যাদা ও আল্লাহ্‌র সন্তোষপ্রাপ্তির পরিমাণে যে পরিবর্তন সূচিত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে জন্য ক্ষমাপ্রাপ্তির এবং বেহেশতে স্থান লাভের পরও এসব মানুষের মধ্যে যে অনুশোচনা হবে সে কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কর্মের মধ্যে পরিবর্তন বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও পার্থক্য সূচনা করে কি না অর্থাৎ ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে কি না তা এ পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সে জন্য আমরা এখন এ সম্বন্ধে আলোকপাত করবো।

ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধি

মূল ঈমান স্থিতিশীল কিছু, না এর হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে? আমলের দ্বারা ঈমানের মধ্যে কোন পরিবর্তন সূচিত হয় কি না? সাধারণ মুসলমানদের ঈমান ও বিশিষ্ট লোকদের ঈমানের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? এমনি ধরনের প্রশ্ন নিয়ে ধর্মতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। ঈমান যে বাড়ে বা কমে এ সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[৫১] হাদীসেও ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। ব্যক্তি বিশেষের মধ্যেও যে ঈমানের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয় তাও হাদীস দ্বারা সমর্থিত। আহলে সুন্নাতের মতে সমস্ত মুসলমানদের ঈমান হতে হযরত আবূ বকর (রা)-এর ঈমান অধিকতর ভারী।[৫২] এতদসত্ত্বেও এ সম্বন্ধে ধর্মতাত্ত্বিকরা ভিন্নমত পোষণ করেন। আমরা তাঁদের এ মত পার্থক্যের ব্যাখ্যা নিয়ে এখানে আলোচনা করবো। তার আগে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্বন্ধে বিভিন্ন উপদলের মত উল্লেখ করতে চাই।[৫৩]

---

৫০. Quoted by H. Ritter from Hilyah, al Awliya in 'Der Islam' (XXI, 1933), p.43.

৫১. আল-কুরআন, ৯ : ১২৪, ৩৩ : ২২; ৩৯ : ২২-২৩, ৪৮ : ৪; ৭৪ : ৩১ ইত্যাদি।

৫২. M.M. Zakaria, **Stories of the Companions of the Prophet** (New Delhi : Idaraye Diniyat, 1973), ch. II, sec 5. p. 35.

৫৩. of Maqalat, pp. 132-39; **Fisal.** IV. p. 221. **Kitab al-Iman**. pp. 193-98.

১. সালেহিয়া সম্প্রদায়ের মতে (আবু আল হুসাইন সালেহী এ মতের প্রবর্তক) ঈমান একটি অবিভাজ্য একক। সুতরাং এর কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই।

২. জাহমিয়া সম্প্রদায়ের মতে (জাহম ইবনে সাফওয়ান এ মতের প্রবর্তক) ঈমান অবিভাজ্য। তাই এর হ্রাস-বৃদ্ধি সম্ভব নয়।

৩. শিমরিয়া সম্প্রদায়ের মতে (আবূ শিমির এ মতের প্রবর্তক) ঈমান অবিভাজ্য। সুতরাং এর হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে না।

৪. সাওবানিয়া সম্প্রদায়ের মতে (আবূ সাওবান এ মতের প্রবর্তক) ঈমান কমতে পারে না, কিন্তু এর বৃদ্ধি হতে পারে।

৫. নাজ্জারিয়া সম্প্রদায় (নাজ্জার এ মতের প্রবর্তক) মনে করে ঈমান কমতে পারে না, কিন্তু বাড়তে পারে। আল্লাহ্‌র মারিফাতের ব্যাপারে পার্থক্য হয়।

৬. হানাফী সম্প্রদায়ের মতে (ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) এ মতের প্রবর্তক) ঈমান অবিভাজ্য, স্থিতিশীল। ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে না।

৭. গাইলানিয়া সম্প্রদায় (গাইলান এ মতের প্রবর্তক) মনে করে ঈমান অবিভাজ্য। তাই এর কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই।

৮. গাস্‌সানিয়া সম্প্রদায় (গাস্‌সান এ মতের প্রবর্তক) মনে করে ঈমানের বৃদ্ধি হতে পারে, কিন্তু হ্রাস সম্ভব নয়।

৯. ইমাম বুখারীর মতে ঈমান স্থিতিশীল কিছু নয়; এর-হ্রাস বৃদ্ধি হয়।[৫৪]

১০. ইবনে হাযামের মতে ঈমানের মধ্যে আমল অন্তর্ভুক্ত বিধায় আমলের অংশে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে ঈমানের মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে। তবে আন্তরিক বিশ্বাস (তাস্‌দীক) একটি অবিভাজ্য একক। এক্ষেত্রে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি সম্ভব নয়।

১১. ইমাম গায্‌যালীর মতে ঈমানের আন্তরিক প্রত্যয়গত অংশটি স্থিতিশীল। তবে আমলের ক্ষেত্রে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। ইসলাম সম্বন্ধে পরিপক্ক জ্ঞান, তাক্‌ওয়ার (আল্লাহ্‌ভীতি) অনুসৃতি ও পবিত্র জীবন-যাপন করার মাধ্যমে মানুষের ঈমানের মধ্যে বিশেষ 'নূর' পয়দা হয় এবং এ ধরনের মানুষের কাছে আল্লায়ী বিধানের বিশেষ তাৎপর্য ধরা পড়ে। এজন্য গায্‌যালী মনে করেন, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং জ্ঞান ও আমলের বৃদ্ধি হেতু ঈমানের ক্ষেত্রেও বৃদ্ধি হতে পারে। ঠিক একইভাবে ইসলাম বিরোধী কাজ ও নফসানী প্রবণতার ফলে ঈমানের ক্ষেত্রে হ্রাস ও হতে পারে। সাধারণ লোকের ঈমান গ্রহণযোগ্য কি না এ নিয়ে ধর্মতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। আশ'আরীয়াদের এক অংশ এবং আহলে হাদীসের এক অংশ 'তাকলীদ বিল ঈমান' (ঈমানের ব্যাপারে অন্যের অনুসরণ)-কে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। গায্‌যালী এদের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন, এতে করে

৫৪. বুখারী শরীফ, ঈমান অধ্যায়।

কয়েকজন মুতাকাল্লিম (যুক্তিবাদী ধর্মতত্ত্ববিদ) ও বিদ্বান ব্যক্তি ছাড়া ইসলামের প্রশস্ত রাজপথ সাধারণের জন্য সংকুচিত হয়ে যায়। মনে হয় এ সমস্ত গুটি কয়েক লোক ছাড়া আর কেউ বেহেশতে যাবে না এবং আল্লাহ্‌র অপার ক্ষমা ও দয়ার যেন এরাই একমাত্র হকদার।[৫৫]

১২. মু'তাযিলাদের মতে ঈমানের মধ্যে যেহেতু আমল অন্তর্ভুক্ত, সেজন্য আমলের সাথে সাথে ঈমানেরও হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে।

১৩. ইবনে তাইমিয়ার মতে আন্তরিক বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও গভীরতা, ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান ও বিস্তৃত জ্ঞান অর্জন এবং আমলের ক্ষেত্রে পার্থক্য অনুযায়ী ঈমানের মধ্যেও পার্থক্য হয়।

১৪. ইমাম আশ'আরীর মতে 'তাস্‌দীক' স্থিতিশীল; তবে ঈমানের স্বীকারোক্তি এবং আমলের অংশে হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে।

১৫. ইমাম মাতুরীদীর মত ঃ তিনি ইমাম আযম আবূ হানীফার মত সমর্থন করে বলেন ঈমান অবিভাজ্য, এর হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। তবে আমলের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

প্রতিটি মত সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তাই আমি বিভিন্ন মতের একটা সমন্বিত আলোচনা করবো। উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন মতের সারাংশ হলো ঃ

ক. ঈমান স্থিতিশীল; খ. ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে; এবং গ. ঈমান হ্রাস পেতে পারে না, কিন্তু এর বৃদ্ধি সম্ভব। আমার মনে হয় দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য এবং একদেশদর্শী বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করার ফলে বিভিন্ন তাত্ত্বিকদের মধ্যে মতানৈক্য দৃষ্টি হয়। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বিভিন্ন তাত্ত্বিক তাঁদের স্ব স্ব অবস্থানে ঠিক আছেন। তবে সহানুভূতিশীল হলে ত্রিধাবিভক্ত ব্যাখ্যার পরিবর্তে ঈমানে একটি সমন্বয়ধর্মী ও সামগ্রিক রূপ প্রণয়ন করা সম্ভব। বস্তুত ঈমানকে যাঁরা স্থিতিশীল বলেছেন, তাঁরা ঈমানের মৌলিক বিশ্বাস্য বিষয়গুলো (Basic articles of Faith) যে সুনির্দিষ্ট এবং সংখ্যাগত দিক দিয়ে (numerically) যে এদের মধ্যে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে না--এ দিকটির প্রতিই গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন, আল্লাহতে বিশ্বাস, আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস হিসেবে এর মধ্যে কোন হ্রাসবৃদ্ধি হতে পারে না। অপরদিকে, যারা ঈমানের ক্ষেত্রে কোন হ্রাস হতে পারে না, কিন্তু বৃদ্ধি হতে পারে—এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাঁরা আলোচ্য ক্ষেত্রে আল্লাহ্ সম্বন্ধে একটি ন্যূনতম ধারণাকে আবশ্যিক মনে করেছেন। বস্তুত, এর নিম্নে গেলে আল্লাহ্‌র ধারণা সংকুচিত হয়ে যায় এবং তাকে প্রকৃত আল্লাহ্‌র বিশ্বাস বলা যায় না। অপরদিকে, আল্লাহ্ সম্পর্কিত এ ন্যূনতম ধারণা বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও নেককাজের পরিণতিতে

---

৫৫. Al Ghazali, **Faysal-al Tafriqah**, ed. by Sulayman Dunya (Cario : Isa al-Babi-al Halabi, 1961). pp. 202-204.

গভীর, ব্যাপক ও দীপ্তিমান হতে পারে। সে জন্য তাদের মতে ঈমানের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি হতে পারে। অন্যদিকে যারা ঈমানের মধ্যে আমলকে অন্তর্ভুক্ত করেন, তাঁদের যুক্তি বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। কারণ বাহ্যত মানুষের আমলের মধ্যে পার্থক্য হয়। সুতরাং আমলের এ পার্থক্য ঈমানের ক্ষেত্রেও পার্থক্য এবং পরিবর্তন সূচনা করে এবং সে হিসেবে ঈমানের মধ্যেও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

ইমাম মাতুরীদি, ইমাম গায্যালী এবং কিছু সংখ্যক সূফী ঈমানের বৃদ্ধি বলতে দীপ্তি ও উজ্জ্বলতায় অধিক্য বুঝিয়েছেন। এ অর্থে কিছু লোকের ঈমান অনেক বেশী দীপ্তিমান ও আলোকোজ্জ্বল (নূরানী); অপর কিছু লোকের ঈমান তদ্রূপ নূরানী নয়। আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি গভীর ভালবাসা, তাঁদের পছন্দনীয় জীবন-যাপন, পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য ও ভোগ-সুখের সাথে সম্পর্ক বর্জন ও নেক্‌কাজের আধিক্য হেতু মানুষের ঈমানের মধ্যে এ 'নূর' বৃদ্ধি পায়। হযরত আবূ বকর (রা) প্রমুখের ঈমানের বৃদ্ধি ও সাধারণ মানুষের তুলনায় তাঁদের ঈমানের আধিক্য এ অর্থে গ্রহণ করতে হবে।[৫৬]

অপর দিকে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, নেক কাজ বর্জন এবং ক্রমাগত কবীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে কি একজন মুসলমান ঈমান হারিয়ে ফেলতে পারে? অর্থাৎ ঈমানের ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও সে কি এমন পর্যায়ে নেমে যেতে পারে যে তাকে 'কাফির' বলা যায়? অন্য কথায়, একজন মুসলমানকে কোন অবস্থায় কি কাফির বলা যায়? অথবা কাফির বলার সত্যিকার মানদণ্ড কি? বিশ্বাস ও আমলের দ্বন্দ্ব ও অসামঞ্জস্যের এ পর্যায়ে এগুলো হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমরা এখন এ সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

কাউকে কাফির বলা

মুসলিম সমাজে প্রথম 'কাফির' শব্দ খারিজীরা ব্যবহার করে। হযরত উসমানের শাহাদতের পর খিলাফত নিয়ে হযরত আলী ও আমীর মুয়াবিয়ার মধ্যে মতবিরোধ, দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধের পরিণতিতে খারিজী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়। "যারা আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী ফয়সালা (সিদ্ধান্ত গ্রহণ) করে না, তারা কফির।"[৫৭] এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে সব ধরনের মানবীয় প্রশাসন ও নেতৃত্ব অস্বীকার করে তারা তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণকারী সবাইকে কাফির আখ্যা দেয়। বিশেষ করে হযরত আলী-মুয়াবিয়া, যুদ্ধের মধ্যস্থতাকারী আমর-ইবন-আস, আবূ মূসা আশ'আরী, তাঁদের সমর্থক এবং যারা এ ফয়সালায় সন্তুষ্ট সবাই কাফির—এ ছিল খারিজীদের মত। এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে তারা ওয়াজিব মনে করে এবং এর ভিত্তি হিসেবে আল-কুরআনের অপর একটি আয়াত দাঁড় করায় যেখানে মধ্যস্থতা অমান্যকারীদের সাথে প্রত্যাবর্তন না করা

---

৫৬. of **Fiqh Akbar** I(As referred by Wensinck p. 3) [Hyderabad, 2nd edition, 1365 H.A.], p. 8.

৫৭ আল-কুরআন, ৫ : ৪৪।

পর্যন্ত যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে।[৫৮] যা হোক তাদের এ চরম মতবাদ বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। তবে অমুসলমানদের কাফির হিসেবে চিহ্নিত করার পরিবর্তে পরবর্তীকালে কিছু সংখ্যক মুসলমান অপর মুসলমানকে কাফির বলার খারিজীদের এ ধিকৃত ঐতিহ্য অনুসরণ করে। একটি রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক অস্ত্র হিসেবে দলীয় রাজনীতিতে প্রতিপক্ষ এবং ভিন্নমত পোষণকারী অপর মুসলমানদের প্রতি অবলীলাক্রমে এটি ব্যবহৃত হতে থাকে। মুসলিম সমাজের ঐক্য ও সম্প্রীতির মধ্যে এ পদের নির্বিচার ব্যবহার একটি দারুণ উত্তেজনা এবং তিক্ততার সৃষ্টি করে মূল সমাজের মধ্যে ফাটল ধরায়। অনেক সময় বহিঃশক্তির ইন্ধনে ফাতোয়াবাজদের এ তৎপরতা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটায়। প্রায় দেড় হাজার বছর পরেও দুঃখজনক এ পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিবর্তে বরং উদ্বেগজনকভাবে বিভেদ সৃষ্টির এ প্রবণতাই অব্যাহত রয়েছে। সামান্যতম মতবিরোধ বা ছোট-খাট ভুলের জন্য পর্যন্ত এ ভয়াবহ পদের ক্রমাগত ব্যবহার হচ্ছে।

মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ওয়াসিল বিন আতার সমসাময়িক 'আবদুল ওয়াহাবের ভ্রাতুষ্পুত্র বকরের অভিমতের বর্ণনা তদানিন্তন বিদ্বেষ ও কোন্দলের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক আলেখ্য : 'যে কোন পাপ, তা ছোটই হোক বা বড় হোক, যেমন ভুলক্রমে কারো থেকে একটি সরিষা নেয়া বা আনন্দচ্ছলে কোন ক্ষতিহীন মিথ্যা কথন, আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করার সমতুল্য। যে ব্যক্তি এ ধরনের কোন পাপ করে, সে কাফির ও মুশরিক। চিরদিন সে জাহান্নামে থাকবে।'[৫৯] বস্তুত এভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায় একে অপরকে কাফির বলতে থাকে। কাফির শব্দের অপব্যবহার এভাবে যখন অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলছিল, তখন মুসলিম সমাজের কল্যাণকামী, বিবেকবান ও চিন্তাশীল অংশের কাছে নির্বিচারভাবে কাফির বলার এ প্রবণতাকে বন্ধ করার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। কিন্তু জোর করে বা কেবল আবেগের দ্বারা এ মানসিকতা বন্ধ করা সহজ ছিল না। তাই ধর্মীয় সংহতি রক্ষার আবেদন এবং যুক্তি প্রয়োগের সাথে সাথে সুস্পষ্ট কিতাবী প্রমাণাদির ভিত্তিতে এ সম্পর্কে একটি সুসংহত তত্ত্ব প্রণয়নের কাজে ইমাম গায্‌যালী (র) এগিয়ে আসেন। আমরা অতি সংক্ষেপে গায্‌যালীর এ মতবাদ বর্ণনা করছি। গায্‌যালী একজনকে কাফির বলার ত্রিবিধ তাৎপর্যের কথা উল্লেখ করেন। কাউকে কাফির বলা অর্থ হলো ঃ ১. সে চিরদিন জাহান্নামে থাকবে; ২. সে কোন মুসলমান নারীকে বিয়ে করতে পারবে না। তার নিরাপত্তা-বিধিও ভিন্ন। এবং আমাদের উত্তরাধিকার আইন দ্বারাও সে সংরক্ষিত নয়, ৩. সে যা [ধর্ম সম্বন্ধে] বলে, তা মিথ্যা ও কল্পনাপ্রসূত এবং তার বিশ্বাস অজ্ঞতা ছাড়া

৫৮. ঐ, ৪৯ ঃ ৯।

৫৯. Ibn Hazm, **Fisal**, IV, p. 191; Also Ashari, **Maqalat**, p. 286.

কিছু নয়। গায্যালীর মতে কাউকে কাফির মনে করার ভিত্তি প্রজ্ঞা বা ব্যক্তিগত যুক্তি বা পছন্দ অপছন্দ হতে পারে না; এর ভিত্তি ওহী। একমাত্র আল্লাহ্‌র বিধানই কাফির মনে করার মানদণ্ড।[৬০] এজন্য তাঁর মতে কে কাফির তা বলার আগে আমাদের সামনে 'কুফর' কি, তা স্পষ্ট হওয়া উচিত। তিনি মনে করেন 'কুফর' হলো রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বা তাঁর দ্বারা আনীত বিধানের ব্যাপারে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। এ অর্থে 'তাকযীব' [মিথ্যা প্রতিপন্ন করণ], তাস্‌দীক [সত্য বলে বিশ্বাস ও গ্রহণ]-এর বিপরীত। তাঁর মতে ঈমান হলো রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কর্তৃক আনীত বিধানকে সত্য বলে গ্রহণ করা।[৬১]

ইমাম গায্যালী (র) ছয় পর্যায়ে কুফরীকে বিভক্ত করেন ঃ

১. ইয়াহূদী, খ্রীস্টান, মূর্তিপূজক, অগ্নি উপাসক প্রভৃতি ঃ এরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, সেজন্য সর্বসম্মতিক্রমে কাফির। পবিত্র কুরআনেও এদের সুস্পষ্টভাবে কাফির বলা হয়েছে।

২. ব্রহ্মবাদী ও বস্তুবাদী : ব্রহ্মবাদীরা কেবল রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে নয়, বরং সব ধরনের নবূওতী পরিকল্পনাকেই অস্বীকার করে। এজন্য এরা কাফির। অন্যদিকে, বস্তুবাদীরা শুধু নবূওতকেই অস্বীকার করে না; নবীদের (আ) যিনি প্রেরণ করেন, সেই আল্লাহকেও অস্বীকার করে। এজন্য এরা আরও শক্ত কাফির। ঠিক একইভাবে যারা এমন কোন মত পোষণ করে যা নবূওতী প্রোগ্রামের অপ্রয়োজনীয়তা বা তার সত্যতা অস্বীকার করার দিকে নিয়ে যায়, তারাও এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত।

৩. দার্শনিক সম্প্রদায় ঃ গায্যালীর মতে এঁরা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, নবূওতী মিশনের সত্যতা ও প্রয়োজনীয়তা এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কর্তৃক আনীত বিধানের সত্যতা স্বীকার করেন; কিন্তু এর সাথে সাথে এমন অনেকগুলো মতবাদ পোষণ করেন, যা সুস্পষ্টভাবে ওহীর বিরুদ্ধে যায়। যেমন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে, সাধারণ লোক ভুল বুঝে বিভ্রান্ত হতে পারে, এ আশঙ্কায় মহানবী (সা) অনেক গূঢ় জিনিস সাধারণে প্রকাশ করেননি। গায্যালীর মতে এর অর্থ হলো, মহানবী (সা) প্রকৃত সত্যকে প্রচ্ছ রেখেছিলেন। মহানবী (সা) সম্বন্ধে এরূপ ধারণা পোষণ করা তাঁর নবূওতী দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে অপূর্ণতা এবং অবিশ্বস্ততা তথা তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপের শামিল ফলে এ মতাবলম্বীরা নিঃসন্দেহে কাফির। অধিকন্তু নিম্নোক্ত তিনটি ক্ষেত্রে তাদের কুফরী স্পষ্টধারণ করেছে : (ক) মানুষের দৈহিক পুনরুত্থান, বেহেশতে নেক্‌কারদের সুখভোগ এবং দোযখে পাপীদের শাস্তি ও ক্লেশপ্রাপ্তিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ না করে রূপক ব্যাখ্যা দান; (খ) আল্লাহ্‌ সার্বিক জানেন, বিশেষ জানেন না; (গ) জগৎ চিরন্তন

৬০. Al-Ghazali, **al-Iqtisad fi-al-Itiqad**, I.A. Cubukcu and Huseyn Atay (eds.), (Ankara : Nur Matbassi, 1962), pp. 242-47.

৬১. **Al-Ghazali, Faysal**, p. 134.

এবং এর বিনাশ নেই। জগতের উপর আল্লাহ্‌র মর্যাদা ও অগ্রবর্তিতা কাজের উপর কারণের অনুরূপ।' গায্‌যালী বলেন, যদিও দার্শনিকরা তাদের এসব কুফরী বিশ্বাস গোপন করার নিষ্ফল প্রয়াস চালিয়েছেন, কিন্তু সত্য গোপন থাকেনি।

৪. মু'তাযিলা ও অন্যান্য সম্প্রদায় ঃ এরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সত্যবাদিতায় ও তিনি যে পূর্ণ দায়িত্বের সাথে সব কিছু মানুষকে জানিয়েছেন, তা বিশ্বাস করেন। কিন্তু পবিত্র কুরআনের কোন কোন আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাদের রূপক অর্থ [তা'বিল] করেন। এ ধরনের লোক বিশেষ করে যারা আহল-ই-কিবলা [কিবলাকে সামনে রেখে সালাত আদায় করে], তাদের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব কুফর-এর ধারণার প্রয়োগ হতে বিরত থাকা দরকার।

৫. গায্‌যালীর মতে যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে না ঠিকই, কিন্তু মৌলিক বিধানের ব্যাপারে প্রমাণ দেয়া সত্ত্বেও সন্দেহ পোষণ করে, তারা কাফির। যেমন যদি কেউ সালাতের আবশ্যকীয়তা বা তার প্রতিপালনের সুস্পষ্ট পদ্ধতি সম্বন্ধে বলে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা বলেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু আমি নিশ্চিত নই যে, এসব কথা কি তিনি সত্যিই বলেছেন না তাঁর প্রতি আরোপ করা হচ্ছে, অথবা কা'বা শরীফ সম্বন্ধে বলে যে, আমি নিশ্চিত নই যে, এটাই কি সে স্থান যে সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, অথবা মহানবী (সা) যেখানে এসেছেন, ইত্যাদি। গায্‌যালী (র) মনে করেন, এ ধরনের সন্দেহ ও কুটতর্ক যদি মৌলিক ব্যাপারে হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে এরূপ ব্যক্তি কাফির। আর যদি সরল ও আন্তরিকভাবে গৌণ ব্যাপারে হয়, তাহলে আইনগত [ফিকহী] ক্ষেত্রে হলে তা হবে ভুল ও নিন্দনীয় অজ্ঞতা এবং বিশ্বাসগত [আকীদা] ক্ষেত্রে হলে হবে ঘৃণ্য বিদ্'আত।

৬. গায্‌যালীর (র) মতে যারা ইজ্‌মার সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করে তাদের কাফির মনে করা সন্দেহজনক। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে অস্বীকারকারী কোন সহীহ হাদীস বা মৌলিক বিধান অস্বীকার করছে না। সর্বসম্মত ইজমার নানা জটিল শর্ত [যেমন একজন প্রতিনিধিত্বশীল মুজতাহিদ ভিন্নমত পোষণ করলে তা আর যথার্থ ইজ্‌মা থাকে না] এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অজ্ঞ বা ভুল করেছে বলাই অধিকতর নিরাপদ।[৬২]

'তাকফীর' [কাকে কাফির মনে করা হবে] সংক্রান্ত গায্‌যালীর এ মত নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে। বিশেষত 'তাবিল' সম্পর্কে তাঁর ধারণা অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। তাঁদের কাছে 'তাবিল' 'তাকযীব'-এরই ভিন্নরূপ। গায্‌যালী এ সমালোচনার বিস্তৃত উত্তর দিয়েছেন। তা আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের আওতার বাইরে। আমরা শুধু এখানে এতটুকুই উল্লেখ করবো যে, গায্‌যালীর মতে সব ধরনের তাবিলই কুফরী নয়। বিশেষ শর্তাধীনে অনেক সময় 'তাবিল' জরুরীও বটে। উদাহরণ স্বরূপ, এখানে

৬২ Ibid, pp. 195, 200; **Also Iqtisad**, pp. 248-53.

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)-এর কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি তাবিলের চরম বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তিন স্থানে তাবিল করতে বাধ্য হয়েছেন। গায্যালী (র) বলেন, ইমাম আহমদ (র) যদি আরও গভীরভাবে গবেষণা করতেন তাহলে এ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেতো। তবে গায্যালীও নির্বিচার তাবিলের ঘোর বিরোধী। তিনি তাবিল গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কতকগুলো আবশ্যকীয় শর্তের উল্লেখ করেছেন। গায্যালীর মতে তাবিলের জন্য এ প্রমাণ (বুর্হান) থাকতে হবে যে, আলোচ্য আয়াত বা হাদীসের আক্ষরিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়—যেমন ইমাম হাম্বল 'হাজর-ই-আসওয়াদের' ক্ষেত্রে করেছেন। যদি এরূপ কোন প্রমাণ না থাকে, তাহলে আয়াত বা হাদীসের ইচ্ছামত রূপক ব্যাখ্যা দান নিঃসন্দেহে কুফরী। আর যদি সেরূপ প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় যে, রূপক ব্যাখ্যা ধর্মের জন্য ক্ষতিকর, তাহলে সেক্ষেত্রে রূপক ব্যাখ্যা দান করা ধর্মের মূলবাণীকে বিকৃতকারী বিদ্'আত [ধর্মে অভিনব কিছু সংযোজন]। তাছাড়া, রূপক ব্যাখ্যা যদি সাধারণ স্বীকৃত আরবী ভাষার পরিপন্থী, স্বাধীন বা মুজতাহিদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-নির্ভর হয়, তাহলে সেরূপ ব্যাখ্যাও কুফরী হবে।[৬৩]

কুফরীর প্রকৃতির পর্যালোচনা আমাদের আর একটি সমস্যার সম্মুখীন করে, সেটি হলো কাফির কি না এটা যে সন্দেহ করে, তার অবস্থা কি? যে সুস্পষ্ট কাফিরের কাফির হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ করে, সব মতাবলম্বীদের মতেই সে কাফির। এর কারণ কুফরকে সন্দেহ করার অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম। আর এমতাবস্থায় তার নিজের ঈমান থাকে না। তবে মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের বাগদাদী উপদলের মতে এরূপ সন্দেহকারীকে যে কাফির মনে না করে সেও কাফির এবং দ্বিতীয় সন্দেহকারী কাফির কি না এটা যে সন্দেহ করে, সেও কাফির এবং ক্রম অন্তহীন। পক্ষান্তরে, এ সম্প্রদায়ের বসরা-উপদলের মতে, প্রথম সন্দেহকারী নিঃসন্দেহে কাফির; কিন্তু পরবর্তী সন্দেহকারী গুনাহ-ই-কবীরাকারী ফাসিক, কারণ সে কুফর যে কুফর, এটা সন্দেহ করছে না বরং দ্বিতীয় সন্দেহকারী সন্দেহ করে কুফর করছে কি না, এটা সন্দেহ করছে।[৬৪] সরাসরিভাবে যা কুফর কেবল তা-ই কুফর নয় বরং যা যৌগিকভাবে কুফরের দিকে ধাবিত করে, তাও [প্রথম দৃষ্টিতে যা যতই নির্দোষ মনে হোক না কেন] কুফর।[৬৫] কে কাফির এ সম্বন্ধে ইমাম তাহাবীর মত উল্লেখযোগ্য। তিনি মনে করেন, একমাত্র যে জিনিসের মাধ্যমে মানুষ ঈমানের পরিসীমায় প্রবেশ করে তার অস্বীকৃতি ব্যতীত আর কিছুই তাকে এর সীমারেখা থেকে বহিষ্কার করতে

---

৬৩. Ghazali, **Faysal,** pp. 175-199.

৬৪. Al-Malati, **al-Taubih wa-al-Radd**, edited by Izzah al-Attar-al Husayni (Cario, 1949), p. 45.

৬৫. Al-Baghdadi, **al-Faraq Bayna al-Faraq**. (Cario : Matba'at al-marif, 1910), p. 330.

পারে না।[৬৬] বাহ্যিকভাবে তাহাবীর মত বেশ আকর্ষণীয় মনে হলেও মানুষ সত্যিকারভাবে কিসের মাধ্যমে ঈমানদার হয়, তা এক জটিল প্রশ্ন। উপরে আমরা এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। সুতরাং বাস্তবে গায্যালীর ব্যাখ্যার অতিরিক্ত কিছু সংযোজন করা অসম্ভব বলেই আমার মনে হয়। বস্তুত, মুসলিম ধর্মতত্ত্বে এ সম্পর্কে গায্যালীর মতই নমনীয় ও ভারসাম্যপূর্ণ।

একজন মুসলমানকে কাফির মনে করার জটিলতা মুসলিম ধর্মতত্ত্বে একটি বিপরীতধর্মী প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে, সেটি হলো একজন মানুষ নিজে কি তার ঈমানের দাবী করতে পারে?

ঈমানের দাবী

কেউ কি সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে নিজের ঈমানের দাবী করতে পারে? সে কি তার অন্তঃস্থিত বিশ্বাসের শর্তহীন প্রকাশ ঘটাতে পারে এভাবে যে, আমি সত্যিই একজন মু'মিন? অথবা তার নিতান্ত ব্যক্তিগত বিশ্বাস প্রকাশের ব্যাপারেও সে যা বলতে পারে তা হলো ইনশাআল্লাহ্ [আল্লাহ্ চাইলে বা আল্লাহ্র ইচ্ছায়] আমি একজন মু'মিন? সাধারণভাবে এটাকে একটি তুচ্ছ প্রশ্ন বলে মনে হয় এজন্য যে, আমি যদি মুনাফিক না হই, মুসলিম সমাজকে মিথ্যা কথা বলে প্রতারণা না করি, পার্থিব জীবনে নিঃশর্ত নিরাপত্তা বা মুসলিম সমাজে বিশেষ কোন সুবিধা লাভই যদি আমার উদ্দেশ্য না হয়, বরং আমি যদি সরল ও আন্তরিকভাবে আল্লাহ্র সন্তোষপ্রাপ্তির জন্য মু'মিন হই, তাহলে আমি কেন তা শর্তহীনভাবে প্রকাশ করতে পারবো না? বরং ঈমানের এ ঘোষণা দেয়ার মাধ্যমেই তো একজন মানুষ কুফরীর অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ পরিত্যাগ করে ইসলামের আলোকোজ্জ্বল রাজপথের পথিক হয়। বস্তুত ঈমানের এ ঘোষণা দেয়ার মধ্য দিয়েই সে ইসলামী সমাজের একজন সদস্য হয় এবং তার আনুগত্যের নিরাপত্তা ও অন্যান্য ইসলামী স্বীকৃতি অধিকার লাভ করে। সুতরাং এ দাবী কেবল অনুমোদনীয়ই নয়, বরং মুসলমান হিসেবে তাকে এ দাবী করতেই হবে। এ ঘোষণা ব্যতীত কিভাবে একজন মানুষকে মুসলমান হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব? সেজন্য প্রথম দৃষ্টিতে এ প্রশ্নটিকে স্ববিরোধী বলে মনে হয়। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, প্রশ্নটি মাত্রই সহজ নয়। এর বাহ্যিক সরল রূপের অন্তরালে গভীর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। এ প্রশ্নের উত্তরকে কেন্দ্র করে আহ্লে-সুন্নাতের দুটো সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে। আশ'আরীয়াদের মতে একজন শর্তহীনভাবে তার ঈমানের ঘোষণা দিতে পারে না। তাঁরা তাঁদের এ মতবাদকে পবিত্র কুরআন, কয়েকজন সাহাবা এবং পূর্ববর্তী কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনাচারের উপর ভিত্তি

---

৬৬. Mohammad Ali, **The Religion of Islam**, (Lahore : Ahmadiyya Anjuman Ishayat Islam, 1973), p. 107.

করে প্রণয়ন করেন। পরবর্তীকালে ইমাম গায্যালী (র) এঁদের সমর্থন করেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ 'তোমরা এমন কথা বলো না যে, আমি আগামীকাল এ কাজটি করবো বরং এর সাথে ইনশাআল্লাহ্ [আল্লাহ্র ইচ্ছা হলে] যুক্ত কর।'[৬৭] পূর্ববর্তীদের মধ্যে যাঁরা ঈমান ঘোষণার সময় ইনশাআল্লাহ্ যুক্ত করতেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হযরত আয়েশা (রা), হাসান আল বস্রী, ইবনে শীরীন, সুফিয়ান সাওরী, ইবনে উয়ায়না, আওযায়ী, মালিক ইবনে আনাস, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র) প্রমুখ। ঈমানকে শর্তসাপেক্ষে প্রকাশ করার পক্ষে প্রধানতঃ চারটি যুক্তি দেয়া হয়। প্রথমত, শর্তহীনভাবে ঈমানের ঘোষণা দেয়ার মধ্যে এক ধরনের আত্মতৃপ্তি ও আত্মম্ভরিতার আশঙ্কা রয়েছে। দ্বিতীয়ত, পবিত্র কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ্র ইচ্ছার প্রতি এভাবে সমর্পিত হওয়ার জন্য বলা হয়েছে। বিরুদ্ধবাদীরা এর মধ্যে যে ধরনের সন্দেহের কথা বলেন, তা অমূলক। তৃতীয়ত, এভাবে শর্তসাপেক্ষে ঈমানের ঘোষণার মধ্যে যে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়, তা মূল ঈমানের ব্যাপারে নয় বরং তার পূর্ণতার প্রতি আর শেষোক্ত ধরনের সন্দেহ নিশ্চয়ই অনুমোদিত, কারণ কেউ-ই তার ঈমানের পূর্ণতার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে না। চতুর্থত, কেউ জানে না যে, তার 'খাতিমা বিল খায়র' [শেষ পরিণতি শুভ অর্থাৎ ঈমানের সাথে মৃত্যু] হবে কি না। কারণ এটি একমাত্র আল্লাহ্ পাকই জানেন [এবং তাঁর ইচ্ছা ও দয়ার উপরই তা নির্ভর করে]।[৬৮] সারা জীবন নেক্কাজ করে এবং ইসলামী জীবন-যাপন করার পরও কেউ তার শুভ পরিণতির গ্যারাণ্টি দিতে পারে না। যেমন এক হাদীসের মর্মার্থে জানা যায়, মানুষ নেক্কাজ করতে করতে এমন এক অবস্থায় উপনীত হয় যে, তার এবং বেহেশতের মধ্যে অতি সামান্য ব্যবধান থাকে; হঠাৎ সে এমন একটি গুনাহের কাজ করে বসে যা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। এজন্য একজন সত্যিকার মুমিন আল্লাহ্র কাছে যেমন একদিকে তার ঈমানের এবং নেক কাজের পুরস্কার আশা করে, অপরদিকে ঠিক তেমনি তার গুনাহ ও ঈমানের অপূর্ণতার জন্যও ভীত হয়। পরিশেষে আল্লাহ্র ক্ষমা ও দয়ার উপরই সে নির্ভর করে। এ কথাই অপর একটি বিখ্যাত হাদীসে বলা হয়েছে যে, ঈমান আশা ও ভীতির মধ্যে অবস্থান করে।

অপরদিকে মাতুরীদি-পন্থী চিন্তাবিদগণ ঈমান প্রকাশের ব্যাপারে এমনি ধরনের শর্ত যুক্ত করাকে খোদ ঈমানের ব্যাপারে সন্দিহান হওয়ার সমতুল্য বলে মনে করেন। এজন্য তাঁরা আশ'আরীয়াদের 'সন্দেহবাদী' [শাক্কিয়া] বলে অভিহিত করেন। ইমাম আযম আবূ হানীফার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় যে, ঈমান ও কুফরের ব্যাপারে কোন

---

৬৭. আল-কুরআন, ১৮ ঃ ২৩; ৬৮ ঃ ১৮

৬৮. **Encyclopaedia of Islam,** Vol. II. pp. 833-34 Vol. III, pp. 465-66.

সন্দেহের অবকাশ নেই। যে বিশ্বাসী সে প্রকৃতই বিশ্বাসী এবং যে কাফির সে প্রকৃতই কাফির; কারণ পবিত্র কুরআনে একদল লোক সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, এরা সত্যিই কাফির;[৬৯] এবং অপর একদল সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, এরা সত্যিই মুমিন (বিশ্বাসী)।[৭০] মাতুরীদীদের মতে ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহের প্রকাশ কুফরীর নামান্তর। তাঁদের যুক্তি হলো ঃ প্রথমত, যদি কেউ এমন কথা বলে যে, আল্লাহ্ চাইলে আমি আল্লাহতে বিশ্বাসী, আল্লাহ্ চাইলে আমি বিশ্বাস করি, মুহাম্মদ (সা) তাঁর রাসূল—তাহলে ঈমানের ঘোষণা হিসেবে তার এ ধরনের শর্তযুক্ত কথা গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামের পরিসীমায় প্রবেশের জন্য যে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার প্রয়োজন, শর্তমূলক বাক্যাংশ সংযোজনের কারণে তা সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে। বস্তুত এ ধরনের সন্দেহমূলক ঘোষণা কুফরীরই নামান্তর। দ্বিতীয়ত, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেও আমরা দেখি যে কোন বেচা-কেনা, বিয়ে-শাদী প্রভৃতি ক্ষেত্রে এমনি ধরনের সন্দেহযুক্ত কথা গ্রহণযোগ্য হয় না।

আমি আপনার কাছে অমুক জিনিস বিক্রি করছি, আল্লাহ্র ইচ্ছা হলে আমি অমুককে বিয়ে করছি বা পরিত্যাগ করছি; তাহলে বিক্রি, বিয়ে বা তালাক কার্যকরী হয় না। একই কথা ঈমানের ব্যাপারেও প্রযোজ্য। তৃতীয়, 'ইনশাল্লাহ্' ভবিষ্যতের ব্যাপারে প্রযোজ্য; কিন্তু আমি এখন ঈমানদার কি না—এটি আমার তাৎক্ষণিক বিশ্বাসের ব্যাপার। এখানে আল্লাহ্র ইচ্ছার প্রসঙ্গ আসে না। চতুর্থত, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্র নিয়ামতের ব্যাপারে তা প্রকাশ্যে ঘোষণার কথা বলা হয়েছে।[৭১] ঈমানের চেয়ে আর বড় কোন নিয়ামত হতে পারে না। তাই তার ঘোষণা অবশ্যই প্রকাশ্যে দিতে হবে। মাতুরীদীদের মতে একটিমাত্র ক্ষেত্রেই ঈমানের ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ্ বলা সঙ্গত; সেটি ভবিষ্যতের সাথে জড়িত অর্থাৎ ভবিষ্যতে আমার ঈমানের অবস্থা কি হবে, তা একমাত্র আল্লাহ্ই ভাল জানেন। আমার ঈমান আল্লাহ্র দরবারে গৃহিত হবে কি না এবং আমি ঈমানের সাথে মরতে পারবো কি না— এ সব ক্ষেত্রে 'ইনশাল্লাহ্' বলে আল্লাহ্র মঙ্গলময় ইচ্ছার উপর নির্ভর করা উচিত। মাতুরীদীদের 'ইনশাল্লাহ'-এর ব্যাপারে এ শেষোক্ত ব্যাখ্যার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এটি সত্যিকারভাবে একজনের অন্তরে ঈমানের অবস্থান (যেটা আশ'আরীয়া ও মাতুরীদীদের মতভেদের কেন্দ্রবিন্দু) সম্পর্কে কোন আলোকপাত করে না। এখানে মাতুরীদী তাত্ত্বিকগণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঈমানের সংরক্ষণ এবং আল্লাহ্র দরবারে তার গ্রহণ সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মাত্র। ঈমানের ঘোষণা দেয়ার ব্যাপারে ইবনে হাযম মাতুরীদীর সমর্থক।[৭২] পক্ষান্তরে ইমাম ইবনে তাইমিয়া আশ'আরীয়া মত অবলম্বন করেছেন। তবে ইবনে তাইমিয়া ঈমানের শর্তসাপেক্ষে ঘোষণার ব্যাপারে

৬৯. আল-কুরআন, ৪ ঃ ১৫১

৭০. ঐ, ৮ ঃ ৭৪

৭১. ঐ, ৯৩ ঃ ১১

৭২. cf. **Encyclopaedia of Islam.** Vol. iii, pp. 796-97.

আশ'আরীয়াদের তৃতীয় যুক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং চতুর্থ যুক্তির প্রচণ্ড বিরোধিতা করছেন। তাঁর মতে যেহেতু ঈমানের মধ্যে আমল অন্তর্ভুক্ত এবং কোন ব্যক্তিই সমস্ত আমল পরিপূর্ণভাবে আদায়ের দাবী করতে পারে না, সেজন্যে ঈমান প্রকাশের সময় 'ইনশাআল্লাহ্' সংযুক্ত করা বাঞ্ছনীয়।[৭৩] ঈমানের দাবী সংক্রান্ত পর্যালোচনা মুসলিম ধর্মতত্ত্বে আর একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের অবতারণা করেছে, তা হলো ঈমানের পরিবর্তে কেউ কি আবশ্যিকভাবে বেহেশতে যাওয়ার দাবী করতে পারে? আমরা এখন অতি সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

ঈমানের বিনিময়ে বেহেশতে যাওয়ার আবশ্যিক দাবী

এ সম্বন্ধে জাহমিয়া এবং মু'তাযিলাদের যুক্তি হলো, ঈমানের পরিবর্তে একজন আবশ্যিকভাবে বেহশত দাবী করতে পারে। জাহমিয়ারা মনে করে, যদি কেউ ঈমান আনে, তাহলে ঈমানের বিনিময় হিসেবে সে অবশ্যই বেহেশত পাবে, কারণ ঈমানের পরিণতি ও পুরস্কার বেহেশত। মু'তাযিলাদের যুক্তি হলো, আল্লাহ্ ন্যায়বিচারক, অধিকন্তু তিনি ঈমানের পুরস্কারস্বরূপ বেহেশতের ওয়াদা করেছেন; আর তিনি নিজে জানিয়েছেন, তিনি ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) ভঙ্গ করেন না। সুতরাং তিনি মু'মিনকে বেহেশত দিবেন। মনে রাখা দরকার, মু'তাযিলারা ঈমানের মধ্যে সমস্ত নেক আমল আবশ্যিকভাবে অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে।[৭৪] ইবনে তাইমিয়ার মতে, ঈমানের বিনিময় বেহেশত এবং ঈমান ছাড়া কেউ বেহেশতে যেতে পারবে না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের জন্য বেহেশত হারাম করে দিয়েছেন।[৭৫] তিনি কাফিরদের জন্য চিরদিনের জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করেছেন[৭৬] আর মুনাফিকদের জন্য জাহান্নামের নিম্নতম স্থান ঠিক করেছেন।[৭৭] আহলে-সুন্নাতের মতেও ঈমান ছাড়া কেউ বেহেশতে যেতে পারে না বা দোযখের শাস্তি হতে রেহাই পাবে না। কিন্তু বেহেশত ঈমানের বিনিময় নয়; এটি একান্তই আল্লাহ্‌র মেহেরবানী। আহলে-সুন্নাত মনে করে, জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম ছাড়া আল্লাহ্‌র কাছে আর কিছু গ্রহণযোগ্য নয়।[৭৮] কিন্তু ঈমান ও আমলের পরিবর্তে কেউ আবশ্যিকভাবে আল্লাহ্‌র কাছে বেহেশত দাবী করতে পারে না। কারণ প্রথমত, সৃষ্টি হিসেবে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনা এবং তাঁর নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা মানুষের সৃষ্টিগত দায়িত্ব। দ্বিতীয়ত, মানুষের জীবনে অনেক গুনাহ্ হয়েই যায়। সুতরাং আল্লাহ্ যদি সে সব গুনাহ্‌র পরিবর্তে কোন শাস্তি না দেন, সেটাই যথেষ্ট। অধিকন্তু, মানুষ যেসব নেক কাজ করে, সেগুলোর মধ্যে অনেক

---

৭৩. **Kitab-al-Iman**, pp. 367-68.

৭৪. A.S. Tritton, **Muslim Theology**. p. 88.

৭৫. **আল-কুরআন**, ৫ : ৭২

৭৬. ঐ, ৯৮ : ৬

৭৭. ঐ, ৪ : ১৪৫

৭৮. ঐ, ২ : ১৩২; ৩ : ১৯; ৩ : ৮৫; ৫ : ৩ ইত্যাদি

অপূর্ণতা থাকে। এই অপূর্ণ নেক আমল কবুল করাও তাঁর মেহেরবানী। সুতরাং মানুষ আল্লাহ্‌র কাছে আবশ্যিকভাবে বেহেশত দাবী করতে পারে না এবং আল্লাহ্ পাকও মানুষকে বেহেশত দিতে বাধ্য নন। তাছাড়া কাজের সাথে প্রতিদানের আবশ্যিক সম্পর্ক অস্বীকার করার পক্ষে নিম্নোক্ত যুক্তি প্রদান করা হয়। যেহেতু মানুষ তার কাজের স্রষ্টা নয়, সে কেবল কর্তা বা প্রচেষ্টার অধিকারী; কাজেই তার প্রচেষ্টার অধিকারী; কাজেই তার প্রচেষ্টার দ্বারা কেবল কাজটি সম্পাদিত হয়, ফল অর্জিত হয় না। অধিকন্তু, কোন কাজের ফল—পুরস্কার বা শাস্তি, প্রশংসা বা নিন্দা—কর্তার ইচ্ছাকৃত হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে। হতে পারে সে কেবল কাজটি করার জন্য করেছে, ফলের চিন্তা করেনি। সেজন্য অর্জনের (কাস্‌ব) মধ্যে ফল অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। সুতরাং ভাল কাজের ফলস্বরূপ বেহেশ্‌ত আবশ্যিকভাবে আশা করা যায় না। এটা নিতান্তই আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহ।[৭৯] একটি হাদীসেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, মহানবী (সা) বলেছেন, 'মানুষের আমল তাকে বেহেশতে নিতে বা দোযখের শাস্তি হতে বাঁচাতে পারে না।' কেউ জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এমন কি আপনাকেও?' তিনি উত্তর করলেন, 'হ্যাঁ, আমাকেও এবং এর সাথে যুক্ত করলেন— যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও দয়া আমাকে আচ্ছাদিত করে।' শেষের কথাটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন।[৮০] উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হয়, মানুষের সাধ্যমত ভাল কাজ করা উচিত এবং আল্লাহ্‌র করুণার উপর নির্ভর করা এবং তাঁর ক্ষমার আশা করা উচিত। তিনি দয়াময়, ক্ষমাশীল এবং উত্তম প্রতিদানকারী। সুতরাং বিনীত সৎকর্মশীলদের আমল তিনি নিশ্চয়ই ধ্বংস করবে না।[৮১] ঈমানের প্রকাশ্য ঘোষণা সম্পর্কিত মতবিরোধ এবং প্রতিকূল রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের কারণে আমরা মুসলিম ধর্মতত্ত্বে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণীয় প্রশ্নের সম্মুখীন হই। সেটি হলো, কোন অবস্থায় ঈমানকে গোপন করা সম্ভব কি? এ সম্বন্ধে এখন আমরা অতি সংক্ষেপে আলোকপাত করবো।

ঈমান কি গোপন করা সম্ভব ?

অন্তরে ঈমান রেখে বাইরে ঈমান গোপন করার (এটা ঠিক কুরআনে বর্ণিত মুনাফিকদের অবস্থার বিপরীত) প্রশ্ন মুলত উমাইয়া শাসন আমলে যখন শী'আদের উপর ভিন্নমত পোষণ করার কারণে নানা ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপ আসছিল, তখন উত্থাপিত হয়। সে সময় থেকে অদ্যাবধি এটা শী'আদের মধ্যে প্রচলিত একটি অন্যতম শক্তিশালী রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আশ্রয়-অস্ত্র হিসেবে গৃহীত

---

৭৯. S,M, Stern, et al. (eds.) **Islamic Philosophy and Classical** Tradition (Oxford : Bruno Cassirer Ltd., 1972), pp. 374-79.

৮০. Al Sharif al Murtada, **Amali**, Vol. I, [Cario : 1954], p. 344.

৮১. আল-কুরআন, ২ঃ ১১২; ৩ঃ ৫৭; ৩ঃ ১৭১ ইত্যাদি

হয়ে এসেছে। শী'আরা প্রতিকূল পরিবেশে ঈমান গোপন করার এ নীতিকে (তাকিয়া) দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহার করে আসছে। তারা পবিত্র কুরআন,[৮২] হাদীস ও বিভিন্ন ইমামের জীবন-ধারা হতে এ নীতির সমর্থন অনুসন্ধান করেছে। মহানবী (সা) নবূয়তের প্রথম দিকে কিছুদিন প্রকাশ্যে ঈমানের ঘোষণা দেননি এবং নও-মুসলিমদের তদ্রূপ ঘোষণা দেয়া হতে বিরত থাকতে উপদেশ দিয়েছেন। পরিস্থিতি অনুকূল হলে আল্লাহ্ তাঁকে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দেন।[৮৩] হযরত আলী (রা) হতে আরম্ভ করে পরবর্তী অনেক ইমামই তাঁদের মতে প্রকৃত সত্যকে অধিকতর কোন কল্যাণের জন্য বা সাধ্যাতীত প্রতিকূলতা এড়ানোর জন্য গোপন করে গেছেন। সুতরাং 'তাকিয়া' গ্রহণযোগ্য বলে শী'আদের অভিমত।

কিন্তু আহলে-সুন্নাতের অভিমত হলো, ঈমান গোপন করার বিষয় নয়। জীবনের বিনিময়েও একজন মুসলমান কুফরী বা শিরক করতে পারে না। শুধুমাত্র আন্তরিক বিশ্বাস যে ঈমান নয়, এ সম্বন্ধে আমরা উপরে ইমাম আযম আবূ হানীফার মত উল্লেখ করেছি। কারণ এ ধরনের আন্তরিক বিশ্বাস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় মক্কা ও মদীনাবাসী অনেকের ছিল। তাঁর অনেক আত্মীয় এবং ইয়াহূদী ও খ্রীস্টান পণ্ডিতরা জানতো যে, তিনি সত্য রাসূল; কিন্তু তারা পার্থিব সুবিধা বা ঈর্ষার ফলে সত্যের সে সাক্ষ্য দেয় নি। আল্লাহ্ও সে জন্য তাদের তিরস্কার করেছেন এবং কাফির বলেই চিহ্নিত করেছেন। কুরআন শরীফের বহু সংখ্যক আয়াত ও হাদীসে ঈমানহীন জীবনের চাইতে ঈমানের জন্য মৃত্যুবরণ করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং কোন অবস্থায়ই কুফর বা শিরকের দিকে সাময়িক আশ্রয় নেয়াকে পর্যন্ত অনুমোদন করা হয়নি।[৮৪] এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ঈমান প্রতি মুহূর্তে অন্তরে লালন করার বিষয় এবং এক মুহূর্তের জন্যও ঈমানকে পরিত্যাগ করা হলে তা পূর্ববর্তী সব নেক কাজকে বরবাদ করে দেয়। আর ঈমান যেমন অন্তরে লালন করার বিষয়, ঠিক একইভাবে তা মুখ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রকাশেরও জিনিস। তাই মুহূর্তের জন্যও বাহ্যিকভাবে ঈমান পরিত্যাগ করা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না বলে আহ্‌লে-সুন্নাতের মত।

ঈমানের সাময়িক গোপন করা সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী এ দু'টো মতের মাঝামাঝি আর একটি মত দেখা যায়। এ মত অনুযায়ী চরম প্রতিকূল পরিবেশে একমাত্র জীবন রক্ষার নিমিত্তে একজন সাধারণ মানুষ অন্তরে ঈমান রেখে স্বল্প সময়ের জন্য বাহ্যিকভাবে ঈমান গোপন করতে পারে।[৮৫] কিন্তু দীর্ঘ সময়ের জন্য এবং নেতৃস্থানীয় ও বিশেষ ব্যক্তিদের বেলায় এর অনুমোদন নেই। কেউ কেউ আবার মনে করে এমতাবস্থায় যে

---

৮২. ঐ, ৪০ ঃ ২৮; ৬৭ ঃ ১৩ ইত্যাদি

৮৩. ঐ, ৫ ঃ ৬৭; ১৫ ঃ ৯৪; ৭৪ ঃ ২

৮৪. ঐ ৩ ঃ ১৪০; ৪ ঃ ৭৪; ৮ ঃ ২৪; ৯ ঃ ১১১; ৯ : ১২০; ৬১ ঃ ৪ ইত্যাদি এবং বুখারী, মুসলিম, আহমদ, তিবরানী শরীফ ঃ ঈমান ও জিহাদ অধ্যায়।

৮৫. Shaharastani, **Nihayah al-Iqdam**, p. 474.

কেউই এ পদ্ধতির আশ্রয় নিতে পারে। এখানে এ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ নেই। তবে একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, শী'আদের 'তাকিয়া' সংক্রান্ত মত কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং এটা প্রকৃত ঘটনার যথার্থ প্রতিফলনও নয়। কারণ প্রথমত, মহানবী (সা), সাহাবা-ই-কিরাম ও ইমামদের (শী'আ) গৃহীত পদ্ধতি জীবন বাঁচানোর জন্য ছিল না। অধিকন্তু, এ সময়েও তাঁরা ঈমানকে গোপন করেন নি। ইসলাম প্রচারের জন্য একটি কৌশলগত নীতি হিসেবেই তাঁরা কখনও প্রকাশ্য পদ্ধতি, কখনও বা পরোক্ষ ও গোপন পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন মাত্র। দ্বিতীয়ত, জীবন বাঁচানোর জন্য কুফরীর আশ্রয় নেয়ার মত ঘৃণ্য পদ্ধতি প্রমাণের জন্য সেই মহাত্মাদের কুরবানীকৃত জীবনকে ব্যবহার করা তাঁদের পবিত্র জীবনের প্রতি কলঙ্ক আরোপের অপচেষ্টার শামিল। তাঁরা বীর ছিলেন, মৃত্যুকে ভালবাসতেন এবং শাহাদতের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। মহানবী (সা) ও সাহাবা-ই-কিরামের ত্যাগ ও তিতীক্ষাপূর্ণ জীবন, বহুসংখ্যক অসম যুদ্ধ এবং সানন্দে শাহাদত গ্রহণ, পরবর্তীকালে কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনা এবং কয়েকজন ইমামের (সুন্নী) জেলে মৃত্যু ও চরম নিগ্রহ সহ্যকরণ এ কথারই জ্বলন্ত সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁরা ঈমানকে গোপন করা তো দূরের কথা, শত প্রলোভন ও অত্যাচারের মুখেও সামান্যতম আদর্শচ্যুত বা কুফরীর সাথে আপোস করেন নি। বস্তুত 'তাকিয়া মতবাদ' সুবিধাবাদী শী'আদের স্বকপোলকল্পিত একটি রাজনৈতিক আশ্রয়-অস্ত্র বিশেষ, যার কোন ধর্মীয় ভিত্তি—এমন কি তাদের স্বীকৃত ইমামদের জীবনীতেও নেই।

মানুষ বেঁচে থাকলে হয়তো আরও নেককাজ করতে পারে। কিন্তু ইসলাম যে কোন মূল্যে বেঁচে থাকাকে অনুমোদন করে না। মৃত্যুতে সব শেষ হয়ে যায় না। তাছাড়া যাঁরা ঈমানের জন্য মৃত্যুবরণ করেন, তাঁরা মহত্তম শহীদ আর ইসলামে শহীদরা অমর।[৮৬] সেজন্য তর্কের খাতিরে যদি স্বীকারও করা হয় যে, বিশেষ অবস্থায় সাময়িকভাবে ঈমান গোপন করাকে ইসলাম অনুমোদন করে, তবুও এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সে অবস্থায়ও ইসলাম এ পদ্ধতির আশ্রয় নেয়াকে সুনযরে দেখে না। নবীদের (আ) কথা বাদ দিলেও সাহাবীদের (রা) ও পরবর্তী মহাত্মাদের গৌরবদীপ্ত রক্তে লেখা ইতিহাস স্বাক্ষরবাহী।

ঈমানের প্রকৃতি এবং আমার আলোচিত বিভিন্ন প্রসঙ্গ সম্বন্ধে আরও অনেক প্রশ্ন উত্থাপন এবং তাদের সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু আমি আমার প্রবন্ধের সূচনায়ই বলেছি, প্রতিটি প্রশ্নের ধর্মতাত্ত্বিক জটিলতা এবং বিভিন্ন চিন্তাবিদের মতামতের বিস্তারিত পর্যালোচনা করা একটি প্রবন্ধের সীমিত পরিধির বাইরে। যা হোক, আমার বিশ্বাস, আমি অতি সংক্ষেপে ঈমানের মতো একটি জটিল, বহুমাত্রিক এবং ইসলামের বুনিয়াদী ধারণার সাথে সম্পর্কিত অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক সমস্যার উপরই আলোকপাত করেছি।

---

৮৬. আল-কুরআন, ২ ঃ ১৫৪

ওহী ও ঈমান*

মতিউর রহমান নীলু

মানুষ এই চলমান জগতে প্রতিনিয়ত যেসব ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়, সেসব অভিজ্ঞতার স্বরূপ, প্রকৃতি, মূল্য ও ক্রিয়া-কলাপ, ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, সম্ভাব্যতা ও অসম্ভাব্যতা, মানুষের ব্যক্তিজীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা এবং পরম সত্তার স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ধারণ করেই ধর্ম-দর্শনের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। এসব জানার পরও ধর্ম-দর্শনের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি চালিত হয় ধর্মীয় সত্য আবিষ্কারের দিকে। কি করে ধর্মীয় সত্য লাভ করা যায়? ধর্মীয় সত্যার্জনের প্রকৃত মাধ্যমটা কি? অন্যান্য বিষয়ের মতো ধর্মের ক্ষেত্রেও কি সত্যার্জনের শর্তাবলী একই? বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সত্যার্জনের পদ্ধতি এবং ধর্মীয় সত্যার্জনের পদ্ধতি কি এক? পদার্থিক বস্তু (Physical objects) ও প্রকৃতির নিয়মাবলীকে জানার পদ্ধতি ও ভিত্তি কি ধর্মীয় নিয়মাবলীর ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য? সাধারণ জ্ঞানের মাধ্যমে কি ধর্মীয় সত্যে প্রবেশ করা সম্ভব? সর্বোপরি ধর্মীয় সত্যের মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকগুলো কি কি? কোন্ পন্থায় আমরা এ দিকগুলো জানতে পারি? এ জাতীয় প্রশ্ন ধর্ম-দর্শনের ধী-বিদ্যক (epistemological) আলোচনায় এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে রয়েছে। ধর্ম-দর্শনের ধী-বিদ্যক পর্বে বিভিন্ন ধর্ম-দার্শনিক তাঁদের আপনাপন দৃষ্টিভঙ্গীতে এ জাতীয় প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দেয়ারও প্রয়াস পেয়েছেন, যার ফলে ধর্ম-দর্শনের ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয় এ সম্পর্কিত বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ। এ মতবাদগুলোকে আমরা প্রধানত পৃথক চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে দেখতে পারি। (এক) ওহী বা প্রত্যাদেশবাদ, (দুই) ঈমান বা বিশ্বাসবাদ, (তিন) স্বজ্ঞাবাদ, (চার) বিচারবাদ। যাঁরা ওহী বা প্রত্যাদেশবাদী, তাঁদের কাছে প্রত্যাদেশই হলো ধর্মীয় সত্যার্জনের একমাত্র উপায়। বিশ্বাসপন্থীদের মতে, যুক্তি-তর্ক বা বিচার-বিশ্লেষণ নয়, একমাত্র বিশ্বাসের মাধ্যমেই আমরা স্রষ্টার অস্তিত্বসহ যাবতীয় ধর্মীয় সত্য অর্জন করতে পারি। স্বজ্ঞাবাদীরা আবার স্বজ্ঞার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের মতে স্বজ্ঞা এমন এক ধরনের অতীন্দ্রিয় ও অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা, যার মাধ্যমেই কেবল অপরোক্ষভাবে ধর্মীয় সত্য লাভ করা যায়। বিচারবাদীরা

---

* [প্রবন্ধটি ইফা পত্রিকা ১৯৮৫ সন ২৪ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা থেকে সংগৃহীত]

এ সবের ধার ধারেন না। তাঁদের কাছে নৈয়ায়িক (logical) বিচার-বিশ্লেষণই ধর্মীয় সত্যাবিষ্কারের একমাত্র অলঙ্ঘনীয় মাধ্যম। প্রবন্ধের এই সীমাবদ্ধ পরিসরে ধর্মীয় সত্যার্জনের সবগুলো মাধ্যমের বিস্তৃতি আলোচনা ও মূল্যায়ন সম্ভব নয়। আর এ কারণেই আমি আমার আলোচনা কেবল ওহী ও ঈমান তথা বিশ্বাস-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাই।

উৎপত্তিগত দিক দিয়ে 'প্রত্যাদেশ' শব্দটির অর্থ হচ্ছে উদঘাটিত হওয়া, প্রকটিত হওয়া কিংবা অস্পষ্ট অবস্থা থেকে কোন কিছু সুস্পষ্ট হওয়া। দার্শনিক ম্যাকগ্রেগার গোলাপ ফুলের উপমা দিয়ে প্রত্যাদেশ [ওহী] শব্দটি বোঝার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, গোলাপের কুঁড়ির পাপড়িগুলো ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হলে গোলাপ ফুলটি যেমন প্রস্ফুটিত হয়, তেমনি প্রত্যাদেশের মাধ্যমেও স্রষ্টার স্বরূপ [ও সিফাত] আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়।[১] তাই প্রত্যাদেশ এক ধরনের মাধ্যম—এমন মাধ্যম যার দ্বারা পরম স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা আপন মহিমা ও সিফাত আমাদের কাছে প্রকাশ করেন। প্রত্যাদেশের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা তাঁকে এবং তাঁর যাবতীয় মহিমাকে উপলব্ধি করার জন্য সমগ্র মাবনজাতিকে নিরন্তর আহ্বান জানান। এভাবেই ইসলাম, খ্রীস্ট ও ইয়াহূদী ধর্ম পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা এখানে ইসলাম ধর্মকে উপস্থাপন করতে পারি। ইসলামের সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) যখন একদিন 'হেরা' পর্বতের এক নির্জন গুহায় ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, তখন এ আয়াত তাঁর উপর নাযিল হলো ঃ 'পাঠ করুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন ......। জিব্‌রীল (আ)-এর মাধ্যমে প্রেরিত স্রষ্টার এ আদেশই হলো ওহী বা প্রত্যাদেশ। স্রষ্টার প্রভুত্ব ও একত্বের মহিমা ও ওহীর মর্মবাণী। স্রষ্টা সর্বশক্তিমান সার্বভৌম। তিনি বিশ্বজগতের নির্মাতা, নিয়ন্তা, পালনকর্তা ও ধ্বংসকর্তা। শেষ বিচারের দিন বলে একটি দিন রয়েছে, যেখানে স্রষ্টা সমস্ত পরলোকগত ব্যক্তিকে পুনর্জীবন দান করে নেক বান্দাদের পুরস্কার আর অবিশ্বাসী তথা গুনাহগারদের দোযখের শাস্তি প্রদান করবেন। ওহীর সমবায়েই গ্রন্থিত হয়েছে পবিত্র কুরআন। ওহী বা প্রত্যাদেশে বিশ্বাসবাদীরা কোন ধর্মীয় সত্যকে ঠিক তখনই সঠিক বলে মনে করেন যখন দেখেন সেই ধর্মীয় জ্ঞানের মাধ্যম হিসেবে মেনে নিতে রাযী নন।

ধর্মের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, প্রচলিত আস্তিক ধর্মের অধিকাংশ লোকই প্রত্যাদেশের বৈধতায় মনে-প্রাণে বিশ্বাসী। তাঁদের মতে, আমরা যেসব প্রত্যয়কে ধর্মীয় সত্য বলে মনে করি, যাদের মাধ্যমেই কেবল জগতে স্রষ্টার

---

১. **Introduction to Religious Philosophy** G. Macgregor, Houghton Mitfin Co. Boston, 1949, p. 20.

অস্তিত্ব ও উদ্দেশ্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যায়, সেসব নৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের অভ্রান্ত সত্যগুলোকে স্রষ্টার স্ব-প্রকাশিত সত্য বলাই অধিক শ্রেয়।[২] আমরা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এবং বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে অনেক সময় ধর্মের নির্যাস সত্যকে [Essenee] উপলব্ধি করতে পারি না। ওহী এ সমস্ত ধর্মীয় সত্যকে জানা ও উপলব্ধি করার একমাত্র অবলম্বন। যুক্তি দিয়ে আমরা অনেক সময় স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারি না; কারণ যুক্তির কোন শেষ নেই। কেউ যুক্তি দিয়ে স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করবেন, অন্যজন আবার অপর কোন যুক্তি দিয়ে স্রষ্টার অস্তিত্বকে অপ্রমাণ করে ফেলার প্রয়াস পাবেন। সুতরাং যুক্তি যেখানে অচল, সেখানে প্রত্যাদেশ ছাড়া আর উপায় কি? অন্যদিকে অনুভূতি ও ভাবাবেগের মাধ্যমেও আমরা যথার্থভাবে ধর্মীয় সত্যকে অর্জন করতে পারি না। কারণ এরা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। ব্যক্তির রুচি অভিজ্ঞতার উপরই অনুভূতি, ভাবাগেত নির্ভরশীল। তাই এদের উপর নির্ভর করে আমরা ধর্মীয় সত্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি না। এদিক থেকে স্রষ্টার মহিমা বা তাঁর ওহীর উপর আমাদের নির্ভর না করে চলে না।

প্রশ্ন থাকে, যে ওহী আমরা স্রষ্টা সম্পর্কিত জ্ঞান লাভের উপায় বলে মনে করে থাকি, তার বৈধতার প্রমাণ কি ? ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান যে যথার্থ, তা আমরা বুঝবো কি করে? কিভাবে বুঝবো যে, ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই? এর উত্তরে বিখ্যাত ধর্ম-দার্শনিক গ্যালোলয়ের একটি উক্তি এখানে প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয়। তিনি বলেন, কোন প্রত্যাদেশ যদি স্রষ্টা বা পরম সত্তাকে যথার্থভাবে প্রকাশ করে থাকে, তাহলে তার একটা প্রকাশধর্মী মূল্য অবশ্যই থাকবে। কারণ সে সত্তার যথার্থ প্রকাশ হচ্ছে এক ধরনের আলোক বর্তিকা— এমন বর্তিকা যা সমগ্র মানবজাতির জীবনের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে যায়।[৩] এ বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, প্রত্যাদেশ নিজেই তার যথার্থ্যের মানদণ্ড।

এবার প্রশ্ন ওঠে যে, ওহীর সাথে বিচার-বিশ্লেষণের আদৌ কোন সম্পর্ক আছে কি? ওহী ও বিচার-বিশ্লেষণ কি পুরোপুরি ভিন্ন স্বভাবের ? সাধারণত এর উত্তরে মনে করা হয়ে থাকে যে, প্রত্যাদেশ ও বিচার-বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার। এদের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু চূড়ান্ত ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে এ দু'য়ের মধ্যকার পার্থক্যটি মুছে যায়। কেয়ার্ড নামে জনৈক ধর্ম-দার্শনিক অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ধর্মের ক্ষেত্রে আমরা যে ধরনের প্রত্যাদেশ প্রত্যাশা করি, তার সাথে

---

২ **Philosophy and Religion**, H. Rash'dall, Duchworth and Co. London, 1924. p. 150.

৩ **The Philosophy of Religion**, G. Galloway, T. and T. clark, New York, 1914, p. 587.

বিচার-বিশ্লেষণের কোন বিরোধ নেই এবং এ দুটো পুরোপুরি পরস্পরে বিরুদ্ধও নয়। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন যে, প্রত্যাদেশে বিশ্বাসী মহল যখন বুদ্ধিগ্রাহ্য জগত এবং বুদ্ধির অতীত জগতের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করে বলেন, এ দু'জগতের সত্যতার মানদণ্ড এক নয়, তখন তাঁরা কিন্তু ওহীর মধ্যে বিচার-বিশ্লেষণকে স্বীকার করেই স্বীয় অভিমত প্রকাশ করেন।[৪] কোন প্রত্যাদেশ যদি ধর্মের ক্ষেত্রে বিচার-বিশ্লেষণের গুরুত্বকে আদৌ স্বীকার না করে, তা'হলে সে ধর্ম অবশ্যই বর্জনীয়। কিন্তু কোন জ্ঞান যখন প্রত্যাদেশের মাধ্যমে কারো কাছে আসে, তখন তা তাঁর কাছে বোধগম্য হয়েই আসে। বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমেই তিনি সেই প্রত্যাদেশ গ্রহণ করেন। ইসলামের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, যাঁদের কাছে আল্লাহ্র ওহী এসেছে, তাঁরা ছিলেন গভীর চিন্তাশীল ও যুক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ছিলেন সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে মহত্তম অনন্য ব্যক্তিত্ব। বিচার-বিশ্লেষণ ও যুক্তিচিন্তনে তিনি যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন, তা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষেরই অনুকরণীয়। তাই ওহীতে বিচার বিশ্লেষণের গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য।

আসলে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে প্রত্যাদেশ ও বিচার-বিশ্লেষণের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না।[৫] ড. রাধাকৃষ্ণন এ কারণেই বলেন, প্রত্যাদেশ যেমন স্রষ্টার দান, তেমনি বিচার-বিশ্লেষণও মানুষ স্রষ্টার কাছ থেকেই পেয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রত্যাদেশ ও বিচার-বিশ্লেষণ উভয়ই স্রষ্টার দান। কাজেই একই স্রষ্টার দুই দানের মধ্যে কোন বিরোধ কল্পনা করা ঠিক নয়। স্রষ্টা এমন এক ধরনের সত্তা, যিনি সর্বদাই আমাদের ধী-শক্তিকে সত্যের পথে চালিত করেছেন এবং আমাদের মধ্যে সত্য-প্রীতি জাগিয়ে তোলার জন্য প্রতি মুহূর্তেই তাঁর কাছ থেকে আমরা প্রেরণা লাভ করে থাকি। আর এর ফলেই আমাদের জ্ঞান বাড়ছে। এ কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, স্রষ্টা ইতিবাচক বিচার-বিশ্লেষণের আধার। সসীম জীবের বিচার-বিশ্লেষণ ওই ধারারই এক সীমিত প্রকাশ। আমাদের বিচার-বিশ্লেষণ সসীম বলেই আমাদের স্বাধীন প্রচেষ্টায় অনেক সময় পরম সত্য ও তত্ত্বগুলোর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারি না। কিন্তু স্রষ্টার অনুগ্রহে কোন ব্যক্তির মনে এ তত্ত্বগুলোর সত্য উদ্ভাসিত হলে তিনি এগুলোর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন এবং এ-ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, প্রত্যাদেশ ও বিচার-বিশ্লেষণের মধ্যে মূলত কোন প্রভেদ নেই; বরং তারা একে অন্যের পরিপূরক।

---

৪. **An Introduction to the Philosophy of Religion**, J. Caird, Indian Edition, Chakravorty and Chatterjee Co. 1956, p. 64.

৫. **Religion and Society**, S. Radhakrishnan, George Allen and Unwin Ltd. London, 1949, p. 107.

প্রত্যাদেশের প্রকৃতি সম্পর্কে অধুনা দু'টি বিশেষ মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে।[৬] একটি হচ্ছে বাচনিক [Propositional] আর অপরটি হচ্ছে অবাচনিক [non-Propositional]। বাচনিক মতবাদটি মধ্যযুগে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল এবং আধুনিককালে রোমান ক্যাথলিকগণ কর্তৃক সমর্থনপুষ্ট হয়েছে। এ মতে প্রত্যাদেশের বিষয়বস্তু এমন কিছু সত্যের নির্দেশ দেয়, যা কেবল বচন বা বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ হওয়ার যোগ্যতা রাখে। এ মতবাদের অনুগামীরা মনে করেন, স্রষ্টা সম্পর্কিত প্রাথমিক জ্ঞান মানুষের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যেই প্রত্যাদেশের উদ্দেশ্য নিয়োজিত ও নিবেদিত। 'ক্যাথলিক বিশ্বকোষ'-এর প্রত্যাদেশের সজ্ঞায় বলা হয়েছে, প্রত্যাদেশ হলো বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন জীবের কাছে স্রষ্টার কোন মহিমা বা সত্যের প্রকাশ কিংবা উদ্‌ঘাটন। এ প্রকাশ এমন এক মাধ্যমে হয়ে থাকে, যে মাধ্যম সাধারণত লৌকিক মাধ্যমের অনেক—অনেক উর্ধ্বে।[৭] সোজা কথায়, লৌকিক কিংবা ভৌতিক কোন মাধ্যমের সাহায্যে স্রষ্টার মাধ্যমকে বুঝানো যেতে পারে না।

উপরিউক্ত বাচনিক মতবাদের মর্মকথা হচ্ছে এই যে, স্রষ্টা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে মানবজাতির কাছে কতকগুলো সত্য ব্যক্ত করেছেন। এ সত্যসমূহ একটা বিধিবদ্ধ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকে। এগুলো মানবজাতিকে স্রষ্টার স্বরূপ বা ধর্মবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও ক্রিয়া সম্পর্কিত একটা নির্দিষ্ট মতবাদের দিকে চালিত করে। প্রত্যাদেশ সম্পর্কীয় বাচনিক মতবাদের তাৎপর্য এখানেই যে, এ মতবাদকে অনুসরণ করেই সমকালীন ধর্ম-দর্শনের ইতিহাসে প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্ব [Natural Theology] এবং প্রত্যাদিষ্ট ধর্মতত্ত্ব [Revealed Theology] এর মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্বে লৌকিক প্রমাণের দ্বারাই ধর্ম ও স্রষ্টা সম্পর্কীয় সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। এখানে প্রত্যাদেশের বিষয়টির কোনরূপ অবতারণা না করেও লৌকিক জগতের প্রমাণের মাধ্যমে স্রষ্টার অস্তিত্ব, মানুষের মরণোত্তর জীবন, পরলোকে অমরতার প্রকৃতি ইত্যাদি প্রমাণ করা সম্ভব; কিন্তু প্রত্যাদিষ্ট ধর্মতত্ত্ব এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে সেই সব ধর্মীয় সত্য ও জ্ঞানের নীতিগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যে গুলো মানুষের বিচার-বিশ্লেষণের নাগালের বাইরে। এসব কেবল প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। সম্ভব। এগুলো যখন স্রষ্টা কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হয়ে আমাদের কাছে এসেছে, তখনই তা কেবল মানবীয় জ্ঞানের বিষয়বস্তু বলে গণ্য হয়েছে।

---

৬. প্রত্যাদেশ ও বিশ্বাসের প্রকৃতি সম্পর্কিত বাচনিক ও অবাচনিক আধুনিক মতবাদের উপাদান সংগ্রহের জন্য আমি প্রেনটিস হল, আমেরিকা থেকে প্রকাশিত জন হিকের **Philosophy of Religion** (1963) গ্রন্থের (পৃঃ ৬১-৭৭) সাহায্য নিয়েছি। এ জন্য আমি এ গ্রন্থের লেখক ও প্রকাশকের প্রতি কৃতজ্ঞ।

৭. **The Catholic Encyclopedia**, Robert Appleton co. New York, 1912, xiii. 1.

আধুনিক কালের অনেক ধর্ম দার্শনিকই প্রত্যাদেশের প্রকৃতি সম্পর্কিত বাচনিক মতবাদটিকে স্বীকার করে নিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এখানে প্রফেসর ওয়াল্টার ক্যাফম্যানের কথা উল্লেখ করতে পারি। ক্যাফম্যানের মতে, বিশ্বাসী ব্যক্তিরা যখন প্রত্যাদেশের কথা বলেন, তখন তাঁরা আসলে এ কথাই বুঝাতে চান যে, স্রষ্টাই মানুষের কাছে তাঁর মহিমাবিষয়ক বাক্য ঘোষণা করতেন। ধার্মিক ব্যক্তিরা কেবল সেই কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করেন মাত্র।[৮] ক্যাফম্যানের এ বক্তব্যটি মোটামুটি সত্য। আমরা যদি ধর্মদার্শনিকদের সমকালীন সমলোচকদের প্রতি লক্ষ্য করি, তা হলে দেখতে পাই যে, তাঁদের অনেকেই বিশ্বাসের সংজ্ঞা বা প্রকৃতির কথা ভাবতে গিয়ে ক্ষীণ অপর্যাপ্ত যুক্তির ওপর ভিত্তি করে প্রত্যাদেশ সম্পর্কীয় বাচনিক মতবাদকেই প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছেন।[৯] অনেক ধর্ম-দার্শনিক ধর্মের সমর্থনে তাঁদের স্বীকার্য মৌলিক ধারণাবলীকে সমর্থন করার জন্য যখন পর্যাপ্ত প্রমাণের অভাবটিকে আন্তরিকভাবে অনুভব করেন, তখন তাঁরা অনেকটা বাধ্য হয়েই বিভিন্ন সুবিধাজনক উপায়ের প্রস্তাব করেন। অনেকের মতে এই ফাঁকটি খুবই সুস্পষ্ট; আর এ কারণে তাকে ইচ্ছাশক্তি দিয়েই পূরণ করে নিতে পারি।[১০]

এ যুক্তিতেই জনৈক সমকালীন ধর্ম-দার্শনিক তাঁর জ্ঞানগর্ভ গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে, একটা সম্ভাব্য বচন থেকে 'বিশ্বাসের' পার্থক্য এখানে নিহিত যে, সম্ভাব্য বচনটিকে যখন স্বীকার করে নেয়া হয়, তখন তা একটা তাত্ত্বিক ব্যাপারে পর্যবসিত হয়ে যায়। কিন্তু বিশ্বাসের বেলায় 'হ্যাঁ' জাতীয় একটা দায়িত্ববোধ থাকে। সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতিরেকে বিশ্বাস একা কোন সম্ভাব্য সত্যকে সুনিশ্চিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না বা এটা তার অবশ্যকরণীয় কোন কাজও নয়। কারণ বিশ্বাস হচ্ছে একটা ঐচ্ছিক প্রতিক্রিয়া [Volitional response], যা আমাদেরকে তাত্ত্বিক প্রবণতায় বেষ্টিত পরিবেশের বাইরে নিয়ে আসতে সাহায্য করে থাকে।[১১]

এতক্ষণ আমরা প্রত্যাদেশের প্রকৃতি সম্পর্কিত বাচনিক মতবাদটি আলোচনা করলাম। এবার আমরা অবাচনিক মতবাদটির প্রতি দৃষ্টি দিতে চাই। এ মতবাদটি বাচনিক মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত, যা বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রীস্টানদের

---

৮. **Critiuqe of Religion and Philosophy**, w. Kaufmann, Harper and Row, New York, 1958, p. 89

৯. **A Philososhical Scrutiny of Religion**, C.J. Ducasse, The Ronald Press, New Youk, 1953, pp. 73-4

১০. **Philosophy of Religion**, J. Hick, Prentice-Hall, New York, 1963, p. 65.

১১. **The Nature of Metaphysical Thinking**, d. Emmet, Macmillan and Co. London. 1945, p. 140.

মধ্যেই সমধিক প্রচলিত।[১২] এ মতবাদের ভিত্তিমূল নিহিত ষোড়শ শতাব্দীর বিশিষ্ট সংস্কারক মার্টিন লুথার, ক্যালভিন এবং তাঁদের সহযোগিদের চিন্তাধারার মধ্যে। এ মতবাদ অনুসারে প্রত্যাদেশের বিষয়বস্তু পরম সত্তা সম্পর্কিত একগুচ্ছ সত্যের [body of Truth about divine Reality] নির্দেশক নয়; বরং মানবজাতির ইতিহাসে ক্রিয়াশীল মাধ্যমেই স্রষ্টা মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে উপলব্ধ হন। এ মতের অনুগামীরা ধর্মতাত্ত্বিক বচনকে প্রত্যাদিষ্ট হিসেবে মনে করেন না। তাঁদের মতে ধর্মতাত্ত্বিক বচনগুলো আসলে প্রত্যাদিষ্ট ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধির পথে মানুষের আন্তরিক প্রয়াস মাত্র। প্রত্যাদেশের প্রকৃতি সম্পর্কিত এই অবাচনিক মতবাদ পরম সত্তার 'ব্যক্তিক বৈশিষ্টে'র সমকালীন ধারণার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে। এটি ব্যক্ত করতে চায় যে, ধর্মতাত্ত্বিক সত্যের ঘোষণাও তাতে স্বীকৃতি জানানোর ঘোষণা থেকে স্রষ্টার সাথে মানুষের আন্তরিক সম্পর্কের ঘোষণা 'অতিরিক্ত কিছু' প্রকাশ করে থাকে। স্রষ্টাকে অবাচনিকবাদীরা একজন 'ব্যক্তি' হিসেবে কল্পনা করেছেন আর এ-কারণেই তাঁর ইচ্ছাশক্তি ও উদ্দেশ্যের মাধ্যমেই স্রষ্টা তাঁর মহিমার প্রকাশ সম্পর্কে মানবজাতিকে সচেতন করে তোলেন বলা হয়। প্রশ্ন থাকে, দুনিয়ার সমগ্র মানুষ কি স্রষ্টার প্রকাশ সম্পর্কে সমানভাবে সচেতন হতে পারে ? অবশ্যই পারে না। পারে না বলেই দুনিয়ায় নাস্তিকের উপস্থিতি বিদ্যামান। কিন্তু কেন ? স্রষ্টা যদি উদ্দেশ্য ও ইচ্ছাশক্তিকে আপন মহিমা সম্পর্কে মানুষের সচেতনতার জন্যই প্রকাশ করে থাকেন, মানুষ কেন নিঃসন্দিগ্ধভাবে তাঁর মহিমা সম্পর্কে সচেতন হতে পারছে না?

এ প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে যে, অসীম স্রষ্টার মহিমা সম্পর্কে সচেতনতার অর্থ কোন সসীম সত্তার উপস্থিতি সম্পর্কিত সচেতনতার সদৃশ নয়। স্রষ্টা সম্পর্কে সচেতনতার অর্থ নিজেকে স্রষ্টার দ্বারা সৃষ্ট, স্রষ্টার উপর নির্ভরশীল এবং এক সর্বব্যাপক ভিত্তি থেকে নিজের জীবন ও কল্যাণকে অর্জন করছি বলে মনে করা। স্রষ্টা এমন এক অসীম সত্তা, যিনি আমাদের দৃষ্টিতে এক রহস্যপূর্ণ প্রেমময় সত্তা হিসেবে গোচরীভূত। সুতরাং স্রষ্টা আমাদের কাছে এভাবে নিজের মহিমা ও নিজেকে প্রকাশ করেন না, যেভাবে কোন সসীম সত্তা তার উপস্থিতি আমাদের সামনে তুলে ধরে। স্রষ্টা যদি সসীম সত্তার মতোই আমাদের সামনে হাজির হতেন, তাহলে অসীম সত্তা সসীম সত্তাকে গ্রাস করে ফেলতো।[১৩] অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এ শিক্ষাই পাই যে, স্রষ্টা আমাদের মতো যাবতীয় সসীম সত্তাকে দেশ-কালের পরিসরের মধ্যেই সৃষ্টি করেছেন, যেখানে আমরা কেবল আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য নিয়েই নিজেকে অস্তিত্বশীল করে তুলতে

---

১২. আধুনিক প্রোটেস্ট্যান্ট চিন্তাধারায় প্রত্যাদেশ ও বিশ্বাস সম্পর্কিত মতবাদের বিস্তৃত বিবরণের জন্য জন বেইলী [John Baillie] রচিত এবং কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত '**The Idea of Revelation in Recent Thought**' (১৯৫৬) গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

১৩. Ibid, J. Hick, p. 71.

পারি। এই সীমিত পরিসরের মধ্যেই স্রষ্টা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জ্ঞাত হন মানুষের কাছে এবং এই পরিসরের মধ্যে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া বা অচেতন থাকার স্বাধীনতা নিজেদেরই রয়েছে। যারা এ স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করে, তারা স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন না হয়ে পারে না। কাজেই স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বা অচেতনতার দায়িত্ব সম্পূর্ণ ব্যক্তির নিজেরই, স্রষ্টার নয়।

এতক্ষণ আমরা ধর্মীয় সত্যের ভিত্তি হিসেবে প্রত্যাদেশের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করছিলাম। এবার আমরা ধর্মীয় সত্যের অন্য একটি ভিত্তির প্রতি দৃষ্টি দেবো। এ ভিত্তিটি হচ্ছে 'ঈমান' বা বিশ্বাস। ওহীর প্রতি মানুষের যে আন্তরিক প্রতিক্রিয়া, তাকে ঈমান বলে আখ্যাত করা হয়ে থাকে। তর্ক অর্থাৎ অনুমান, যুক্তি-চিন্তন, বিচার-বিশ্লেষণ ধর্মীয় সত্যার্জনের আদর্শিক মাধ্যম হতে পারে না। যেহেতু প্রজ্ঞা ও চিন্তাশক্তি নেহাত সীমিত, তাই অসীমের জ্ঞান এই সীমিত শক্তির মাধ্যমে জানা যেতে পারে না। পরম সত্তা সীমাহীন, অনন্ত ও শর্তহীন। সীমিত সান্ত ও শর্তসাপেক্ষ চিন্তা বা যুক্তি দ্বারা পরম সত্তার জ্ঞানার্জনের আশা করাটাই এক ধরনের বাতুলতামাত্র। কাজেই ধর্মী সত্যার্জনের পথে যদি কোন সুদৃঢ় ভিত্তি থাকে, তা হলে সেটা হবে ঈমান [বিশ্বাস]। ধার্মিক ব্যক্তি যদি সততা ও নিষ্ঠার সাথে কোন ধর্মবিশ্বাস পোষণ করে, তা হলে তার সেই সততা ও নিষ্ঠাই তাকে প্রকৃত সত্য দেখিয়ে দিবে।

এখন প্রশ্ন, ঈমান বা বিশ্বাস বলতে আদতে আমরা ঠিক কী বুঝে থাকি ? আরবী 'ঈমান' শব্দকে ইংরেজীতে বলা হচ্ছে Faith এবং বাংলায় তা 'বিশ্বাস'। ইংরেজী ভাষায় এ শব্দটি বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ধর্মীয় ব্যবহারে যুক্তি, তর্ক, অনুমান ও বিচার-বিশ্লেষণ প্রভৃতির কোনরূপ সাহায্য না নিয়ে কেবল নিজের তৃপ্তি সাধনের জন্য নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কোন কিছুতে আস্থা স্থাপনের মানসিক প্রবণতাকে বিশ্বাস বলে আখ্যাত করা চলে। তা হলে একথা পরিষ্কার যে, অদৃশ্য সত্যে নিষ্ঠার সাথে আস্থা স্থাপন করাই হলো বিশ্বাস। এ-ও বলা হয় যে, বিশ্বাস শব্দটি এমন কিছুর নির্দেশক, যাতে স্রষ্টার কাছ থেকে অলৌকিকভাবে আসা প্রত্যাদিষ্ট সত্যে আস্থা জ্ঞাপন করা হয়। নৈতিকভাবে বিশ্বাস হলো আনুমানিক প্রমাণ-নিরপেক্ষ সত্যতার নিশ্চয়তা বিশেষ। যুক্তিবাদীদের কাছে যা সন্দেহমুক্ত হয়নি কিংবা যা প্রমাণিত হয়নি, তা-ই যেন বিশ্বাসের আলোচ্য বিষয়। এ কারণেই ম্যাকগ্রেগার বলেন, বিশ্বাস যতই সুদৃঢ় হয়, সন্দেহ ততই ক্ষীণ হতে থাকে। তাই বিশ্বাস হচ্ছে সন্দেহের সম্ভাবনার মুখে সন্দেহাতীত ঘোষণা।[১৪]

প্রফেসর প্রেট অনুসন্ধান-কার্য পরিচালনা করে 'বিশ্বাস' পদটির চারটি পৃথক

---

১৪. Ibid, G. Macgregor. p. 132.

অর্থের সন্ধান পেয়েছেন।[১৫] এক, অভ্যাসজাত বা প্রামাণিক [habitual or authoritative] বিশ্বাস; দুই. যুক্তিসম্মত [reasonal] বিশ্বাস; তিন. আবেগিক [emotional] বিশ্বাস এবং চার. ঐচ্ছিক [volitional] বিশ্বাস। প্রেটের মতে কেউ অভ্যাসগতভাবেই ধর্মীয় সত্যে বিশ্বাস পোষণ করে থাকে। এ ধরনের বিশ্বাস পরিবার-প্রসূত। শিশু জন্মের পর থেকেই পরিবারের কাছ থেকে এ ধরনের বিশ্বাস অর্জন করে থাকে। কেউ কেউ আবার ধর্মীয় সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করেন ধর্মগ্রন্থ বা প্রচারকের বাণীকে সামনে রেখে। তাদের মতে ধর্ম গ্রন্থের বাণী বা ধর্মপ্রচারকরা যে সমস্ত বাণী উচ্চারণ করেছেন, তা প্রামাণিক। কাজেই ওই সমস্ত বাণী অবশ্যই সন্দেহমুক্তভাবে সত্য বহন করে। এদিকে লক্ষ্য রেখেই জেম্‌স বলেছিলেন, বিশ্বাস কথাটির অর্থ হচ্ছে অপরের বিশ্বাসে পূর্ণাস্থা জ্ঞাপন করা। যাঁরা যুক্তিসম্মত বিশ্বাসে আস্থাশীল, তাঁরা মনে করেন যে, ধর্মীয় সত্যের পেছনে যুক্তি থাকলেই আমরা তাতে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে পারি। স্রষ্টা বা আত্মার অমরতায় কিংবা পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস স্থাপন করা হয় এ-কারণে যে, এদের অস্তিত্বের পক্ষে সূচনাকাল থেকেই বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শিত হয়ে আসছে। এঁদেরকে আমরা বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের সারিতে ফেলতে পারি। আরেক ধরনের বিশ্বাস আছে, যা সম্পূর্ণ অন্তরের– আবেগের ব্যাপার। আবেগের বশবর্তী হয়ে অনেকেই ধর্মীয় সত্যে আস্থাশীল হয়ে উঠেন। বিশেষ করে মরমীবাদী দার্শনিকরা এ ধরনের বিশ্বাসের অনুসারী। প্রেটের মতে বিশ্বাস কথাটির সর্বশেষ প্রকার হচ্ছে ঐচ্ছিক। অনেক সময় আমরা নিছক ইচ্ছার বশবর্তী হয়েই ধর্মীয় সত্যে আস্থা স্থাপন করে থাকি। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, যে-কোন ধরনের বিশ্বাসের মূলে ইচ্ছাই সর্বময় গুরুত্বের অধিকারী। ইচ্ছাশক্তি সব ধরনের বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে কাজ করে। যুক্তিদ্বারা বা আপ্তবাক্যের সাহায্যে আমরা অন্যের মনে বিশ্বাস জাগাতে পারি; কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই বিশ্বাস জাগানোর পুরো ব্যাপারটিই নির্ভর করছে ওই ব্যক্তির ইচ্ছা বা সংকল্পের উপর। তার ইচ্ছাশক্তিকে প্রভাবিত করতে না-পারলে সব প্রচেষ্টাই পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হতে বাধ্য। এ জন্য প্রেট ইচ্ছাশক্তিকে বিশ্বাসের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

এবার স্বাভাবিকভাবেই পাঠক-পাঠিকাদের মনে একটা প্রশ্ন প্রাসঙ্গিকরূপে জাগে। প্রশ্নটা হচ্ছে, বিশ্বাসের সাথে যুক্তি-চিন্তন বা বিচার-বিশ্লেষণের সম্পর্ক কি? বিশ্বাস ও বিচার বিশ্লেষণ কি পুরোপুরি আলাদা স্বভাবের, না এরা একে অপরের পরিপূরক ? প্রশ্নটা খুবই মৌলিক, তাই একটু তলিয়ে দেখা আবশ্যক। সাধারণ দৃষ্টিতে বিচার

১৫. **The Religious Consciousness**, J. B. Pratt, Macmillan and Co., New York, pp. 210-23.

বিশ্লেষণের সাথে বিশ্বাসের একটা প্রভেদ সুস্পষ্ট। যাঁরা এই সাধারণ দৃষ্টিতে আস্থাশীল, তাঁরা জ্ঞানক্রিয়াকে পার্থিব ও অপার্থিব, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সাপেক্ষ ও ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ– এ দু'ভাগে ভাগ করে দেখে থাকেন। তাঁদের মতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পার্থিব জ্ঞানের আওতাধীন। এ জ্ঞানে বিচার বিশ্লেষণ, পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ ও যুক্তি-তর্ক অত্যাবশ্যক। প্রমাণ ব্যতীত কোন কিছুই এ জ্ঞান মেনে নেয় না, নিতে পারে না। কিন্তু ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ বা অপার্থিব জ্ঞান ইন্দ্রিয় সাপেক্ষ নয়, এটি প্রমাণ বা যুক্তির অতীত। এ ক্ষেত্রে মানুষের একমাত্র করণীয়, বিচার-বিশ্লেষণের কোনরূপ অপেক্ষা না করেই বিশ্বাসের মাধ্যমে তাদের গ্রহণ করে নেয়া।[১৬]

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বিচার-বিশ্লেষণের সাথে বিশ্বাসের একটা মৌলিক পার্থক্য রয়ে গেছে। কিন্তু তাই বলে কি বিশ্বাসলব্ধ জ্ঞানের পেছনে আদৌ কোন যুক্তি নেই ? বিশ্বাস ক্রিয়াটির অন্তর্নিহিত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এর সত্যতার পেছনেও কিছু যুক্তি থাকে, যদিও এ যুক্তিগুলো বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের সত্যতার যুক্তি থেকে স্বতন্ত্র। এ স্বাতন্ত্র্য বোঝানো যেতে পারে তথ্যজ্ঞান ও মূল্যজ্ঞানের স্বাতন্ত্র্যের মাধ্যমে। একজন বিজ্ঞানী সর্বদাই তাঁর লক্ষ্যকে নিবেদিত রাখেন বস্তু যেভাবে আছে, ঠিক সেভাবে সংশ্লিষ্ট বস্তুটির বিচারের দিকে। বিজ্ঞানীর কাজ দাঁড়ায় তথ্য-বিচার, যা নৈর্ব্যক্তিক, মনোনিরপেক্ষ এবং পুরোপুরি বস্তুনিষ্ঠ। কিন্তু মূল্যের বিচার শুধু এভাবে করা যায় না। একটা গৃহীত আদর্শকে সামনে রেখেই মূল্যের বিচার করা হয়ে থাকে। তা হলে দেখা যায়, মূল্যের বিচারে একদিকে যেমন বস্তুর দিকে লক্ষ্য রাখা হয়, অন্যদিকে তেমনি একই সঙ্গে আদর্শের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হয়। আর এ কারণে মূল্যের বিচার একদিকে যেমন বস্তুগত, অন্যদিকে তেমনি আদর্শগত।

অনুরূপ যুক্তি বিশ্বাসের বেলায় খাটে। বিশ্বাস বিচার বিশ্লেষণের মতো সম্পূর্ণ বস্তুগত না হলেও কল্পনার মতো সম্পূর্ণ মনগড়া নয়। বিশ্বাসের দেখাকে আমরা অনুরাগের দেখার সাথে তুলনা করতে পারি। স্রষ্টাকে ধর্ম যে চোখ দিয়ে দেখে, তা অনেকটা প্রেমিকের চোখ, বন্ধুর চোখ।[১৭] আসলে বিশ্বাস এমন একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার, যার মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠতা না থাকলেও কল্পনার মতো এটি একেবারে অলীক কিছু নয়। এ যুক্তিতেই মনস্তাত্ত্বিক স্টাউট বিশ্বাস ও কল্পনার মধ্যকার পার্থক্যরেখা নির্ধারণ করেছেন। তাঁর মতে বিশ্বাসের মধ্যে মানসিক ক্রিয়ার উপর বস্তুগত নিয়ন্ত্রণ থাকে, কিন্তু কল্পনার রাজ্যে তা একেবারে অনুপস্থিত।[১৮] তা

১৬. **Manual, Stout,** P. 570.

১৭. **The Phlisophy of Religion**, D. M. Edwards, Indian Edition, The Progressive Publishers, Calcutta, 1960, p. 211.

১৮. Ibid, p. 571, Stout.

হলে বিশ্বাস অবশ্যই কল্পনার ঊর্ধ্বে। বিশ্বাস অন্তত কল্পনার মতো একেবারে বিচার-বিযুক্ত ব্যাপার নয়। বিশ্বাস সরাসরি বিচার-বিশ্লেষণকে প্রত্যাখ্যান করে না। আবার যাকে আমরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বলে সম্মান করি, তার মধ্যেও বিশ্বাসের ছোঁয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক যে সত্যগুলো আবিষ্কার করেছেন, সেগুলোতে প্রথমে তিনি আস্থা স্থাপন করেন, তারপরই তিনি সেগুলোকে প্রমাণ করেন বা করার চেষ্টা করেন। এ কারণেই বার্গ বলেন, সত্যানুসন্ধানে একমাত্র সহায়তা করার জন্যই নয়, সত্যাবিষ্কারের সূচনাকে সম্ভব করে তোলার কাজেও বিশ্বাস একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।[১৯]

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্বাস ও বিচার-বিশ্লেষণের মধ্যে অন্তর্নিহিত কোন দ্বন্দ্ব নেই। এ দু'টি আসলে একে অন্যের পরিপূরক। যে বিজ্ঞানে আমরা বিচার-বিশ্লেষণের চরম প্রকাশ দেখি, সেও তার গৃহীত পদ্ধতিগুলোকে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে বিশ্বাস করে নেয়। পক্ষান্তরে বিশ্বাসের মধ্যে যদি কোন বিচার-বিশ্লেষণ না থাকে, তা হলে সে গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে পারে না, অর্ধ পথেই সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে বাধ্য। কাজেই সাধারণ দৃষ্টিতে বিশ্বাস ও বিচার-বিশ্লেষণের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও পরিণামে এরা একে অন্যের সহযোগী হিসেবে কাজ করে।[২০] অতএব এ দু'ধরনের জ্ঞানকে আমরা আলাদা আলাদা রাজ্যের নির্বাসন দিতে পারি না। বিচার-বিশ্লেষণ লব্ধজ্ঞানে বিশ্বাসের ব্যাপারটা থাকে প্রচ্ছন্ন, আর বিশ্বাসলব্ধ জ্ঞানে বিচার-বিশ্লেষণ থাকে প্রচ্ছন্ন। প্রকৃত বিশ্বাস বোধের সঙ্গে বিচার-বিশ্লেষণের তাই কোন বিরোধিতা নেই। বিশ্বাস বিচার-বিশ্লেষণের ঊর্ধ্বের এক স্তর, যা বিচার-বিশ্লেষণের সাথে বৈরীভাব পোষণ করে না, বরং তার পরিপূরক হিসেবে কাজ করে চলে। অন্যদিকে বিচার-বিশ্লেষণ তার স্বভাবগত ধর্মে বিশ্বাসের সহযোগী হিসেবে কাজ করে চলে।

প্রত্যাদেশের মতো বিশ্বাসের প্রকৃতি সম্পর্কেও অধুনা 'বাচনিক' ও 'অবাচনিক' নাম নিয়ে দু'টো বিশেষ মতবাদের আবির্ভাব ঘটেছে। প্রথমে আমরা বিশ্বাস সম্পর্কে বাচনিক মতবাদটি আলোচনা করার চেষ্টা করবো। প্রত্যাদেশের বাচনিক মতবাদের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করেই বিশ্বাসের প্রকৃতি সম্পর্কিত বাচনিক মতবাদটির উৎপত্তি। ১৮৭০ সালে ভ্যাটিকান পরিষদ বিশ্বাসের এই আধুনিক বাচনিক রূপের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে, বিশ্বাস হচ্ছে এক অতি-প্রাকৃত [Supernatural] সদগুণ, যার জন্য স্রষ্টার করুণা দ্বারা অনুপ্রাণিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে তাঁর প্রকাশিত সত্যগুলোকে আমরা 'বাস্তব সত্য' বলে মনে করে থাকি। আমেরিকার সমকালীন একজন নেতৃস্থানীয় ধর্মবিদ বলেছেন, 'বিশ্বাস শব্দটি একজন ক্যাথলিকের কাছে যে ধারণার নির্দেশ করে

১৯. **Towards a Religious Philosophy**, W. G. Burgh, Macmillan and Co., Lodon, 1954, p. 17.

২০. Ibid, p. 212, D. M. Edwads.

তা হলো প্রত্যাদেশের বিষয়াবলীকে সত্য মনে করে বুদ্ধিগত স্বীকৃতি জ্ঞাপন করা। কারণ স্রষ্টা হলেন একমাত্র প্রামাণিক কর্তৃপক্ষ, যাঁর দ্বারা ওই সত্য প্রত্যাদিষ্ট হয়। তাই স্রষ্টার দ্বারা ব্যক্ত একটি বিচার-বুদ্ধি সম্মত বাণীর প্রতি ক্যাথলিকের প্রতিক্রিয়ার নামই হচ্ছে বিশ্বাস'।[২১]

বিশ্বাসের প্রকৃতি সম্পর্কিত বাচনিক মতবাদ ইচ্ছার স্বাধীনতাকে জোর সমর্থন করে। এ মতবাদের অনুগামীরা মনে করেন যে, স্রষ্টা বা তাঁর ক্রিয়াকলাপ মানুষের স্বাধীনতাকে খর্ব করে না। কোন কিছুর নির্বাচনের ব্যাপারে মানুষ খেয়াল খুশী মতো তাঁর কাঙ্ক্ষিত জিনিসটিকে নির্বাচন করতে পারে, বিশ্বাসের বেলায়ও তার কোন ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় না। অর্থাৎ মানুষ ইচ্ছা করলে ঐ পরম সত্তার প্রতি যেমন আস্থা স্থাপন করতে পারে, তেমনি ইচ্ছা করলে যে তার বিপরীতটাও করতে পারে। তার মানে পরম সত্তায় আস্থা স্থাপনে বা অবিশ্বাসে তার নিজস্ব ইচ্ছাই তাকে চালিত করে। মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই অসীম ও বৃহত্তর সত্তার প্রতি আস্থা স্থাপন করতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্বাসের সাথে ইচ্ছার স্বাধীনতার সম্পর্ক খুবই নিকট ও নিবিড়। বিশ্বাসের সাথে ইচ্ছার স্বাধীনতার ভূমিকার এই ইতিবাচক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ধর্ম-দর্শনের ইতিহাসে বিশ্বাসের প্রকৃতি সম্পর্কিত কতকগুলো নতুন মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে। এসব নতুন মতবাদের স্থপতিরা হচ্ছেন সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী চিন্তাবিদ ব্লেইস প্যাসকেল, ঊনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকান দার্শনিক ও বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেম্‌স ও প্রখ্যাত আমেরিকান দার্শনিক এফ. আ. টেনেন্ট। বিশ্বাসের প্রকৃতি সম্পর্কিত আধুনিক মতবাদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়ার উদ্দেশ্যে এবার আমরা এসব বিখ্যাত মনীষীর মতের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা উপস্থাপনের চেষ্টা করবো।

প্যাসকেলের মতে, ধর্মীয় বিশ্বাস মূলত সেচ্ছায় কোন কিছুকে স্বীকার করে নেয়া। তিনি মনে করেন, স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কিত বিশ্বাসটি একটা রহস্যময় ব্যাপার। স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কিত বিশ্বাসটিকে আমরা একটা 'পণ' হিসাবে ধরে নিতে পারি। স্রষ্টা অস্তিত্বশীল বলে যদি আমরা পণাবদ্ধ হই এবং যদি আমাদের এ পণ সঠিক হয় তা হলে আমরা আর কিছু না পেলেও অন্তত চিরন্তন মুক্তি [Eternal Salvation] অর্জন করতে পারি। আর যদি আমাদের পণ ভুল বলে প্রমাণিত হয়, তাহলেও কিন্তু আমাদের তেমন কিছু হারাবার ভয় নেই। পক্ষান্তরে স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই বলে যদি আমরা পণাবদ্ধ হই এবং আমাদের পণ যদি সঠিক হয়, তাহলে আমাদের লাভের

---

২১. **Faith and understanding in America**, G. Weigel, Macmillan and Co., New York, 1959, p. 1.

দিকটা এখানে খুবই তুচ্ছ। আর যদি আমাদের পণ ভুল বলে প্রমাণিত হয়, তা হলে চিরন্তন মুক্তিটা হারাই। এ কারণে প্যাসকেল বলেন, স্রষ্টা অস্তিত্ববান, এ বিশ্বাসের লাভ-ক্ষতির হিসাব টানলে দেখা যাবে যে, যদি আমরা লাভ করতে পারি, তা হলে 'অনেক কিছুই লাভ' করে বসি, কিন্তু হারালে আমাদের 'অনেক কিছু হারাবার' ভয় থাকে না। অতএব আমরা স্রষ্টাকে অস্তিত্বশীল ধরে পণাবদ্ধ হতে পারি।[২২]

এ প্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কারো মধ্যে আদৌ কি ধর্মীয় বিশ্বাস জাগ্রত করা যায়? প্যাসকেলের উত্তর– হ্যাঁ। তবে তড়িঘড়ি করে তা করা যায় না। এর জন্য কিছু সময়ের দরকার। একটা অনুশীলন পদ্ধতির মাধ্যমে এ কাজে অগ্রসর হতে হবে। এ পদ্ধতি হলো অবিশ্বাস দূর করার বা অবিশ্বাসের প্রতিকার অনুসন্ধানের পদ্ধতি। এখানে আমাদের করণীয় হলো ধর্মীয় সত্যে অবিশ্বাসী ব্যক্তিরা যেভাবে বিশ্বাসী হয়েছেন, তা অনুসন্ধান করা এবং তাঁদের কর্মের অনুশীলন করা। এভাবেই একজনের মধ্যে আমরা ধর্মীয় বিশ্বাস জাগ্রত করতে পারি, কিন্তু তা না-করে যদি আমরা সঙ্গে সঙ্গেই কারো মনে স্রষ্টা সম্পর্কিত সত্য জাগ্রত করার চেষ্টা করি, তা হলে এ কাজে অবশ্যই আমাদের বিফল হতে হবে।[২৩]

প্রয়োজনবাদী দর্শন সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম জেম্‌স তাঁর 'The Will to Believe' শীর্ষক রচনায় স্রষ্টার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের বিশ্বাসের ব্যাপারটিকে একটা অত্যাবশ্যক প্রকল্প হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে এখনো আমরা এ সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত প্রমাণ আবিষ্কার করতে পারছি না। তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, যে-কোন ব্যক্তি তার খেয়াল-খুশী মতো, স্রষ্টার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের বিশ্বাসের প্রকল্পের ওপর তার জীবনকে পণ হিসেবে ধরে নিতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা তা-ই করে থাকি বা করতে অনেকটা বাধ্য হই। জেম্‌সের মতে সন্দেহবাদের মুখোশ পরে আমরা এ ব্যাপারটাকে এড়িয়ে চলতে পারি না। এড়িয়ে না যাওয়ার পেছনে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে জেম্‌স বলেন, "ব্যাপারটিকে এড়িয়ে গেলে, ধর্ম সত্য হলে একদিকে যেমন আমরা শুভকে হারাই, অন্যদিকে ধর্ম মিথ্যা হলে অশুভকে পরিহার করতে পারি। কিন্তু ধর্ম সত্য না মিথ্যা তা আমরা তাৎক্ষণিকভাবে বলতে পারি না। আর পারি না বলেই আমরা বিশ্বাসের ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যেতে চাই না, চাইলেও অনেক সময় পারি না। অধিকন্তু স্রষ্টাকে যদি আমরা 'ব্যক্তি' হিসাবে কল্পনা করি, তা হলে তাঁকে বাস্তব বলে আমাদের অবশ্যই মেনে নিতে হয়। এক্ষেত্রে সন্দেহবাদীদের অনিচ্ছা স্রষ্টাকে স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে একটা বাধার

---

২২. Pensees, **Pascal**, E. P. Dutton and Co., New York, 1932, No. 233, P. 67.

২৩. Ibid, No. 233, p. 68, **Pascal**.

সৃষ্টি করে থাকে।"[২৪] বিশ্বাসের প্রকৃতি সম্পর্কিত জেম্‌সের এ মত থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, তিনি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইচ্ছার অবাধ স্বাধীনতার সমর্থক। কিন্তু কোন ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতার স্বীকৃতি অনেক সময় অশুভ ফলও বয়ে নিয়ে আসতে পারে। ধর্মের ব্যাপারে এ কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এ কারণেই সম্ভবত জর্জ সান্টায়ানা জেম্‌সের এ মতের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে জেম্‌স যা বলেছেন, তা নিছক ব্যক্তিগত। আর এ ব্যক্তিগত মতে একদিকে যেমন লক্ষ্য করা যায় নিরাপত্তার অভাব, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে এতে আনন্দের অনুপস্থিতি। তাঁর [জেম্‌স] বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি বিশ্বাসের সমর্থক ছিলেন না, বিশ্বাসের অধিকারে তিনি বিশ্বাস করতেন।[২৫]

এফ.আর. টেনেন্ট[২৬] নামে জনৈক সমকালীন ধর্মদার্শনিক অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, সব ধরনের আবিষ্কারের মধ্যে বিশ্বাসও একটা আবিষ্কার এবং এটি মূলত ইচ্ছাক্রিয়ার উপাদানের সাথে এক ও অভিন্ন। তাঁর মতে কোন কিছু আবিষ্কার করতে গেলে যেমন ব্যক্তির ইচ্ছা তার সাথে সম্পৃক্ত থাকে, বিশ্বাস নামক প্রক্রিয়াটির সাথেও ব্যক্তির ইচ্ছা তেমনি অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। তিনি বিশ্বাস প্রক্রিয়ার সাথে ঝুঁকির উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন। বিজ্ঞানের আবিষ্কারে যেমন ঝুঁকি নেয়া প্রয়োজন, বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও ঝুঁকি না নিলে উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। টেনেন্ট এখানে বিজ্ঞান ও ধর্মকে একই চোখে দেখেছেন বলে মনে হয়। কিন্তু আসলে তা ঠিক নয়। যে কোন সাধারণ একজন ব্যক্তিত্ব এ ব্যাপারে সচেতন যে, বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস ও ধর্মীয় বিশ্বাস এক হতে পারে না। বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের মধ্যে পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণের একটা অবকাশ স্বীকৃত, কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তার আশা করাটাই এক ধরনের অজ্ঞতা মাত্র। ধর্মীয় বিশ্বাস হচ্ছে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। অন্তরাত্মার ব্যাপার। এখানে ব্যক্তির মনে ধর্মীয় সত্য কতটুকু সাড়া জাগাতে সক্ষম, তা-ই আমাদের বিবেচ্য। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্যে ব্যাপারটি আলাদা। এখানে বাস্তব ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক সত্যের কতটুকু সাযুজ্য রয়েছে, তা-ই আমরা বিবেচনা করে থাকি। সুতরাং বৈজ্ঞানিক সত্যের সাথে ধর্মীয় সত্যের অভেদ কল্পনা করে টেনেন্ট বিশ্বাসের প্রকৃতি সম্পর্কে যে মতবাদ দাঁড় করিয়েছেন; তা আমরা একবাক্যে গ্রহণ করতে পারি না।

---

২৪. **The Will to Believe and other Essays**, W. James, Longmans, Green and Co. New York, 1897, pp. 26-7.

২৫. **Character and Opinion in the United Stetes**, G. Santayana, Doubleday Anchor Books, New York 1958, p. 47.

২৬. **Philosophical Theology**, F.R. Tennant, Cambride University Press, Cambridge, 1928, p. 109.

সব কিছু বলতে না পারলেও আমরা এখন আলোচনার প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। এ পর্যায়ে আমরা বিশ্বাসের প্রকৃতি সম্পর্কিত অবাচনিক মতবাদের মর্মবাণীটি বুঝে নিয়ে বর্তমান আলোচনায় সীমারেখা টেনে দেবো। অবাচনিক মতাবলম্বীদের মতে, বিশ্বাসের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে, এ মানবজাতির ইতিহাসে স্রষ্টার যাবতীয় কাজের ঐচ্ছিক স্বীকৃতির নির্দেশক মাত্র। বিশ্বাসের বিষয়বস্তু কোন অবস্থাতেই স্রষ্টা সম্পর্কিত এক গুচ্ছ সত্যের নির্দেশক নয়; বরং এ কোন একটি ঘটনাকে বিশেষ প্রেক্ষিত থেকে দেখা, গ্রহণ করা বা ব্যাখ্যা করার মানসিক প্রবণতার নির্দেশ দিয়ে থাকে।

এই 'দেখা'র বিষয়টি কেবল ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, ধর্মনিরপেক্ষ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সমকালীন বিশ্লেষণী দার্শনিক লুডভিগ ভিটগেনস্টাইন জ্ঞানতাত্ত্বিক [epistemological] দিক থেকে 'দেখার বিষয়টিকে' ধর্মনিরপেক্ষ অভিজ্ঞতায় প্রয়োগ করে এর একটি পৃথক অর্থ নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। তিনি একটি ধাঁধাঁর ছবির উদাহরণ দিয়ে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন।[২৭] দৃষ্টান্ত স্থলে এখানে একটি কাগজের উপর অঙ্কিত কতকগুলো বিন্দু ও রেখার ছবিকে বিবেচনা করা যাক। সাধারণ দৃষ্টিতে হঠাৎ এই বিন্দু ও রেখার দিকে কারো দৃষ্টি পড়লে তিনি কাজগটির উপর বিন্দু ও রেখাকে না দেখে অন্য কোন কিছুর ছবি দেখে ফেলতে পারেন। তখন ওই ব্যক্তির কাছে বিন্দু ও রেখার দ্বারা বেষ্টিত কাগজটি এক বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয়। তার কাছে ওই বিন্দু ও রেখাগুলো এলোমেলো চিহ্নের সমষ্টি হিসেবে ধরা পড়ে না। অতএব এই 'দেখার বিষয়টি' ধর্মনিরপেক্ষ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও এক তাৎপর্যের অধিকারী।

যে সমস্ত ধর্মীয় অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে জটিলতর বলে মনে হয়, তাদের ক্ষেত্রে 'দেখার বিষয়টি' আরো গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে প্রতিভাত হয়। সময় সময় যখন কোন ধার্মিক মনে কোন ঘটনার অভিজ্ঞতা হয়, তখন সেই ঘটনা একই অবস্থায় দু'টি স্বতন্ত্র ধরনের তাৎপর্যের ইঙ্গিত নিয়ে আসতে পারে। ধর্মীয় ঘটনাটি একই ব্যক্তির কাছে একাধারে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা এবং অন্যদিকে তার কাছে সেই ঘটনাটি স্রষ্টার মহিমা প্রকাশের তাৎপর্যও বহন করতে পারে। এক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তির স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার তাৎপর্যের উপর একটি ধর্মীয় তাৎপর্য আরোপিত হয়।

ওহী বা প্রত্যাদেশ ও ঈমান বা বিশ্বাস সম্পর্কীয় উপরোক্ত দার্শনিক আলোচনার পর এ দু'টোর বৈধতা সম্পর্কে নতুন করে আর কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না।

---

২৭. **Philosphical Investigations**, L. wittgenstein, Basil Blackwell, Oxford, 1953. part II, Sec. xi

অতীন্দ্রিয় ও ধর্মীয় জ্ঞানের মাধ্যম হিসেবে এরা যে দু'টো প্রামাণিক [authentic] উৎস, এতে কোন সন্দেহ নেই। কুরআনুল করীমে এদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট সমর্থন লক্ষণীয়। পবিত্র কুরআনের শুরুতেই আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেছেন ঃ 'ইহা সেই কিতাব এতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য ইহা পথ-নির্দেশ, যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে... জিব্‌রীল (আ.)-এর মাধ্যমে মহানবীর কাছে প্রেরিত আল্লাহ্ তা'আলার ওহীর এক অপূর্ব সংকলন কুরআনুল করীম। ওহী প্রত্যাদেশে বিশ্বাস স্থাপন করা প্রতিটি মুসলমানের অবশ্যই কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত। এই বিশ্বাস স্থাপন করেই আমরা কেবল ধর্মীয় জ্ঞানসহ ইহকাল ও পরকাল, স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং বেহেশত ও দোযখ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারি। আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যাদেশে বিশ্বাস স্থাপন এবং সে অনুয়ারী আমল করেই মানুষ স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। আর স্রষ্টার এই সান্নিধ্য লাভই প্রতিটি মুসলমানের এক পরম ও অলঙ্ঘনীয় আদর্শ।.......

অনেক দার্শনিক ধর্মীয় জ্ঞান ও তার মাধ্যম হিসেবে প্রত্যাদেশ ও বিশ্বাসের বাস্তবতা অস্বীকার করে বসেছেন। তাঁদের মতে, পার্থিব জ্ঞানকে যে মাধ্যমে পাওয়া যায়, সে মাধ্যমে আমরা ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করতে পারি না; আর পারি না বলেই ধর্মীয় জ্ঞানের বাস্তবতা বা সত্যতাকে স্বীকার করা যায় না। ধর্মীয় জ্ঞানের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসী দার্শনিকদের এ ধরনের অভিযোগ দুঃখজনক। এ ধরনের অভিযোগ ধর্মীয় জ্ঞানের স্বরূপ সম্পর্কে তাঁদের করুণ অনবহিতিই প্রকাশ করে মাত্র। তাঁদের অভিযোগ আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁরা পার্থিব জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে ধর্মীয় জ্ঞানের সমতুল্য ভেবে একই মানদণ্ডের আলোকে তাদের মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। স্বভাবের দিক থেকে ধর্মীয় জ্ঞান পার্থিব ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আর এ কারণেই পার্থিব ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্বীকৃত মানদণ্ডের আলোকে ধর্মীয় জ্ঞান ও সত্যকে মূল্যায়ন করা যায় না। অবিশ্বাসী দার্শনিকগণ যদি এর উর্ধ্বে উঠে প্রত্যাদেশে বিশ্বাসী হতে পারতেন, তা হলে তাঁরা কোনক্রমেই ধর্মীয় জ্ঞানের বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারতেন না। তাঁরা আরো নিরপেক্ষভাবে আল্লাহ্ তা'আলার ওহীর স্বরূপ সম্পর্কে অনুসন্ধান করবেন, প্রত্যাদেশকে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করবেন– উপসংহারে এ আশাই করছি।

অপরাধ প্রতিরোধে ঈমানের ভূমিকা*

মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

ইসলামে ঈমানের স্থান সর্বপ্রথম। তার পরই ইসলাম। ঈমান বীজ-সদৃশ আর ইসলাম হচ্ছে সে বীজ থেকে অংকুরিত বৃক্ষ। বীজ না হলে যেমন বৃক্ষের অস্তিত্ব অসম্ভব, তেমনি ঈমান ব্যতীত ইসলাম অবাস্তব। ইসলাম একটা দেহ সংস্থা, ঈমান তার মধ্যে অবস্থিত প্রাণ-সদৃশ। প্রাণহীন দেহ মূল্যহীন। তাই দীন ইসলামে ঈমানের গুরুত্ব সর্বাধিক।

ইসলাম মানুষকে সর্বপ্রথম ঈমান গ্রহণেরই আহ্বান জানায়। কেননা ঈমান হচ্ছে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ প্রাসাদের ভিত্তি যেমন বীজ হচ্ছে শাখা-প্রশাখা পত্র-পল্লব সমন্বিত বৃক্ষের মূল।

বীজ বপন করা হলেই বৃক্ষের অংকুরোদ্‌গম হওয়ার সম্ভাবনা। বীজ রোপিত না হলে বৃক্ষের অস্তিত্ব আকাশ-কুসুম। ঈমান দানা বেঁধে উঠলে ইসলাম তথা ইসলামী বিধান কার্যত অনুসৃত হবে বলে প্রত্যয় জন্মে। ঈমান হলে ইসলাম পালিত হওয়ার সম্ভাবনা যেমন থাকে, তেমনি ঈমান বিহীন ইসলাম আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ব্যবস্থা হিসাবে তাঁর নিকট গৃহীত হয় না। ঠিক এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে বান্দাহ্‌দের জন্য যে বাস্তব কর্মের বিধান উপস্থাপিত করেছেন তার সবগুলিতেই তিনি সম্বোধন করেছেন ঃ يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا 'হে ঈমানদার লোকেরা' কিংবা 'হে ঐ সব লোক যারা ঈমান এনেছো' বলে। কেননা আল্লাহ্‌র প্রতি যার ঈমান নেই, সে আল্লাহ্‌র বিধান আদেশ বা নিষেধ পালনে প্রস্তুত হবে কেন! আল্লাহ্‌র প্রতি যার ঈমান রয়েছে সেই আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করতে এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকতে প্রস্তুত হতে পারে। আর যার তা নেই সে তা পালন করবে এমন আশা নিতান্তই অর্থহীন।

মূলত ঈমান শব্দের অর্থ হচ্ছে সত্য বলে মেনে নেয়া, সত্য বলে স্বীকার করা। কেউ কোনো বিষয়ে কাউকে কোন সংবাদ দিলো, সেই সংবাদকে সত্য বলে মেনে

---

* [প্রবন্ধটি ইফা পত্রিকা ১৯৮২-৮৩ সন ২১, ২২ বর্ষ ৩য়, ৪র্থ ও ১ম সংখ্যা থেকে সংগৃহীত]

নেয়া বা স্বীকার করাই হচ্ছে ঈমান। সে 'ঈমানে' শুধু মৌখিক স্বীকৃতির কথা নেই, তা মানতে প্রস্তুত হওয়ার কথাটিও শামিল রয়েছে এবং খবরদাতার দেয়া শুধু খবরটুকুকে সত্য বলে মেনে নেয়াই ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়; সেই সাথে খবরদাতাকে সাচ্চা বা সত্যবাদী—সত্য সংবাদদাতা বলেও বিশ্বাস করা তার অন্তর্ভুক্ত। কেননা শুধু খবরটুকুকে সত্য মেনে নিলেও সে খবরটুকুর প্রকৃত সূত্র হওয়ার জন্য তা যথেষ্ট হয় না। সেই সাথে খবরদাতাকে সত্য মানাও একান্তই অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে সংবাদটুকুকে শুধু মৌখিকভাবে সত্য মেনে নেয়াই ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়, সেই সংবাদের পরিণতি সম্পর্কিত অংশকেও অবশ্যই সত্য বলে মেনে নিতে হয় এবং তা সত্য হলে সেই পরিণতি অনুযায়ী স্বীয় কর্মনীতি নির্ধারণ করাও অনিবার্য হয়ে পড়ে।

তাহলে কোনো সংবাদকে সত্য বলে মেনে নেয়ার তিনটি দিক একই সময় অবিচ্ছিন্নভাবে বর্তমান রয়েছে। প্রথম ঃ সংবাদ সত্য; দ্বিতীয় ঃ সংবাদদাতাও সত্য; এবং তৃতীয় ঃ সংবাদে নিহিত পরিণতি সত্য বিধায় তদনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণে রাযী হওয়া।

দুনিয়ার ঈমানের আহ্বান জানিয়েছেন আল্লাহ্ প্রেরিত নবী রাসূলগণ। তাদের আহ্বান ছিলো একক ও লা-শরীক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান গ্রহণের। এ আহ্বানের প্রতি ঈমানের অনিবার্য দাবী হচ্ছে, আল্লাহ্ আছেন, তিনি এক ও একক, লা-শরীক, এই কথাকে পরম সত্য বলে মেনে নেয়া। এই কথাকে সত্য বলে মেনে নেয়া হলে এই সংবাদ যাঁরা দিয়েছেন এবং এ আহ্বান যাঁরা জানিয়েছেন, সেই নবী ও রাসূলগণকেও সত্য বলে মেনে নিতে হয়। এ হচ্ছে ঈমানের প্রথম ও দ্বিতীয় দিক। আর তৃতীয় দিক হচ্ছে, আল্লাহ্ আছেন, তিনি লা-শরীক, এই কথাকে মেনে নিলে তাঁর আদেশ নিষেধসমূহকেও সত্য মেনে নিতে হয়, সত্য মেনে নিতে হয় তার পরিণতি—অর্থাৎ তা না মানলে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি, ক্রোধ এবং আযাব ভোগ করতে হবে, আর মানলে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জিত হবে, পরকালে পাওয়া যাবে জান্নাত—একথাটুকু। এভাবে একই ঈমান এর মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে নিহিত রয়েছে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান, রাসূলের প্রতি ঈমান এবং পরকালের প্রতি ঈমান। ঈমানের ক্ষেত্রে এই বিন্যাস বা পরম্পরা সাধারণভাবেই পরিচিত, কিন্তু ঈমান গ্রহণের প্রয়োজনের দিক দিয়ে প্রথম হচ্ছে রাসূলের প্রতি ঈমান। তারপরে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এবং তৃতীয় পর্যায়ে পরকালের প্রতি ঈমান।

রাসূলের প্রতি ঈমান গ্রহণ সর্বপ্রথম প্রয়োজন। কেননা, ঈমানের আহ্বান সর্বপ্রথম তিনিই আমাদের দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা সরাসরিভাবে এই আহ্বান মানুষের কাছে পৌছাননি। তিনি এই আহ্বান প্রচারের জন্য তাঁর মনোনীত নবীকে প্রথম প্রস্তুত করেছেন; পরে এই নবীর জবানীতে দুনিয়ার মানুষের নিকট সে আহ্বান পৌছেছে

এবং সর্বত্র বিস্তৃত হয়েছে।

কিন্তু পরিণতির দিক দিয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব হচ্ছে পরকালের প্রতি ঈমানের। কেননা পরকাল-ই যদি সত্য না হলো, তা'হলে আল্লাহ্‌র প্রতি বা রাসূলের প্রতি ঈমানের কোনো তাকীদ অনুভূত হবে না। এ তাকীদ অনুভূত হয় এ ভাবে যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান ও আনুগত্য না হলে পরকালে কঠিন আযাব ভোগ করতে হবে নিশ্চিতভাবে। এই কারণে পরকালকে শুধু সত্য মেনে নেয়াই যথেষ্ট নয়, পরকালের সত্যতার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় একান্তই অপরিহার্য। এ জন্যই সূরা আল-বাকরার শুরুতে গাইব অর্থাৎ আল্লাহ্, ফিরিশতা ওহী ও রিসালতের প্রতি ঈমান গ্রহণের কথা বলার শেষে বলা হয়েছে ঃ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ (بقرة٤)

'এবং পরকালের প্রতি তারা অবিচল দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করে।'

অবশ্য আনুগত্যের দিক দিয়ে বিন্যাস হচ্ছে, প্রথমে আনুগত্য করতে হবে আল্লাহ্‌র এবং তারপরে তাঁর রাসূলের। বিধান পালনের দিক দিয়ে প্রথমে পালন করতে হবে আল্লাহ্‌র কালাম-কুরআন মজীদের বিধান। তারপরে রাসূলের সুন্নতের বিধান। কেননা মানুষের আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী হচ্ছেন একমাত্র মহান আল্লাহ্—সারা জাহানের অনন্য সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষণাবেক্ষণকারী বলে। আর রাসূলের আনুগত্য করতে হবে কেবল তাঁরই নির্দেশে তিনি তাঁর আনুগত্য করতে বলেছেন বলেই। অন্যথায় রাসূলের মানুষের আনুগত্য পাওয়ার কোন যুক্তি নেই।

পূর্বেই বলেছি, ঈমান প্রথমে, তার পরে ইসলাম। ইসলাম হচ্ছে কার্যবলীর বাস্তব বিধান যা করতে হবে বা যা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কুরআন এই আদেশ ও নিষেধ সমন্বিত যে বিধান উপস্থাপিত করেছে তার বাস্তবতা এই ঈমানের উপরই নির্ভরশীল। প্রথম দিকে যে সব লোক ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনতা ও বশ্যতা স্বীকার করেছিলো, কিন্তু ঈমান গ্রহণ করেনি, তাদের সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ ط وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (الحجرات : ١٤)

'মরুবাসী আরবরা বলেছে, আমরা ঈমান এনেছি। তুমি ওদের বলো ঃ তোমরা (এখনো) ঈমান আননি, বরং বলো, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। (অর্থাৎ ইসলামের অধীনতা মেনে নিয়েছি)। তোমাদের দিলে ঈমান এখনো প্রবেশ করেনি। আর তোমরা যদি আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করো তা'হলে তিনি তোমাদের কর্মের শুভ ফলে কোনো কমতি করবেন না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।'

ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনতা ও আনুগত্যকে ওরা ঈমানের সমতুল্য মনে করেছিলো,

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তা খণ্ডন করেছেন। বলে দিয়েছেন, ঈমানের অনিবার্য দাবী হচ্ছে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা যা ইসলামের মৌল ভাবধারা। কিন্তু তার পূর্বে আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমানের প্রয়োজন। এ ঈমান না আনা হলে 'আমরা ঈমান এনেছি' বলার অধিকার হয় না ইসলামের প্রশাসনিক আইন পালন করতে থাকা সত্ত্বেও। মোটকথা, রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের দিকটি ইসলাম, ঈমান নয়। এবং প্রথমে ঈমান না হলে রাষ্ট্রীয় আনুগত্য অর্থাৎ ইসলামের কোনো মূল্য আল্লাহ্র নিকট হবে না।

সংশয়মুক্ত ঈমান

সংশয়মুক্ত ঈমানই ইসলামে কাম্য। বরং সত্যি কথা, সংশয়হীন বিশ্বাসই ইসলামের ঈমান নামে পরিচিত ও অভিহিত। যে ঈমান সংশয়মুক্ত নয়, তা মানুষকে প্রকৃত মু'মিন বানায় না। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ط أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
(الحجرات : ١٥)

'প্রকৃত মু'মিন তারাই যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি। অতঃপর কোনোরূপ সংশয়াচ্ছন্ন হয়নি এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে তাদের জান-মাল দিয়ে। তারাই সত্যিকার ঈমানদার।'

আয়াতের প্রথম অংশ থেকে ঈমানের সংশয়মুক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা প্রকাশিত হয়েছে। মাঝখানের অংশে ঈমানের অনিবার্য ফলশ্রুতি আমল বাস্তব কাজের অর্থাৎ দীন কায়েমের জন্য জিহাদ করার উল্লেখ হয়েছে এবং শেষ অংশে আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমানের সাথে বাস্তব কাজের সমন্বয়কে প্রকৃত সত্য ঈমান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে ঈমান গ্রহণের বিন্যাস হচ্ছে, প্রথমে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এবং তারপর তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান। এবং এই ঈমানের সত্যতা প্রমাণকারী হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে নিজেদের জান-মাল বিনিয়োগ সহকারে আল্লাহ্র পথে আল্লাহ্র দীন কায়েমের লক্ষ্যে জিহাদ করাকে। এই ঈমান ও ঈমান অনুযায়ী আমল এর সমন্বিত রূপকেই সত্য ঈমানের প্রতীক রূপে ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ শুধু ঈমান-ই যথেষ্ট নয় সত্য ঈমান নয়। ঈমান অনুযায়ী কাজ শেষে সে ঈমানের সত্যতা প্রমাণিত হলেই সে ঈমানকে ঈমান বলে গ্রহণ করা হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঈমানের সত্যতা প্রমাণ স্বরূপ তদনুযায়ী আমল করার পূর্বে ঈমানের অস্তিত্ব হওয়ার অপরিহার্যতাকেও এখানে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। আর এই কারণেই কুরআনের যেখানেই ঈমানের কথা বলা হয়েছে, সেখানেই বলা হয়েছে আমলে সালিহ্ (عمل صالح) নেক'আমলের কথা।

এ প্রেক্ষিতে নেক আমল তা-ই যা ঈমানের দাবী অনুযায়ী ঈমানের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করে করা হবে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ

'যারা ঈমান এনেছে তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্‌র পথে এবং যারা কুফরি গ্রহণ করেছে তারা যুদ্ধ করে তাগুতের পথে।'

ঈমান ও কুফর

এ আয়াতে 'ঈমান' ও 'কুফর'– এ দুইটির অনিবার্য পরিণতির উল্লেখ করা হয়েছে। এ দুটিই মূলত মন-মানসিকতার ব্যাপার। এই মন-মানসিকতায় হয় আল্লাহ্‌র রাসূল ও পরকালের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস থাকবে, অথবা থাকবে অবিশ্বাস। বিশ্বাস থাকলে তার অনিবার্য ফলশ্রুতি হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে সশস্ত্র যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া আল্লাহ্‌র দীনের বিজয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। পক্ষান্তরে সে মন-মানসিকতায় আল্লাহ্‌র রাসূল ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস না থাকলে অনিবার্যভাবে থাকবে অবিশ্বাস। এই অবিশ্বাসই তাকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ বিরোধী কার্যকলাপে উৎসাহিত করবে, নেমে পড়তে বাধ্য করবে। আর আল্লাহ্‌র আদেশ বিরোধী কার্যকলাপের মধ্যে চূড়ান্ত হচ্ছে আল্লাহ্‌র দীন নির্মূল করে আল্লাহ-দ্রোহী শক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠা কল্পে সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। উভয় ক্ষেত্রেই সশস্ত্র যুদ্ধের (قتال) কথা বলা হয়েছে। আর সশস্ত্র যুদ্ধ হচ্ছে চরম পর্যায়ের আত্মত্যাগ। এই আত্মত্যাগে প্রস্তুত হওয়া নির্ভর করে বিশ্বাসের বলিষ্ঠতার উপর। বিশ্বাসের এই চরম বলিষ্ঠতা না থাকলে কারো পক্ষেই এই চরম মাত্রার আত্মত্যাগে ঝাঁপিয়ে পড়া সম্ভব হয় না। আর কি আল্লাহ্‌র পথে কি তাগূতের পথে— উভয় ক্ষেত্রেরই অনিবার্য দাবী হচ্ছে এই চরম মাত্রার আত্মত্যাগের। এই চরম মাত্রার আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত হওয়ার পূর্বে একটা প্রস্তুতি-পর্যায় অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে। কেননা হঠাৎ করে কারো পক্ষেই সচেতনভাবে এই চরম মাত্রার আত্মত্যাগে রাযী হওয়া সম্ভব হয় না। এই প্রস্তুতি-পর্ব হচ্ছে, যে লোক কুফরি নীতি অবলম্বন করেছে, সে তার মন-মেজায ও যাবতীয় তৎপরতা সেই অনুরূপই গড়ে তুলবে। আল্লাহ্‌র ও রাসূলের প্রতি চরম মাত্রার শত্রুতা মনের মধ্যে স্থান দিবে। আল্লাহ্‌র বিধানকে অগ্রাহ্য করবে, তাঁর অস্তিত্বও বরদাশ্‌ত করতে রাযী হবে না। পক্ষান্তরে যে লোক আল্লাহ্‌র প্রতি, রাসূলের প্রতি এবং পরকালের প্রতি ঈমান আনবে সে হবে আল্লাহ্ ও রাসূলের একনিষ্ঠ অনুগত। আল্লাহ্‌র প্রদত্ত ও রাসূলের উপস্থাপিত বিধানকে পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে পালনকারী হবে সে। সে আল্লাহ্‌র বিধান কোনক্রমেই বিন্দুমাত্রও অগ্রাহ্য করবে না; কেউ অগ্রাহ্য করুক তা সে বরদাশ্‌ত করতেও রাযী হবে

না। সে বিধানে যা হালাল তাকেই সে হালাল মেনে নেবে। কেউ তাকে হারাম বললে তা সে মানতে রাযী হবে না কিছুতেই। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন তা সে নিজে তো করবেই না—করতে কোনো ক্রমেই রাযী হবে না; উপরন্তু অপর কেউ সেই হারাম কাজ করুক, তা সে মুহূর্তের জন্যও বরদাশ্‌ত করবে না। এভাবে তার চিন্তা-চেতনা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌ময় হয়ে গড়ে উঠবে। কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র বিধানই বাস্তবায়িত হোক, তার বিপরীত কোনো বিধান সমাজে এক বিন্দু স্থান না পাক, আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি বিশ্বাসী ও তার ঐকান্তিক অনুসারীরাই সমাজে নেতৃত্বে ও রাষ্ট্র পরিচালনায় কর্তৃত্বের আসনে আসীন হোক, রাষ্ট্র ক্ষমতা তাদেরই করায়ত্ব হোক যেনো সর্বত্র আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব পুরাপুরি বাস্তবায়িত হতে পারে,—এই-ই হবে তার অন্তরের ঐকান্তিক কামনা ও বাসনা এবং এই তাকিদেই সে সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত চরম মাত্রার আত্মত্যাগে সচেতনভাবে রাযী হতে পারে।

ঈমান ও আমল

মোটকথা, ঈমানের পরে পরেই এবং সাথে সাথেই তদনুযায়ী আমল একান্তই জরুরী। অন্যথায় ঈমানের যথার্থতাই অপ্রমাণিত থেকে যায়। আর ঈমান অনুযায়ী আমল হচ্ছে, আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা এবং সেই সব কাজ করা যা তিনি ফরয বা কর্তব্যরূপে ঘোষণা করেছেন। এই আমল-ই ঈমানদারকে প্রকৃত মু'মিন বানিয়ে দেয়। কুরআন মজীদের বহুসংখ্যক আয়াতেই এ কথা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে বলা হয়েছে। এখানে এই পর্যায়ের কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করা হয়েছে ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَرْفَعُوٓا۟ أَصْوَٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِىِّ وَلَا تَجْهَرُوا۟ لَهُۥ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَٰلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. (الحجرات: ١-٢)

'হে ঈমানদার লোকেরা ঃ তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অগ্রে চলে যেও না। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। হে সে সব লোক, যারা ঈমান এনেছো! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপরে তোমাদের নিজেদের কণ্ঠস্বর অধিকতর উচ্চ করবে না এবং তোমরা পরস্পর যেভাবে জোরে জোরে কথা বলো নবীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সেরূপ জোরে বলো না। কেননা তোমাদের অজ্ঞাতসারেই তোমাদের সব নেকআমল বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় আছে।'

দু'টি আয়াতেই ঈমানদার লোকদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে। সেকথা হচ্ছে, তিনটি কাজের নিষেধ ও একটি কাজের আদেশ। আল্লাহ্ ও রাসূলের অগ্রে যেতে, রাসূলের কণ্ঠস্বরের তুলনায় স্বীয় কণ্ঠস্বর উচ্চ করতে এবং রাসূলের সাথে জোরে-জোরে

কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে[১] এবং আদেশ করা হয়েছে আল্লাহ্‌কে ভয় করতে। এ আদেশ ও নিষেধ কাজ বিশেষ। এ কাজের ভিত্তি হচ্ছে ঈমান। এ ঈমান যাদের আছে, তাদেরকেই কাজের আদেশ করা হয়েছে এবং কয়েকটি কাজ করতে তাদেরই নিষেধ করা হয়েছে।

অতএব যাদের ঈমান আছে, তারা অবশ্যই এ আদেশ ও নিষেধ মান্য করবে। আর যাদের ঈমান নেই তারা এ আদেশ নিষেধকে গ্রাহ্যমাত্রও করবে না। তাহলে ঈমান-ই আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ পালনের মূলে আসল প্রাণশক্তি। ইসলাম মানুষের মধ্যে এই প্রাণশক্তিকেই জাগিয়ে দিতে চায় সর্বপ্রথম। তা হলেই আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ বাস্তবায়িত হবে বাস্তবে অনুসৃত হবে বলে আশা করা যায়।

এই ঈমানের ভিত্তিতেই এসেছে আল্লাহ্‌র যাবতীয় আদেশ ও নিষেধ। একটি আয়াত ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَاتَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ (البقرة : ٢٠٨)

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামে পূর্ণ মাত্রায় প্রবেশ করো। এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। কেননা সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু।'

দ্বিতীয় আয়াত ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ (ال عمران : ١٤٩)

'হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা যদি কাফের লোকদের আনুগত্য ও অনুসরণ করো তা হলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের অতীতের (সেই জাহিলিয়তের) যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। আর তা হলে তোমরা খুবই ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়বে।'

ঈমান ও রাষ্ট্র

পূর্বোল্লিখিত আয়াতে ঈমানদার লোকদিগকে কাফেরদের অনুসরণ ও আনুগত্য গ্রহণ করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে এবং পুরাপুরিভাবে ইসলামে প্রবেশ করার ইসলাম অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপনের আহ্বান জানানো হয়েছে। বস্তুত যাদের

---

১. এই কথাটির অর্থ অনেক ব্যাপক। তন্মধ্যে এগুলো রয়েছে ঃ আল্লাহ্ ও রাসূলকে কোন বিষয়ে প্রস্তাব দিওনা—এই কাজ করুন বলে। কোন বিষয়ে আল্লাহ্ ও রাসূলের বলার পূর্বে তোমরা কিছু বলো না। আল্লাহ্ ও রাসূল যা বলেন নি, তোমরা তা বলো না। আল্লাহ্ ও রাসূল যে কথা যতটুকু বলেছেন, তোমরা তার উপর বাড়িয়ে কিছু বলো না—এই সব অর্থই হতে পারে। হযরত ইবন আরকাম বলেছেন؛ لاتقولوا خلاف الكتاب والسنة অর্থ ঃ—কুরআন ও সুন্নতের বিরুদ্ধে কিছু বলো না।

অন্তরে ঈমানের অস্তিত্ব বিদ্যমান, তারা এ নিষেধ অমান্য ও এই আহ্বান অগ্রাহ্য করতে পারে না।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ (الحجرات: ٦)

'হে ঈমানদার লোকেরা ঃ তোমাদের নিকট কোনো কাফের ব্যক্তি যদি কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তার সত্যাসত্য যাচাই করো, যেনো মুর্খতা বা অজ্ঞতাবশত কোনো জনসমষ্টির উপর বিপদ টেনে না আনো। তা হলে তোমরা তোমাদের কৃত কর্মের জন্য লজ্জিত হবে।'

আয়াতের সম্বোধন সে সব ঈমানদার লোকদের প্রতি যারা রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। এই নির্দেশ অনুযায়ী তারা সর্বপ্রকারের সংবাদের উৎসের যথার্থতা সন্ধান করতে বাধ্য। যে রাষ্ট্র পরিচালকগণ ঈমানদার তারা এই আদেশ পালনে বাধ্য। তাদের ঈমানের তাকীদেই তারা তা করবে। এর বিপরীত কিছু করতে তারা প্রস্তুত হবে না তাদের ঈমানেরই কারণে। অন্যথায় তারা এমন কাজ করে বসতে পারে যার দরুন তারা লজ্জিত বা দুঃখিত হবে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ج وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ط (الحجرات : ١١)

'হে ঈমানদারগণ, কোনো জন-গোষ্ঠী যেন অপর কোনো জন-গোষ্ঠীকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে। অসম্ভব নয় যে, তারা তাদের তুলনায় অনেক উত্তম হবে। অনুরূপভাবে কোনো মেয়েলোক যেনো অপর মেয়েলোকদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে; অসম্ভব নয় যে, তারা এদের অপেক্ষা অনেক ভালো হবে এবং তোমরা পরস্পরের নানাবিধ খারাপ উপাধি দিয়ে সম্বোধন করবে না।'

সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের দৃষ্টিতে এ আয়াতটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। এ'তে যে সব কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে তা কোনো ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষেই করা সম্ভব নয়। বস্তুত যার মধ্যে প্রকৃত ঈমান রয়েছে সে এর কোনো একটি কাজও করতে পারে না। ঈমানই তাকে এই নিষিদ্ধ কাজগুলি করতে বাধা দেবে, এ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে, একে এই কারণেই ঈমানের অবদান বলতে হবে। আয়াতের নিষিদ্ধ কাজগুলি সমাজে কত যে অশান্তি এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি করতে পারে, তা সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারেন না। আয়াত অনুযায়ী সে অশান্তি ও বিপর্যয়কর অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার মৌলিক উপায় হচ্ছে সত্যিকারের ঈমান। ঈমান থাকলেই তা থেকে বাঁচা সম্ভব হবে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ط اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ (الحجرات : ١٢)

'হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা বহু সংখ্যক খারাপ ধারণা পরিহার করে চলো। কেননা কোনো কোনো ধারণা গুনাহ্। আর তোমরা লোকদের দোষ খুঁজে বেড়িয়ো না এবং তোমরা পরস্পরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইর গোশ্ত ভক্ষণ করা পছন্দ করবে ? অতঃপর তোমরা তা ঘৃণাই করবে আর আল্লাহ্কে ভয় কর।

এ আয়াতে কিছু কিছু অমূলক খারাপ ধারণা পোষণ, পরের দোষ খুঁজে বেড়ানো এবং পরস্পরের গীবত দোষ গেয়ে বেড়ানো নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। এই নিষিদ্ধ ঘোষণা ঈমানদার লোকদের প্রতি। কেননা এই কাজগুলো ঈমানের পরিপন্থী। বস্তুত যার ঈমান আছে, সে কখনই এই নিষিদ্ধ কাজগুলো করতে পারে না। ঈমানই তাকে এই সব সমাজ বিরোধী ও সাধারণ ভাবে শান্তি নিরাপত্তার পরিপন্থী কাজ থেকে বিরত রাখে। এখানেও ঈমানের ভূমিকাই প্রবল এবং এসব সমাজ বিধ্বংসী কার্যাবলী থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র অবলম্বন হচ্ছে ঈমান। ঈমানের তাকীদেই এসব কাজ থেকে মানুষ স্বতঃই বিরত থাকবে।

বস্তুতঃ নবী প্রেরণও হয়েছে লোকদের মধ্যে ঈমান সৃষ্টির লক্ষ্যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ

পরে বলা হয়েছে, "হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহ্র (দীনের) সাহায্যকারী হও"। আল্লাহ্র দীনের বিজয়ে অংশগ্রহণ যেমন ঈমানের তাকীদে, তেমনি আল্লাহ্র সাহায্যকারী হওয়াও ঈমানেরই তাকীদে সম্ভবপর। ঈমান না থাকলে আল্লাহ্র সাহায্যকারী হওয়ার-সুযোগ কেউ পাবে না। অথচ আল্লাহ্র সাহায্যকারী হওয়া মানুষের জন্য একটা খুব বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার।

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুকে এমন বন্ধু (বা পৃষ্ঠপোষক) রূপে গ্রহণ করো না যে, তাদের প্রতি বন্ধুতা পোষণ করে গোপন কথা বলে দিবে। অথচ ওরা তোমাদের নিকট আগত মহাসত্যকে অমান্য ও অগ্রাহ্য করেছে। ওরা রাসূল এবং তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করে শুধু এই অপরাধে যে, তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান গ্রহণ করেছে।" [আল মুমতাহিনা ঃ ১]

এ আয়াতে শত্রুদের প্রতি বন্ধুতা পোষণ করতে এবং তাদের নিকট গোপন তথ্য ফাঁস করে দিতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। আর শত্রুদের চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের কার্যাবলীর দৃষ্টিতে। সে কার্যাবলীর মধ্যে প্রথম, তারা আল্লাহ্র নিকট থেকে আসা সত্য দীনকে অমান্য অগ্রাহ্য করেছে এবং দ্বিতীয়, 'তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান

এনেছো– শুধু এই অপরাধে তারা রাসুল এবং তোমাদের– ঈমানদার লোকদের দেশে থেকে বহিষ্কৃত করেছে।' যদিও হিজরতের পরে মক্কার লোকদের এই অপরাধের কারণে তাদের আল্লাহ ও ঈমানদার লোকদের শত্রু বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রহণ করে তাদের নিকট গোপন তথ্য ফাঁস করতে নিষেধ করা হয়েছে; কিন্তু এ একটি চিরন্তন বিধান। সর্বকালের মু'মিনরাই এ বিধান মেনে চলতে বাধ্য। কেননা এ বিধানের ভিত্তি হচ্ছে ঈমান। ঈমানের কারণেই কাফিররা মু'মিনদের প্রতি শত্রুতা করে চিরকাল। তাই সেই ঈমানের ভিত্তিতেই তাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রহণ না করতে। বস্তুত ওরা যেমন কুফরী অবলম্বনের দরুন ঈমানকে বরদাশ্ত করতে রাযী নয়, ঈমানদার লোকদের সাথে চরম শত্রুতা করতে কিছুমাত্র পিছপা নয়, তেমনি ঈমানদার লোকেরা এই ঈমানের কারণেই ওদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারে না। কেননা ঈমান চিরকালই কুফরীর বিপরীত। ঈমান ও কুফরীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও শত্রুতা চিরন্তন। এই দ্বন্দ্ব ও শত্রুতা অনিবার্য, একান্ত অপরিহার্যও। এই দ্বন্দ্ব ও শত্রুতা যেদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে, সেদিন ঈমানের নাম-চিহ্নও থাকবে না। কিন্তু তা কোনো ক্রমেই সত্য হতে পারে না। তাই ঈমানকে তার স্বমর্যাদায় চিরকাল ভাস্বর ও সক্রিয় হয়ে থাকতে হবে। আর এই ঈমানের ভাস্বরতা ও সক্রিয়তার ফলেই শত্রুকে চিনতে ও চিহ্নিত করতে বিলম্ব হবে না—কোনোরূপ অসুবিধাও হবে না এবং ঈমানদার লোকেরা তাদেরকে বন্ধু পৃষ্ঠপোষকরূপে কখনই গ্রহণ করবে না, তাদের নিকট নিজেদের গোপন তথ্য ফাঁসও করে দিবে না।

'হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা মু'মিনদের পরিবর্তে কাফির লোকদিগকে বন্ধু পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিও না।' [আন্-নিসা ঃ ১৪৪] এ আয়াতে উপরোদ্ধৃত আয়াতের বক্তব্যই ভিন্নভাবে পেশ করা হয়েছে। ঈমানের এই কার্যকারিতা চিরকালই অনস্বীকার্য।

'হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের নিকট যখন হিজরতকারী মু'মিন মহিলারা আসবে, তখন তোমরা তাদের যাচাই পরীক্ষা করো। আল্লাহ্ই তাদের ঈমানের বিষয়ে অধিক অবহিত।' [আল-মুমতাহিনা ঃ ১০]

মুসলমানদের মদীনায় হিজরত করে যাওয়ার পর বিপুলসংখ্যক ঈমানদার মহিলাও হিজরত করে মদীনায় উপস্থিত হতে শুরু করেন। এই সুযোগে অ-ঈমানদার তথা কাফির মেয়ে লোকেরা যাতে মদীনায় প্রবেশ করতে না পারে, তা সর্তকতার সাথে লক্ষ্য করা মদীনাবাসীদের জন্য একান্তই জরুরী হয়ে পড়েছিলো। তাই এই নির্দেশ। এ নির্দেশেরও ভিত্তি হচ্ছে ঈমান। কেননা মদীনা ঈমানের ভিত্তিতে গড়া সমাজের অধিবাস। এখানে শত্রু পক্ষের কাফির নারীরা প্রবেশ করে ঈমানদার সমাজের ঈমানী

ভিত্তিকে বিনষ্ট করে দেবার ষড়যন্ত্র করতে পারে, তা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এজন্য এই নির্দেশ।

'হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা যখন পরস্পর গোপন পরামর্শ করবে, তখন অবশ্যই গোনাহ্, সীমালংঘনমূলক কাজ ও রাসূলের অমান্যতার পরামর্শ করবে না। বরং গোপন পরামর্শ করবে পুণ্যময় ও তাক্ওয়ামূলক বিষয়ে। আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয়করবে,যাঁর নিকট হাশরের দিনে তোমাদের একত্রিত হতে হবে।' [আল-মুজাদিলা ঃ ৯]

এ আয়াতেও সম্বোধন ঈমানদার লোকদের প্রতি এবং তারও ভিত্তি হচ্ছে ঈমান। এই ঈমানের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের ন্যায় গোনাহ্, সীমালংঘনমূলক ও নবীর নাফরমানীর কার্যাবলী বিষয়ে পরস্পর পরামর্শ করতে নিষেধ করেছেন ঈমানদার লোকদের বরং তাদের তাক্ওয়া ও পুণ্যময় কার্যাবলী নিয়ে সলা-পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন, প্রথম ধরনের পরামর্শ একটা শয়তানী কাজ। এই কাজ কখনই ঈমানদার লোকদের জন্য শোভনীয় নয়। উপরন্তু এই ধরনের সলা-পরামর্শ ঈমানদার লোকদের সমন্বয়ে ঈমানের ভিত্তিতে গড়া সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাতে সমাজ-সংস্থা দৃঢ় হয় না, বিশ্লিষ্ট হয়; শক্তিশালী হয়ে গড়ে ওঠে না, দুর্বল হয়ে থাকে। অথচ ঈমান ভিত্তিক সমাজের জন্য সে অবস্থা কোন ক্রমেই কাম্য হতে পারে না।

ঈমান ও সামাজিক রীতিনীতি

অপর আয়াতে বলা হয়েছে, "হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের যখন বলা হবে যে, মজলিসে একটু খোলামেলাভাবে বসো, তখন তোমরা অবশ্যই খোলামেলাভাবে বসবে। তা'হলে আল্লাহ্ও তোমাদের জন্য প্রশস্ততা এনে দেবেন। আর যখন বলা হবে, তোমরা উঠে দাঁড়াও, তখন অবশ্যই উঠে দাঁড়াবে। তা'হলে তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার, আল্লাহ্ তাদের উচ্চমর্যাদা দিবেন।" [আল-মুজাদিলা ঃ ১১]

এ আয়াতে ঈমানদার লোকদের সামাজিক রীতি-নীতি ও বৈঠকী নিয়মাদির কথা বলা হয়েছে। কথার সার হ'ল, ঈমানদার লোকদের সমাজ হবে নিয়ম শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ। এখানে স্বেচ্ছাচারিতা, নিয়ম বিধির অমান্যতা এবং নেতৃত্বের প্রতি অবজ্ঞা চলতে পারে না। কেননা, তা ঈমানেরই পরিপন্থী। এই সমাজের লোকদের মজলিসে এতটা প্রশস্ততা থাকা আবশ্যক যে, প্রয়োজনে যেনো সেখানে বেশী বেশী লোকের সংস্থান করা সম্ভব হয় এবং কোনো প্রয়োজনে সকলকে উঠতে বললেও যেনো সকলে উঠে দাঁড়ায়। মজলিসে প্রয়োজনাধীন দেয়া এ ধরনের আদেশ অমান্য করা হলে সামাজিক শৃংখলাই বিনষ্ট হয়ে যায়। এরূপ নির্দেশ নিশ্চয়ই সমাজ-নেতার পক্ষ থেকে আসবে। আর সমাজ-নেতার প্রয়োজনবোধে দেয়া এসব ছোটো-খাটো ব্যাপার সম্পর্কিত

আদেশই যদি অমান্য করা হয়, তাহলে সুসংবদ্ধ ইসলামী সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। কেননা ইসলামী সমাজ তো ঈমানদার লোকদের সমন্বয়ে গঠিত সমাজ। সে সমাজে যদি এতটুকু আদেশেরও মান্যতা না থাকে, তা'হলে সে সমাজের লোকদের ঈমান আছে, তার কোনো প্রমাণই পাওয়া যাবে না। আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ শুধুমাত্র মজলিসী নিয়ম হয়েই থাকবে না, বৃহত্তর সমাজ জীবনেও বাইরে থেকে মুসলমানদের জন্য স্থান বানাবার মতো উদারতা ও সেজন্য নিজের ঘর-বাড়ী, জমি-জায়গাও বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও প্রশস্ততা সৃষ্টি করতে রাযী থাকা ঈমানদার সমাজের লোকদের কর্তব্য– ঈমানের পরিচায়ক।

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো। তাহলে তিনি তাঁর রহমতের দ্বিগুণ অংশ তোমাদের দিবেন এবং তোমাদের জন্য এমন 'নূর' বানিয়ে দিবেন যার আলোকে তোমরা চলবে এবং তোমাদের মাগ্‌ফিরাত দান করবেন। বস্তুত আল্লাহ্ বড়োই ক্ষমাশীল ও অতীব দয়াবান।" [আল-হাদীদ ঃ ২৮]

আল্লাহ্‌র দ্বিগুণ অংশের রহমত, আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নূর লাভ করা—যার আলোকে নির্বিঘ্নে জীবনের পথ অতিক্রম করা যাবে এবং তাঁর মাগ্‌ফিরাত লাভ মানুষ মাত্রেরই ইহকালে ও পরকালে পরম কাম্য হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তা লাভ করার জন্য ঈমান প্রথম শর্ত। ঈমান হলেই এই সব পাওয়া সম্ভব। এই ঈমানই মানুষের মনে আল্লাহ্‌র ভয় জাগ্রত করে, যে ভয় মানুষকে আল্লাহ্‌র না-ফরমানী থেকে বিরত রাখে এবং তাঁর আদেশাবলী যথাযথ পালনে উদ্বুদ্ধ করে।

এই ঈমানই হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিকট উচ্চতর মর্যাদা লাভের প্রথম স্তর ও উন্নতির সিঁড়ির প্রথম ধাপ। তাই বলা হয়েছে 'আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে, তারাই সত্যবাদী সিদ্দীক এবং শহীদরূপে গণ্য তাদের প্রভুর কাছে– তাদের জন্য শুভ ফলও রয়েছে। আছে তাদের জন্য নূর। পক্ষান্তরে যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অসত্য মনে করেছে, তারাই জাহান্নামী। [আল-হাদীদ ঃ ১৯]

আয়াতটিতে ঈমানের শুভ ফল এবং কুফর-এর মর্মান্তিক পরিণতির কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। এখানে ঈমানের আহ্‌বান অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

"তোমরা ঈমান গ্রহণ করো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং ব্যয় করো সেই ধন-মাল থেকে যাতে তিনি তোমাদের খলীফার মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। অতএব তোমাদের মধ্য থেকে যারাই ঈমান আনবে ও অর্থব্যয় করবে, তাদের জন্য বিরাট শুভ ফল বর্তমান। [আল-হাদীদ ঃ ৭]

ঈমান ও অর্থ-ব্যবস্থা

এ আয়াতে ঈমান গ্রহণের দাওয়াত অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। সেই সাথে ঈমানী অর্থব্যবস্থার মৌল তত্ত্বও ব্যক্ত করা হয়েছে। দুনিয়ার অর্থ-সম্পদে মানুষের—ঈমানদার লোকদের মর্যাদা কি, তাদের কর্তৃত্ব ও অধিকার কতটা এবং তাদের দায়িত্ব কি, তা এ আয়াতে বলা হয়েছে। এ আয়াতের দৃষ্টিতে যাবতীয় ধন-সম্পদে মানুষ আল্লাহ্‌র খলীফা—প্রতিনিধি বা নায়েব। মানুষ তার প্রকৃত মালিক নয়। সব কিছুর প্রকৃত মালিক হচ্ছেন মহান আল্লাহ্ তা'আলা। তাঁরই খলীফা হিসাবে মানুষ ধন-মাল আয়-উৎপাদন ও বন্টন-ব্যয় করবে। আয়, ভোগ, বন্টন ও ব্যয় সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা যে পূর্ণাঙ্গ ও মৌলিক বিধান দিয়েছেন, সেই বিধানই হবে তাদের অর্থ-বিধান। বস্তুত, ধন-মালকে ব্যক্তির কিংবা রাষ্ট্রের নিরংকুশ মালিকানা মনে করাই যত অনর্থের মূল। ব্যক্তির নিরংকুশ মালিকানা দুনিয়ায় পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের নিরংকুশ মালিকানার ধারণা সৃষ্টি করেছে সমাজতন্ত্রের। একদিকে ব্যক্তি পর্যায়ের শোষণ লুণ্ঠন, অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বঞ্চনা ও নির্যাতন—আজকের বিশ্বব্যাপী উক্ত দু'ধরনের অর্থব্যবস্থার ফলশ্রুতি। কুরআন যে ঈমানের আহ্বান নিয়ে এসেছে, তাতে এই উভয় ব্যবস্থাকেই অস্বীকার করা হয়েছে। ঈমানের ঘোষণা হচ্ছে, এই দুনিয়ার কোনো কিছুরই মালিক মানুষ নয়, নয় মানব-সৃষ্ট সমাজ বা রাষ্ট্র। সর্বস্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌ই হচ্ছেন সব কিছুর একমাত্র নিরংকুশ মালিক। আর সব মানুষ হচ্ছে সেই আল্লাহ্‌রই সৃষ্ট এবং বান্দাহ্। অতএ সবকিছুই আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী চলবে। তাহলেই মানুষ দুনিয়ায় বেঁচে সুখ পাবে ঈমানই মানুষকে যথেচ্ছ ভোগ-বিলাস, অপচয়, লুটপাট, বঞ্চনা-গঞ্জনা থেকে বিরত রাখে। ঈমানই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে অকাতরে অর্থ দান করতে, বঞ্চিতকে তার ন্যায হিস্‌সা যথাযথভাবে দিয়ে দিতে, সম্পদ সমান অধিকারের ভিত্তিতে ভাগ করে নিতে ও দিতে।

ঈমানদার ও বেঈমানদের বৈষয়িক জীবন পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত বলে তা কখনোই এক ও অভিন্ন হয় না। পরিণতি সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিকোণও এক হয় না।

"আল্লাহ্ তিনিই যিনি পরম সত্যতা সহকারে কিতাব ও সত্য-মিথ্যা নির্ধারণের মানদণ্ড [শরীয়াত] নাযিল করেছেন। আর কোন্ জিনিস তোমাকে জানিয়ে দিবে, সম্ভবত কিয়ামতের দিনটি নিকটবর্তী! যারা তার প্রতি ঈমানদার নয়, তারা তাকে খুব তাড়াতাড়ি পেতে চায়। আর যারা তার প্রতি ঈমান এনেছে, তারা তাদের জন্য ভীত সন্ত্রস্থ এবং তারা জানে যে, তা নিঃসন্দেহে সত্য। জেনে রাখো, কিয়ামতের বিষয়ে যারা সন্দেহের প্রশ্রয় দেয়, তারা অবশ্যই সুস্পষ্ট ও গভীর গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত।' [আশ্-শুরা ঃ ১৭-১৮]

পরকাল একটি বাস্তব সত্য। বর্তমানের এই বস্তু জগত ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই হচ্ছে কিয়ামত। তা ঈমানের অন্যতম এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। দুনিয়ায় দু'ধরনের লোক রয়েছে। এখানে কিয়ামতের প্রতি যেমন ঈমানদার লোক রয়েছে, তেমনি বহু লোকই তা স্পষ্টভাবে অবিশ্বাস করছে। মনে করছে, মৃত্যুনিদ্রা কোন দিনই ভাঙবে না। এই দুই শ্রেণীর লোকের বৈষয়িক জীবন দুই ধারায় প্রবহমান। কারণ যারা পরকাল অবিশ্বাস করে, তারা তাকে একটা ঠাট্টা ও বিদ্রূপের বিষয় ধরে নিয়েছে এবং বলছে, আরে কিয়ামত না কি হবে। যদি হয়-ই, তা হলে তা শীগ্‌গীরই হয়ে যাক! তা হতে দেরী হচ্ছে কেন! কিয়ামতকে তারা একটুও ভয় পায় না। আর তা বিচিত্র কিছু নয়। হামাগুড়ি দিয়ে চলা শিশু জ্বলন্ত আগুনের প্রদীপকে রাঙা চক্‌চকে খেলনা মনে করে তাতে হাত দেয়। কেননা ওরা আগুনের দাহিকা শক্তি সম্পর্কে আদৌ অবহিত নয়। কিন্তু যারা তা জানে, তারা নিশ্চয়ই সুস্থ জ্ঞানে কখনই তাতে হাত দিয়ে ধরতে যাবে না। কিয়ামতের ব্যাপারটিও ঠিক তাই। কাফির বেঈমানরা তা বিশ্বাস করে না। তার বাস্তবতা ও স্বাভাবিকতা সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। আর সেই জন্যই ওরা বিদ্রূপচ্ছলে তা তাড়াতাড়ি হোক বলে উক্তি ঝাড়ে। কিন্তু ঈমানদার লোকেরা তার সত্যতা বাস্তবতা সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী। সেই কারণেই তারা তাকে ভয় পায়। কেননা সেদিন তো মানুষের ইহজীবন শেষ হয়ে গিয়ে চূড়ান্ত হিসাব নিকাশের মুহূর্ত উপস্থিত হবে। যদি নেকআমলের জোরে উতরে যাই, তো সৌভাগ্যের ব্যাপার। নতুবা জাহান্নামের দুর্ভাগ্যই হবে ললাট লিখন। তাই তারা এ জীবন এমনভাবে যাপন করতে চেষ্টা করে, যেন পরকালের সে কঠিন দিনে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

বস্তুত এ ব্যাপারে ঈমানই হচ্ছে আসল চালিকা শক্তি। এই শক্তি যার হৃদয়-মনে জাগরূক, সক্রিয় সে কখনই আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করতে পারে না, লংঘন করতে পারে না আল্লাহ্‌র নিষেধকে। সে হবে প্রকৃত শরীয়াত অনুসারী ইসলামী সমাজের সৎ নাগরিক। আর এই ঈমানদার লোকেরাই ইহকাল পরকাল উভয় ক্ষেত্রে পরম সাফল্যের অধিকারী হবে।

'হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং ঠিক কথা বলো। তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের আমলসমূহকে সংশোধিত করে দেবেন এবং তোমাদের গোনাহ্‌সমূহ মাফ করে দিবেন। আর যে লোকই আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করলো সে-ই পরম সাফল্য লাভে ধন্য হলো। [আল-আহ্‌যাব ঃ ৭১]

এই জীবনের যাবতীয় কাজকর্ম ঠিকঠিকভাবে সম্পন্ন হওয়া, গোনাহর মাগফিরাত লাভ এবং এই ঈমান সহকারেই আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা হলেই ইহ ও পরকালে পরম সাফল্য লাভ সম্ভব। তা ছাড়া এর কোনোটিই অর্জিত হতে পারে

না। এই ঈমান থাকলেই আল্লাহ্‌র ভয় হৃদয় মনে জেগে উঠবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে চলা সম্ভব হবে। ঈমান না হলে এই সব কিছুই নিষ্ফল ও ব্যর্থ হতে বাধ্য।

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা নবীর ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করবে না এবং খাওয়ার সময় হলেই সে ঘরে পৌঁছে যেয়ো না। তবে যদি খাবার খাওয়ার জন্য ডাকা হয়, তাহলে প্রবেশ করতে পার।" [আল-আহ্‌যাব ঃ ৫৩]

কারুর ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা একটি সামাজিক অপরাধ বিশেষ। এতে কোনো ব্যক্তিরই নিজস্ব গোপনীয়তা রক্ষা পেতে পারে না। তাছাড়া এর ফলে নানা প্রকারের নৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপরাধ হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। এই কারণে প্রথমে নবীর ঘরে এবং পরে সব মুসলিম ব্যক্তির ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এই নিষেধেরও ভিত্তি হচ্ছে ঈমান। ঈমানই মানুষকে এই নিষেধ মেনে চলতে প্রস্তুত করে। যার ঈমান নেই, সে এই নিষেধ অমান্য করবে এবং আত্মীয় বা অনাত্মীয় কারুর ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করে নানাবিধ অপরাধ সৃষ্টির কারণ বা সুযোগ ঘটাবে। কিন্তু ইসলামী সমাজে তা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়।

বিনানুমতিতে কারো ঘরে প্রবেশ করা একটি সামাজিক অপরাধ। এই অপরাধ এড়িয়ে চলার জন্য সাধারণভাবে সব ঈমানদার ব্যক্তির প্রতিই নির্দেশ দেয়া হয়েছে তবে একই ঘরের অভ্যন্তরে বসবাসকারী বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য এ ব্যাপারে কিছুটা প্রশস্ততা ও স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক। যদিও তার মধ্যেও বিশেষ বিশেষ সময় এমন, যখন এই স্বাধীনতাও ক্ষুণ্ন বা সংকীর্ণ করে সময় বেঁধে দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। তাই ঈমানদার লোকদেরই বলা হয়েছে ঃ

"হে সে লোকেরা, যারা ঈমান এনেছ! এ নির্দেশ পালনীয় যে, তোমাদের মালিকানাধীন (ক্রীতদাস-দাসী) এবং পূর্ণ বয়স্কতা পায়নি তোমাদের এমন বাচ্চারা তিনটি সময়ে অনুমতি নিয়ে যেন তোমাদের ঘরে প্রবেশ করে ঃ তা হচ্ছে, ফজরের সালাতের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা পরিধেয় বস্ত্র খুলে রাখ এবং এশার সালাতের পর। কেননা এই তিনটি হচ্ছে তোমাদের জন্য পর্দার সময়। এই সময় ছাড়া অন্যান্য সময় এরা বিনানুমতিতে তোমাদের ঘরে প্রবেশ করলে না তোমাদের কোন গোনাহ্ হবে, না ওদের।" [আন্-নূর ঃ ৫৮]

বস্তুত নারী পুরুষ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই জীবনে কিছুটা নির্দিষ্ট স্থান থাকা আবশ্যক, যেখানে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও পূর্ণ নির্বিঘ্নতায় জীবন কাটাতে পারবে এবং এজন্য এমন একটা নির্দিষ্ট সময় থাকাও একান্তই আবশ্যক, যখন সেখানে অন্য কারুরই ঢুকে পড়ার সুযোগ বা আশংকা থাকবে না। এই নিরাপত্তা প্রয়োজন যেমন ঘরের বাইরের লোকদের থেকে, তেমিন ঘরের লোকদের থেকেও। সাধারণত ঘরে

যেসব দাস-দাসী বা চাকর চাকরানী থাকে; কিংবা থাকে পূর্ণবয়স্ক ছেলে-মেয়ে, ভাই-বাপ এদের থেকেও নির্জনতার নিশ্চয়তা থাকা আবশ্যক– বিশেষ করে মেয়েদের জন্য।

ঘরের দাস-দাসী বা চাকর-চাকরানী—এমনকি পূর্ণবয়স্কতা পায়নি এমন বালক-বালিকার জন্য ঘরের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ব্যক্তির শয়ন কক্ষে প্রবেশের ব্যাপারে একটা নিয়ন্ত্রণ থাকা আবশ্যক। অন্যথায় ব্যক্তিরা যেমন বিভিন্ন সময় অপ্রস্তুত বা বিব্রত হয়ে পড়তে পারে, তেমনি আকস্মিকভাবে নানা গোপনীয় ব্যাপার দেখতে পেয়ে নৈতিকতার দিক দিয়ে বিপর্যয়ে পড়ে যেতে পারে। কিন্তু তা কিছুতেই কাম্য হতে পারে না। এই কারণেই এই বিধান উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই বিধানেও ভিত্তি হচ্ছে ঈমান। ঈমান যে কি কি ভাবে মানুষকে নৈতিক অপরাধ থেকে রক্ষা করে, এই বিধান তার একটি প্রকৃষ্ট ও স্পষ্ট নিদর্শন।

ঘরের বালক বালিকারাই ভবিষ্যৎ বংশধর, ভবিষ্যৎ সামজের নাগরিক। তাদের আদর্শ চরিত্রের অধিকারী বানিয়ে তোলার ব্যবস্থাও অনুকূল পরিবেশসম্পন্ন ঘরের অভ্যন্তরেই হতে হবে। কেননা এখানেই যদি তারা চরিত্র হারানোর মত অবস্থায় পড়ে যায়, তা হলে তারা বড় হয়ে বড় মাত্রার অপরাধী হয়ে দাঁড়াতে পারে। আর তা হলে অপরাধ-মুক্ত মানুষ ও সমাজ গড়া কোন ক্রমেই সম্ভব হবে না। অথচ ঈমান অপরাধমুক্ত ব্যক্তি ও সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া বলিষ্ঠভাবে কার্যকর করার পক্ষপাতী। তাই ঈমানদার লোকদের প্রতি এই নির্দেশ। এই নির্দেশ পালন করা প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষেই একান্ত জরুরী।

এই পর্যায়ে সমস্ত ঈমানদার লোকদের জন্য যে সাধারণ বিধান জারী করা হয়েছে তা এই ঃ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যদের ঘরে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তোমরা ঘরের লোকদের সহিত পরিচিতি গড়ে তুলবে ও তাদের প্রতি সালাম করবে। এই নীতি তোমাদের জন্য অতীব উত্তম। আশা করা হয়, তোমরা এই নির্দেশের তাৎপর্য অনুধাবন করবে ও স্মরণে রাখবে।" [আন্-নূর ঃ ২৭]

বস্তুত ঘরের লোকদের সহিত পরিচিতি লাভ এবং তাদের সহিত একাত্মতা সৃষ্টি না করে হঠাৎ করে ভেতরে প্রবেশ করা আধুনিক পাশ্চাত্য ধর্মহীন সভ্যতার আওতায় নিষিদ্ধ না হলেও ইসলামের আদৌ সমর্থিত নয়। ইসলামের সামাজিক জীবনে সর্বাধিক গুরুত্ব হচ্ছে ব্যক্তির নিজস্ব স্বতন্ত্র নির্জনতার (Privacy) এবং নৈতিক চরিত্রের। এ দু'টি ক্ষুণ্ন হতে পারে যে যে কাজে ও আচরণে ইসলামে তা শুধু অপছন্দ করা হয়েছে তা-ই নয়, শিষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধও হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও এই নিষেধের ভিত্তি

হচ্ছে ঈমান। ঈমানই মানুষকে লোকদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত নির্জনতা ক্ষুণ্ন করা ও চরিত্র হননের সব কাজ থেকে বিরত রাখে।

"হে সে সব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা শয়তানের পদাংশ অনুসরণ করে চলো না। কেননা যে লোকই শয়তানের পদাংশ অনুসরণের নীতি গ্রহণ করবে শয়তান তো তাকে নির্লজ্জতা ও পাপ-অপরাধজনক কাজেরই আদেশ করবে। বস্তুত আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া অনুকম্পা যদি তোমাদের প্রতি না থাকতো, তাহলে তোমাদের কোন একজন লোকও কখনো পবিত্র হতে পারতো না। বরং আল্লাহ্ই যাকে চান পবিত্র পরিশুদ্ধ করেন। আর আল্লাহ্ই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" [আন-নূর ঃ ২১]

ঈমানের পরিপন্থী যে কুফর, তারই অগ্রনেতা হচ্ছে শয়তান। ঈমান যেমন মানুষকে আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত বানায়, তেমনি কুফর বানায় শয়তানের অনুসারী। অতএব যারাই নিজেকে শয়তানের অনুসারীতে পরিণত করবে, তারাই শয়তানের নির্দেশ ও কুপরামর্শ অনুযায়ী সকল প্রকার পাপ, পংকিলতা ও অপরাধজনক কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য হবে। এক কথায় বলা যায়, দুনিয়ায় যত পাপ, যুলুম, শোষণ, নির্যাতন, বঞ্চনা ও নৈতিক বিচ্যুতি, পদস্খলনজনিত অপরাধ, তা সবই একমাত্র শয়তানের প্ররোচনা ও শয়তানের আনুগত্যের ফলশ্রুতির। একমাত্র ঈমানই মানুষকে এই অবাঞ্ছনীয় পরিণতি থেকে রক্ষা করতে পারে। তাই ঈমানদার লোকদের প্রতি কুরআনের এই উদাত্ত আহ্বান।

এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে যারাই ঈমান গ্রহণ করবে, তারা কখনই ব্যভিচারের ন্যায় জঘন্য অপরাধ করতে পারে না। যদি কেউ সে অপরাধ করেই বসে, তা হলে তার জন্য কুরআন নির্দিষ্ট শাস্তি অবশ্যই কার্যকর করতে হবে। এই শাস্তি কার্যকর করা ও তা প্রত্যক্ষ করাও ঈমানদার লোকদেরই দায়িত্ব।

"(অবিবাহিত) ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী দু'জনের প্রত্যেককেই এক শ'টি করে দোর্‌রা মার এবং এ দু'জনের প্রতি মহানুভবতা যেন আল্লাহ্র বিধান কার্যকর করার ব্যাপারে তোমাদের পেয়ে না বসে, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক এবং এই দু'জনকে দেয়া শাস্তি যেন ঈমানদার লোকদেরই কিছুসংখ্যক প্রত্যক্ষ করে।" [আন্-নূর ঃ ২]

ব্যভিচারীকে শাস্তিদান আল্লাহ্র বিধান। এ বিধান বা আইন অবশ্যই কার্যকর হতে হবে। তার বাস্তবায়নের দু'টি দিক। একটি হল ঃ অপরাধী প্রমাণিত হওয়ার পর তার উপর ঘোষিত শাস্তিটা কার্যকর করা আর দ্বিতীয়টি হল ঃ শাস্তি দানটা যেহেতু প্রকাশ্যভাবে অনুষ্ঠিত হতে হবে, এজন্য তা বহু লোকের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হওয়া এবং বহু লোকেরা উপস্থিত হয়ে তা প্রত্যক্ষ করা। কিন্তু এ দু'টি দিকই নির্ভর করে

ঈমানের উপর। এ কারণেই আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে শাস্তি কার্যকর করতে এবং তাতে কোনরূপ দয়া-সহানুভূতি যেন তার কার্যকরতার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায়, এই কারণে শর্ত দেয়া হয়েছে এই বলে, যদি তোমরা ঈমানদার হও এবং দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, তা প্রত্যক্ষ করবে ঈমানদার লোকেরাই। কেননা এ শাস্তিটা শিক্ষাপ্রদ। কেবল মাত্র ঈমানদার লোকেরাই তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

বস্তুত ঈমানই হচ্ছে সর্বপ্রকার অপরাধ প্রতিরোধক, অপরাধ হলে তার জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির বিধায়ক। ঈমান না হলে এর কোনটাই বাস্তবায়িত হতে পারে না। আর ঈমান থাকলে প্রথমত অপরাধই হবে না। অপরাধ হলেও তা শাস্তি যথাযথভাবে কার্যকর হবে। ফলে তা প্রত্যক্ষকারী জনতা কখনই অনুরূপ অপরাধ করতে সাহসী হবে না। এরই প্রভাবে গোটা পরিবেশ ব্যভিচার তথা অপরাধ-বিরোধ হয়ে উঠবে। অপরাধ প্রতিরোধ এরূপ কার্যকর শক্তি দ্বিতীয় কিছুই নেই, হতে পারে না।

এই ঈমানের ভিত্তিতেই মদ পান, জুয়া খেলা ইত্যাদি অপরাধ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্ তা'আলা ঃ

"হে ঈমানদার লোকেরা, চূড়ান্তভাবে জেনে নেবে, যাবতীয় মাদক দ্রব্য, জুয়া, অ-খোদার উদ্দেশ্যে বলিদানের স্থানসমূহ এবং ভাগ্য জানার পন্থাসমূহ ঘৃন্য বস্তু, শয়তানের কাজ। অতএব তোমরা সকলে তা পরিহার কর। আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে। এর পেছনে মূল ব্যাপার হল, এই মাদক ও জুয়ার মাধ্যমে শয়তান তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি করতে চায় এবং চায় তোমাদেরকে সালাত ও আল্লাহ্র যিক্র থেকে বিরত রাখতে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, তোমরা কি এসব পাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে ?" [আল মায়েদা ঃ ৯০-৯১]

সর্বপ্রকারের মাদক ও জুয়া এবং শিরকের কার্যাবলী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়া পর্যায়ে এ আয়াতে চূড়ান্ত কথা ঘোষিত হয়েছে, ঈমানদার লোকদের সম্বোধন করে। তার অর্থ, যার মধ্যে ঈমান রয়েছে, সে কখনই এ সব কাজ এবং এর মধ্যে কোন একটিও করতে পারে না। ঈমানই মানুষকে এসব কাজ থেকে বিরত রাখে। আর এ সব কয়টি কাজই যেহেতু যাবতীয় অন্যায়, পাপ ও অপরাধের মৌল উৎস, তাই যে লোক এ সব কাজ থেকে বিরত থাকবে, খুবই আশা করা যায়, সে অন্যান্য সকল প্রকার অন্যায়, পাপ ও অপরাধ থেকেও বিরত থাকবে। কুরআন ঈমানের হাতিয়ার দিয়ে বাকী পাপ ও অপরাধের প্রতিরোধ করতেও ইচ্ছুক। আপরাধমুক্ত সমাজ গঠনও এই ঈমানের দ্বারাই সম্ভব। কুরআনের এ ইচ্ছা যে নিঃসন্দেহে যথার্থ ও বাস্তবভিত্তিক, তদানীন্তন, মদীনার সমাজ ও একালের পাশ্চাত্য সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হতে পারে।

এ ঈমানেই মানুষকে সকর প্রকার উত্তম-উপাদেয় পবিত্র খাদ্য গ্রহণে এবং মৃত জীব, রক্ত, শূকর এবং আল্লাহ্‌র নামের যবেহ্ করা হয়নি এমন সব জন্তুর গোশ্‌ত খাওয়া বর্জন করে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ এই শেষোক্ত জিনিসগুলি অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও হীন চরিত্র সৃষ্টিকারী খাদ্য। খাদ্যবস্তু যে মানুষের চরিত্রে প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে—ভাল-উৎকৃষ্ট পবিত্র খাদ্য পবিত্র নিষ্কলুষ চরিত্র এবং নিকৃষ্ট ও জঘন্য খাদ্য মানুষের চরিত্রকে পংকিল করে দেয়, কুরআনে এই দৃষ্টিভংগী আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও যথার্থ বলে প্রমাণিত করেছে। অপরাধমুক্ত ব্যক্তি ও সমাজ গঠনে নিকৃষ্ট জঘন্য খাদ্য পানীয় থেকে সমাজকে মুক্ত করা এবং ভালো, উপাদেয় ও উত্তম-উৎকৃষ্ট খাদ্য গ্রহণে মানুষকে আগ্রহী বানানো একান্তই কর্তব্য। আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানও এ তত্ত্বকে অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে। তাই কুরআন মজীদে ঈমানদার লোকদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ

"হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা খাও আমাদের দেয়া উৎকৃষ্ট-পবিত্র খাদ্যসমূহ এবং তোমরা আল্লাহ্‌র শোকর কর—যদি তোমরা কেবল তাঁরই বন্দেগীতে রত হয়েই থাক। তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন শুধু মাত্র মৃত জীব, রুক্ত, শূকরের গোশ্‌ত এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারুর নামে বলি দেয়া জন্তুর মাংস।" [আল-বাকারাহ্ ঃ ১৭২-১৭৩]

এ আয়াতে ঈমানদার লোকদের প্রতি একদিকে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকর এবং আল্লাহ্‌র নামে নয়—অন্য কারুর নামে বলি দেয়া জন্তুর মাংস খাওয়া হারাম করে দিয়েছেন। অপর দিকে আল্লাহ্‌র দেয়া উৎকৃষ্ট পবিত্র খাদ্যসমূহ খাওয়ার অনুমতি ঘোষিত হয়েছে। এই নিষেধ এবং অনুমতি, অন্য কথায় হালাল ও হারাম নির্ধারণের এই ঘোষণাটি উপস্থাপিত করা হয়েছে ঈমানের উপর ভিত্তি করে। ফলে যাদের ঈমান আছে, তারা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অনুমতি প্রাপ্ত খাদ্যসমূহকে হালাল মনে করে নিতে এবং যে সব দ্রব্য খেতে নিষেধ করা হয়েছে তাকে হারাম মেনে নিয়ে সম্পূর্ণ পরিহার করে চলতে একবিন্দু দ্বিধা বা কুণ্ঠাবোধ করতে পারে না।

সত্যি কথা, ঈমানই মানুষকে সর্বপ্রকারের হারাম খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত থাকতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রস্তুত করে এবং তার ফলে তারা সকল প্রকার নৈতিক পদস্খলন, চরিত্রহীনতা ও যাবতীয় পাপকাজ থেকে দূরে সরে থাকতে স্বভাবতই সক্ষম হয়। সেদিকে তাদের কোন স্বাভাবিক বা প্রকৃতিগত প্রবণতা থাকে না।

সূরা আল-মায়েদা শুরু হয়েছে 'হে সে সব লোক যারা ঈমান এনেছ' বলে এবং তৃতীয় আয়াতে নিষিদ্ধ খাদ্য দ্রব্যের বিস্তারিত উল্লেখ প্রসংগে বলা হয়েছে ঃ

"তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস, প্রভু ছাড়া অন্য কারুর নামে বলি দেয়া জন্তু, গলায় ফাঁস লাগিয়ে মরা, আঘাত খেয়ে মরা, উপর

থেকে পড়ে গিয়ে মরা, সংঘর্ষে এসে মরা জন্তুর গোশ্‌ত অথবা কোন হিংস্র জন্তুর ছিন্নভিন্ন করে খাওয়া জীবের অবশিষ্টাংশ জীবিত অবস্থায় পাওয়ার পর যবেহ্ করা না হলে এবং যা কোন বলিদান ক্ষেত্রে যবেহ করা হয়েছে তাও। সে সাথে হারাম করা হয়েছে জুয়ার তীরদ্বারা ভাগ্য জানতে চেষ্টা করাকে। এই নিষিদ্ধ খাদ্যাদি খাওয়া এবং এই নিষিদ্ধ কার্যাবলী করা তোমাদের পক্ষে শরীয়তের স্পষ্ট লংঘন মাত্র।" [আল-মায়েদা ঃ ৩]

এ আয়াতে যে সব জীবের মাংস খাওয়া ও যে-সব কাজ করা হারাম ঘোষিত হয়েছে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে যে, তা সবই মানব চরিত্রের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। অথচ ইসলামের মূল লক্ষ্য হল চরিত্রবান লোক ও সমাজ তৈরী। সে কারণেই এসব নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

ঈমান ও পারস্পরিক চুক্তি ও ওয়াদা

কুরআন পরিকল্পিত সমাজে পারস্পরিক চুক্তি ও ওয়াদা প্রতিশ্রুতি রক্ষার গুরুত্ব অত্যধিক। সমাজের ব্যক্তিগণের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যকার সুসম্পর্ক এরই ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। আর তার মূলে ঈমানের ভূমিকা সদা কার্যকর। তাই বলা হয়েছে ঃ

"হে ঈমানদার লোকেরা। তোমরা পারস্পরিক ওয়াদা প্রতিশ্রুতি পুরাপুরিভাবে পূর্ণ কর, রক্ষা কর।" [আল-মায়েদা ঃ ১]

একটি জিনিসকে অপর একটি জিনিসের মধ্যে দৃঢ়ভাবে বেঁধে দেয়াকেই বলা হয় আক্‌দ (عقد)। সোজা কথা বলা হয় গীড়া লাগানো। এখানে তার আরও অর্থ হল, ইসলামী শরীয়াতের সে সব আইন বিধান এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত যা পালন করা বান্দাহ্‌দের জন্য একান্ত জরুরী ও বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। একজন অপর জনের নিকট যে আমানত রাখে এবং পারস্পরিক কাজ কর্মে একজন অপরজনের নিকট যে ওয়াদা করে, যা পূরণ করা একান্তই কর্তব্য, যা পূরণ না হলে কেউ-ই কারুর উপর বিশ্বাস রাখতে ও সাময়িক ক্ষতি বা বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারে না এবং লোকদের পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা না থাকলে সমাজ-ই গড়ে উঠতে ও রক্ষা পেতে পারে না– সেই সবও এর মধ্যে শামিল রয়েছে। এতে যেমন আল্লাহ্‌র সহিত কৃত ওয়াদা প্রতিশ্রুতি ঃ যেমন এক আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার এবং তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ পালন করে চলার ওয়াদা শামিল রয়েছে, তেমনি জনগণের পারস্পরিক ওয়াদা-প্রতিশ্রুতিও এর অন্তর্ভুক্ত। তা ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠিগত কিংবা জাতীয় পর্যায়েই করা হোক না কেন। কাজেই এই উভয় দিকের ওয়াদা প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হলেই কুরআন পরিকল্পিত আদর্শ সমাজ গঠিত হতে পারে এবং মানুষও পেতে পারে সত্যিকার শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা।

অপরাধমুক্ত ইসলামী সমাজের ভিত্তি যে ঈমানের উপর রক্ষিত, কুরআনে তার উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। সেই সাথে ঈমানের প্রশস্ত রূপকেও তুলে ধরা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি আয়াতের উল্লেখই যথেষ্ট ঃ

"হে সে সব লোকেরা, যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা ঈমান গ্রহণ কর আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, সেই কিতাবের প্রতি যা নাযিল করেছেন তাঁর রাসূলের উপর এবং সেই কিতাবের প্রতিও যা এর পূর্বে তিনি নাযিল করেছেন। আর যে লোক আল্লাহ্‌, তাঁর ফিরিশ্‌তা, তাঁর কিতাবসমূহ ও পরকালের প্রতি কুফর করবে, সে গুমরাহীতে অনেক দূরে চলে যাবে।" [আন্ নিসা ঃ ১৩৬]

ইসলাম উপস্থাপিত মৌলিক ঈমানসমূহ এ আয়াতে বিধৃত হয়েছে। তা হচ্ছেঃ আল্লাহ্‌, ফিরিশ্‌তা, কুরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাব, তাঁর রাসূল—হযরত মুহাম্মদ (সা) এবং অন্যান্য সব নবী রাসূল এবং পরকাল—এই কয়টির প্রতি ঈমান গ্রহণ। বিচ্ছিন্নভাবে এর এক-একটির প্রতি ঈমানের সমন্বয়েই গড়ে উঠে পূর্ণাঙ্গ ঈমান। এ ঈমানসমূহ এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, যারা ঈমানদার বলে পরিচিত বা তার দাবীদার তাদেরকেই নতুন করে ঈমান আনতে বলা হয়েছে এ আয়াতে।

তাই একথা বলিষ্ঠভাবেই বলা যায় যে, কুরআন মজীদ যে ঈমান গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে, যে ঈমানের দাওয়াত প্রচারের জন্য আল্লাহ্‌র নবী রাসূলগণ প্রাণপাত জিহাদ করে গেছেন এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) যে ঈমানের ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ গঠন করেছিলেন, সে ঈমান হচ্ছে অপরাধ পরিপন্থী একটি তুলনাহীন শক্তি। এই শক্তি চির-নতুন শাশ্বত—যে ঈমানের ভিত্তিতে আজও ব্যক্তি ও সমাজ—তথা রাষ্ট্র ও অর্থনীতি—এক কথায় পূর্ণাঙ্গ সমাজ গঠন করা হলে তা-ও একটি আদর্শ সমাজ হবে এবং তাতে অপরাধ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে না গেলেও তার মাত্রা সংখ্যা ও প্রকট অনেক কম হবে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

ইসলামের জীবন-দর্শন*

ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ

যে কোনো সমাজ, জাতি বা সভ্যতার জীবনীশক্তি অনেকখানি নির্ভর করে তার জীবন-দর্শন উপলব্ধি ও অনুশীলনের ওপর। আদিম সমাজব্যবস্থায় মানুষ নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া খুব কম বিষয়েই চিন্তা করেছে, পরবর্তীকালে চিন্তা করেছে নিকট আত্মীয় স্বজনদের কথা। প্রত্যেক যুগেই অবশ্য এমন কিছু মানবগোষ্ঠি দেখা গেছে যাঁরা ছিলেন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণের অধিকারী। আমরা যখন বিভিন্ন সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী অধ্যয়ন করি—এবং সম্ভবত বর্তমানে আমরা এক নতুন সভ্যতার জন্মলগ্নে উপস্থিত হয়েছি—আমরা দেখতে পাই, কোনো বিশেষ যুগে একটি বিশেষ গোষ্ঠি সভ্যতার আলোকবর্তিকা বহনের গৌরব অর্জন করলেও সমসাময়িক অন্যান্য মানবগোষ্ঠি যে তার সভ্যতার আলোকবর্জিত থাকবেই এমন কোনো কথা নেই। বরং দেখা যায় সভ্যতার ময়দানে কোনো বিশেষ গোষ্ঠি হয়ত অপরগুলির ওপর কিছুটা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। যেমন, ফিনিশীয়রা যখন সভ্যতার মঞ্চে আবির্ভূত হয়ে এক অত্যুজ্জ্বল সভ্যতা গড়ে তুললো, তখন সমসাময়িক অপর কয়েকটি জনগোষ্ঠিও প্রায় অনুরূপ উন্নত ছিলো, কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য উপযুক্ত সুযোগ ও ক্ষেত্র পাচ্ছিলো না। আরব- ইসলামী যুগে গ্রীক, রোমান, চীনা ও ভারতীয়রা সভ্য জাতির সমস্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী থাকা সত্ত্বেও তারা সে যুগে সভ্যতার আলোক-বর্তিকা বহনের মতো শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারেনি। আমাদের বর্তমান যুগে আমেরিকা ও রাশিয়া পারমাণবিক এবং অন্যান্য শক্তির সুবাদে সভ্যতার অগ্রনায়ক রূপে বিবেচিত হলেও বৃটিশ ফরাসী ও জার্মান জাতিও তাদের খুব বেশী পেছনে পড়ে নেই। কোনো কোনো জাতির এসব প্রগতি সত্ত্বেও বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আজও পৃথিবীর কোন কোন অংশে এখনও ঠিক নরমাংসভোজী না হলেও সভ্যতার আলোকবর্জিত মানবগোষ্ঠি রয়ে গেছে।

প্রশ্ন ওঠে, কারো বিবর্তনের গতিধারা কেন দ্রুত এবং অন্যদের কেন মন্থর হবে? একটি যুগে যখন গ্রীকরা এক গৌরবময় সভ্যতার শীর্ষদেশে অবস্থান

---

* [প্রবন্ধটি ইফা পত্রিকা ১৯৮১ সন ২১ বর্ষ ২য় সংখ্যা থেকে সংগৃহীত]

করছিলো, তখনও পশ্চিম ইউরোপ কেন বর্বরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলো? আরবরা যখন সভ্যতার শীর্ষদেশে আরোহণ করেছিলো, রাশিয়ানরা তখনও কেন বর্বর যুগে অবস্থান করছিলো? কয়েক যুগের বেশ কয়েকটি দেশ সম্পর্কে এ প্রশ্ন তোলা যায়। একি নেহায়েৎ দৈবাৎ কোন ব্যাপার, না অন্যান্য গোষ্ঠীর বদলে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে উত্তম চিন্তাধারা ও মহৎ চরিত্রের কিছু সংখ্যক ব্যক্তির আবির্ভাবের ফলশ্রুতিতে এমনটি ঘটেছিলো? এ ব্যাপারে সম্ভবত অন্যরকম ব্যাখ্যাও রয়েছে, যেগুলি আরও জটিল এবং সমসাময়িক এমন সব কারণের ওপর নির্ভরশীল যেগুলির ফলে একটি মানবগোষ্ঠি সাফল্যের স্বর্ণশীর্ষে আরোহণ করেছে এবং অন্যটি ব্যর্থ—এমনকি নিশ্চিহ্ন পর্যন্ত হয়ে গেছে।

এর পরেও আরও প্রশ্ন রয়েছে। কিছু দিন সাফল্যের স্বর্ণশীর্ষে আরোহণের পর কোনো জাতি বর্বর যুগে ফিরে না গেলেও তুলনামূলকভাবে অখ্যাতির বিবরে নিক্ষিপ্ত হয় কেন?

আমরা এ প্রশ্নগুলির উত্তর সন্ধান করতে চাই সমসাময়িক ইসলামের আলোকে এবং এর পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনাও সেই সাথে পরখ করে দেখতে চাই।

আমরা যদি ইবনে খালদুনে বিশ্বাস করি, তাহলে জৈবিক উপাদানই আসল কারণ। ইবনে খালদুনের তত্ত্বে বিশ্বাস করলে ধরতে হবে এক্ষেত্রে জৈবিক উপাদানই আসল কারণ। প্রতিটা জেনারেশনের শেষে প্রজাতি তার প্রাণশক্তি হারিয়ে গেলে এবং প্রাণশক্তি পুনঃসঞ্চারের জন্য অন্ততপক্ষে কর্তৃত্বে অবস্থিত লোকদের পরিবারে পরিবর্তন সূচনা করতে হয়। এই বর্ণগত তত্ত্বকে যদি একটা উন্নত পর্যায়ের অতিশয়োক্তি বলে ধরে নেয়াও যায়, তবুও বর্ণভিত্তিক সভ্যতা এবং সম্প্রসারণবিমুখ ধর্মের ক্ষেত্রে এর প্রভাব অনস্বীকার্য। সৌভাগ্যবশত ইসলাম এই সীমাবদ্ধতার চক্র থেকে মুক্ত; কারণ পৃথিবীর সব বর্ণের মধ্যেই এর অনুসারী রয়েছে। এবং বড় বা ছোট আকারে এর প্রসারণ দুনিয়ার সর্বত্র সমানে ঘটে চলেছে। তা ছাড়া একথা সকলে স্বীকার করবেন যে, ইসলাম এর সমাজ-দেহের অভ্যন্তরে বর্ণবৈষম্যকে সম্পূর্ণভাবে উৎখাত করেছে যার ফলে যে কোনো বর্ণের লোক অনায়াসে এর নেতা ও পতাকাবাহী রূপে অধিষ্ঠিত হতে পারেন। কুরআন মজীদে প্রদত্ত দাসমুক্তির সুপরিকল্পিত বিধানও এক্ষেত্রে একটি গৌরবজনক দৃষ্টান্ত। প্রকৃত প্রস্তাবে ইতিহাসে মুসলমান শাসকদের মধ্যে এমন কতকগুলি শাসক-বংশ দেখা যায় যেগুলি সম্পূর্ণভাবেই সদ্যমুক্ত ক্রীতদাসদের বংশোদ্ভূত ছিলো।

কোনো সভ্যতার জন্ম ও মৃত্যু সমভাবে তার মূল শিক্ষার মানের ওপর নির্ভর করে। এটা যদি তার অনুসারীদের প্রতি দুনিয়া তরক করার আহবান জানায়, তবে আধ্যাত্মিকতা যথেষ্ট বিকাশ লাভ করবে। কিন্তু মানব জীবনের অন্যান্য

দিক ঃ তার দেহ, তার বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি তাদের স্বাভাবিক কর্তব্য সাধনে সক্ষম হবে না, বরং এগুলি বিকাশ লাভের পূর্বেই মরে যাবে। অপর পক্ষে কোনো সভ্যতা যদি জীবনের শুধু বৈষয়িক দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তবে মানুষ অন্যান্য দিকের বদলে এসব দিকে প্রভূত উন্নতি সাধন করবে এবং এ ধরনের সভ্যতা বুমেরাং হয়ে আত্মধ্বংস সাধনেও প্রবৃত্ত হতে পারে। বস্তুবাদ প্রায়শই অহং-সর্বস্বতার জন্ম দেয় এবং অন্যের অধিকারের প্রতি উদাসীন থেকে এমন সব শত্রু সৃষ্টি করে চলে, যারা তাদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকে। এর ফলশ্রুতিতে শুরু হয় পারস্পরিক হানাহানি। সেই দুই দস্যুর কাহিনী সকলেরই জানা আছে। তারা কিছু ধনরত্ন লুট করেছিলো। একজন শহরে গেল খাবার কিনতে, আরেকজন খাবার তৈরীর জন্য লাকড়ি যোগাড় করতে লেগে গেলো। মনে মনে উভয়ের গোপন সংকল্প সংগীকে খতম করে গোটা লুটের মাল দখল করে নেয়া। যে বাজার করতে গিয়েছিলো, সে খাবারে বিষ মিশিয়ে রাখলো, আর তার সংগী রাস্তার পাশে পালিয়ে থাকলো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মতলবে। শহর থেকে ফিরবার সময়ে সে তাকে এভাবে খুন করে ফেলল। কিন্তু পরে যখন সে খাবার খেলো সেও মৃত্যুবরণ করে পরজগতে তার বন্ধুর সন্নিধানে গিয়ে হাজির হল।

কেনো সভ্যতার মধ্যে আরেক ধরনের ত্রুটি থাকতে পারে। অর্থাৎ যখন তার শিক্ষার মধ্যে বিকাশ এবং পরিস্থিতির সংগে খাপ খাইয়ে নেবার মত অন্তর্নিহিত শক্তি না থাকে। এর শিক্ষা বিশেষ যুগ বা বিশেষ পরিবেশেরে জন্য সুন্দর হলেও অন্য যুগ বা অন্য পরিবেশের জন্য তা সেরূপ না-ও হতে পারে। এ ধরনের কোনো শিক্ষার প্রতি অন্ধ আনুগত্য পরবর্তী যুগের লোকদের জন্য মারাত্মক প্রমাণিত হতে পারে। একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দিয়ে এ বিষয়টার ব্যাখ্যা করা যায়। যখন বৈদ্যুতিক আলো ছিল না অথবা যখন কোনো ধর্ম প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট নিয়মিত আয় ছিলো না, তখন রাতে লোক সমাগম হয় এমন কোন ধর্মীয় স্থানে রাতের বেলায় মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখা নিশ্চয়ই পুণ্যের কাজ বিবেচিত হতে পারতো। এ বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও কিছু বলবার নেই যে, কোনো ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাফরমানী বা হক্কুল ইবাদ লংঘনের মত গোনার কাজ করার পর অনুতপ্ত হলে কোন পুণ্যকর্ম দ্বারা তার প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে। কিন্তু তাই বলে বৈদ্যুতিক আলোয় উদ্ভাসিত কোনো স্থানে মোমবাতি জ্বালানোর কাজকে কি অপচয় ছাড়া অন্য কিছু বলা যায়? ইসলামকে এ ধরনের পরিস্থিতির আলোকেই এখানে উপস্থিত করা হচ্ছে।

ইসলামী আদর্শ

সকলেই জানেন, ইসলামের লক্ষ্য কুরআনুল করীমের দু'টি কথার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে—"দুনিয়াতে কল্যাণ এবং আখিরাতে কল্যাণ।" ইসলাম অতি-আধ্যাত্মবাদী বা অতি বস্তুবাদী, কোনো চরমপন্থায় বিশ্বাসী নয়—বৃহত্তর মানবগোষ্ঠির পক্ষে অনুসরণযোগ্য মধ্যম পন্থায় বিশ্বাসী। ইসলাম চায় একই সাথে দেহ ও আত্মার এমনভাবে বিকাশ ঘটাতে হবে, যাতে করে মানুষের মধ্যে এদু'য়ের ভারসাম্য গড়ে ওঠে। ইসলাম মানুষের এ উভয় উপাদানের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছে, কারণ ইসলামের মতে দেহ ও আত্মা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং এর কোনো একটাকেই অপরটির যুপকাষ্ঠে বলি দেয়া উচিত নয়। ইসলাম যেখানে আধ্যাত্মিক কর্তব্য ও অনুষ্ঠানের বিধান দিয়েছে তার মধ্যেও বৈষয়িক উপযোগিতা রয়েছে। অনুরূপভাবে ইসলাম যেখানে পার্থিব উপযোগিতার যেসব বিধান দিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে আধ্যাত্মিক সন্তোষ লাভের উৎস। নীচের দৃষ্টান্তগুলি থেকে এ যুক্তি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এ ব্যাপারে সকলেই একমত হবেন যে, ইসলামের আধ্যাত্মিক সাধনার লক্ষ্য হচ্ছে, সেই অপরিহার্য পরম শক্তির সান্নিধ্য লাভ, যিনি আমাদের স্রষ্টা ও প্রভু, এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন। সুতরাং কুরআনের বিধানে যেমন রয়েছে, মানুষ 'আল্লাহ্‌র রঙ্গে নিজেকে রাঙ্গিয়ে তুলতে' চেষ্টা করে, যাতে করে সে তাঁর চোখ দিয়ে দেখতে পারে, তাঁর স্বরে কথা বলতে পারে—এক কথায় সামগ্রিকভাবে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী যেন আচরণ করতে পারে। এমন কি তার ক্ষুদ্র মানবীয় শক্তি নিয়ে সে যেন তাঁকে অনুকরণেরও চেষ্টা করতে পারে। একজন বিশ্বাসীকেও অবশ্যই কুরআনে নির্ধারিত সময়ে উপবাস করতে হবে, কারণ সেটাই আল্লাহ্‌র বিধান। প্রভুর হুকুম তামিল করা এমনিতেই পুণ্যের কাজ, কিন্তু এর অতিরিক্ত যে লাভ তা হচ্ছে, উপবাস দেহকে দুর্বল করে দেয় বলে তা বৈষয়িক কামনা সংযত করে আত্মাকে শক্তিশালী করে। মানুষ এতে আত্মিক উন্নতি উপলব্ধি করে, আল্লাহকে এবং আল্লাহ্ আমাদের জন্য যা করেন সে তার সব কিছু স্মরণ করে এবং অন্যান্য আধ্যাত্মিক কল্যাণ ভোগ করে। অবশ্য রোযার ফলে দৈহিক উপকার লাভও সম্ভব হয়। মানুষ যখন ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত হয়, বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে যে অম্লক্ষরণ হয় তা পাকস্থলীর বহু রোগজীবাণু ধ্বংস করে। তাছাড়া এতে লোকে সংকটকালে উপবাসে থেকে অনায়াসে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যাবার শক্তিও অর্জন করে। কেউ যদি বৈষয়িক লাভের জন্য উপবাস করে তার কোনো আধ্যাত্মিক মূল্য নেই, কিন্তু কেউ যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্যও উপবাস করে, তাতে তার দৈহিক

লাভ কখনও নষ্ট হয় না। বিস্তারিত আলোচনায় না যেয়েও একথা বলা যায় যে, অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধনা ও ক্রিয়াকর্মেও পার্থিব ও আত্মিক উভয় দিকে লাভ আছে। সালাতের ক্ষেত্রেও এরূপ দ্বিবিধ লাভ আছে—হোক না তা একা-একা, বা জামাতে। বায়তুল্লাহ্ শরীফে হজ্জের ক্ষেত্রে দরিদ্রদের মধ্যে যাকাত দানের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রেও নিম্নতম লাভের উর্ধ্বেও অন্যান্য উপকার পাওয়া যায়। কেউ যদি শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র ওয়াস্তেও কোন কাজ করে তবুও তার বৈষয়িক লাভ না হারিয়ে আত্মিক কল্যাণ অর্জনের তথা দ্বিবিধ উপকার লাভ সম্ভব হয়। বিপরীতভাবে কেউ যদি সেই একই কাজ শুধুমাত্র বৈষয়িক উদ্দেশ্যে করে তবে সে বৈষয়িক লাভ অর্জন করতে পারে। তবে সে তার আত্মিক উপকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবে। এ প্রসঙ্গে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বিখ্যাত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ 'নিশ্চয়ই সমস্ত কাজের বিচার হবে নিয়্যত ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে।'

সম্পূর্ণ জাগতিক একটা কাজের কথা ধরা যাক। লোকে সরকারকে কর দেয়। এটা আশ্চর্যের কথা নয় যে, এরকম একটা ব্যাপারকেও ইসলাম ঈমান, সালাত, রোযা ও হজ্জের মত ধর্মের পাঁচটি মূল স্তম্ভের মত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য বিবেচনা করতে পারে। এর তাৎপর্য গভীর ঃ একই কাজের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক বিষয় সুসম্বন্ধিত হয়েছে। এমন অবস্থায় লোকে ঠিক বেগার শোধের ধরনে কর দেয় না। কর দানের সামাজিক কর্তব্যটুকুও তার মনের মধ্যে এমন পবিত্র কর্মরূপে গেঁথে যায় যে, এটা সেই আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর কর্তব্য হিসাবে প্রতিভাত হয় যাঁর কাছ থেকে কোন কিছুই গোপন করা যায় না এবং যিনি আমাদের পুনর্জীবিত করে হিসাব তলব করবেন। সহজেই বুঝা যায়, এই অবস্থায় একজন বিশ্বাসী কীরূপ যত্ন ও সততার সংগে কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে দেয় টাকা পরিশোধ করবে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ভিন্ন ইসলামে যুদ্ধ নিষিদ্ধ। এটা বুঝতে মোটেই কষ্ট হবার কথা নয় যে, এই মনোভাবের একজন সৈনিকের আচরণ স্বাভাবিকভাবেই মানবিক হবে এবং সে কিছুতেই জীবন বিপন্ন করতে গিয়ে কোন পার্থিব স্বার্থের কথা চিন্তা করবে না। জাগতিক কর্তব্যসমূহের আধ্যাত্মিকরণের পেছনে মানুষের আধ্যাত্মিক দিকটা জোরদার করা ছাড়া ইসলামের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। মানুষ এভাবেই বৈষয়িক ক্ষেত্রে বৈষয়িক লাভের বহু উর্ধ্বে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টা চালায়। বিখ্যাত সূফী মনীষী ইমাম গায্যালী (র) ঠিকই বলেছেন ঃ "কেউ যদি প্রদর্শন বা রিয়ার উদ্দেশ্যে সালাত রোযা করে, তা হবে শিরক, এটা আল্লাহ্‌র ইবাদত নয়, তার

নফসের উপাসনা হবে। অপর পক্ষে কেউ যদি কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থে করবার উদ্দেশ্যে নয়, বরং আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্য (হক) পালনের উদ্দেশ্যে স্ত্রী সহবাসও করে, তা হবে পুণ্যের ও সাওয়াবের কাজ—যার জন্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও পুরস্কার তার প্রাপ্য হবে"।

এই সামগ্রিক জীবনদৃষ্টির অনুসিদ্ধান্ত হিসাবেই সম্ভবত কুরআনে বারবার একই সংগে 'ঈমান ও আমলে সালিহ' তথা বিশ্বাস ও সৎকর্মের' কথা উল্লেখ রয়েছে, যে বিশ্বাসের সঙ্গে বাস্তব অনুশীলন নেই, তার মূল্য খুবই কম। ইসলাম দু'টিকেই সমান গুরুত্ব দেয়। সামাজিক স্বার্থের দৃষ্টিতে অবশ্য খারাপ কাজের চাইতে আল্লাহ্-এ বিশ্বাসহীন অবস্থায়ও ভাল কাজের মূল্য বেশী তবে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ঈমানবিহীন ভাল কাজ পরকালে মুক্তি দিতে পারে না।

কিন্তু ভাল-মন্দের বিচার করা যাবে কিভাবে? প্রথমতঃ অবতীর্ণ বিধানই হবে এ বিচারের মাপকাঠি। তবে শেষ পর্যন্ত যার যার বিবেকই এ ব্যাপারে শেষ ফয়সালা বা সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে। কোন সমস্যা যখন উত্থাপন করা হয়, তখন পারলে নিজেকেই ইসলামী বিধানের আলোকে তার ফয়সালা করতে হবে। প্রয়োজনবোধে বিদ্বান ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহায্যও নেয়া যেতে পারে। একজন আইন বিশেষজ্ঞ বা মুফতী তো মাত্র যে সব তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে তার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত দিতে পারেন। কিন্তু কোনো বস্তু বা তথ্য যদি অনিচ্ছা বা ইচ্ছাক্রমে গোপন করা হয়, তা হলে তার পরিণতিতে যে অবিচার হবে তার জন্য সংশ্লিষ্ট বিধান বা আইনকে দায়ী করা যায় না। আমরা এ প্রসংগে রাসূলে করীমের (সা)-এর একটি সুন্দর হাদীসের অবতারণা করতে পারি। তিনি একবার বলেছিলেন, "হে লোকসকল! তোমরা আমার নিকট যে সব অভিযোগ নিয়ে আস, সেগুলির ফয়সালা আমি করি আমার গোচরে আনীত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে। যদি পূর্ণ তথ্যের অনুপস্থিতিতে আমি কাউকে এমন কোন অধিকার দিয়ে দেই, যা তার প্রাপ্য নয়, সে জেনে রাখুক, আমি তাকে দোযখের আগুনের অংশেরই অধিকার দেই।" ইসলামী বিচারব্যবস্থার অন্যতম মূলনীতিতেও এর প্রতিফলন রয়েছে ঃ "আইন বিশেষজ্ঞগণ তোমাকে যতই যুক্তি প্রদর্শন করুক তুমি তোমার বিবেক প্রয়োগ করবে।"

অন্য কারো কথা চিন্তা না করে সব সময় শুধু নিজের বিষয় চিন্তা করা মানুষের কাজ নয়, পশুর কাজ। নিজের প্রয়োজন পূরণের পর অন্যান্যদের কথা চিন্তা করা স্বাভাবিক ও বৈষয়িক ব্যাপার। তবুও "যারা নিজেদের ভাগ্যে দারিদ্র্য স্বীকার করে নিয়েও নিজেদের তুলনায় অন্যের অগ্রাধিকার দেয়" তাদেরকে

কুরআনে প্রশংসা করা হয়েছে। (৫৯ ঃ ৯) স্পষ্টতই এটা সুপারিশ মাত্র এবং সাধারণ মানুষের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য নয় এবং কেউ এটা পালন না করলে তা অপরাধী বা গোনাহগার মনে করা হবে না। এ ধরনের সুপারিশমূলক একটা বিখ্যাত হাদীস উল্লেখ আমরা এ প্রসংগে করতে পারি ঃ 'মানুষদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম, যে অন্যদের কল্যাণকর ব্রতী হয়।'

ইসলামের বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক দিক কুরআনের নির্দেশে ফুটে উঠেছে ঃ 'এবং তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ বর্ণনা করে দাও' (৯৩ ঃ ১১)। রাসূলের একটি বাণীতে এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির উপর তাঁর নিয়ামতের নিদর্শন দেখতে একদিন রাসূলের এক ধনী সাহাবা অত্যন্ত খারাপ পোশাকে তাঁর নিকট উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি কৃপণতার জন্য নয়, তাক্ওয়া হিসাবে দরিদ্র বেশে থাকতে চান, কারণ তাঁর নিজের চেয়েও তিনি দরিদ্রের অগ্রাধিকার দিতে চান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এটা অনুমোদন না করে আত্মত্যাগের সীমারেখা ঠিক করে দেন। কুরআন (২৮ ঃ ৭৭) আরও বলেছে, 'এ দুনিয়ায় তোমার হক অবহেলা করো না।' ইসলাম এটা মানে না যে কেউ কাজকর্ম বাদ দিয়ে পরগাছা জীবন যাপন করবে, অন্য দিকে সকলকেই আল্লাহ্‌র দেয়া শক্তি ও প্রতিভাকে সৃষ্টির কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে। সে যতটা সম্ভব উপার্জন করবে এবং নিজের প্রয়োজন পূরণের পর অতিরিক্ত সম্পদ তাদের দেয়া হবে যারা নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন ঃ "তোমাদের পক্ষে অপরের করুণাপ্রার্থী অপেক্ষা স্বচ্ছল বংশধর রেখে যাওয়াই উত্তম।" মানুষের জন্য নানারূপ প্রাত্যহিক কর্তব্যাদি নির্ধারণ সত্ত্বেও ইসলাম মানুষের নিকট দৈন্যদশা বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দুঃখ দাবী করে না। বিপরীত ক্রমে কুরআন এ ধরনের মনোভাবের লোকদের ভর্ৎসনা করে বলেছে—

"বলো ঃ বান্দাদের জন্য আল্লাহ্‌র দেয়া সৌন্দর্য-সম্ভার এবং উত্তম আহার্যকে তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছে ? বলো ঃ পার্থিব জীবনে এবং বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে এগুলি তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে। বিজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য আমাদের বিধান আমরা এভাবেই বিশদভাবে বিবৃত করি।" (৭ ঃ ৩২) শরীয়াতে যে সব জিনিস ব্যবহার যা ভোগের অনুমতি রয়েছে, সেগুলি স্বেচ্ছায় কেউ যদি নিজের জন্য নিষিদ্ধ করে নেয় তাতে যেমন পুণ্য নেই, যেমন রয়েছে শরীয়াতে নিষিদ্ধ বস্তুর ব্যবহার পরিহার করে চললে।

আল্লাহ্-এ বিশ্বাস

মানুষ সব যুগে তার স্রষ্টার ইবাদতের উদ্দেশ্যে তাঁকে জানতে চেষ্টা করেছে এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি যুগ ও প্রতিটি সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ কিছু আচরণ-বিধি প্রবর্তন করেছেন আদিম যুগের মানুষ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁর শক্তি ও করুণার অভিব্যক্তিকে পূজা করেছে। অন্যেরা কেউ কেউ মংগল ও অমংগলের প্রতিভূস্বরূপ দু'জন পৃথক ঈশ্বরের কল্পনা করেছে এবং তারা এই বৈষম্যের ফলে একাধিক ঈশ্বরের মধ্যে গৃহযুদ্ধের যুক্তিসংগত পরিণতির কথা খেয়াল করেনি। আবার অন্যেরা স্রষ্টাকে এমন রহস্যের জটাজালে আবদ্ধ করে রেখেছে যে, সেখানে তাঁর সমগ্র অস্তিত্বই যেন চাপা পড়ে গেছে। অন্য কেউ কেউ এমন সব রূপক, ফর্মুলা বা ভাবভংগির প্রয়োজন অনুভব করেছে যার ফলে তাদের ধর্মীয় মতবাদকে পৌত্তলিকতা বা শিরক থেকে পৃথক করে দেখা কষ্টকর হয়ে পড়ে।

এ ব্যাপারে ইসলামের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ইসলাম আল্লাহ্র নিরংকুশ একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে ইবাদত ও সালাতের এমন সব পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে যার মধ্যে প্রতিমা বা প্রতীক পূজার কোন অবকাশই থাকে না (কারণ ওগুলি আদিম জীবন ও পৌত্তলিকতার ধ্বংশাবশেষ রূপে বিবেচিত হয়)। ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ্ শুধু দৈহিক উপলব্ধির অতীত শ্রেষ্ঠতম ও অপার্থিবই নন, তিনি একাধারে সর্ববিরাজমান ও সর্বশক্তিমান। মানুষ ও তার স্রষ্টার মধ্যে সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত এবং সেখানে কোনো মধ্যস্থের প্রয়োজন হয় না। এমন কি সাধক সমাজের মধ্যে যারা সর্বোচ্চ মর্যাদার সাধক, যেমন নবী-রাসূলগণ, তাঁরাও পথ প্রদর্শক ও বাণীবাহক মাত্র। সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং আল্লাহ্র নিকট প্রত্যক্ষ জবাবদিহির দায়িত্ব ব্যক্তি-মানুষের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ইসলাম ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা উন্নয়নে প্রয়াসী। ইসলাম স্বীকার করে যে, মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত দুর্বলতা রয়েছে, কারণ ভাল ও মন্দ উভয় ধরনের ক্ষমতাসহ তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তবুও একথা স্বীকার করা হয় না যে, মানুষের মধ্যে মূলগতভাবেই পাপ রয়েছে, কারণ তা হলে সেটা হবে একটা অবিচার। আদম যদি কোনো পাপ করে থাকেন, তার দায়িত্ব তাঁর বংশধরদের উপর বর্তাতে পারে না। প্রতিটি মানুষকে শুধু তার নিজের কাজের জন্যই জবাবদিহি করতে হবে।

ব্যক্তি তার নিজের দুর্বলতার কারণে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে বা সৃষ্ট প্রাণীর বিরুদ্ধে অপরাধ করতে পারে। প্রত্যেক অপরাধের জন্য পরিমিত দায়িত্বও (শাস্তি) রয়েছে, তবুও ইসলাম ক্ষমার সম্ভাবনা স্বীকার করে যার উপাদান রয়েছে অনুতাপ

ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থার মধ্যে। মানুষের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ করা হলে তার যথাসাধ্য প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে করে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ঔদার্যের বশবর্তী হয়ে, অথবা তার কাছ থেকে যে দ্রব্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো তার ক্ষতিপূরণ, প্রত্যর্পণ বা অনুরূপ কোনো কর্মপন্থা গ্রহণের ফলে, সে ক্ষমা করে দিতে পারে। আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অপরাধ করা হলে মানুষ হয় তার উপযুক্ত শাস্তি, নতুবা প্রতিপালকের নিকট হতে মহান ক্ষমা লাভ করবে। ইসলাম এ কথা স্বীকার করে না যে অনুতপ্ত পাপীদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্ প্রথমে কিছু নির্দোষ লোককে শাস্তি দিতে বাধ্য, কারণ তা আল্লাহ্‌র পক্ষে হবে অবিচারের শামিল।

সমাজ

যদিও ইসলাম ব্যক্তি সত্তার উন্নয়নে প্রয়াসী, তবুও ইহা সামাজিক সামষ্টিকতার দিকে যথেষ্ট মনোযোগী। ইসলামের ধর্মীয় ও জাগতিক সমস্ত বিধানে ইহা সুস্পষ্ট। এজন্য জামাতের সঙ্গে সালাত আদায়ের বিধান রয়েছে। [পাঁচ ওয়াক্ত প্রাত্যহিক সালাতে প্রয়োজনবোধ এ বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেয়া গেলেও সাপ্তাহিক জুম'আ ও বাৎসরিক ঈদের সালাত সেরূপ কোনো অব্যাহতির বিধান নেই]। হজ্জের ক্ষেত্রে এই বিধান আরও অধিক সুস্পষ্ট, কারণ পৃথিবীর সমস্ত দেশ থেকে বিশ্বাসীদের একই স্থানে জমায়েত হতে হয়। রোযাতেও সামগ্রিক দিকটা দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে যখন দেখা যায়, দুনিয়ার সমস্ত বিশ্বাসী একই মাসে সিয়াম উদ্‌যাপন করে। তাছাড়া, একজন খলীফা থাকার প্রয়োজনীয়তা, সমাজের সকলের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে বাধ্যতামূলক যাকাত প্রথা--এসব কিছুই একই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বাস্তব প্রমাণ বহন করে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সামষ্টিকতা বা সমাজের মধ্যে এ শক্তি নিহিত রয়েছে যা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-মানুষদের পক্ষে কিছুতেই আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ্ বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্নরূপ গুণ দান করেছেন। কেন এরূপ করা হলো তা তিনিই ভাল জানেন। একই দম্পতির দু'টি সন্তান, একই ক্লাশের দু'জন ছাত্রকে সব সময় একইরূপ গুণ বা শক্তির অধিকারী হতে দেখা যায় না। সমস্ত জমি একইরূপ উর্বরা তবু বিভিন্ন আবহাওয়ার পার্থক্য দেখা যায়। একই জাতের বীজের দু'টি বৃক্ষে পরিমাণ গুণগতভাবে একই রূপ উৎপাদন হয় না। প্রতিটি বস্তুর এবং একটা বস্তুর প্রতিটা অংশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। এই প্রাকৃতিক সত্যের আলোকে ইসলাম একদিকে যেমন সকলের মৌলিক সাম্য স্বীকার করে, তেমনি অপরদিকে এক ব্যক্তির উপর অন্য ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়। সকলেই

এক আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। বৈষয়িক শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে কেউ আল্লাহ্‌র নিকট উচ্চতর মর্যাদা লাভ করবে না, ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি তার ধার্মিকতা। প্রকৃত প্রস্তাবে এ পার্থিব জীবন তো ক্ষণস্থায়ী এবং মানুষ ও পশুর আচরণে অবশ্যই পার্থক্য থাকতে হবে।

জাতীয়তা

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই ইসলাম সংহতির উপাদান হিসাবে জাতীয়তার সংকীর্ণ ভিত্তি প্রত্যাখ্যান করে। যে বংশে বা যে দেশে একটা লোক জন্মগ্রহণ করে তার প্রতি তার আকর্ষণের প্রশ্নটা স্বাভাবিক, তবুও মানবতার স্বার্থ দাবী করে যে, অন্যান্য মানবীয় গোষ্ঠির প্রতি সহনশীল হতে হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের পার্থক্য বিভিন্ন দেশকে পরস্পর নির্ভরশীল করে রেখেছে। সহাবস্থানের নীতি এখানে অপরিহার্য, নইলে বিরামহীন সংঘর্ষে আমরা সব ধ্বংস হয়ে যাব। ভাষা, বর্ণ, অথবা জন্মস্থানের ভিত্তিতে জাতীয়তা একটা আদিম ব্যাপার। এতো অদৃষ্টের হাতে আত্মসমর্পণের শামিল, কারণ এর ওপরে মানুষের কোনো হাত নেই। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী প্রগতিশীল এবং তা ব্যক্তির পছন্দ অপছন্দের ভিত্তিতে নির্ধারিত। ইসলাম বর্ণ, ভাষা অথবা বাসভূমি নির্বিশেষে সেই সব লোকের ঐক্যের কথা বলে যারা একটা আদর্শে বিশ্বাস করে। কাউকে নির্মূল বা পদানত করার প্রশ্ন যখন বাদ দেয়া হয়, তখন একমাত্র বৈধ সম্ভাবনা থাকে স্বীকরণ, আর একই আদর্শে বিশ্বাস স্থাপনের চাইতে আর কিসে আরও ভালভাবে এই স্বীকরণের ভূমিকা পালন হবে? পুনর্বার ইহা বলা চলে যে, ইসলামী আদর্শে দেহ ও আত্মা-উভয়ের প্রয়োজন পূরণের সুসমন্বয় ঘটেছে, তদুপরি এর মধ্যে রয়েছে সহনশীলতার শিক্ষা। ইসলাম ঘোষণা করেছে, আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছেন। বিভিন্ন নবী-রাসূলের মাধ্যমে যুগে যুগে আল্লাহ্‌র যে শাশ্বত বাণী প্রচারিত হয়েছে ইসলাম তার নবায়ন ও পুনরুজ্জীবনের ভূমিকা ছাড়া নিজের জন্য অন্য কোনো ভূমিকা দাবী করেনি। ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইসলাম সব রকমের জবরদস্তি নিষেধ করেছে এবং যতই অবিশ্বাস্য শোনাক, ইসলাম একটি ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী অমুসলিমদের স্বাধিকার দান করতে এর নিজের ধর্মীয় বিধান মতেই বাধ্য। কুরআন ও হাদীস এবং সর্বকালের রেওয়াজে বলে দেয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিমদেরকে তাদের নিজেদের আইন অনুসারে তাদের বিচারকদের সমবায়ে গঠিত ট্রাইবুন্যালের মাধ্যমে বিচারের সুযোগ দিতে হবে এবং তাদের ধর্মীয় বা সামাজিক কোনো ব্যাপারেই মুসলিম কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী

অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর সামাজিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কুরআনে যখন ঘোষণা করা হয়—পার্থিব সম্পদের উদ্দেশ্য মানবতার জীবিকার প্রয়োজন পূরণ (৪ ঃ ৫), তখন এতটুকু বাড়িয়ে বলা হয় না। সকলেই যদি নিজের ছাড়া আর কারো কথা চিন্তা না করে, সমাজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে; কারণ ধনীর সংখ্যা কম এবং গরীবের সংখ্যা অনেক বেশী এবং কালক্রমে বিপুল সংখ্যক বঞ্চিত মানুষ সংখ্যালঘিষ্ঠ ধনীগোষ্ঠিকে এক সময় নির্মূল করে ফেলবে। মানুষ অনেক অভাব সহ্য করতে পারে, কিন্তু খাদ্যাভাব সহ্য করতে পারে না। এ ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী সুপরিচিত। ইহা জাতীয় সম্পদের বিরামহীন পুনর্বন্টন ও আবর্তনের বিধান দেয়। ইসলামে দরিদ্রকে কর থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে এবং ধনীর উপর করারোপ করে দরিদ্রের প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া আরও আইন রয়েছে যার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির বাধ্যতামূলক বন্টনের ব্যবস্থা করে গুটিকতক লোকের হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত হওয়ার সম্ভাবনা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সূদে টাকা ঋণ দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, নিকট আত্মীয়দের প্রতি বঞ্চনামূলক উইল নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। তা ছাড়াও ইসলামে এমন সমস্ত বিধান রয়েছে যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় খাতে খরচের পদ্ধতি এমনভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছে যার ফলে রাষ্ট্রীয় আয়ের কল্যাণমুখী পুনর্বণ্টন সুনিশ্চিত হয়, এবং উপকারপ্রাপ্তদের মধ্যে দরিদ্ররা শীর্ষে অবস্থান করে। এই নীতি যদি দৃষ্টিপথে রাখা হয়, তবে লক্ষ্য অর্জনে অঞ্চল, যুগ ও পরিবেশের বিশেষ তাকিদ পূরণ সম্ভব হয়। স্বাধীন উদ্যোগের প্রতিযোগিতাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সহ্য করা যায়, যতক্ষণ তা শোষণে এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বলের ধ্বংস সাধনে পর্যবসিত না হয়। পরিস্থিতি বা অর্থনৈতিক জনসংখ্যামূলক বিবর্তনের কারণে তেমন প্রয়োজন হলে সামগ্রিক পরিকল্পনাও সমভাবে মেনে নেয়া যায়। যে কোনো মূল্যেই সম্পদ ও শক্তির অপচয় পরিহার করতে হয় এবং সময়ের প্রয়োজনে এমন কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে যা অবস্থা মোকাবেলায় অধিকতর উপযোগী।

স্বাধীন ইচ্ছা ও তাকদীর

এই পর্যায়ে স্বাধীন ইচ্ছা সম্পর্কীয় দার্শনিক প্রশ্নেরও অবতারণা করা চলে। এই চিরন্তন বিতর্কের সমাধান যুক্তি দিয়ে চলে না। কারণ, যদি সমস্ত ব্যাপারে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা স্বীকৃত হয়, তবে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌ই যদি সব কিছু পূর্বাহ্নে স্থির করে দিয়ে থাকেন, তা হলে মানুষকে কেন তার সব কাজের দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে? হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর

উম্মাতদেরকে এই প্রশ্নে তর্কে প্রবৃত্ত না হতে সুস্পষ্ট উপদেশ দিয়েছেন। 'কারণ এই বিতর্ক তোমাদের পূর্ববর্তী বহু জাতিকেই বিভ্রান্ত করেছে।' তিনি আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও মানুষের দায়িত্ব এই দুটি প্রশ্নকে পৃথক করে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রেমের মধ্যে কোন যুক্তি নেই। মুসলিম তার স্রষ্টাকে ভালবাসে। সে স্বীকার করে নিতে পারে না যে, আল্লাহ্‌র কোন ত্রুটি আছে। আল্লাহ্ শুধু সর্বজ্ঞই নন, তিনি সর্বশক্তিমানও। আবার তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক এবং করুণাময়ও। ইসলামে আল্লা'য়ী গুণাবলীকে মানুষের পার্থিব বিষয়াদি থেকে পৃথক করা হয়েছে এবং বিশ্বাসীদের কাজ করে খাবার উপর গরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যেহেতু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা মানুষের নিকট অজানা থাকে, সুতরাং মানুষের কর্তব্য হচ্ছে প্রাথমিক ব্যর্থতার পর নিরাশ না হয়ে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন বা চূড়ান্ত ব্যর্থতা না আসা পর্যন্ত বারবার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। সর্বশেষ এই অবস্থায়ই ইসলামী ধারণার তাকদীরের ভূমিকার প্রয়োজন হয় মানুষের জন্য সান্ত্বনা হিসাবে অর্থাৎ তখন ধরে নিতে হবে, এটাই ছিলো আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এবং শেষ নাজাতের তুলনায় এ দুনিয়ার সাফল্য বা ব্যর্থতার কোনো গুরুত্ব নেই। আর সেই শেষ মূল্যায়নে আল্লাহ্ পার্থিব সাফল্যের পরিমাণ নয়, উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টার বিচার করবেন।

কুরআনের (৫৩ ঃ ৩৬-৪২ এবং অন্যান্য আয়াত) মতে, এই সত্যই আল্লাহ্ সর্বযুগে তাঁর নবী-রাসূলদের নিকট অবতীর্ণ করেছেন ঃ

"সে কি মূসা ও ইব্‌রাহীমের নিকট প্রেরিত গ্রন্থে কি রয়েছে সে খবর রাখে না ? একজনের বোঝা আরেক জন বহন করবে না। মানুষ শুধু তাই পাবে যার জন্য সে চেষ্টা চালায়। তার প্রচেষ্টার মূল্যায়ন করা হবে এবং সর্বশেষে তার পূর্ণতম প্রাপ্য পরিশোধ করা হবে। আর তোমার প্রভু, তিনিই সর্বশেষ লক্ষ্য।"

মানুষ যদি তার সব কাজের জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নিকট দায়ী মনে না করে, তার শাস্তি বা পুরস্কার কোনটা পাবারই দাবী নেই। সংক্ষেপে বলতে গেলে, যেহেতু ইসলাম দু'টি প্রশ্নকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দেখে, তাই একই সাথে মানুষের কর্তব্য (চেষ্টা, দায়িত্বজ্ঞান) এবং তাকদীর নির্ধারণের ক্ষমতা-সমেত আল্লাহ্‌র গুণাবলী এবং তাঁর অধিকার স্বীকার করে নেয়াতে ইসলামের পক্ষে অসুবিধা হয় না।

ইসলামে তাকদীরের আরেকটি তাৎপর্য আছে, যার গুরুত্বও কোনো দিক দিয়ে কম নয়। আর তা হলো, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই কোনো মানবীয় আচরণে ভাল বা মন্দ বৈশিষ্ট্য আরোপ করতে পারেন, কারণ আল্লাহ্‌ই সমস্ত আইনের উৎস। আমাদের সমস্ত আচরণে আল্লাহ্‌র নির্দেশকে মান্য করতে হবে।

এসব নির্দেশ তিনি তাঁর মনোনীত বাণী বাহকদের মাধ্যমে আমাদের কাছে পাঠিয়ে থাকেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) এঁদের সর্বশেষ এবং তাঁর শিক্ষা সর্বোত্তমভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। প্রাচীন গ্রন্থসমূহের আদি পাঠ আমাদের যুগে পাওয়া যায় না। মানব সমাজের ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ-কলহে সেগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। কুরআন শরীফ এ ব্যাপারে শুধু ব্যতিক্রমই নয়, এটা আল্লাহ্‌র সর্বশেষ বাণীও বটে। এটা একটা সাধারণ সত্য যে, একই আইন প্রণেতার পরবর্তী আইন পূর্ববর্তী আইনকে বাতিল করে দেয়।

উপসংহারে আমরা ইসলামী জীবন-ধারার আরেকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করবো ঃ একজন মুসলিমের দৈনন্দিন জীবনে, কী ব্যক্তিগতভাবে, কী সমষ্টিগতভাবে, জাগতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে একজন মুসলিমকে শুধু যে আল্লাহ্‌র বিধানই মেনে চলতে হয়, তা নয়—তাকে তার শক্তি ও সম্ভাবনা অনুসারে এই আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রেও অবদান রাখতে হয়। এই আদর্শের ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ্‌র ওহী এবং এর লক্ষ্য সার্বজনীন কল্যাণ।

সুতরাং দেখা যায়, এই সর্বাঙ্গীন আদর্শ মানুষের বৈষয়িক ও আত্মিক সমগ্র জীবনের জন্যই পরিকল্পিত, আর, মানুষ পার্থিব জীবন-যাপন করে থাকে পারলৌকিক জীবনের প্রস্তুতি হিসাবেই।

অনুবাদ ঃ অধ্যাপক আবদুল গফুর

ইসলাম ও কুফরের মানদণ্ড*

মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী (র)

কোন মুসলমানকে কাফির অথবা কাফিরকে মুসলমান বলা উভয়টাই গুরুতর ব্যাপার। কুরআন শরীফে এই দুইটি সম্পর্কেই কঠোর নিষেধবাণী আসিয়াছে। মুসলমানকে কাফির বলা সম্পর্কে আছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ أَلْقٰى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

"হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা আল্লাহ্‌র পথে সফর কর, তখন প্রত্যেকটি কাজ সূক্ষ্মরূপে বাছবিচার করিয়া করিও এবং যে ব্যক্তি তোমাদিগকে সালাম দেয় পার্থিব সম্পদ লাভের [গনীমত প্রাপ্তি] জন্য তোমরা তাহাদিগকে অবিশ্বাসী বলিয়া অভিহিত করিও না। কেননা, আল্লাহ্‌র কাছে অঢেল গনীমতের মাল রহিয়াছে। তোমরাও প্রথম এইরূপই ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের উপর দয়া করেন। সুতরাং ভাবিয়া দেখ তোমরা যাহা কিছু করিতেছ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত রহিয়াছেন।" (সূরা নিসা ঃ ৯৪)

এই আয়াতের দ্বারা জানা গেল যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলিয়া জাহির করে, তাহার কাফির হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাহাকে 'কাফির' বলা অবৈধ এবং গুরুতর ব্যাপার।

পক্ষান্তরে, কাফিরকে মুসলমান বলিয়া অভিহিত করাও নিষিদ্ধ। কুরআন শরীফে আছে ঃ

أَتُرِيْدُوْنَ أَنْ تَهْدُوْا مَنْ أَضَلَّ اللّٰهُ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا – (سورة النساء : ٨٨)

* [প্রবন্ধটি ইফা পত্রিকা ১৯৮৪ সন ২৪ বর্ষ ১ম সংখ্যা থেকে সংগৃহীত]

"তোমরা কি সেইসব লোককে হিদায়ত করিতে চাও, যাহাদিগকে স্বয়ং আল্লাহ্ গুমরাহীর মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছেন? আর যাহাদিগকে আল্লাহ্ স্বয়ং গুমরাহীতে ফেলিয়া রাখেন, তাহাদিগকে উদ্ধারের কোনই পথ তুমি পাইবে না।"
(সূরা নিসা ঃ ৮৮)

সাহাবা, তাবিঈন এবং পরবর্তী যুগের আয়িম্মায়ে মুজতাহিদগণ এ ব্যাপারে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনের জন্য বারবার সতর্ক করিয়া গিয়াছেন। কালাম ও ফিকাহ্‌বিদগণ এই ব্যাপারটিকে অত্যন্ত জটিল মনে করিতেন এবং এ ব্যাপারে যাঁহারা আলোচনা করিতে চাহেন, তাঁহাদের প্রতি কঠোর সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়াছেন। হযরত মোল্লা আলী কারী 'শারহে শিফায়' বলেন ঃ

ادخال كافر فى الملة الاسلامية او اخراج مسلم عنها عظيم فى الدين

"কাফিরকে মুসলমান সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা বা মুসলমানকে ইসলাম বহির্ভূত বলিয়া অভিহিত করা উভয়টাই শরীয়াতের দৃষ্টিতে গুরুতর ব্যাপার।" [শারহে শিফা, খণ্ড-২ পৃঃ ৫০০]

কিন্তু আজকাল এই দুইটি ব্যাপার এতই সহজ যে, মনে করা হইয়া থাকে, কুফর ও ইসলাম এবং ঈমান ও ইরতিদাদের [ধর্মচ্যুতির] কোন মাপকাঠি ও মূলনীতি বলিয়া যেন আদৌ কিছু নাই!

এক জামা'আত তো কেবল কুফরীর ফাতোয়াদানকেই তাহাদের একমাত্র কাজ বা পেশা বানাইয়া লইয়াছে। কেহ সামান্য একটু শরীয়াত বিরোধী বা তাহাদের মর্জির বিরোধী কিছু করিলেই অমনি তাহারা সেই ব্যক্তিকে কাফির বলিয়া ফাতোয়া দিয়া বসে। সামান্য কথার জন্য তাহারা মুসলমানদিগকে ইসলাম হইতে খারিজ করিয়া দেয়। অপরদিকে আর একদল আছে, যাহাদের কাছে ঈমান ইসলামের জন্য তেমন কিছুর প্রয়োজন হয় না; বরং যে কেহ নিজেকে মুসলমান বলিয়া জাহির করে, তাহাকেই তাহারা নির্বিচারে ও নির্দ্বিধায় মুসলমান বলিয়া অভিহিত করে—চাই সে ব্যক্তি কুরআন-হাদীস ও ইসলামের আহ্‌কাম-আরকান যতই অস্বীকার বা অবজ্ঞা করুক না কেন! তাহাদের মতে, সমস্ত কুফরী কথাবার্তা ও কার্যকলাপই ইসলামের অন্তর্ভুক্ত। হিন্দুধর্ম ও অন্যান্য বাতিল ধর্মসমূহের মতো ইহারা ইসলামকেও একটা জাতীয় পরিচিত বা লকব বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে—আকীদা [বিশ্বাস] যাহাই থাকুক না কেন, আমল [আচরণ] যে প্রকারই হউক না কেন, সর্বাবস্থায়ই সেই ব্যক্তি মুসলমান থাকিবে! তাহারা ইহাকে

উদারতা ও মনের প্রশস্ত বলিয়া অভিহিত করে। তাহাদের সমস্ত রাজনৈতিক স্বার্থ ও সুবিধা ইহার উপরই নির্ভরই করে।

কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইসলাম ও ইসলামের নবী (সা) এই বক্রতা বা গুমরাহী এবং বাড়াবাড়ি ও অতি-উদারতার আদৌ পক্ষপাতী নহেন। ইসলাম তার অনুসারীদের জন্য একটি আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান পেশ করিয়াছে। যে ব্যক্তি ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে এবং সর্বপ্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পরিহার করিয়া উহাকেই শিরোধার্য করিয়া লয়, সে মুসলমান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র এই বিধানের সামান্যতম কোন ব্যাপারকেও ইনকার বা অগ্রাহ্য করিয়া বসে, নিঃসন্দেহে ও নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, সে ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া যায়। এমন ব্যক্তিকে ইসলাম তাহার গণ্ডীর মধ্যে ধরিয়া রাখিতে চাহে না। এমন ব্যক্তির দ্বারা ইসলামের পরিসর মুসলমান সমাজের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে ইসলাম ও মুসলিম জাতি রীতিমত অপমান বোধ করেন এবং এই ধরনের স্বল্পসংখ্যক লোককে ইসলামের মধ্যে দাখিল বলিয়া মানিয়া .নিলে হাজার হাজার মুসলমানের ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া যাওয়ার সমূহ আশংকা দেখা যায়। অতীতে একাধিকবার এইরূপ দেখা গিয়াছে। আর ইহা এমনি একটি ক্ষতি যে, যদি কৃতই উহার বিনিময়ে হাজার রকমের কল্যাণও সাধিত হয়, তবুও কোন ধর্মপ্রাণ মুসলমান উহা গ্রাহ্য করিতে পারে না, বিশেষতঃ যখন সেই হাজার রকমের উপকার নিছক কাল্পনিক ও অনুমানভিত্তিক হয়।

আমাদের যুগের লোকদের এই বাড়াবাড়ি, অতি উদারতা এবং ইসলাম ও কুফরের বাপারে এই অসতর্কতা দর্শনে দীর্ঘদিন ধরিয়া এ সম্পর্কে একখানি পুস্তিকা রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া আসিতেছিলাম, যাহাতে ইসলাম ও কুফরীর মানদণ্ড বর্ণিত হইবে, বর্ণিত হইবে কোন্ কোন্ আকীদা, কথাবার্তা ও কার্যকলাপের দ্বারা কোন ব্যক্তি ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া যায়। এমনি সময়ে নিম্নে বর্ণিত প্রশ্নের জবাব লিখিবার প্রয়োজন দেখা দিল। তাই উহা একটু বিস্তারিত লিখিয়া দিয়াছি, যাহা দ্বারা কি কি কারণে একটি লোক কাফির হইয়া যায়, উহা জানিবার সাথে সাথে কিছু কিছু গুমরাহ জামা'আত সম্পর্কে ইসলামের বিধান কি, তাহাও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী ব্যক্তিদের সম্পর্কে ইসলামের কিছু বিধানও উহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) এই পুস্তিকাখানি আগাগোড়া পড়িয়া অনেক পরিবর্ধন ও পরিমার্জনা করিয়া দেন এবং উর্দূ পুস্তিকাখানির নাম 'উসূলুল-আফ্কার ইলা উসূলিল ইক্ফার' وصول الأفكار الى اصول الإكفار। রাখিয়া দেন।

ইসলাম ও কুফর

প্রশ্ন ঃ কুফর ও ইসলামের মাপকাঠি কি? কি কারণে একজন মুসলমানকে মুরতাদ বা ইসলামত্যাগী কাফির বলা যাইতে পারে?

উত্তর ঃ শরীয়াতের পরিভাষায় মুরতাদ বলা হয় সেই ব্যক্তিকে, যে ব্যক্তি ইসলাম হইতে বিমুখ হইয়া যায় বা ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে। ইহা দুই প্রকারে হইতে পারে ঃ

প্রথম প্রকার হইতেছে এই যে, কোন হতভাগ্য ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীস্টান, ইয়াহূদী, আর্যসমাজী বা ইত্যাকার অন্য কোন ধর্মে দীক্ষিত হইয়া পড়িল, কিংবা আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব বা তাঁহার একত্বে [তওহীদ] বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিল; অথবা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রিসালতকেই অস্বীকার করিয়া বসিল। [আল্লাহ্ রক্ষা করুন!]

দ্বিতীয় প্রকার হইতেছে এই যে, প্রকাশ্যে হয়তো সে ধর্ম পরিবর্তন করিল না বা তাওহীদ ও রিসালতকে অস্বীকার করিল না; কিন্তু এমন আমল-আচরণ, কথাবার্তা বা আকীদায় [বিশ্বাসে] লিপ্ত হইয়া পড়িল; যাহাতে প্রকারান্তরে কুরআন শরীফ বা রিসালতকেই অস্বীকার করা হয়। যেমন সে ব্যক্তি ইসলামের এমন কোন ব্যাপারকেই অস্বীকার করিয়া বসিল, যাহা কুরআন শরীফের স্পষ্ট আয়াতের দ্বারা সপ্রমাণিত বা যাহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস হইতে বর্ণনা পরম্পরায় এমনিভাবে সপ্রমাণিত যে উহা অস্বীকার করা চলে না। সমস্ত উম্মাতের উলামা-ই কেরামের সর্ববাদী সম্মত মত হইল এই যে, এমন ব্যক্তি ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া 'মুরতাদ' শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়ে, যদিও বা সেই একটি ব্যাপার ছাড়া আর সব ব্যাপারেই সে ইসলামের পূর্ণ আনুগত্য ও পাবন্দী করিয়া থাকে।

এই দ্বিতীয় প্রকারের মুরতাদদের যেহেতু ইসলামী বেশভূষা ও আচার-আচরণে কোন পার্থক্য সূচিত হয় না, এ জন্য ইহাদের ব্যাপারে মুসলমানরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুল-বুঝাবুঝিতে লিপ্ত হইয়া পড়েন এবং মুসলমানগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহাদের মুসলমান বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন। বাহ্যত ইহা একটি মামুলী ভুল মনে হইলেও পরিণতির দিক হইতে চিন্তা করিলে ইহার চাইতে মারাত্মক ব্যাপার ইসলাম ও মুসলমান সমাজের জন্য আর কিছুই হইতে পারে না। কেননা, ইহাতে কুফ্র ও ইসলামের কোন মাপকাঠি সীমারেখাই বর্তমান থাকে না—পার্থক্য থাকে না একজন মু'মিন ও একজন কাফিরের মধ্যে। ফলে ইসলামের ধূর্ত শত্রুরা চালাকি করিয়া মুসলিম সমাজের একজন সাজিয়া আস্তিনের সাপ বা ঘরের শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে এবং বন্ধুর বেশে শত্রুতার সকল পরিকল্পনাই নির্বিঘ্নে বাস্তবায়িত করিয়া চলিবে।

তাই ইরতিদাদ [মুরতাদ হওয়া] সংক্রান্ত ব্যাপারটি একটু বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করার প্রয়োজন অনুভূত হয় আর মুরতাদ হওয়া যেহেতু ঈমানেরই বিপরীত বস্তু, তাই প্রথমে ঈমানের মোটামুটি পরিচিত বর্ণনার পর ইরতিদাদের [মুরতাদ হওয়া] স্বরূপ ব্যাখ্যা করিব।

ঈমান ও ইরতিদাদের সংজ্ঞা

ঈমানের সংজ্ঞা সুবিদিত। ইহার দুইটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ রহিয়াছে। প্রথম অংশ হইল আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়ন বা বিশ্বাস স্থাপন, দ্বিতীয় অংশ, তাঁহার রাসূল (সা)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন। কিন্তু যেইভাবে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থ কেবলমাত্র তাঁহার অস্তিত্বের কথা স্বীকার করিয়া নেওয়াই নহে; বরং সমুদয় গুণ যে তাঁহার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় রহিয়াছে; তিনি যে সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে শ্রবণশীল, দর্শনশীল, ক্ষমতাশীল—যেইভাবে কুরআন শরীফে বিবৃত হইয়াছে— বিনা বাক্য ব্যয়ে মানিয়া নিতে হইবে। নতুবা ইয়াহূদী, খ্রীস্টান, হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাও তো স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থ এই নহে যে, কেহ তাঁহার অস্তিত্ব ছিলো বলিয়া বিশ্বাস করিবে আরও বিশ্বাস করিবে যে, তিনি মক্কা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন, মদীনায় হিজরত করেন—৬৩ বৎসরের আয়ু লাভ করেন এবং অমুক অমুক কাজ করিয়া যান; বরং রাসূলুল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনয়নের তাৎপর্য হইতেছে কুরআনের ভাষায় ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٥ (سورة النساء : ٦٥)

"কসম আপনার প্রভুর, তাহারা সেই পর্যন্ত মুসলমান হইতে পারিবে না, যতক্ষণ না তাহাদের মধ্যকার বিবাদ-বিসম্বাদে আপনাকে মধ্যস্থ ও বিচারক বলিয়া মানিয়া লইবে এবং আপনার ফয়সালা কোনরূপে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ব্যতিরেকে শিরোধার্য করিয়া লইবে এবং পূর্ণরূপে আপনার সম্মুখে নতি স্বীকার করিবে।" [সূরা নিসা ঃ ৬৫]

"তফসীর-ই-রূহুল মা'আনী'-এর লেখক এ আয়াতের তাফসীর প্রাথমিক যুগের আলিমগণের প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন এইভাবে ঃ

فقد روى عن الصادق رضى الله عنه قال لو ان قوما عبدوا الله تعالى واقاموا الصلوة واتو الزكواة وصاموا

رمضان و حجوا البيت ثم قالوا لشىء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الاصنع خلاف ما صنع او وجدوا فى انفسهم حرجا لكانوا مشركين ثم تلا هذه الاية -(روح المعانى ص - ٦٥ج-٥)

হযরত জাফর সাদিক (র) হইতে বর্ণিত আছে, যদি কোন সম্প্রদায় আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, রমযানের রোযা রাখে বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জও করে; কিন্তু এমন কোন কাজ যাহা স্বয়ং হুযূর (সা) করিয়াছেন বলিয়া সপ্রমাণিত—সে সম্পর্কে বলে যে, এমন একটি কাজ তিনি কেমন করিয়া করিলেন কিংবা এমনটি করা হইতে তিনি কেন বিরত থাকিলেন না এবং ইহা মানিয়া নিতে তাহার অন্তরে দ্বিধা সৃষ্টি হয়, তবে এ সম্প্রদায় মুশরীক সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য হইবে।" [তাফসীর-ই-রূহুল মা'আনী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৬৫]।

উপরিউক্ত আয়াত এবং তাহার তাফসীরের দ্বারা একথা স্পষ্ট হইয়া গেল যে, রাসূল বা রিসালতের প্রতি ঈমান আনয়ন করার অর্থ হইতেছে তাঁহার সমস্ত বিধি-বিধানকে সজ্ঞানে ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে শিরোধার্য করিয়া লওয়া এবং ইহাতে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ বা ইতস্ততঃ না করা।

ঈমানের তাৎপর্য স্পষ্ট হইয়া যাওয়ার সাথে সাথে কুফর ও ইরতিদাদ যে কী বস্তু, তাহাও সুস্পষ্ট হইয়া গেল। কেননা, যাহা মানিয়া নেওয়া বা স্বীকার করিয়া নেওয়াকে ঈমান বলে, তাহাই না মানা বা অস্বীকার করার নাম কুফর ও ইরতিদাদ। [শারহুল মাকাসিদ কিতাবে এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে]। ঈমান ও কুফরের উক্ত সংজ্ঞা দ্বারা একথাও প্রমাণিত হইয়া গেল যে, আল্লাহ্ ও রাসূলকে আদৌ না মানিলেই কেবল কোন ব্যক্তি কাফির হয় না বরং যাহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ বলিয়া নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত বা সাব্যস্ত হয়, [রাসূলুল্লাহ্‌র হুকুম জানিয়াও] যদি কেহ তাহা মানিতে অস্বীকার করে, তবে শরীয়াতের অন্য দশটি বিধান কড়াকড়িভাবে পালন করিলেও তাহা কুফর বলিয়াই গণ্য হইবে। কারণ কুফর ও ইরতিদাদ হইতেছে 'মালিকুল মুলক ওয়াল মালাকূত' আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। একথা কাহারো অজানা নাই যে, বাদশাহ্‌র সমস্ত আইন-কানুনকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করা যেমন বিদ্রোহ, তেমনি তাহার কোন একটি আইনকে অগ্রাহ্য করা এবং আইন ভঙ্গ করা তেমনি বিদ্রোহ ; যদিও অন্য দশটা আইন কোন ব্যক্তি মানিয়াও চলে।

দুনিয়ার হীনতম কাফির ও কাফির সৃষ্টিকারী ইব্‌লীস শয়তানের কুফ্‌রও এই দ্বিতীয় প্রকারেরই। কেননা, সে না ধর্ম পরিবর্তন করিয়াছিল, না আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, কু'দরত ও রবুবিয়্যত [প্রভুত্ব] অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করিয়াছিল ; বরং আল্লাহ্‌র একটিমাত্র হুকুম অগ্রাহ্য করিয়া সে চিরতরে বিতাড়িত ও অভিশপ্ত হইয়াছিল। হাফিয ইব্‌ন তাইমিয়া তাঁহার সুবিখ্যাত 'আস্‌-সারিমূল মাস্‌লুল' কিতাবের ৩৬৭ পৃষ্ঠায় লিখেন ঃ

كما ان الردة تتجرد عن السب فكذالك تتجرد عن قصد تبديل الدين و ارادة التكذيب بالرسالة كما تجرد كفر ابليس عن قصد التكذيب بالربوبية-

"আল্লাহ্‌ ও রাসূলকে গালি না দিয়াও যেমন একজন লোক মুরতাদ হইতে পারে, তেমনি অন্য ধর্ম গ্রহণ বা রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ইচ্ছা পোষণ না করিয়াও কোন ব্যক্তি মুরতাদ হইয়া যাইতে পারে, যেমন ইব্‌লীসের কুফ্‌র ও ইরতিদাদে আল্লাহ্‌র রবুবিয়াতের অস্বীকৃতির ইচ্ছা অনুপস্থিত ছিলো।"

মোদ্দাকথা, ইরতিদাদ শুধু ধর্মান্তরিত হওয়া বা প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করাকেই বলে না ; বরং ধর্মের অত্যাবশ্যক বস্তুসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন এবং সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত ও সাব্যস্ত হুকুমসমূহের কোন একটির প্রতি জানিয়া-শুনিয়া অস্বীকৃতি জ্ঞাপনও সমানভাবেই কুফ্‌র ও ইরতিদাদ।

লক্ষণীয়

এখানে দুইটি ব্যাপার লক্ষণীয়। প্রথমতঃ কুফর ও ইরতিদাদ কেবল তখনই হয়, যখন শরীয়াতের কোন হুক্‌মে-কেত্‌'য়ী বা নিশ্চিত বিধানের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয় বা উহা অবশ্যকরণীয় বলিয়া বিশ্বাস না থাকে। কিন্তু কেহ যদি উহাকে অবশ্যপালনীয় বলিয়া বিশ্বাস ও স্বীকার করে, কিন্তু আলস্য বা গাফিলতিবশতঃ উহার উপর আমল না করে, তবে উহাকে কুফর ও ইরতিদাদ বলা যাইবে না—যদি সে ব্যক্তি সারা জীবনের মধ্যে একবারও উহার উপর আমল না করে, তবুও তাহাকে মুসলমানই বলা হইবে, কাফির বা মুরতাদ বলা চলিবে না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি উহাকে অবশ্যপালনীয় বলিয়া অন্তরে বিশ্বাসই পোষণ করে না, সে ব্যক্তি সারা জীবন ধরিয়াও যদি উহার উপর আমল করে, তবুও সে ব্যক্তি মুরতাদ বলিয়া গণ্য হইবে। উদাহরণস্বরূপ ধরুন, এক ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পাবন্দীর সহিতই আদায় করে, কিন্তু ফরযজ্ঞানে নহে–সে

ব্যক্তি কাফির হইবে। আবার অপর যে ব্যক্তিটি উহাকে ফরয জানে, কিন্তু কখনও সালাত আদায় করে না, সে ফাসিক ফাজির ও শক্ত গুনাহ্গার বটে ; কিন্তু সে মুসলমানই, কাফির বা মুরতাদ নহে।

দ্বিতীয়তঃ লক্ষণীয় যে, প্রামাণ্যতার ব্যবধানে শরীয়াতের বিধি বিধানও বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এ ব্যাপারে সব বিধানের এক হুকুম নহে। কুফর ও ইরতিদাদ শুধু সেই ধরনের হুকুমকে অগ্রাহ্য করিলেই হইয়া থাকে, যাহা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত قطعى الثبوت এবং যাহা সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন قطعى الدلالة। নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত বলিতে কেবল সেই সব বিধান বা হুকুমকেই বুঝানো হইয়াছে, যাহা কুরআন শরীফ এবং এমন পর্যায়ের হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত, যাহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগ হইতে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে এবং প্রত্যেক স্তরে এত বেশী সংখ্যক লোকের মারফত প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে যে, তাঁহাদের সকলে একটি মিথ্যা ব্যাপারে একমত হইতে পারেন বলিয়া বিশ্বাস করা সুকঠিন। হাদীসের পরিভাষায় এরূপ হাদীসকে মুতাওয়াতির হাদীস বলা হইয়া থাকে।

সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বলিতে বুঝানো হইয়াছে এই যে, কুরআন শরীফের যে আয়াত বা মুতাওয়াতির হাদীসের যে পাঠ (Text)-এর দ্বারা সেই সেই বিধানটি প্রমাণিত, উহার অর্থ এতই সুস্পষ্ট যে, উহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করা বা অর্থ বিকৃত করার কোন অবকাশ নাই।

তারপর আবার এ ধরনের আহকাম বা বিধি-বিধান যদি মুসলমান জাতির প্রত্যেক স্তরের লোকের মধ্যে এতই সুবিদিত ও সুপরিচিত থাকে যে, তাহা জানিবার জন্য তেমন কোন বিশেষ বিদ্যাশিক্ষা বা আয়াস স্বীকারের প্রয়োজন হয় না ; বরং মুসলমানগণের বংশ পরম্পরায়ই উহা জানা থাকে–যেমন সালাত, রোযা, হজ্জ, যাকাত ফরয হওয়া কিংবা চুরি ও মদ্যপান হারাম হওয়া, নবী-করীম (সা)-এর শেষ নবী হওয়া প্রভৃতি। শরীয়াতের এই জাতীয় ব্যাপারসমূহকে বলা হয় জরুরীয়াত-ই-দীন বা ধর্মের অপরিহার্য ব্যাপারসমূহ। এবং যে সব ব্যাপার সেইরূপ মশহুর বা সুবিদিত নহে, সেইগুলিকে জরুরীয়াত বা অপরিহার্য ব্যাপার বলা হয় না।

এই দুই প্রকারের বিধানের মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রথম প্রকার অর্থাৎ জরুরীয়াত-ই-দীন বা ধর্মের অপরিহার্য ব্যাপারসমূহকে কোন ব্যক্তি অবজ্ঞা বা অগ্রাহ্য করিলে সেই ব্যক্তি সর্ববাদীসম্মতরূপে কাফির হইবে—অজ্ঞতার ওযর এখানে চলিবে না বা অন্যরূপ ব্যাখ্যাও চলিবে না।

পক্ষান্তরে, যে সব বিধান সুপ্রমাণিত হয়, কিন্তু ততটা মশহুর বা সুবিদিত নহে, সে সব ব্যাপারে হানাফী মযহাবের মত হইল এই যে, কোন সাধারণ মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ যদি উহা ইনকার করিয়া বসে, তবে প্রথমে তাহাকে তাবলীগ করিয়া একথা বুঝাইতে হইবে যে, ব্যাপারটি দলীল প্রমাণাদির দ্বারা সুপ্রমাণিত এবং উহার অর্থও সুস্পষ্ট–দ্ব্যর্থহীন, সুতরাং এমন একটি ব্যাপারকে ইনকার বা অস্বীকার করা চলে না এবং তারপরও যদি সে ব্যক্তি উহা ইনকার করে ও সেই ইনকারের উপরই অটল থাকে, তবেই কেবল তাহাকে কাফির বলিয়া ফতোয়া দেওয়া চলিবে।

ইমাম ইব্‌ন হুমাম (র) তাঁহার বিখ্যাত 'আল-মুসাহিরাতু ওয়াল মুসামিরা' নামক কিতাবে লিখেন ঃ

و اما ما ثبت قطعا ولم يبلغ حد الضرورة كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلبية باجماع المسلمين فظاهر كلام الحنفية الاكفار بجحده بانهم لم يشترطوا فى الاكفار سوى القطع فى الثبوت (الى قوله) ويجب حمله على ماذا علم المنكر ثبوته قطعا (مسامره ص١٤٩)

"শরীয়তের যে হুকুম সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়, কিন্তু জরুরীয়াত-ই-দীনের পর্যায়ে পড়ে না, যেমন উত্তরাধিকারের ব্যাপারে–যদি কেহ নিজ কন্যা এবং পৌত্রী রাখিয়া যায়, তবে সমস্ত মুসলিম জাতির সর্ববাদীসম্মত মতে পৌত্রীর প্রাপ্য পরিত্যক্ত সম্পদের এক-ষষ্টমাংশ। হানাফীদের এক রায়ে, বাহ্যিক অর্থে এ বিধানটিকে যে অস্বীকার করিবে, তাহাকে কাফির বলা হইবে ; কেননা, ব্যাপারটি সুনিশ্চিত দলীলের দ্বারা সুপ্রমাণিত এবং তাঁহারা [হানাফিগণ] সুনিশ্চিত দলীলের দ্বারা প্রমাণিত বিধানকে অস্বীকার করিলেই কোন ব্যক্তিকে কাফির বলিবার পক্ষপাতী। কিন্তু হানাফিগণের এই মত কেবল যে সেই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যেখানে অস্বীকারকারী ব্যক্তি উহা সুনিশ্চিত দলীলের দ্বারা সুপ্রমাণিত বলিয়া জানে, তাহা অবশ্যই বলিতে হইবে।" [মুসামিরা পৃঃ ১৪৯]

মোদ্দাকথা যেভাবে ধর্মান্তরিত হওয়াকে কুফর ও ইরতিদাদ [মুরতাদ হওয়া] বলে, তেমনি ধর্মের অপরিহার্য ব্যাপারসমূহ ও সুনিশ্চিতভাবে ইসলাম বলিয়া বিধৃত যে কোন ব্যাপার অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করিলে অথবা ইসলামের অপরিহার্য কোন ব্যাপারের সুবিদিত অর্থ গ্রহণের পরিবর্তে মনগড়া ভিন্ন অর্থ করিলে—যদ্দারা

উহার আসল উদ্দেশ্যই পণ্ড হইয়া যায়, উহাও কুফর ও ইরতিদাদভুক্ত। এই দ্বিতীয় প্রকারের ইরতিদাদকে পবিত্র কুরআনের পরিভাষায় বলা হয় 'ইলহাদ'।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يَلْحِدُوْنَ فِيْ اٰيَاتِنَا لاَ يَخْفُوْنَ عَلَيْنَا-

'যাহারা আমার আয়াতসমূহে ইলহাদ করে, তাহারা আমার নিকট হইতে গোপনীয়তা অবলম্বন করিতে পারিবেনা'।

আর হাদীসেই এ জাতীয় ইরতিদাদকে বলা হইয়াছে 'যিন্দিকা'। যেমন 'মাজমাউল-বিহার'-এর সংকলক হযরত 'আলী কার্রামাল্লাহু ওজহাহু বর্ণনা করেন ঃ

اتى على بزنادقة هى جمع زنديق (الى قوله) ثم استعمل فى كل ملحد فى الدين والمراد ههنا قوم ارتدوا عن الاسلام - (مجمع البحار ص٦٩٥)

"হযরত আলী (রা)-এর সমীপে কিছু সংখ্যক যিন্দীককে [গ্রেফতার করিয়া] আনা হইল। যানাদিকা হইতেছে যিন্দীক শব্দের বহুবচন এবং যিন্দীক এমন সব লোককে বলা হয়, যাহারা ধর্মে ইলহাদ বা বিকৃত অর্থ করে। এখানে যানাদিকা বলিতে ইসলামত্যাগী একদল মুরতাদের কথা বুঝানো হইয়াছে।" [মাজমাউল বিহার, পৃঃ ৬৯৫]

কালাম ও ফিকাহ্‌বেত্তাগণ এই বিশেষ ধরনের ইরতিদাদকে বাতিনিয়াত বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। আবার কখনও কখনও তাঁহারাও উহাকে যিন্দিকা বলিয়া অভিহিত করেন।

'শারহে মাকাসিদে' আল্লামা তাফতাযানী (র) কুফরের প্রকরণ বর্ণনা করিয়াছেন এইভাবে ঃ

'একথা সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, যে ব্যক্তি মু'মিন নহে, সে-ই কাফির পদবাচ্য। এখন যদি সে নিজেকে মুসলমান বলিয়া বাহ্যত দাবী করে, তবে এমন ব্যক্তিকে মুনাফিক বলা হইবে। আর যদি মুসলমান হওয়ার পর কুফরীতে লিপ্ত হয়, তবে তাহাকে বলা হইবে মুরতাদ। কেননা, সে ইসলাম হইতে ফিরিয়া গিয়াছে। যদি সে ব্যক্তি একাধিক ইলাহ্ গ্রহণের পক্ষপাতী হয়, তবে তাহাকে মুশরীক বা অংশীবাদী বলা হইবে। যদি ইয়াহূদী ধর্ম, খৃস্টধর্ম প্রভৃতি মানসূখ বা রহিত ধর্ম অবলম্বন করে, তবে তাহাকে বলা হইবে কিতাবী। যদি সে ব্যক্তি মনে করে যে, এই বিশ্ব চরাচর অনাদিকাল হইতে [কোন স্রষ্টা ও নিয়ন্তা ছাড়াই] এমনিতেই চলিয়া আসিয়াছে এবং যুগচক্রেই সব ঘটনাবলী এমনিতে ঘটিয়া চলিয়াছে তবে

তাহাকে বলা হইবে দাহরিয়া। আর যদি সে স্রষ্টার অস্তিত্বই আদৌ স্বীকার না করে, তবে তাহাকে বলা হইবে মু'আত্তিল (معطل) যদি নবী করীর (সা)-এর নুবূওয়াত ও ইসলামের প্রতীকরূপী সওম-সালাতের স্বীকারোক্তির সাথে সাথে এমন কিছু বিশ্বাসও পোষণ করে, যাহা সর্ববাদীসম্মতরূপে কুফর বলিয়া স্বীকৃত, তবে এমন ব্যক্তিকে বলা হইবে যিন্দীক।' (শারহে মাকাসিদ পৃঃ ২৬৮-৬৯ ও কুল্লিয়াতি আবিল বাকা, পৃঃ ৫৫৩-৫৪)

যিন্দীকের সংজ্ঞা বর্ণনাকালে বলা হইয়াছে যে, সে তাহার বাতিল বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করে, উহার অর্থ এই নহে যে, সে মুনাফিকদের মতো তাহার অন্তরের বিশ্বাসকে গোপন রাখে ; বরং উহার অর্থ হইতেছে এই যে, সে তাহার কুফরী আকীদা ও বিশ্বাসসমূহকে ইসলামের ছদ্মাবরণে চাকচিক্যময় করিয়া পেশ করে।

كما ذكره الشامى حيث قال فان الزنديق يموه كفره و يروج عقيدته الفاسدة و يخرجها فى الصورة الصحيح و هذا معنى ابطان الكفر فلا ينافى اظهاره الدعوى - (شامى باب المرتد ص-٤٥٨ ج-٣)

"আল্লামা শামী বলেন, যিন্দীক তাহার কুফরকে চাকচিক্যময় করিয়া তোলে, তাহার বিকৃত বিশ্বাস সাধারণ্যে ছড়াইয়া দিতে ও প্রতিষ্ঠিত করিতে আগ্রহান্বিত থাকে এবং উহাকে নিখুঁতরূপে পেশ করে। যিন্দীকের সংজ্ঞা বর্ণনা করিতে গিয়া বলা হয় যে, সে তাহার কুফর গোপন করে, উহার অর্থ ইহাই যে, সে তাহার কুফরকে এমন নিখুঁতরূপে পেশ করে যে, লোকেরা উহা দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। এ জন্য তাহার কুফর গোপন করা তাহার বক্তব্য প্রকাশের দ্বারা বিঘ্নিত হয় না। অর্থাৎ তাহার বক্তব্য প্রকাশ করা সত্ত্বেও কুফর গোপন করা অব্যাহতই থাকে।" [শামী, মুরতাদ অধ্যায়, পৃঃ ৪৫৮, জিল্‌দ-৩]

কুফরের উপরিউক্ত প্রকারসমূহের মধ্যে শেষোক্ত কুফরই আমাদের আলোচ্য ও প্রতিপাদ্য। এ সম্পর্কে শারহে মাকাসিদ-এর বর্ণনায় সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, যেভাবে পূর্বে বর্ণিত কুফরের অন্যান্য প্রকারসমূহ কুফর, ঠিক তেমনি কুফর এই শেষ প্রকারের কুফরও। আর উহা হইল এই যে, এক ব্যক্তি হুযূরে পাক (সা)-এর রিসালত এবং কুরআন শরীফের বিধি-বিধান (আহকাম) মানিয়া নেওয়া সত্ত্বেও এবং মুখে মুসলমানীর দাবী এবং কার্যত কড়াকড়িভাবে ইসলামের সমুদয়

আহকাম-আরকান মানিয়া চলা সত্ত্বেও কিছু কিছু আহকাম ও আকাইদ-ই-ইসলামের বিরোধিতার জন্য কাফির ও মুরতাদ হইয়া যাইবে।

একটি সন্দেহ ভঞ্জন

একটি কথা সাধারণ্যে মশহুর যে, আহ্লে-কিবলা কোন ব্যক্তিকে কাফির সাব্যস্ত করা জায়েয নাই। ফিকহ্ ও 'আকাইদের কিতাবসমূহেও এইরূপ কথা রহিয়াছে। কোন কোন হাদীসের দ্বারাও এই মাসআলাটি সাবিত আছে। যেমন আবূ দাউদ শরীফে জিহাদ প্রসঙ্গে আছে ঃ

عن انس رضى الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث من اصل الايمان الكف عمن قال لا اله الا الله ولا تكفره بذنب ولا تخرجه من الاسلام بعمل

"হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমান, ঈমানের আসল কথা হইতেছে তিনটি ঃ ১. যে ব্যক্তি কালিমা-ই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর স্বীকারোক্তি করে, তাহাকে হত্যা করিও না। ২. কোন গুনাহের দরুন তাহাকে কাফির বলিও না এবং ৩. কোন মন্দ আমলের জন্য তাহাকে ইসলামের গণ্ডীর বাহিরে ঠেলিয়া দিও না।"

এজন্য প্রতিপাদ্য বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ জাগে যে, যে ব্যক্তি সওম-সালাতের পাবন্দ, সে তো আহ্লে-কিবলাভুক্ত ; তাহা হইলে কোন কোন আকীদায় বিরোধিতা করায় বা দুই চারটি আহকাম অগ্রাহ্য করিলে তাহাকে কেমন করিয়া কাফির বলা হইবে ? এই সন্দেহের বশবর্তী হইয়া অনেক মুসলমানই আজকাল এই দ্বিতীয় পর্যায়ের কাফির অর্থাৎ মুলহিদ ও যিন্দীকদিগকে মুরতাদ ও কাফির মনে করেন না। ইহা এমন একটি মারাত্মক ভুল যে, উহার প্রতিক্রিয়া সরাসরি ইসলামের উপর আসিয়া পড়ে। কেননা, আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি যে, যদি এই দ্বিতীয় পর্যায়ের কুফরকে কুফর বলিয়া মানিয়া নেওয়া না হয়, তবে স্বয়ং ইবলীসও আর কাফির থাকে না। এজন্য বিস্তারিত আলোচনা করিয়া এই সন্দেহ ভঞ্জন করার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। ব্যাপার হইল এই যে, 'শারহে ফিক্হ-ই-আকবর' প্রভৃতি গ্রন্থে ইমাম আযম আবূ হানীফার প্রমুখাৎ এবং শারহে আকাইদের হাশিয়ায় শায়খ আবুল হাসান আশ'আরীর প্রমুখাৎ আহ্লুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের এই অভিমত উদ্ধৃত করা হইয়াছে ঃ

ومن قواعد اهل السنة و الجماعة ان لا يكفر واحد من اهل

القبلة (كذا فى شرح عقائد النسفية ص١٢١) وفى شرح التحرير ص-٣١٨ ج-٣ و سياقها عن أبى حنيفة رحمه الله ولا نكفر أهل القبلة بذنب انتهى فقيده بالذنب فى عبارة الأمام واصله من حديث أبى داؤد كما مر آنفا-

'আহ্‌লুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি হইতেছে এই যে, কোন আহ্‌লে-কিবলা ব্যক্তিকে কাফির বলা যাইবে না। শারহ্-ই-আকাইদ-ই-নাসাফী ও শারহ্-ই-তাহ্‌রীর, পৃঃ ৩১৮, জিল্‌দ-৩ এ আছে যে, এই অভিমতটি ইমাম আবূ হানীফা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কোন গুনাহের দরুন আমরা কোন আহ্‌লে-কিবলা ব্যক্তিকে কাফির বলিব না। এই বাক্যে 'গুনাহের দরুন' শর্তটি রহিয়াছে। যতদূর মনে হয়, একটু আগে বর্ণিত আবূ দাউদ শরীফের উক্ত হাদীস খানার ভিত্তিতেই তিনি একথাটি বলিয়া থাকিবেন।'

উহার বিশুদ্ধ অর্থ হইতেছে এই যে, কোন গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়ার দরুন কোন মুসলমানকে কাফির বলিয়া অভিহিত করিও না, চাই তাহার গুনাহ যতই মারাত্মক হউক না কেন ; তবে শর্ত হইল এই যে সেই গুনাহ্ যেনো কুফর ও শিরক না হয়। কেননা, গুনাহ্ বলিতে এখানে সেই সব গুনাহ্‌কেই বুঝানো হইয়াছে, যাহা কুফরের আওতায় পড়ে না।

كما فى كتاب الايمان لابن تيمية حيث قال ونحن اذا قلنا أهل السنة متفقون على لايكفر بالذنب فانما نريد به المعاصى كالزنا و الشرب انتهى و اوضحه القونوى فى شرح العقيدة الطحاوية

"যেমন হাফিয ইব্‌ন তাইমিয়ার 'কিতাবুল ঈমান' এ আছে—আমরা যখন বলি যে, আহ্‌লুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এ ব্যাপারে একমত যে, কোন ব্যক্তিকে কোন বিশেষ গুনাহের দরুন কাফির বলা যাইবে না, তখন আমরা যাহা বুঝাইয়া থাকি, তাহা হইল কাহাকেও জিনা বা মদ্যপান প্রভৃতি গুনাহের জন্য কাফির বলা যাইবে না। আল্লামা কাওনাভী (র) তাঁহার 'শারহ্-ই-আকীদায়ে তাহাবী' কিতাবে উহা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।"

তাহা না হইলে বাক্য অর্থহীন হইয়া পড়ে এবং 'গুনাহের দরুন' বলার (যাহা 'ফিক্‌হ্-ই-আকবর' ও 'শারহ্-ই-তাহ্‌রীর'-এর উদ্ধৃতি সহকারে উপরে বর্ণিত

হইয়াছে) কোন অর্থই হয় না। আসলে সন্দেহের সূত্রপাত হইয়াছে যে কারণে, তাহা হইল এই যে, কোন কোন আলিম ব্যাপারটি সর্বজনবিদিত থাকায় 'গুনাহের দরুন' অংশটি তাঁহাদের রচনায় বাক্যসংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে ছাড়িয়া দিয়াছেন, ফলে শেষ পর্যন্ত উহা হইয়া দাঁড়াইয়াছে 'আহলে-কিবলাকে কাফির বলা চলে না।' হাদীস ও ফিকহ্ সম্পর্কে অজ্ঞ ও শরীয়তের স্পিরিট সম্পর্কে বে-খবর লোকেরা ইহাতে ধরিয়া লইয়াছে যে, 'যে কেহ কিবলার দিকে মুখ করিয়া সালাত আদায় করিবে, তাহাকে আর কাফির বলা চলিবে না, চাই সে যত কুফরী আকীদা ও বিশ্বাসই পোষণ করুক এবং যত কুফরী কালামই উচ্চারণ করিয়া থাকুক না কেন।' এই অর্থকে ঠিক বলিয়া ধরিয়া নিলে দুনিয়াতে আর কাফির বলিয়া কেহ থাকিতে পারে না। কেননা, কখনও কখনও প্রত্যেকেই কিবলামুখী হইয়া থাকেই—চাই সালাত আদায় করুক বা না করুক। আর একথা বলাই বাহুল্য যে, আহলে-কিবলা বলিতে সর্বক্ষণ কিবলামুখী হইয়া থাকা লোককে বুঝানো হইতে পারে না। সুতরাং মাঝে মধ্যে কিবলামুখী হইলেই সাধারণভাবে আহলে-কিবলা বলা যাইতে পারে। এখানে ভালমতে বুঝিয়া লউন যে, 'আহলে-কিবলা একটি শার'য়ী পরিভাষা। উহার অর্থ আহলে-ইসলাম বা ইসলামপন্থী। এবং আহ্ল-ই-ইসলাম কিবলা সেই লোকই হইতে পারে, যে ইসলামের সকল অপরিহার্য অঙ্গকেই কায়মনোবাক্যে শিরোধার্য করিয়া লয় এবং রাসূলুল্লাহ্র আনীত বলিয়া প্রমাণিত সকল ব্যাপারেই ঈমান রাখে। ইহার অর্থ কখনও কিবলার দিকে মুখ করা ব্যক্তি হইতে পারে না। যেমন দুনিয়ার কোর্ট-কাছারীতে কর্মচারী বলিতে সেইসব লোককেই বুঝানো হইয়া থাকে, যাহারা যথারীতি চাকুরীজীবী এবং যাহারা চাকুরীর নিয়ম কানুন মানিয়া চলেন। উহার অভিধানিক অর্থানুসারে 'যে কোন কাজ করিলেই' কর্মচারী বলা হয় না। এই বক্তব্য ফিকহ্ ও আকাইদের প্রায় সমস্ত কিতাবেই লিপিবদ্ধ আছে। অল্প কয়েকটি উদ্ধৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

হযরত মোল্লা আলী কারী (র) 'শারহে ফিক্হ-ই-আকবরে' লিখেন ঃ

اعلم ان المراد باهل القبلة الذين اتفقوا على ما هو من ضروريات الدين كحدوث العالم و حشر الأجساد وعلم الله تعالى بالكليات و الجزئيات وما اشبه ذالك من المسائل المهمات فمن واظب طول عمره على الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم العالم و نفي الحشر او نفي علمه سبحانه و

تعالى بالجزئيات لا يكون من أهل القبلة و ان المراد بعدم تكفير احد من أهل القبلة عند أهل السنة انه لايكفر احد مالم يوجد شيء من امارة الكفر و علاماته و لم يصدر عنه شئي من موجباته

"জানিয়া রাখ, আহলে-কিব্‌লা বলিতে সেইসব লোককেই বুঝানো হইয়া থাকে, যাহারা পৃথিবীতে নশ্বরতা, পরকালে সশরীরে পুনরুত্থান এবং সর্ববিষয়ে (কুল্লিয়াত ও জুযিয়াত) আল্লাহ্‌র সম্যক জ্ঞান ও দীনের ইত্যাকার মৌলিক ব্যাপারসমূহ একবাক্যে বিশ্বাস করে। তাই যে ব্যক্তি ইবাদত বন্দেগী ও শারীয়াতের আনুগত্যের মধ্য দিয়া দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করিয়াছে, অথচ বিশ্বাস পোষণ করিয়াছে যে, এই পৃথিবী অবিনশ্বর, পরকালে সশরীরে পুনরুত্থান হইবে না এবং সর্বব্যাপারে আল্লাহ্‌র সম্যক জ্ঞান নাই—এমন ব্যক্তি 'আহলে-কিবলা' পদবাচ্য নহে। অতএব, 'আহলে-কিবলা' কোন ব্যক্তিকে কাফির বলা যাইবে না বলিতে আহ্‌লুস্‌ সুন্নাত ওয়াল জামা'আত যাহা বুঝাইয়া থাকেন, তাহা হইল, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার মধ্যে কুফরের কোন আলামত বা লক্ষণ পাওয়া না যাইবে বা তাহার দ্বারা কোন কুফরী কার্যকলাপ সংঘটিত না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এমন ব্যক্তিকে কাফির বলা চলিবে না।"

'শারহ-ই-মাকাসিদ', সপ্তম অধ্যায়ে উপরিউক্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার পর লিখেন ঃ

فلا نزاع فى كفر أهل القبلة المواظب طول العمر على الطاعات باعتقاد قدم العالم و نفى الحشر ونفى العلم بالجزئيات ونحو ذالك وكذالك بصدور شيء من موجبات الكفر عنه-

"আহলে-কিবলার মধ্যকার যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, পৃথিবী অবিনশ্বর, পরকালে সশরীরে পুনরুত্থান হইবে না, আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্ব ব্যাপারেই সম্যক অবগত নহেন—ইত্যাদি, কিংবা যদি তাহার দ্বারা কোন কুফরী কার্যকলাপ সংঘটিত হয়, তবে এমন ব্যক্তি সারা জীবন ইবাদত বন্দেগী ও শরীয়াতের মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিলেও তাহার কাফির হওয়া সম্পর্কে কাহারো দ্বিমত নাই।"

আল্লামা শামী 'রাদ্দুল মুহতার', বাবুল ইমামত, জিলদে আউয়াল 'তাহরীরুল উসূলের' বরাত দিয়া লিখেন ঃ

لا خلاف فى كفر المخالف من أهل القبلة المواظب طول عمره على الطاعات كما فى شرح تحرير - ص-٣٧٧ ج -١

–'আহ্‌লে-কিবলার মধ্যকার কোন ব্যক্তি জরুরীয়াত-ই-দীন বা দীনের মৌলিক ব্যাপারের যে কোন বিষয়কে অগ্রাহ্য বা ইনকার করিলে সারা জীবন ইবাদত বন্দেগী ও শরীয়াতের আনুগত্যের মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিলেও যে সে ব্যক্তি কাফির-এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নাই।" [শারহ-ই-তাহরীর, জিল্‌দে আউয়াল পৃঃ ৩৭৭]।

শারহ-ই-আকাইদে নসফীর শরহ-ই-নিবরাস-এর ৫৭২ পৃষ্ঠায় আছে ঃ

أهل القبلة فى إصطلاح المتكلمين من يصدق بضروريات الدين الى قوله لم يكن من أهل القبلة ولو كان مجاهدا بالطاعات وكذالك من باشر شيئا من إمارات التكذيب كسجود الصنم والاهانة بامر شرعى والاستهزاء عليه فليس من أهل القبلة ومعنى عدم تكفير أهل القبلة ان لايكفر بارتكاب المعاصى ولا بانكار الأمور الخفية غير المشهوره هذا ما حققه المحققون-

"কালামবেত্তাগণের পরিভাষায় আহলে-কিবলা বলিতে সেই লোককেই বুঝানো হইয়া থাকে, যে জরুরীয়াত-ই-দীন বা দীনের মৌলিক ব্যাপারসমূহকে সত্য বলিয়া জানে। ...কোন ব্যক্তি যদি ইবাদত বন্দেগীতে নিমগ্নও থাকে আর জরুরীয়াত-ই-দীনের কোন একটি ব্যাপারকেও অগ্রাহ্য করে, তবে সে আহলে-কিবলা বলিয়া গণ্য হইবে না। অনুরূপভাবে যাহার মধ্যে কুফরের কোন আলামত বা লক্ষণ পাওয়া যায় কিংবা কুফরী কোন কার্য তাহার দ্বারা সংঘটিত হয়—যেমন সে মূর্তি পূজা করিল বা শরীয়াতের কোন বিধানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিল অথবা উহা লইয়া উপহাস করিল, এমন ব্যক্তি 'আহলে-কিবলা'র অন্তর্ভুক্ত নহে। 'আহলে-কিবলাকে কাফির বলা চলিবে না'–বলিতে যাহা বুঝানো হইয়াছে, তাহা হইল কোন গুনাহের জন্য বা শরীয়াতের এমন সব ক্ষুদ্র ব্যাপার, যাহা সর্বজনবিদিত নহে, অজ্ঞতাবশত তাহা অগ্রাহ্য করিলে কোন ব্যক্তি কাফির হইবে না।"

সাবধানবাণী

কোন মুসলমানকে কাফির বলা না বলার বাপারে আজকাল অত্যধিক বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হইতেছে। এক শ্রেণীর লোক সামান্য কারণেই মুসলমানদের কাফির বলিয়া আখ্যায়িত করে, যেনো এই কুফরী ফাতোয়া দেওয়াই তাহাদের পেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহারা শরীয়াতের খেলাফ একটু দেখিলেই কাহাকেও ইসলাম হইতে খারিজ করিয়া দেয় ! অপরদিকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একদল বল্গাহীন লোক রহিয়াছে, যাহাদের মতে ইসলামী আকীদা ও বিশ্বাসের ঘোর বিরোধিতা করিলেও কোন ব্যক্তি কাফির হয় না। তাহারা এমন সব ব্যক্তিকেই মুসলমান বলিয়া মানিয়া লওয়া ফরয জ্ঞান করে, যাহারা নিজেদেরকে মুসলমান বলিয়া দাবী করে—চাই সে ব্যক্তির আকীদা বিশ্বাস ও আচার-আচরণ ইসলামের ঘোর বিরোধীই হউক না কেন বা সে ব্যক্তি জরুরীয়াত-ই-দীন বা ইসলামের মৌলিক ব্যাপারসমূহকে অগ্রাহ্য করিয়া বসুক না কেন ! একজন মুসলমানকে কাফির বলা যেমন বিপজ্জনক, তেমনি একজন কাফিরকে মুসলমান বলাও কম বিপজ্জনক নহে। কেননা এতদুভয় অবস্থায়ই ইসলাম ও কুফরের গণ্ডী লঙ্ঘিত হয়। এ জন্যই ধর্মবিদ উলামা-ই-কিরাম এ ব্যাপারে সর্বদাই কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথমোক্ত ব্যাপার অর্থাৎ কোন মুসলমানকে কাফির বলার ব্যাপারে তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি কোন শরীয়াত বিরাধী উক্তি করে এবং সেই উক্তিটির বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে, তবে সকল অর্থেই সেই উক্তিটি কুফরী হইলেও কোন এক দূরতম অর্থেও যদি উহার একটি ইসলাম-সম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া চলে এবং সে ব্যক্তি নিজে এই ব্যাখ্যাটির বিরোধিতা না করে, তবে এই দূরতম অর্থটিকেই গ্রহণ করিয়া মুফ্‌তীর জন্য তাহাকে মুসলমান বলিয়া ফাতোয়া দেওয়া ওয়াযীব। অনুরূপভাবে কোন মুসলমান যদি এমন কোন বিশ্বাস পোষণ করে বলিয়া প্রকাশ পায় যাহা কুফরী বলিয়া অধিকাংশ 'উলামা-ই-কিরাম ফাতোয়া দিয়েছেন, কিন্তু কোন কোন ইমাম উহা কুফরী নহে বলিয়াও মত প্রকাশ করিয়াছেন, তবে সেই বিতর্কমূলক বিশ্বাসের জন্যও কোন মুসলমানকে কাফির বলা জায়েয নহে। [বাহ্‌রুর রাইক, বাবুল মুরতাদ, ৫ম জিল্‌দ, রাদ্দুল মুহ্‌তার, জামি'উল ফুসুলায়ন--কালিমাতুল কুফর অধ্যায় দ্রষ্টব্য।]

অপরদিকে যে ব্যক্তি প্রকৃতই ইসলামচ্যুত মুরতাদ বা কাফির হইয়া গিয়াছে, তাহাকে স্পষ্টভাবে কাফির বলিয়া অভিহিত করিতে দ্বিধাবোধ করা এ ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করাও যে ইসলামের মূলনীতিকেই পঙ্গু করিয়া দেওয়া বৈ নহে, তাহাও সাহাবা-ই-কিরামের কার্য পদ্ধতি দ্বারা সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। রাসূল-ই-করীম

(সা)-এর ইন্তিকালের পর যাহারা মুরতাদ হইয়াছিল, তাহাদের ইরতিদাদও এই দ্বিতীয় প্রকারেরই ইরতিদাদ ছিলো, প্রকাশ্যে ধর্মান্তর গ্রহণ ছিলো না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করা এতই প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিলেন যে, সময়টা কত সঙ্কটপূর্ণ এবং মুসলমানরা যে তখন কত দুর্বল, সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র করিলেন না। অনুরূপভাবে নবুওয়াতের দাবীদার মুসায়লামা কায্যাব এবং তাহার অনুসারীদের বিরুদ্ধে তিনি জিহাদ পরিচালনা করেন এবং জমহুর সাহাবা-ই-কিরাম ইহাতে অংশগ্রহণও করেন, যাহা দ্বারা এ ব্যাপারে তাঁহাদের ইজ্‌মা ও ঐক্যমতও সাধিত হইয়া গেল যে, যে ব্যক্তি খতমে নুবুওয়াত বা নবী-ই-করীমের শেষ নবী হওয়ার ব্যাপারটি অস্বীকার করে বা নিজেই নুবুওয়াতের দাবী করিয়া বসে, সে কাফির—যদিও বা সে ব্যক্তি সাওম সালাত প্রভৃতি আরকান-ই-ইসলামের পূর্ণ পাবন্দ এবং জাহিদ ও আবিদ তথা সূফী-দরবেশও হইয়া থাকে।

সুতরাং কাহাকেও কাফির সাব্যস্ত করার জন্য শরীয়াতের মূলনীতি নির্ধারিত হইয়াছে এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কাহারও উক্তিকে ইসলাম সম্মত সাব্যস্ত করার অবকাশ থাকে এবং সে নিজে উহার বিপরীত অর্থ প্রকাশ না করে, অথবা তাহার 'আকীদা কুফরী' আকীদা হওয়া সম্পর্কে মুজতাহিদীন উলামার মধ্যে সামান্যতম দ্বিমতও থাকে, তবে সে ব্যক্তিকে কাফির বলা চলিবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি জরুরীয়াত-ই-দীনের কোন একটি ব্যাপারও অগ্রাহ্য করে, কিংবা উহার এমন বিকৃত অর্থ প্রকাশ করে, যাহা তাহার সর্ববাদীসম্মত অর্থের বিপরীত, তাহাকে কাফির বলিয়া আখ্যায়িত করিতে একটুও দ্বিধাবোধ করা উচিত নহে।

জরুরী সতর্কবাণী

আলোচ্য বিষয়ে এই কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, এই মাস্‌আলাটি অত্যন্ত জটিল। এ ব্যাপারে বেপরোয়ায়ী করা বা তড়িঘড়ি করিয়া মন্তব্য করিয়া বসা অত্যন্ত বিপজ্জনক। মাস'আলার দুইটি দিকই অত্যন্ত সতর্কতার দাবী রাখে। কেননা, যেভাবে একজন মুসলমানকে কাফির বলা একটি মহাসঙ্কট স্বরূপ এবং হাদীসের বর্ণনানুযায়ী এইরূপ উক্তিকারীর নিজেরই কাফির হইয়া যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা রহিয়াছে, তেমনি কোন কাফিরকে মুসলমান বলা বা মনে করাও তাহার চাইতে কম বিপজ্জনক নহে। যেমন 'শিফা'র উদ্ধৃতিতে উক্ত হইয়াছে—এই মাস'আলাটির জটিলতা 'শিফা' বর্ণনা করিয়াছেন এইভাবে ঃ

ولمثل هذا ذهب ابو المعالى فى اجوبته ابى محمد عبد الحق وكان سأله عن المسئلة فاعتذر له بان الغلط فيه يصعب

لان ادخال كافر فى الملة الاسلامية او اخراج مسلم عظيم فى الدين (شرح شفاء فصل تحقيق القول فى اكفار المتأولين ص-٥٠٠ ج-٢)

"আবুল মা'আলী আবদুল হকের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়া এই মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। আবদুল হক তাঁহাকে এই প্রশ্ন করিলে তিনি এই বলিয়া জবাব দানে নিজের অপারগতা প্রকাশ করেন যে, এই ব্যাপারে ভুল-ভ্রান্তি অত্যন্ত বিপজ্জনক। কেননা কোন কাফিরকে মুসলমান শ্রেণীভুক্ত বলিয়া আখ্যায়িত করা বা কোন মুসলমানকে কাফির বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া মুসলিম সমাজ বহির্ভূত করা ধর্মের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার।" [শারহে শিফা, পৃঃ ৫০০, জিল্দ-২]

এ জন্যই একদিকে তো এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে যে, যখন কোন ব্যক্তির একটি বিভিন্ন অর্থবোধক উক্তি সম্মুখে আসে, যাহার সবকয়টি অর্থেই কুফরী আকীদা বিশ্বাস প্রকাশ পায় ; কিন্তু কেবল একটি অর্থ উহার এমনও আছে, যাহা শরীয়াত-সম্মত—শরীয়াতের বিরোধী নহে, তবে সেই অর্থটি দুর্বল হইলেও মুফতী ও কাযীর উপর ফরয হইল, তাহার সেই উক্তিটিকে শুদ্ধ অর্থে গ্রহণ করিয়া তাহাকে মুসলমান বলিয়া ফাতোয়া দেওয়া [যেমন শিফা, বাহ্‌র ও জামিউল ফুসূলায়ন কিতাবে আছে], অপরদিকে যাহার কাফির হওয়া সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়া যায়, তাহাকে কাফির বলিয়া অভিহিত করিতে বিলম্ব করা বা তাহার অনুসারীদিগকে কাফির বলিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করাও উচিত নহে—যাহা ধর্মবিদ আলিমগণের উপরোক্ত উক্তিসমূহের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

মাস'আলার উপসংহার—ইমদাদুল ফাতোয়া হইতে

উপরিউক্ত বর্ণনা ও ফাতোয়া কেবল সেই ব্যক্তি ও জামা'আতের উপরই প্রযোজ্য, যাহার বা যাহাদের উক্তরূপ উক্তি বা বিশ্বাসের কথা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়। কিন্তু যদি এই ব্যাপারে সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তি এইরূপ কথা বলিয়াছে কি না বা এইরূপ আকীদা ও বিশ্বাস সত্য সত্যই পোষণ করে কি না, তখন তাহার ব্যাপারে ইমদাদুল ফাতোয়ার নির্দেশিত পন্থা গ্রহণই নিরাপদ। মাস্'আলাটির উপসংহাররূপে নিম্নে তাহা হুবহু উদ্ধৃত করা হইল ঃ

"যদি কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ জামা'আতের কাফির হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ উপস্থিত হয়, চাই সে সন্দেহের কারণ উলামা-ই-কিরামের মতানৈক্যই হউক, চাই উহা যে কারণসমূহের জন্য তাহাকে কাফির বলা হইবে, সেই

কারণসমূহের বৈপরীত্যই হউক, চাই তাহা নীতিগত জটিলতাই হউক—এসব অবস্থায় নিরাপদ ব্যবস্থা হইল এই যে, এমন ব্যক্তিকে কাফির বা মুসলমান কোনটাই বলা হইবে না। কেননা, এমতাবস্থায় যদি সে লোকটিকে কাফির বলা হয়, তবে তাহার ব্যাপারে উহা অসতর্কতা বা বাড়াবাড়ি হইয়া যাইতে পারে। আবার যদি মুসলমান বলা হয়, তবে তাহা অপর দশজন মুসলমানের জন্য ক্ষতিকর বিধায় অন্যরূপ বাড়াবাড়ি হইয়া যাইবে। সুতরাং উভয়দিক হইতেই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ না তাহার সহিত বিবাহ-শাদীর অনুমতি দেওয়া হইবে, না তাহার পশ্চাতে সালাত আদায় করা হইবে, না তাহার যবেহ্ করা পশুর গোশ্‌ত খাইবে আর না তাহাকে কাফির সাব্যস্ত করিয়া তাহার সহিত কাফিরসুলভ আচরণ করিবে। সামর্থ্য থাকিলে তাহার প্রকৃত অবস্থা যাচাই করিবে এবং যাচাইয়ের পর সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করিবে আর নচেৎ তাহার ব্যাপারে পূর্ণ মৌনতা অবলম্বন করিয়া তাহার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র উপর ছাড়িয়া দিবে। তাহার হুকুম হইবে আহল-ই-কিতাব সম্প্রদায়ের সন্দেহজনক রিওয়ায়েত সমূহের হুকুমের অনুরূপ। তাহাদের সম্পর্কে হাদীসে আছে ঃ

لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبواهم وقولوا امنا بالله وما انزل الينا الاية (رواه البخارى)

"আহল-ই-কিতাবদিগকে তোমরা সত্যবাদীও জ্ঞান করিও না, আবার মিথ্যাবাদীও প্রতিপন্ন করিও না ; বরং এক্ষেত্রে তোমরা বলিও ঃ আমরা ঈমান আনয়ন করিয়াছি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আমাদের প্রতি যাহা নাযিল করা হইয়াছে, উহার প্রতি।" [বুখারী]

অনুবাদ ঃ আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী

একত্ববাদ ও খ্রীস্টধর্ম*

মুহাম্মদ আতাউর রহিম

ঐতিহাসিক গবেষণা প্রমাণ করেছে, পৃথিবীর প্রাচীন জাতিসমূহের সর্বপ্রাণবাদ (animism) ও পৌত্তলিকতা সব ক্ষেত্রেই ছিল আদিম প্রকৃতিবাদী বিশ্বাস থেকে বিচ্যুতির ফল এবং ইয়াহূদীধর্ম, খ্রীস্টধর্ম ও ইসলামের প্রচারিত একত্ববাদ ছিলো বহু ঈশ্বরবাদের বিপরীত ধারার বিশ্বাস—বিবর্তিত রূপ হিসেবে নয়। স্বাভাবিকভাবে যে কোন ধর্মীয় ইতিহাসের প্রথম স্তরে দেখতে পাওয়া যায় তার নির্ভেজাল শিক্ষা, পরবর্তীকালে যার মধ্যে আসে বিকৃতি। খ্রীস্টধর্মের ইতিহাসও এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা উচিত। এক আল্লাহ্‌য় বিশ্বাস নিয়েই এর যাত্রা শুরু হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে এর মধ্যে বিকৃতি আসে, যার ফলে ত্রিত্ববাদের নীতি স্বীকার করে নেয়া হয়। এর পরিণতিতে এমন এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, যা ক্রমাগত এর অনুসারীদের সুস্থ চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

হযরত ঈসা (আ)-এর অন্তর্ধানের পর খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে যারা তাঁর ধর্ম অনুসরণ করত, তারা আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাসী ছিলো। আনুমানিক ৯০ খ্রীস্টাব্দে গ্রন্থবদ্ধ 'শের্ফাড অব হারামস্' [Shepherd of Harams]-কে চার্চ কর্তৃক অবতীর্ণ গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি দান থেকে এ সত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে উল্লেখিত 'টুয়েল্‌ভ কম্যান্ডমেন্ট' এর প্রথমটির শুরু এভাবে ঃ সর্বপ্রথম, বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ্‌ এক এবং তিনি সব কিছু সৃষ্টি ও সংগঠিত করেন, অনস্তিত্বে থেকে সমস্ত বস্তুকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন এবং তিনি সমস্ত বস্তুর সীমারেখা নির্ধারণ করে দেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং অসীম।

থিয়োডর যোহন এর মতে ২৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত খ্রীস্টানদের কালিমা বা মূল বিশ্বাস ছিলো ঃ 'আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ [গড্‌ দি অলমাইটি] বিশ্বাস করি।' ১৮০ থেকে ২১০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে 'সর্বশক্তিমান' বা 'অলমাইটি' শব্দের সংগে 'ফাদার' শব্দটি জুড়ে দেয়া হয়। চার্চের বহুসংখ্যক নেতা এ প্রচেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ করেন। বিশপ ভিক্টর ও বিশপ জেফিজিয়াস এই প্রচেষ্টার নিন্দা করেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়; কারণ ধর্মগ্রন্থে কোন কোন শব্দ যোগ-বিয়োগ করা তাঁরা অকল্পনীয় পাপ বলে গণ্য করতেন। তাঁরা হযরত ঈসা (আ)-কে 'ঈশ্বর'রূপে

---

* [প্রবন্ধটি ইফা পত্রিকা ১৯৮৪ সন ২৪ বর্ষ ২য় সংখ্যা থেকে সংগৃহীত]

কল্পনা করার প্রবণতারও বিরোধিতা করেন। তাঁরা হযরত ঈসা (আ)-এর আসল শিক্ষায় যেমনটি প্রকাশ পেয়েছে, তার আলোকে আল্লাহ্‌র একত্বে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে, যদিও ঈসা (আ) নবী ছিলেন, তিনি অন্যান্য মানুষদের মতই মানুষ ছিলেন; তবে তিনি আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেন। উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ায় গড়ে উঠা চার্চসমূহেও অনুরূপ বিশ্বাস প্রচলিত ছিলো।

হযরত ঈসা (আ)-এর শিক্ষা প্রসার লাভ করতে থাকলে এই শিক্ষা একদিকে যেমন অন্যান্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসতে থাকে, তেমনি শাসন কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সংগে সংঘাতের সম্মুখীন হতে থাকে। এই সব সংস্কৃতি যেমন এই শিক্ষাকে গ্রহণ ও স্বীকরণ করে নিতে লাগলো, তেমনি শাসকদের পীড়ন লঘু করার তাকীদে এই শিক্ষার মধ্যে পরিবর্তন সাধন শুরু হলো। বিশেষতঃ গ্রীসে প্রথমবারের মত একটি নতুন ভাষায় ভাষান্তরিত হওয়া এবং এ সংস্কৃতির ভাবধারা ও দর্শনের আলোকে পুনর্বিন্যাসের ফলে এর আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হলো। প্রধানতঃ গ্রীকদের বহু ঈশ্বরবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সংগে টারসাস [Tarsas] এর পল প্রমুখ কিছু সংখ্যক ব্যক্তির ক্রমাগত চেষ্টার মাধ্যমে ঈসা (আ)-কে একজন নবী থেকে 'খোদা'র আসনে উন্নীত করার ব্যাপার সংযুক্ত হবার ফলশ্রুতিতেই ত্রিত্ববাদ-এর ধারণা জন্মলাভ করলো।

সর্বপ্রথম ৩২৫ খ্রীস্টাব্দেই ত্রিত্ববাদ গোঁড়া খ্রীস্টান ধর্মীয় বিশ্বাস বলে ঘোষিত হয়। তবে তখনো যাঁরা এই ধর্ম গ্রহণ করতেন, তাঁদের কেউ কেউ ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করতেন না; কারণ ধর্মগ্রন্থে এর সমর্থনে দলীল পাওয়া যেত না। এ্যাথানাসিয়াস [Athanasius], যাঁকে এই মতবাদের জনক বলে মনে করা হয়, তিনি নিজেও এর সত্যতা সম্বন্ধে খুব নিঃসন্দেহ ছিলেন না। তিনি স্বীকার করেন যে, 'যখনই তিনি তাঁর বিচারশক্তিকে জোর করে ঈসার ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে ধ্যানে নিয়োগ করতেন, তাঁর শ্রম ও আয়াসসাধ্য প্রচেষ্টা যেন কুঁকড়ে আসতে চাইত; তিনি যত অধিক লিখতেন, তিনি তাঁর ভাব প্রকাশে ততই যেন অপরাগ হয়ে পড়তেন।' এক পর্যায়ে তিনি এমনও লিখেন, 'আল্লাহ্ তিন জন নন, এক জন।' ত্রিত্ববাদের মতবাদের প্রতি তাঁর আনুগত্যের ভিত্তিমূলে তাঁর বিশ্বাস নয়, তাঁর কর্মকৌশল ও আপাত প্রয়োজন ক্রিয়াশীল ছিলো।

এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের ভিত্তি যে ছিলো রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ও দর্শনের ভ্রান্ত যুক্তি-প্রদর্শন, তা বুঝা যায় নিসিয়া [Nicea] পরিষদে সভাপতিত্বকারী রোমের প্যাগান সম্রাট কনস্ট্যান্টাইনের ভূমিকা থেকে। তখনকার দিনে সম্প্রসারণশীল খ্রীস্টান সম্প্রদায়সমূহ এমন এক শক্তিতে পরিণত হয়েছিলো, যা

সম্রাটের সাম্রাজ্যকে যথেষ্ট দুর্বল করে তুলেছিলো। এই শক্তির বিরোধিতা করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। এই শক্তির সমর্থন সাম্রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধির জন্য মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়েছিলো। খ্রীস্টধর্মের রূপান্তর ঘটিয়ে তিনি চার্চের সমর্থন লাভ এবং চার্চের অভ্যন্তরের মতানৈক্যের অবসান ঘটানোর আশা করেছিলেন। এসব মতানৈক্যও ছিলো তাঁর রাজ্যের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অন্যতম উৎস।

তিনি যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জনে আংশিক সাফল্য লাভ করেন, তার দৃষ্টান্ত দেয়া যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে সংঘটিত একটি ঘটনা থেকে। একবার মুসলমানদের ঈদ উৎসব যতই নিকটবর্তী হচ্ছিলো, সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিতব্য একটি ঈদ অনুষ্ঠান সম্বন্ধে টোকিয়ো থেকে প্রচারণা ততই তুঙ্গে উঠেছিলো। সিঙ্গাপুর তখন জাপানের দখলে। প্রচার করা হচ্ছিলো, এটা হবে এমন একটা ঐতিহাসিক ঘটনা, যার প্রভাব সমগ্র মুসলিম বিশ্বে অনুভূত হবে। কয়েকদিন পর অভাবিতপূর্ব গুরুত্বপ্রাপ্ত এই ঈদ অনুষ্ঠানের প্রচারণা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল। এর রহস্য উদ্‌ঘাটিত হলো যখন এক খণ্ডযুদ্ধে ধৃত একজন জাপানী কয়েদী জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হলো। সে জানালো, জাপানী সরকার-প্রধান তোজো আধুনিককালের শ্রেষ্ঠতম মুসলিম সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণের পরিকল্পনা করেছিলেন। আধুনিককালের প্রয়োজনের সংগে ইসলামের শিক্ষার একটা সামঞ্জস্য বিধানের পরিকল্পনা তাঁর ছিলো। তাঁর মতে এর ফলে একটা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যে, মুসলমানরা এর পর মক্কা শরীফের পরিবর্তে টোকিয়োর দিকে মুখ করে সালাত আদায় শুরু করে, কারণ তোজোর শাসনাধীনে টোকিয়োই হবে ইসলামের ভবিষ্যত কেন্দ্র। মুসলমানরা ইসলামী অনুশাসনের এই পরিবর্তন মেনে নিতে রাজী হলো না, যার ফলে গোটা প্রকল্পই পরিত্যক্ত হলো। এর পরিণামে সে বছর সিঙ্গাপুরে কোন ঈদ জামা'আতেরই অনুমতি দেয়া হলো না। তোজো ইসলামের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তার সাম্রাজ্যবাদী অভিলিপ্সা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেই ইসলামকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। তোজো যেখানে ব্যর্থ হন, সেখানে কনস্ট্যান্টাইন সাফল্য লাভ করেন। পলীয় খ্রীস্টধর্মের কেন্দ্র হিসেবে জেরুজালেমের স্থান দখল করলো রোম।

খ্রীস্টধর্মে বহু-ঈশ্বরবাদের স্বীকৃতি লাভের ফলে হযরত ঈসার (আ) বিশুদ্ধ শিক্ষার মধ্যে যে বিকৃতি অনুপ্রবেশ করলো, তা কোন দিনই বিনা চ্যালেঞ্জে গৃহীত হয় নাই। ৩২৫ খ্রীস্টাব্দে যখন ত্রিত্ববাদের ধারণাকে গোঁড়া খ্রীস্টান তত্ত্ব বলে সরকারীভাবে প্রস্তাবিত হল, উত্তর আফ্রিকার খ্রীস্টানদের অন্যতম নেতা অরিয়াস [Arius] কনস্ট্যান্টাইন ও ক্যাথলিক চার্চের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে

রুখে দাঁড়ালেন এবং তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, যীশু [হযরত ঈসা (আ)] সব সময়ই আল্লাহ্‌র একত্বের পক্ষে কথা বলেছেন। কনস্ট্যান্টাইন প্রতিবাদমুখর একত্ববাদীদের নির্মূল করে দেয়ার লক্ষ্যে তাঁর সাধ্যের মধ্যে সর্বপ্রকার বল প্রয়োগ ও নৃশংসতার পথ অবলম্বন করেও লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হন। যদিও পরিহাসের ব্যাপার এই যে, কনস্ট্যান্টাইন নিজে মৃত্যুবরণ করেন একজন একত্ববাদী হিসেবে, তবুও অতঃপর ইউরোপে খ্রীস্টধর্মের ভিত্তি হিসেবে ত্রিত্ববাদই সরকারীভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। এই তত্ত্ব লোকদের মধ্যে নানারূপ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে লাগলো এবং তাদের অনেককেই বুঝবার চেষ্টা না করে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলা হলো। এসব সত্ত্বেও বুদ্ধিবৃত্তির মাপকাঠিতে বিচার-বিশ্লেষণ থেকে জনগণকে নিবৃত্ত করা সম্ভবপর ছিলো না। মোটামুটিভাবে তিন ধারায় চিন্তা-প্রবাহ অগ্রসর হলো। প্রথমটি চতুর্থ শতাব্দীর সেন্ট অগাস্টাইনের সংগে সম্পৃক্ত। তাঁর অভিমত ছিলো এই যে, তত্ত্বটি প্রমাণ করা যায় না, তবে দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝানো যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর সেন্ট ভিক্‌টর দ্বিতীয় চিন্তা-গোষ্ঠির সংগে জড়িত। তাঁর বিশ্বাস, তত্ত্বটি বাস্তবক্ষেত্রে প্রমাণ করা যায় এবং উদাহরণ দিয়েও বুঝানো যায়। চতুর্দশ শতাব্দীতে জন্মলাভ করলো তৃতীয় চিন্তা-গোষ্ঠি। এদের ধারণা, ত্রিত্ববাদের মতবাদ উদাহরণ দিয়ে যেমন বুঝানো যায় না, তেমনি একে প্রমাণও করা যায় না। তবুও অন্ধভাবে এটাকে মেনে নিয়ে এতে বিশ্বাস স্থাপন করা প্রয়োজন।

যদিও যে সব গ্রন্থে হযরত ঈসার (আ) শিক্ষা স্থানলাভ করেছিলো, সেগুলো হয় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও গায়েব করে দেয়া হল অথবা মারাত্মক স্ববিরোধিতা এড়ানোর লক্ষ্যে পরিবর্তন করা হল। যে দু'একটা ধর্মগ্রন্থ অক্ষত রইল, তার মধ্যেও বহুল পরিমাণ সত্যের সন্ধান পাওয়া গেল। ফলে ত্রিত্ববাদের ধারণা টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে ধর্মগ্রন্থে কি পাওয়া গেছে তার পরিবর্তে গীর্জার পুরোহিতরা কী বলেন, তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা শুরু হলো। দাবী করা হলো যে, ত্রিত্ববাদের ধারণার মূল 'যীশুর কনে' তথা চার্চের নিকট অবতারিত বিশেষ ঐশী বাণী, যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ফ্রা ফালজেনমিওকে পোপ একটি পত্রে তিরস্কার করে বললেন, 'ধর্মগ্রন্থের প্রচারণা একটি সন্দেহযুক্ত ব্যাপার। যে ব্যক্তি ধর্মগ্রন্থের সংগে নিবিড় সংযোগ রক্ষা করে চলবে, সে ক্যাথলিক চার্চকে ধ্বংস করে দেবে।' তাঁর পরবর্তী পত্রে যাঁরা ধর্মগ্রন্থের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেন, তিনি আরো সুস্পষ্টভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেন ঃ '(ধর্মগ্রন্থ) এমন এক গ্রন্থ, কেউ যার সংগে নিবিড় সংযোগ স্থাপন করলে সে ক্যাথলিক চার্চ ধ্বংস করে দেবে।'

প্রধানতঃ ঈসা নবীর (আ) ঐতিহাসিক বাস্তবতা সম্পূর্ণরূপে চাপা পড়ে যাবার ফলেই তাঁর শিক্ষার কার্যকর বর্জন সম্ভবপর হয়। চার্চ ধর্মকে শুধু যে ধর্মগ্রন্থ-নিরপেক্ষ করে দিল, তাই নয়, ধর্মকে ঈসার সঙ্গেও সম্পর্কবিহীন করে ছাড়লো। ফলে ব্যক্তি ঈসাকে একটি কাল্পনিক খ্রীষ্টের সংগে তালগোল পাকিয়ে দেয়া হল। ঈসার প্রতি বিশ্বাসের অর্থ যে এক কল্পনা-প্রসূত নতুন যীশুর প্রতি বিশ্বাসই বুঝতে হবে, এমন কথা নেই। হযরত ঈসার (আ) সাক্ষাৎ অনুসারীরা যেখানে তাঁর দৃষ্টান্তের আলোকে নিজেদের জীবন-ধারা গড়ে তুলেছিলো, পলীয় খ্রীস্টান ধর্মের ভিত্তিমূলে সেখানে থাকল কল্পিত ক্রুশবিস্ফুরণ পরবর্তী যীশুখ্রীস্টে বিশ্বাস। ঈসা (আ)-এর জীবনকালে তাঁর প্রদর্শিত জীবনাদর্শ ও শিক্ষার আর কোন গুরুত্বই থাকল না।

প্রতিষ্ঠিত চার্চ এভাবে যতই হযরত ঈসার শিক্ষা থেকে দূরে সরে পড়তে লাগলো, ততই চার্চের নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে অধিকতরভাবে জড়িয়ে পড়তে লাগলেন। হযরত ঈসার শিক্ষা ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের অভিপ্রায়ের মধ্যেকার পার্থক্য যতই অস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল এবং এর একটি অপরটির সংগে মিশে যেতে লাগল, চার্চ রাষ্ট্রের থেকে তার পৃথকীকরণের কথা ঘোষণা করেও রাষ্ট্রের সংগে অধিকতর ভাবে জড়িয়ে পড়তে লাগল এবং শক্তি সঞ্চয় করে চললো। প্রথম দিকে চার্চ রাষ্ট্রীয় শক্তির অধীন থাকলেও রাষ্ট্রের সংগে পুরোপুরি আপোষ করার ফলে অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল।

হযরত ঈসার (আ) শিক্ষা থেকে এসব বিচ্যুতি সর্বসময়ই প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। চার্চ অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠার ফলে ত্রিত্ববাদকে অস্বীকার করা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। এতে মৃত্যুর ঝুঁকিও ছিল প্রায় সুনিশ্চিত। যদিও লুথার পরবর্তীকালে রোমান চার্চ পরিত্যাগ করেন, তাঁর বিদ্রোহ ছিল শুধু পোপের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে, রোমান ক্যাথলিক চার্চের মূল তত্ত্বের বিরুদ্ধে নয়। ফলে তিনিও একটি নতুন চার্চের জন্ম দিয়ে নিজে তার প্রধান হন। আদর্শ-বিচ্যুত খ্রীস্টানদের সমস্ত মূল তত্ত্ব গ্রহণ করা এবং অক্ষুণ্ন রাখা হল। এর ফলে বহু সংখ্যক রিফর্মড্ চার্চ ও উপ-সম্প্রদায় সৃষ্টি হল, তবে রিফর্মেশন-পূর্ব খ্রীস্টধর্ম যথারীতি বহাল রইল। পলীয় (Pauline) চার্চের এই দুই প্রধান শাখা অদ্যাবধি টিকে আছে।

উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ার সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠি অরিয়াস [Arius] এর শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। পরবর্তীকালে ইসলামের আবির্ভাব ঘটলে তারা সংগে সংগে ইসলাম গ্রহণ করে। এটা সম্ভব হয়েছিল এ জন্য যে, তারা একত্ববাদ ও

হযরত ঈসার (আ) প্রচারিত নির্ভেজাল শিক্ষায় বিশ্বাসী ছিল বলে সহজেই তারা ইসলামকে সত্য বলে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলো।

ইউরোপে খ্রীস্টধর্মের অভ্যন্তরে একত্ববাদের সূত্র কখনো সম্পূর্ণ ছিন্ন হয় নাই এবং অতীতের একটানা নৃশংস নির্যাতন এবং বর্তমান কালের উপেক্ষা সত্ত্বেও এই আন্দোলন টিকে আছে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে।

ক্রমেই অধিক হতে অধিকতর লোক বর্তমানে বুঝতে পারছেন যে, তাঁরা খ্রীস্টধর্ম বলে যা জানেন তার সাথে হযরত ঈসার (যীশুর) মৌল শিক্ষার খুব কমই সম্পর্ক আছে। বিগত দুই শতাব্দী ব্যাপী ঐতিহাসিকদের গবেষণা খ্রীস্টান 'রহস্যে' বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখবার খুব কমই অবকাশ রেখেছে। তবে প্রতিষ্ঠিত চার্চের কল্পিত যীশুখ্রীস্টের সংগে ইতিহাসের যীশুখ্রীস্ট তথা হযরত ঈসার যে প্রায় কোন সম্পর্ক নেই, এই তথ্য প্রমাণিত হলেই যে খ্রীস্টানরা সত্য স্বীকারে এগিয়ে আসবে, তা মনে করার কারণ নেই। বর্তমান শতাব্দীর চার্চের ইতিহাসকারদের রচনা থেকেই খ্রীস্টানদের বর্তমান সমস্যার প্রকৃতি অনুধাবন করা যায়। অ্যাডলফ হারমাক [Adolf Harmack] এই মৌলিক সমস্যাটি তুলে ধরেছেন এই ভাবে— 'খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যেই আসল বাইবেল (Gospe)-এর উপর গ্রীক দর্শনের ছিপি এঁটে দেয়া হয়। এখন ঐতিহাসিকদের কর্তব্য হচ্ছে, এই ছিপি খুলে ফেলে ভেতরকার আদর্শের মূল সীমারেখা যে কত পৃথক, তা প্রকাশ করে দেয়া।' কিন্তু এরপর হারমাক এই কর্তব্য পালনের পথে অসুবিধার কথাও স্মরণ করিয়ে দেন এই বলে যে, বহুদিন ধরে ব্যবহারের ফলে এই তাত্ত্বিক ছিপি ধর্মের চেহারাও পাল্টে দিতে পারে ঃ

'মুখোশ নিজস্ব একটি জীবন লাভ করে। ত্রিত্ববাদ, ক্রাইস্টের দ্বৈত প্রকৃতি, নিষ্পাপতা এবং এসব সংস্কারের সমর্থনে সমস্ত প্রস্তাবনা ছিল বিভিন্ন সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত এবং সম্পূর্ণ পৃথকভাবে উদ্ভূত বিভিন্ন পরিস্থিতির পরিণাম-ফল,-- তবুও...প্রথম বা পরবর্তী যুগের, পরিণাম ফল বা পরিবর্তক শক্তি, যাই হোক না কেন, এই মতবাদ আগাগোড়াই রয়ে গেছে ইয়াহূদীদের নির্যাতন থেকে খ্রীস্টানদের পলায়ন কালে গ্রীকদের কাছ থেকে শেখা বুদ্ধি বৃত্তায়নের একটি বদভ্যাস।'

হারমাক এ বিষয়ে তাঁর একটি বইয়ে বিস্তৃততর বিশ্লেষণ দেন। সেখানে তিনি স্বীকার করেন ঃ

'চতুর্থ ধর্মগ্রন্থ (Gospel) জন থেকে পাওয়া যায় নাই। এমনটি দাবীও করা যায় না। জন একজন ঐতিহাসিক বিশেষজ্ঞ বলে স্বীকৃত হতে পারেন না। চতুর্থ ধর্মগ্রন্থের রচয়িতা সীমাহীন স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করেন, ঘটনার যদৃচ্ছা রদবদল

করেন এবং অন্তত খামখেয়ালী দিয়ে সেগুলোর পুনর্বিন্যাস সাধন করেন। তিনি নিজেই আলোচনার অবতারণা করেন এবং কাল্পনিক কাহিনী ফেঁদে নানা ভাবধারার দৃষ্টান্ত দেন।'

তিনি [হারমাক] বিখ্যাত খ্রীস্টান ঐতিহাসিক ডেভিড স্ট্রাইস (Dabid Straues)-এর গ্রন্থেরও উল্লেখ করেন। স্ট্রাউস সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে, তিনি [স্ট্রাউস] 'শুধু চতুর্থ গসপেল নয়, প্রথম তিনটি গসপেল-এর ঐতিহাসিক বিশ্বাসযোগ্যতাও প্রায় বিধ্বস্ত করে দিয়েছেন।'

অপর একজন ঐতিহাসিক যোহান্স লেহম্যান (Jahannes Lehman)-এর মতে চারটি স্বীকৃত বাইবেলের রচয়িতাদের রচনায় যীশুখ্রীস্টের যে বিবরণী পাওয়া যায়, তা ঐতিহাসিক বাস্তবতার নিরিখে প্রাপ্ত যীশু থেকে পৃথক। এর পরিণতি নির্দেশকারী হেইন্ট যাহরান্ট (Haint Zahrant)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লেহম্যান বলেন ঃ

'যদি ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে, ইতিহাসের ঈসা আর প্রচারিত যীশুখ্রীস্টের মধ্যে দুরতিক্রম্য পার্থক্য রয়েছে বলে যীশুর নিজের মধ্যেই যীশুর উপর বিশ্বাসের সপক্ষে সমর্থন নেই, তা হলে এটা যেমনটি এন. এ. দাহল (N.A. Dahl) বলেন, শুধু ধর্মতাত্ত্বিক দিক দিয়েই সর্বনাশা হবে না, এর অর্থ দাঁড়াবে, সমস্ত খ্রীস্টতত্ত্বের সমাধি। তবুও আমি সুনিশ্চিত যে, ধর্মতাত্ত্বিকরা একটি জবাব তৈরী করতে সমর্থ হবেন—এমন কোন সময় ছিল কি যখন আমরা তা পারিনি? কিন্তু আমরা হয় এখন মিথ্যা বলছি, নইলে তখন মিথ্যা বলবো।'

এই অল্প কয়েকটা ক্ষুদ্রাকারের উদ্ধৃতি থেকে খ্রীস্টধর্ম বর্তমানে কি ধরনের সমস্যার আবর্তে রয়েছে, তার প্রমাণ মেলে। যাহরান্ট (Zahrant)-এর কথায় আরও মারাত্মক কিছুর সন্ধান মেলে, যার মূলকথা হল ঃ যীশুর শিক্ষা এবং তাঁর সাক্ষাৎ পরবর্তী যুগের চার্চ ও ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহের পরিণতি কি দাঁড়ায়, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত গবেষণার ও প্রশ্ন তোলার অবকাশ রয়েছে, কারণ তাঁর শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য উপেক্ষিত হয়েছে বা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ থিয়োডর যোহন প্রতিষ্ঠিত চার্চসমূহের মধ্যে তীব্র মতভেদের প্রমাণ তুলে ধরেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, রোমান ক্যাথলিকরা গ্রীক অর্থডক্স চার্চের বিরুদ্ধে অসৎ উদ্দেশ্যে পবিত্র ধর্মগ্রন্থের মধ্যে যোগ বিয়োগ করে পরিবর্তন সাধনের অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। পক্ষান্তরে গ্রীকরা দেখায় যে, ক্যাথলিকরা নিজেরাই অনেক ক্ষেত্রে মূল পাঠের অনেক কিছু বদলিয়ে ফেলেছে। এসব পার্থক্য সত্ত্বেও এরা আবার ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচলিত মতে অবিশ্বাসী খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে 'সত্য পথ'

থেকে সরে যাবার অপবাদ দেয় এবং এদের হেরেটিক্স বলে গালাগালি দেয়, আর 'হেরেটিকসরাও' 'জালিয়াতদের মত নতুন সত্য সৃষ্টি করবার জন্য ক্যাথলিকদের অভিযুক্ত করে।' উপসংহারে তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'বাস্তব ঘটনা কি এসব অভিযোগ সত্য প্রমাণ করে না?'

স্বয়ং যীশু (ঈসা) এখন সম্পূর্ণ বিস্মৃতির অন্তবালে হারিয়ে গেছেন। যে বিকৃতি সাধিত হয়েছে, সে সম্পর্কে যারা সচেতন এবং যারা সমস্ত আন্তরিকতা নিয়ে যীশুর ['ঈসা] মূল আদর্শের দিকে প্রত্যাবর্তন এবং তা অনুসরণ করতে চায়, তাদেরকে এ কাজে বাধা দেয়া হয়। কারণ মূলশিক্ষা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং এর পুনরুদ্ধার এখন অসম্ভব।

ইরাসমাস (Erasmus) এ সম্পর্কে বলেন ঃ

'প্রাচীনরা ধর্মীয় বিষয় নিয়ে খুব কমই দার্শনিকতা করতেন। পূর্বে ধর্ম-বিশ্বাস একটা প্রচারের ব্যাপার মাত্র ছিল না, জীবনে এর প্রতিফলন ঘটেছিলো। যখন ধর্ম-বিশ্বাস হৃদয়ের নয়, রচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল, তখন প্রায় যত লোক তত মতবাদ দেখা দিল। বিধি, উপবিধি বাড়তে লাগল, কিন্তু আন্তরিকতা হ্রাস পেয়ে চলল। নরম গরম যুক্তি খাড়া হতে লাগল এবং প্রেম শীতল হয়ে গেল। খ্রীস্টের যে মতবাদে পূর্বে কোন চুলচেরা তর্কের কথা শোনা যেত না, এখন তাই দর্শনের কূট তর্কের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। চার্চের অধঃপতনের এটাই ছিল প্রথম স্তর।'

এমনিভাবে কথায় যা ব্যাখ্যা করা যেত না, তার ব্যাখ্যা দান করতে চার্চকে বাধ্য করা হল এবং উভয় পক্ষই সম্রাটের সমর্থন লাভের জন্য হন্যে হয়ে উঠতে লাগল। ইরাসমাস এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে আরো বলেন ঃ

'এ ব্যাপারে সম্রাটের কর্তৃত্বের অনুপ্রবেশ ধর্ম-বিশ্বাসের পবিত্রতা প্রমাণে বিশেষ সাহায্য করল না। ...যখন ধর্মমতের স্থান হয় মুখে, অন্তরে নয়, তখন ধর্মগ্রন্থের নির্ভুল জ্ঞান লাভ অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষকে আমরা পরিচালিত করি এমন কিছু স্বীকার করতে যা তারা বিশ্বাস করে না, এমন কিছু ভালবাসতে, যা তারা ভালবাসে না, এমন কিছু জানতে, যা তারা জানে না। যা জোর করে করানো হয়, তা কখনো আন্তরিক হতে পারে না।

ইরাসমাস বুঝতে পেরেছিলেন যে, প্রথম যুগের খ্রীস্টানগণ ছিলেন যীশুর সাক্ষাৎ অনুসারী। তাঁরা একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু তাঁদের এটা কখনো প্রকাশ করবার প্রয়োজন হত না। এই শিক্ষা যখন প্রসার লাভ করল এবং বিভিন্ন চার্চের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল, একমাত্র তখনই খ্রীস্টতত্ত্ববিদগণ প্রকৃত সত্য

সম্বন্ধে তাঁদের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হন। কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেকে যীশুর একত্ববাদের পরিভাষাসহ প্রকৃত শিক্ষার পুরোটাই বিস্মৃত হতে বসেছে। তাদের তখন প্রধান অবলম্বন ছিল গ্রীক দর্শনের শব্দ-সম্ভার ও পরিভাষা, যার সৃষ্টি ছিল একত্ববাদের দিকে নয়, ত্রিত্ববাদের দিকে। এভাবেই সত্যের প্রতি একটি সহজ সরল বিশ্বাস অনিবার্য কারণে এমন এক ভাষার জালে জড়িয়ে গেল, যা যীশুর নিকট ছিল বিদেশী ভাষা। এর ফলে যীশুর উপর দেবত্ব আরোপের এবং পবিত্র আত্মা ধারণার মাধ্যমে ত্রিত্ববাদের মতবাদ খাড়া করা হল। এর অনিবার্য পরিণামফল হিসেবে মানুষ যখন একত্ববাদী জীবনাদর্শের পথ হারিয়ে বসল, তখন তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও উপদলীয় দ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিয়ে উঠল।

যীশুখ্রীস্ট কে ছিলেন এবং তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে কি শিক্ষা দিয়ে গেছেন, সেই সত্যটা যিনি জানতে চান, তাঁর জন্য এই উপলব্ধি একেবারেই অপরিহার্য। সংগে সংগে এটাও সংশ্লিষ্ট সকলের জেনে রাখা প্রয়োজন যে, একবার যদি কোন নবীর শিক্ষার প্রতিমূর্তরূপ তাঁর দৈনন্দিন জীবন ধারা সূত্র থেকে অনুসারীদের বঞ্চিত হতে হয়, তবে তারা ত্রিত্ববাদের তত্ত্বেই বিশ্বাসী হোক বা একত্ববাদের উচ্চকণ্ঠ প্রবক্তাই হোক, তারা প্রকৃতই মহা ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

অনুবাদ ঃ অধ্যাপক আবদুল গফুর

ইসলামে পরকাল বিশ্বাস*

মুহাম্মদ আবদুর রহীম

গ্রীক-দার্শনিক সক্রেটিস মৃত্যুর পর আর একটা জীবন হওয়ার কথা বিশ্বাস করতেন। তাঁর ছাত্র প্লেটোর বিশ্লেষণ অনুযায়ী তিনি পূর্ণমাত্রার স্থিতি ও প্রশান্তি সহকারে মৃত্যুবরণ করে তাঁর এই বিশ্বাসের কথাকেই অকাট্যভাবে প্রমাণিত করে গেছেন। কিন্তু দার্শনিক ক্যানিংহাম তাঁর Plato's Apology নামক গ্রন্থে মৃত্যুর পর জীবন সম্পর্কে সক্রেটিসের এই বিশ্বাসকে Cheerful Agosticism বলে অভিহিত করেছেন। আর একালের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকদেরও এই মত। তাঁরা মনে করেন, মৃত্যুর পর জীবন ব্যাপারটি বস্তুজগত বহির্ভূত বিধায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তার সত্যাসত্য বিচার সম্ভব নয়। আর এই কারণেই তাকে তাঁরা অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক মনে করেন। ধর্মীয় বিশ্বাস হিসাবে তার গুরুত্ব যতই হোক, আধুনিক বৈজ্ঞানিক মন ও মানস তাকে সত্য বলে মেনে নিতে প্রস্তুত হতে পারে না বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেছেন।

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি

কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেননা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণে যা আসে কেবলমাত্র তা-ই সত্য ও বাস্তব, তার বাইরে সত্য ও বাস্তবতার কোন অস্তিত্ব নেই, বিজ্ঞান এমন দাবী কখনই করেনি। পানি আমাদের প্রত্যক্ষ গোচরীভূত; কিন্তু পানির প্রতিটি বিন্দু (Molecule) যে দুই বিন্দু হাইড্রোজেন ও একবিন্দু অক্সিজেন সমন্বিত, তা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। তা আমরা কেবলমাত্র ধারণা, অনুমান ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই জানতে পারি। দুনিয়ার অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপার সম্পর্কেও এই কথাই সত্য। এ. এস. ম্যাণ্ডার (Mander) লিখেছেনঃ

'যে সব সত্য আমরা সরাসরিভাবে ইন্দ্রিয়নিচয়ের মাধ্যমে জানতে পারি, তা হচ্ছে Perceived Facts। কিন্তু যেসব সত্য আমরা জানতে পারি, তা কেবলমাত্র সেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনাবলী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয় ; তা ছাড়াও আরও বহু সত্য রয়েছে, আমরা প্রত্যক্ষভাবে জানতে না পরলেও সে সম্পর্কে আমরা জানতে

---

* [প্রবন্ধটি ইফা পত্রিকা ১৯৭৭ সন ১৬ বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা থেকে সংগৃহীত]

পারি। এই জানার মাধ্যম হচ্ছে Inference (অনুমতি বা অনুসিদ্ধান্ত)। এই উপায়ে যে সব সত্য লাভ হবে, সে সবকে Inferred Facts বলা যায়। 'এই পর্যায়ে গুরুত্ব সহকারে বুঝে নিতে হবে যে, এই দুই প্রকারের সত্যে এ দু'য়ের সত্যতা ও যথার্থতার দিক দিয়ে কোনই পার্থক্য নেই। প্রকৃত পার্থক্য হচ্ছে এ হিসাবে যে, একটিকে আমরা 'জানি'। আর দ্বিতীয়টিকে আমরা জানতে পারি। প্রকৃত সত্য সম্পূর্ণ অভিন্ন, তা আমরা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানি, আর অনুমিতি বা অনুসিদ্ধান্তের (Inference) মাধ্যমে জানি।'

(Clearer Thinking,London-1940 ; P. 46)

তিনি আরও লিখেছেন ঃ

"বিশ্বলোকে যে সব সত্য নিহিত রয়েছে, তার মধ্যে খুব অল্পই আমরা ইন্দ্রিয়নিচয়ের মাধ্যমে জানতে পারি। তা হ'লে সে সবেরই বাইরে অন্যান্য আরও যা কিছু রয়েছে,তা আমরা কি উপায়ে জানতে পারি ? তার উপায় হচ্ছে Inference কিংবা Reasoning। এই অনুমিতি বা অনুসিদ্ধান্ত ও বিচার বিবেচনা একটি বিশেষ চিন্তাপদ্ধতি। এর সাহায্যে আমরা কতিপয় জানা ঘটনাবলী থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত এই বিশ্বাস বানিয়ে নিই যে, এখানে অমুক সত্য নিহিত রয়েছে, যদিও তা কখনও দৃষ্টিগোচর হয়নি"। (ঐ–৪৯ পৃঃ)

এখানে প্রশ্ন ওঠে, বিচার বিবেচনা ও যুক্তিপদ্ধতি সত্য জানবার উপায় হতে পারে কিরূপে ? আমরা নিজেদের চক্ষে যা দেখিনি, কেবল বিবেকের তাকিদে মেনে নিয়েছি, তা যে সত্য ও অকাট্য, এমন কথা আমরা কি করে বলতে পারি ?

বিজ্ঞান এই প্রশ্নের জওয়াব দিয়েছে এই বলে ঃ

The reasoning process is valid because the universe of fact is rational.

অন্য কথায় যুক্তিভিত্তিক অনুসিদ্ধান্তের মাধ্যমে সত্য জানার পদ্ধতি অভ্রান্ত। কেননা স্বয়ং বিশ্বলোকেই যুক্তিবাদ বিদ্যমান। অন্য কথায় গোটা বিশ্বলোকই যুক্তিভিত্তিক। বাস্তব জগত ও এই জগতের ঘটনাবলী এক সংগতিপূর্ণ। সমগ্র বিশ্বলোকের তাবৎ ঘটনাবলী পরস্পরের সংগে সামঞ্জস্যশীল, এই সবের মধ্যে বিরাট শৃঙ্খলা, নিয়মানুগত্য ও সাযুজ্য বর্তমান। কাজেই যে ধরনের অধ্যয়ন পদ্ধতি ঘটনাবলীর পারস্পরিক সাযুজ্য ও সে সবের সামঞ্জস্যতা অকাট্যভাবে আমাদের সম্মুখে প্রকট করে তোলে না, তা নির্ভুল ও অভ্রান্ত হতে পারে না। এটা বৈজ্ঞানিক ম্যাথ্যরের উক্তি। এ কথার পর তিনি লিখেছেন ঃ

> 'দৃশ্যমান ঘটনাবলী প্রকৃত সত্যের (World of reality) কতিপয় অংশমাত্র (Patches of facts)। আমরা যা কিছু ইন্দ্রিয়নিচয়ের মাধ্যমে জানি, তা আংশিক ও অসংবদ্ধ ঘটনাবলী মাত্র। বিচ্ছিন্নভাবে শুধু তা-ই যদি দেখা যায়, তবে তা সবই অর্থহীন বোধ হবে। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূত ঘটনাবলীর সঙ্গে সঙ্গে আরও বহু অননুভূত ঘটনাবলী মিলিয়ে যখন আমরা দেখি, ঠিক তখনই আমরা এ সবের তাৎপর্য ও অর্থপূর্ণতা বুঝতে পারি।'

এর পর তিনি একটা সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন ঃ

> 'আমরা দেখতে পাই, একটি পাখী মরে গেলে তা মাটিতে পতিত হয়। আমরা দেখি, একটি প্রস্তর খণ্ড মাটি থেকে উপরে তোলার জন্য যথেষ্ট শক্তি ব্যয় করতে হয়। আমরা দেখি, চাঁদ আকাশমণ্ডলে আবর্তিত হচ্ছে, আমরা দেখি, পাহাড় থেকে অবতরণ করার তুলনায় তার উপর আরোহণ করা খুবই কষ্টকর। এই ধরনের বহু সংখ্যক পর্যবেক্ষণ নিত্য আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু বাহ্যত এই সবের মাঝে কোন সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় না। এর পর একটা অনুসিদ্ধান্তমূলক সত্য (Inferred Fact) উদ্ঘাটিত হয়। আর তা' হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণের বিধান (Law of gravitation)। সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত পর্যবেক্ষণ এই অনুসিদ্ধান্তমূলক সত্যের সাথে মিলিত হয়ে পরস্পর সংযুক্ত ও সুসংবদ্ধ হয়ে যায়। এর ফলে সম্পূর্ণ প্রথমবারই আমরা জানতে পারি যে, এই বিভিন্ন ঘটনাবলীর মাঝে সুসংগতি, সুসংবদ্ধতা ও সাযুজ্য রয়েছে। ইন্দ্রিয়ানুভূত ঘটনাবলীকে আলাদা বিচার করলে সেগুলোকে নিতান্ত বিচ্ছিন্ন, অবিন্যস্ত, অসংবদ্ধ সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ও পরস্পর সম্পর্কহীন মনে হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ানুভূত ঘটনাবলীও অনুসিদ্ধান্তমূলক সত্য—এতদুভয়কে মিলিয়ে বিচার করলে এই সবই একটা সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্তরূপ পরিগ্রহ করে। (ঐ)

অন্য কথায় একটা জিনিসকে সত্য বলা চলে তখন, যখন অন্যান্য ঘটনাও সত্যের সংগে তা কিভাবে বিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ তা আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে পারি। অথবা আমরা যখন সে সবকে একটা সমগ্রের অংশ বলে প্রমাণ করতে পারব। ম্যাগার লিখেছেন ঃ

> 'আমরা একটা সত্য জানতে পেরেছি, একথা বলার অর্থ হচ্ছে, আমরা যেন বলছি, আমরা তার তাৎপর্য (meaning) জানতে পেরেছি। কথাটি এভাবেও বলা যায়, আমরা কোন জিনিসের বর্তমানতার কারণে এবং তার অবস্থা জেনে নিয়ে তার ব্যাখ্যা করি...আমাদের অধিকাংশ বিশ্বাস-ই (Beliefs) এই পর্যায়ের। আসলে তা হচ্ছে পর্যবেক্ষণাদির ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ মাত্র (Statements of observations)। (ঐ ৫২ পৃঃ)

এরপর ম্যাণ্ডার পর্যবেক্ষিত সত্য (observed Facts) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

> 'আমরা যখন কোন পর্যবেক্ষণের (observation) কথা বলি, তখন আমরা সব সময় নিছক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পর্যবেক্ষণের অধিক কিছু বোঝাতে চাই। তার অর্থ হয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পর্যবেক্ষণ এবং সেই সঙ্গে স্বীকৃতি ও অভিজ্ঞতা (Recognition) ও থাকে। আর তাতে ব্যাখ্যারও কিছু অংশ শামিল থাকে।' (ঐ ৫৬ পৃঃ)

এর একটা স্পষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে 'এ্যাটম' বা অণু। 'এ্যাটম' বা অণু আজ আমাদের জীবনে একটা মহাসত্য ব্যাপার। কিন্তু তা আজ পর্যন্ত প্রচলিত অর্থে কখনই 'দেখা' যায়নি। কিন্তু এই অপর্যবেক্ষিত ঘটনাকে বিজ্ঞান সমর্থন করছে শুধু এই কারণে যে, অন্যান্য পর্যবেক্ষিত ঘটনাবলী এর বাস্তবতার সত্যতা ও যথার্থতা ঘোষণা করছে। অনুরূপভাবে আংগিক বা দৈহিক ক্রমবিকাশকেও বিজ্ঞানী মহলে চূড়ান্ত সত্য বলে মেনে নেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারেও সম্পূর্ণ 'ঐকমত্য' প্রতিষ্ঠিত। কারুর কোন দ্বিমত থাকতে পারে তা কল্পনাও করা যায় না। অথচ ক্রমবিকাশের (Evolution) কল্পিত মতটি একটা সুদীর্ঘ কার্যক্রম এবং দূর অতীতের সাথে সম্পর্কিত ব্যাপার। তা কেউ 'দেখতে পেয়েছে', এমন কথা চরমভাবে হাস্যকর। তার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই মতটিকে একটা 'পরম সত্য' রূপে মেনে নেয়া হচ্ছে। কেননা তা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে ঃ

১—সমস্ত জ্ঞাত সত্যের সংগে পুরাপুরি সংগতিপূর্ণ (consistant)।

২—এই মতটি দ্বারা এমন বহু ঘটনার বিশ্লেষণ করা যায়, যা এই মত ছাড়া আদৌ বোঝাই যায় না।

৩—এ ছাড়া অপর এমন কোন মত এখনও গোচরীভূত হয়নি যা ঘটনাবলীর সাথে এতটা সঙ্গতিপূর্ণ। (ঐ ১১২ পৃ.)

পরকাল বিশ্বাস

ইসলামের পরকাল বিশ্বাসের ব্যাপারটিও ঠিক এইরূপ। এই বিশ্বাসের দাবীটি আমাদের বর্তমান ইন্দ্রিয় শক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ অনুভব-অযোগ্য, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশ্বলোকে নিহিত অন্যান্য বহু ঘটনাই এমন অনুভূত ও পরিজ্ঞাত হয়ে আছে, যা থেকে এর সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়, এর বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জাগিয়ে দেয়। বর্তমান জগতে সত্যকে যাচাই করার সর্বাধিক নির্ভুল মানদণ্ডে তা পুরাপুরিভাবে উত্তীর্ণ। যুক্তি ও প্রমাণের সব কয়টি দিকই তাকে সম্পূর্ণ সত্য ও অভ্রান্ত বলে প্রমাণ

করে। বিশ্বলোকের যে সব ব্যাপার আমরা সত্য বলে জানি সে সবের সঙ্গতিপূর্ণ কোন ব্যাখ্যাই সম্ভব নয় পরকাল সংক্রান্ত এই বিশ্বাসটিকে সম্পূর্ণ নির্ভুল বলে মেনে না নিলে।

ইসলাম পরকাল সম্পর্কে যে বিশ্বাস উপস্থাপিত করেছে, তার তাৎপর্য হচ্ছে, বর্তমান জগতটি মূলত মানুষের জন্য পরীক্ষার ক্ষেত্র। এখানে মানুষকে একটা বিশেষ মিয়াদ পর্যন্ত রাখা হবে। তারপর এমন একটা সময় আসবে, যখন এই জগতের মালিক নিজেই এই জগতটিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়ে একটা নতুন জগত, নবতর পদ্ধতি ও নিয়মে নির্মাণ করবেন। এই জগতে সমস্ত মানুষকে নতুন করে জীবিত করা হবে এবং এই দুনিয়ায় মানুষ ভাল বা মন্দ যে কাজই করেছে তা সবই আল্লাহর আদালতে পেশ করা হবে, আর প্রত্যেকটি মানুষকেই তার আমল অনুযায়ী পুরস্কার বা শাস্তি প্রদান করা হবে।

কিন্তু ইসলামের এই বিশ্বাসটি অভ্রান্ত কি ভিত্তিহীন সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা আমাদের জন্য একান্তই জরুরী। আর এ ক্ষেত্রে দু'টি মৌলিক প্রশ্নের মীমাংসা করে নেয়া আবশ্যক। একটি প্রশ্ন হচ্ছে, পরকাল কি সম্ভব ? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, এর যথার্থতা, এর সার্থকতা ও এর তাৎপর্য সম্পর্কে। অর্থাৎ

১. বিশ্বলোকের বর্তমান ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে এই ধরনের কোন পরকাল সংঘটিত হওয়া কি সম্ভব বলে মনে হয়? এখানে নিত্য সংঘটিত ঘটনাবলীর মধ্যে এই ঘটনাটির সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনার কোন ইংগিত পাওয়া যায় কি?

২. পরকাল সংঘটিত হওয়া কি এই জগতের পক্ষে অপরিহার্য? পরকাল বিশ্বাস ব্যতীত বর্তমান জগতের কোন যুক্তিসম্মত (Reasonable) ব্যাখ্যা দেওয়া কি সম্ভবই নয় ?

প্রথম প্রশ্ন

বর্তমান বিশ্বলোক ব্যবস্থার চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি সর্বপ্রথম বিচার্য। এই পর্যায়ে বিবেচনা শুরু করলেই আমরা জানতে পারি, বর্তমান জগত কোন দিক দিয়েই পরকালের সম্ভাব্যতাকে উড়িয়ে দেয় না। শুধু তাই নয়, এই ধরনের একটা ঘটনা সংঘটিত হওয়া যে সম্ভব তা এই জগত ব্যবস্থাই নানাভাবে সুস্পষ্ট ও প্রকট করে তোলে। বিশ্লেষণের জন্য আমরা সর্বপ্রথম বর্তমান জগতের চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার কথাটিকে গ্রহণ করছি। এই ব্যাপারটি বর্তমানেও কিছুমাত্র দুর্বোধ্য নয়। নিত্য সংঘটিত ঘটনাবলীর আলোকে এই ব্যাপারটি আমরা খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারি। এই বিশ্বাসটির তাৎপর্য হল, বিশ্বলোকে আমরা

যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'কিয়ামত' সংঘটিত হতে নিত্য দেখতে পাই, তা-ই ভবিষ্যতে কোন এক সময় অধিক বড় ও ব্যাপক মাত্রায় সংঘটিত হবে। এটা বর্তমানে স্থানীয় ভিত্তিতে সংঘটিত 'কিয়ামত'সমূহের অত্যন্ত বড় ও ব্যাপকভাবে সংঘটিত হওয়ার একটা ভবিষ্যদ্বাণীই মাত্র।

প্রাচীনতমকালে বিরাট গান্ধারা রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল ট্যাক্সিলা (Taxila)। বর্তমানে তা একটি ধ্বংস্তূপরূপে রাওয়ালপিণ্ডি ও হাসান আবদাল নামক শহরদ্বয়ের মধ্যবর্তী একটি স্থানে মাটির তলায় পড়ে আছে। এই ধ্বংস্তূপের খোদাই কার্য চলাকালে কিছু সংখ্যক মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। সম্ভবত এই লোকগুলি হঠাৎ-আসা দুর্ঘটনা থেকে বাঁচবার উদ্দেশ্যে ঘরের কোণায় আত্মগোপন করেছিল। আর তখন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে নিজেদের মুখমণ্ডল দুই হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছিল।

বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য হচ্ছে, দুই সহস্রাধিক বছর পূর্বে এখানে একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছিল। এই ভূমিকম্পের প্রচণ্ড কম্পনে 'ট্যাক্সিলা' উপত্যকাটি ধসে যায়। অনুরূপ আর একটি আবিষ্কৃত জনপদের সন্ধান সম্প্রতি পাওয়া গেছে। ২৪০ বছর পূর্বে খনন কার্য শুরু করে রোমের প্রাচীন নগরী পম্পেই জীবন যাত্রার প্রথম নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখানে কয়েকটি কঙ্কালও পাওয়া গেছে। আগ্নেয়গিরির লাভায় চাপা পড়ে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর পূর্বে তৎকালীন বিশ্বের সভ্য জনপদ পম্পেই বিরান ভূমিতে পরিণত হয় এবং ক্রমে মাটির নীচে চাপা পড়ে যায়। বস্তুত ভূমিকম্প আজও দুনিয়ার মানুষের জন্য এক ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় ব্যাপার। আসলে তা মানুষের উপর প্রকৃতি-সৃষ্ট একটি মহা আক্রমণ বিশেষ। এতে চূড়ান্ত ফয়সালার সমস্ত ক্ষমতা প্রতিপক্ষের হস্তে নিবদ্ধ। ভূমিকম্পের ব্যাপারে মানুষ বাস্তবিকই চরম অসহায় ও একান্তই নিরুপায়। ভূ-পৃষ্ঠের অভ্যন্তর অংশ অত্যন্ত উত্তপ্ত ও তরল লাভার ন্যায়। আগ্নেয়গিরিসমূহ থেকে নিঃসৃত লাভাই তার বড় প্রমাণ। এই বস্তুটি নানারূপে পৃথিবীর উপরিতল (Surface) কে প্রভাবিত করে। তার দুরুন কখনও কখনও পৃথিবীর উপর ভাগে ঘর্ঘর ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। আর ভূগর্ভে সংঘটিত দ্বন্দ্বের ফলে প্রচণ্ড কম্পনের উদ্ভব হয়। এরই নাম ভূমিকম্প। এই ভূমিকম্প আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমরা একটি রক্তবর্ণ গলিত ও অতিশয় উত্তপ্ত বস্তুর উপর বসবাস করছি। তা থেকে মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটার পুরু একটা স্তরই আমাদেরকে দূরে রেখেছে মাত্র। এই স্তরটিকে আপেলের উপরে লাগানো অত্যন্ত ক্ষীণ খোসার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। জনৈক ভূ-তত্ত্ববিদের ভাষায়, আমাদের জনবসতিপূর্ণ শহর-জনপদ ও নীল সমুদ্রের নিম্নভাগে একটি 'প্রাকৃতিক জাহান্নাম' (Physical Hell) দাউ দাউ করে নিরন্তর

জ্বলছে। (George Gamow, Biography of the Earth, P-82) আজকের ভাষায় বলা যায়, আমরা একটা বিরাট ডিনামাইটের উপর দণ্ডায়মান। তা যে কোন মুহূর্তে দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে আমাদেরকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দিতে সক্ষম।

ভূমিকম্প সম্পর্কে সকলেরই জানা যে, তা দুনিয়ার প্রায় সব অঞ্চলেই প্রায় প্রতিদিনই সংঘটিত হয়ে থাকে। কিন্তু ভৌগলিক বিচারে তা আগ্নেয়গিরি সন্নিহিত অঞ্চলেই সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়। চীনের শাঁসী (Shensi) প্রদেশে ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দে সংঘটিত ভূমিকম্পটি ইতিহাসের সর্বাধিক বিধ্বংসী ও ভয়াবহ। আট লক্ষেরও অধিক লোক এই ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যায়।[১] ১৮৯৭ সনে আসাম প্রদেশেও এই ধরনেরই এক ভয়াবহ ও প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছিল। দুনিয়ার সংঘটিত বড় বড় পাঁচটি ভূমিকম্পের মধ্যে এটিও একটি। এ সময় উত্তর আসাম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্রহ্মপুত্র নদীটির দিক পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং এভারেস্টের শৃঙ্গ একশ' ফুট উচ্চে উঠে যায়।

ভূমিকম্প মূলত ক্ষুদ্রায়তন 'কিয়ামত' বিশেষ। এই সময় ভয়াবহ ও প্রলয়ঙ্কর ঘর্ঘর ধ্বনিতে ভূ-পৃষ্ঠ দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যায়, সুরম্য হর্ম্য ও প্রসাদোপম পাকা বাড়ী-ঘরসমূহ তাসের ঘরের মত টপ্ টপ্ করে পড়ে যেতে ও ধ্বসে যেতে শুরু করে। ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ ধ্বসে যায়। আর নিম্ন ভাগ উপরে উঠে যায়। ঘনবসতিপূর্ণ শহর-জনপদসমূহ কয়েক নিমিষের মধ্যে ভয়াবহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে পড়ে। মানুষের লাশ মরে-যাওয়া মাছের ন্যায় ভূপৃষ্ঠের উপর স্তূপীকৃত অবস্থায় পড়ে থাকে।

ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা অবর্ণনীয়। এই সময় মানুষ প্রকৃতির বুকে নিজেকে সর্বাধিক অসহায় ও নিরাশ্রয় বলে অনুভব করে। ভূমিকম্প কখনই বলে কয়ে আসে না, আসে নিতান্তই আকস্মিকভাবে। ভূমিকম্প ঠিক কবে, কখন ও কোথায় সংঘটিত হবে, সে বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা কারুর পক্ষেই সম্ভবপর নয়। এক্ষেত্রে এটাই একটা অত্যন্ত মর্মান্তিক ব্যাপার। আধুনিক মানুষ বিজ্ঞানগর্বী। কিন্তু এই সর্বশ্রেষ্ঠ বিপদ সম্পর্কে কারুরই কিছু জানা নেই। আমরা বলতে চাই, এই ভূমিকম্পসমূহই আমাদের জন্য কিয়ামতের মহাপ্রলয়ের আগাম অবহিতি। পৃথিবীর

১. বৃটানিকা বিশ্বকোষ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ভয়ংকর ভূমিকম্পরূপে উল্লেখ করেছে পর্তুগালের ভূমিকম্পটি। ১৭৫৫ খ্রীস্টাব্দের ১লা নভেম্বর সংঘটিত এই ভূমিকম্পে লিজবন (Lisbon) নামক শহরটি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। মাত্র ছয় মিনিট সময়ে ত্রিশ সহস্রাধিক মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়। সমস্ত ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত হয়। ভূমিকম্পের পর ক্রমাগতভাবে ছয়টি দিন পর্যন্ত প্রলয়ংকর আগুন জ্বলতে থাকে। এই ভূমিকম্পে ইউরোপের চারগুণ বড় অঞ্চল কম্পিত হয়ে উঠেছিল।

(Encyclopaedia Britannica-1958)

স্বত্বাধিকারী ও নিয়ন্ত্রক নিজেই পৃথিবীর বর্তমান ব্যবস্থাকে কিভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে সক্ষম, এই ভূমিকম্পসমূহই তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

এসব হচ্ছে পৃথিবীর স্থানীয়ভিত্তিক 'কিয়ামত'। এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা মহাশূন্যের তুলনায় আমাদের এই পৃথিবীর ক্ষেত্রে অনেক গুণ বেশী। প্রতিদিন কোটি কোটি উল্কা পৃথিবীর মহাশূন্যের সাথে সংঘর্ষে এসে পড়ে। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় তা খুবই ক্ষুদ্র হয় বলে পৃথিবীর উপর তার কোন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু কখনও কখনও বড় আকারের উল্কাও পৃথিবীর সংগে সংঘর্ষে আসতে দেখা গিয়েছে। গ্রীনল্যাণ্ডের একটি ঝিলে নিপতিত একটি উল্কা আজ পর্যন্ত জানা নিপতিত সব কয়টির মধ্যে বড়। এটির ওজন ছিল ৩৬ টনেরও অধিক। আর কয়েক শ' বছর পূর্বে উত্তর আমেরিকার এরিজোনা (Arizona) মরুভূমিতে পড়েছিল একটি অতি বড় উল্কা। পৃথিবীর বুকে বারশত মিটার গোলাকার একটি বিরাট গহ্বরের সৃষ্টি করেছিল। সংঘর্ষের ফলে তার যে টুক্‌রার সৃষ্টি হয়েছিল তা পাঁচ মাইল দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। এভাবে আরও অনেক কয়টি বড় বড় উল্কা পৃথিবীর বুকে নিপতিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলো সাধারণত মরুভূমি ও মহা-সমুদ্রসমূহে নিপতিত হয়েছিল। এই কারণে তার দরুন দুনিয়ার মানুষ তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। তা সত্ত্বেও উল্কাসমূহের (Shooting strar) এই বর্ষণ কখনও কখনও অস্বাভাবিক রূপও পরিগ্রহ করে। আর তা পৃথিবীর বুকে এমন ধরনের মহাপ্রলয়ের সৃষ্টি করতে পারে, যেমনটা ইসলামের পরকাল বিশ্বাসে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মহাবিশ্বে অসংখ্য তারকা নক্ষত্র নিরন্তর নিরুদ্দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। খগোলবিদ্যার অধ্যয়নে জানা যায়, এই নক্ষত্রসমূহ কখনও কখনও পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। পৃথিবী সৃষ্টি সংক্রান্ত মতবাদ এইরূপ একটি সংঘর্ষ বিশ্বাসের উপর ভিত্তিশীল। এই সংঘর্ষটিকেই যদি আমরা বিরাট আকারে কল্পনা করি, তা হলে আমরা অতি সহজেই আলোচ্য বিষয়টি বুঝতে পারি। কেননা এইরূপ একটি সংঘর্ষেরই অপর নাম কিয়ামত।

এই দৃষ্টিতে বিচার করা হলে পরকাল বিশ্বাসের ব্যাপারটি শুধু এতটুকু যে, বিশ্বলোকের অভ্যন্তরে প্রাথমিক পর্যায়ে ও ক্ষুদ্রায়তনে যে ঘটনা নিহিত রয়েছে, তা-ই একদিন চরম ও চূড়ান্ত মাত্রায় এবং সর্বাত্মকভাবে সংঘটিত হয়ে পড়বে। এই কারণে পরকাল হওয়াটা আমাদের নিকট একটি জানা সত্য। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, এখন আমরা তার সম্ভাব্যতাটুকু জানি। আর ভবিষ্যতে তা-ই বাস্তব ঘটনারূপে আমরা দেখতে পাব। তখন আমাদের 'জানা'টা রূপান্তরিত হবে 'দেখায়'।

মৃত্যুর পর জীবন

এরপর বিশ্লেষণীয় বিষয় হচ্ছে 'মৃত্যুর পর জীবন' সংক্রান্ত ব্যাপার। বহু লোকই তার সত্যতা মেনে নিতে প্রস্তুত নন। তাদের ধারণা মৃত্যুর পর মানুষ চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যায়। কাজেই আবার জীবন লাভের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু মৃত্যুর পর জীবনের সম্ভাব্যতা স্বীকার না করা একটা হাস্যকর বৈপরীত্যের স্বীকৃতি। আজ যারা মৃত্যুর পর জীবনের সম্ভাব্যতাকে অস্বীকার করতে চান, তাঁরা বর্তমান জীবনের অস্তিত্ব তো অবশ্যই স্বীকার করেন। তা হলে একবার যে জীবনটা সম্ভবপর হল, সেই জীবনটা পুনরায় সম্ভব নয় বলে মনে করা যেতে পারে কোন যুক্তিতে? একটি ঘটনাকে যদি আমরা বর্তমানে সত্য বলে স্বীকার করি, তাহলে ভবিষ্যতে অনুরূপ ঘটনা আবার সংঘটিত হওয়ার সম্ভাব্যতাকে অস্বীকার করার মত বিবেক-বিরুদ্ধ ও হাস্যকর ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না।

বর্তমান কালের মানুষ এই বিশ্বলোকের ব্যাখ্যাদান পর্যায়ে নিজেরাই যে 'আল্লাহ্'কে কল্পনা করেছে, সে 'আল্লাহ্' ঘটনাবলীকে পুনর্বার সংঘটিত করতে সক্ষম বলে দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করে। কিন্তু ধর্ম বিশ্বাস যে আল্লাহ্‌র কথা বলে, তিনি ঘটনাবলীকে পুনর্বার অস্তিত্ব দানে সক্ষম, এই কথা মেনে নিতে সে সব লোক প্রস্তুত হচ্ছে না। বস্তুত একালের মানুষের জীবনে এ এক বিস্ময়কর বৈপরিত্য (Self-Contradiction)। দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক জেমস্ জীনস্ বর্তমান পৃথিবী এবং এর সমস্ত Phenomenon একটি দুর্ঘটনার ফলশ্রুতি বলে ঘোষণা করেছেন। অতঃপর তিনি লিখেছেন ঃ

'আমাদের এই পৃথিবী যদি নিছক কয়েকটি দুর্ঘটনার ফলে অস্তিত্ব লাভ করে থাকে তা হলে তাতে বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নেই। পক্ষান্তরে বিশ্বলোক যদি এমনিভাবে দীর্ঘকাল ধরে বর্তমান থাকে, তাহলে অনুমানযোগ্য যে কোন দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর।'

(Modern Scientific Thought, P-3)

এই পর্যায়ে আমরা ক্রমবিকাশ-তত্ত্বের একটি বিশেষ দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করতে চাই। এই মতাদর্শের দৃষ্টিতে জীব-জন্তুর বিভিন্ন প্রজাতি একটি মাত্র প্রাথমিক প্রজাতি (Species) থেকে উন্নতি (Evolution) করে অস্তিত্ব লাভ করেছে। ডারউইনের ব্যাখ্যানুযায়ী একালের জীরাফ শুরুতে অন্যান্য ক্ষুরসম্পন্ন চতুষ্পদ জন্তুর মতই ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে ক্ষুদ্র সামান্য পরিবর্তনের (variations) একত্রিভূত হওয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত তা অস্বাভাবিকভাবে এক দীর্ঘদেহ কাঠামো অর্জনে সফল হয়েছে। এই কথাটির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে লিখেছেন ঃ

'(দীর্ঘকাল পর্যন্ত কাংখিত কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে) একটি সাধারণ ক্ষুরসম্পন্ন চতুষ্পদ জন্তু জীরাফের আকারে পরিবর্তিত করা সম্ভবপর। আমার মতে এ ব্যাপার প্রায় দৃঢ় প্রত্যয়ের পর্যায়ে গণ্য।'

(The origin of Species, London 1948-P. 169)

বস্তুত যে ধরনের অবস্থার বর্তমানতার জীবন ও বিশ্বলোকের অস্তিত্ব লাভের কারণ বলে মনে করা হবে, তা যদি একবার নিঃশেষ হয়ে পুনর্বার সংগৃহীত হতে পারে, তাহলে নিঃসন্দেহে এই ঘটনাবলীই পুনর্বার সংঘটিত হলে—সহজ কথায়, এই বিশ্বলোক ও জীবন পুনর্বার অস্তিত্ব লাভ করতে পারে। জীবন ও বিশ্বলোকের যে বিশ্লেষণই যে দিক না কেন, এই কথার সত্যতা তাকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে। এই যুক্তির ভিত্তিতেই বলতে চাই, বিবেক বুদ্ধি ও যুক্তির বিচারে মৃত্যুর পর জীবন বর্তমান জীবনের মতই অকাট্যভাবে সম্ভবপর। বিশ্বলোকের 'স্রষ্টা'রূপে যাকেই মেনে নেয়া হোক, তিনি একবার যে সব ঘটনা সংঘটিত করতে পেরেছেন, তা তিনি পুনর্বারও সংঘটিত করতে সক্ষম বলে মেনে নেয়া ছাড়া কোনই উপায় থাকতে পারে না। অবশ্য বর্তমানের বাস্তবতাকেই যদি কেউ অস্বীকার করার ধৃষ্টতা দেখাতে চায়, তবে তার কথা স্বতন্ত্র। তাকে সুস্থ মানুষ মনে করার মত অসুস্থতায় আমরা ভুগছি না। কিন্তু আমাদের কথা হল, বর্তমানের জীবনকে বাস্তব বলে স্বীকার করার পর পুনর্বার এই জীবনের সম্ভাব্যতাকে অস্বীকার করার কোন যুক্তি বা ভিত্তিই থাকতে পারে না।

অবশ্য একটি বিশেষ কারণে দ্বিতীয়বার জীবন হওয়ার সম্ভাব্যতার ব্যাপারে সাধারণত সন্দেহ পোষণ করা হয়। মানুষ সাধারণত মানুষকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেহসম্পন্ন সত্তা মনে করে। এই দেহ যখন মরে যায়, তখন তার অংশসমূহ বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এইরূপ অবস্থায়ই মনে করা হয় যে, মানুষ চিরতরে নিঃশেষ ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু দেহের ধ্বংস হয়ে যাওয়াকেই যদি 'মৃত্যু' মনে করা হয়, তাহলে 'মৃত্যুর' পরও মানুষ জীবিতাবস্থায় বেঁচে থাকে বলে আমরা সহজেই মনে করতে পারি।

কেননা মানবদেহ কতিপয় বিশেষ উপকরণে সৃষ্ট। প্রধানত তাকে বলা হয় কোষ (Cell)। কোষ হচ্ছে অতীব জটিল সংগঠনসম্পন্ন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু। মধ্যম আকারের একটি মানবদেহে প্রায় sperm রয়েছে। অসংখ্য ক্ষুদ্রকায় ইঁট দ্বারা যেমন প্রাসাদ নির্মিত হয়, মানবদেহ-প্রাসাদও এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ ইঁট দ্বারা নির্মিত। (কোষসমূহকে ইঁটের সাথে তুলনা করা হয়েছে মাত্র। অন্যথায় কোষ অত্যন্ত ক্ষুদ্র জীবাণু) প্রত্যেকটি ধাতবযন্ত্রে নিরন্তর ঘর্ষণে অবক্ষয় ও অবচয়

(Depreciation) হতে থাকে। আমাদের দেহ যন্ত্রেও ঘর্ষণজনিত এই অবক্ষয় সুনিশ্চিত। দেহ প্রাসাদের ইঁটসমূহ এই ঘর্ষণের ফলে নিরন্তর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ক্ষয় ও সংখ্যায় হ্রাস হতে থাকে। খাদ্যের মাধ্যমে উহার ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হওয়ার ব্যবস্থা হয়। খাদ্য হজম হয়ে আমাদের দেহের এই ক্ষয় ও হ্রাসপ্রাপ্ত ইঁটসমূহ পুনর্নির্মিত হতে থাকে। কোষ পরিবর্তনের এই কার্যক্রম সংঘটিত হয় অত্যন্ত দ্রুত ও তীব্র গতিতে। আমাদের রক্তে সহস্র কোটি সংখ্যক লাল কণিকা রয়েছে। প্রতি সেকেণ্ডে তা থেকে প্রায় এক লক্ষ কণিকা নিঃশেষ হয়ে যায় ও তদস্থলে সম্পূর্ণ নতুন কণিকার জন্ম হয়। কোষ পরিবর্তনের দ্রুততা সম্পর্কে এ থেকেই অনুমান করা চলে। আমাদের দেহযন্ত্রে আমাদের সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতসারে প্রতিটি নিমেষে এই পরিবর্তন কার্যকর হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এমন একটা সময় আসে, যখন পুরাতন সমস্ত ইঁটই নিঃশেষে চূর্ণ হয়ে বের হয়ে যায় এবং সেই স্থানে সম্পূর্ণ নতুন 'ইট' এসে বসে যায়। শিশুদের দেহে এই কার্যক্রম খুব দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়। আর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার গতিতে মন্থরতা সূচিত হয়। সম্পূর্ণ বয়সের গড় হিসাব করলে বলা যায়, প্রতি দশ বৎসরান্তর এক-একটি দেহ সম্পূর্ণ নতুন ইট বা কোষ দ্বারা তৈরী হয়ে যায়। তাতে পুরাতন কোষ একটিও অবশিষ্ট থাকে না।

এ হচ্ছে জৈবদেহের অবক্ষয় ও নিঃশেষ হওয়ার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া প্রতি মুহূর্তে সক্রিয় এবং চালু। কোন একটি মুহূর্তেও এই প্রক্রিয়ার কার্যকরতা স্তব্ধ হয়ে যায় না। এর ফলে জৈবদেহ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। কিন্তু জৈবদেহের এই বস্তুগত পরিবর্তনের কোন প্রতিক্রিয়া অভ্যন্তরস্থ 'মানুষ'টির উপর প্রবর্তিত হয় না। অভ্যন্তরস্থ মানবসত্তা নিজ অবস্থায় সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত ও চিরন্তন হয়ে থেকে যায়। মানুষের জ্ঞান, বিদ্যা, স্মরণ শক্তি, তার চিন্তা-কল্পনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বভাব-চরিত্র আদত-অভ্যাস–সবকিছুই যথারীতি একই অবস্থায় অপরিবর্তিত হয়ে থাকে। মানুষ তার বয়সের প্রতিটি স্তরে সেই আসল মানুষটিই থেকে যায়। দশ বছর পূর্বে যে 'মানুষটি ছিল, দশ বছর পরও সেই মানুষটিই অক্ষত' থাকে। মানুষ নিজেকে তা-ই মনে করে, নিজ সম্পর্কে মানুষ তা-ই অনুভব করে। মনে করে, আমি সেই মানুষটিই রয়ে গেছি, যা ছিলাম দশ-বিশ বছর পূর্বে।

এ প্রেক্ষিতে প্রশ্ন হল, কেবলমাত্র জৈবদেহের পরিসমাপ্তিরই নাম যদি 'মৃত্যু' হয়, তা হলে বলতে হবে, এই কার্যক্রমের প্রতিবারের সম্পূর্ণতা লাভে পূর্বের মানুষটির মৃত্যু হয়ে গেছে। আর এক্ষণে তাকে আমরা যে জীবিত দেখতে পাচ্ছি,

এটা তার নতুন ও দ্বিতীয় জীবন। পূর্ববর্তী জীবনের পরিসমাপ্তি অন্যকথায় মৃত্যুর পর সে এই নতুন ও দ্বিতীয় জীবন লাভ করেছে। তার অর্থ দাঁড়ায়, পঞ্চাশ বছর বয়সের যে জীবিত ব্যক্তিটিকে আমরা চলাফেরা ও কাজ-কর্ম করতে দেখতে পাচ্ছি, সে আসলে তার এই সংক্ষিপ্ত জীবনে অন্তত পাঁচবার 'মরে গিয়ে বা মৃত্যুবরণ করে' পুনর্বার জীবন লাভ করেছে। আর পাঁচবার করে দৈহিক মৃত্যু বরণের পরও যে লোকটি মরে গেল না, সে ষষ্ঠবারের মৃত্যুতে মরে নিঃশেষ হয়ে যাবে কেন?

ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক দর্শনকেও আমরা এই আলোচনায় আনতে চাই দৃষ্টান্ত স্বরূপ মাত্র। ফ্রয়েডের গবেষণা অনুযায়ী 'অবচেতনা' (Subconscious) কিংবা অন্যকথায় মানুষের স্মৃতিপটে তার সমস্ত চিন্তা বিশ্বাস মতবাদ চিরকালের জন্য অক্ষত ও সুরক্ষিত থেকে যায়। এটা আজকাল সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত কথা বলে স্বীকৃত। এই তত্ত্ব অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, মানুষের মন তার দেহের অংশ নয়। কেননা মানব দেহের অণুসমূহ (কোষ) প্রতি দশ বছরান্তর সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়। কিন্তু অবচেতনায়—স্মৃতি শক্তির দফতরে শত বছর পরও কোন পরিবর্তন, কোন অস্পষ্টতা বা স্মৃতি বিকৃতির উদ্ভব হয় না। স্মৃতি শক্তির ভাণ্ডার যদি দেহের সহিত সম্পৃক্ত হত, তা হলে এই পরিবর্তন ঝঞ্ঝা বাত্যায় তা কেমন করে রক্ষা পায়, কোথায় গিয়ে থাকে? তা দেহের কোন অংশে বিরাজ করে? দেহের 'অণু'সমূহ যখন কয়েক বছর পর নিঃশেষে খতম হয়ে যায়, তখন তা নিঃশেষ ও বিলীন হয়ে যায় না কেন? এ কি রকমের রেকর্ডিং? 'রেকর্ড পাত্রটিতো ভেঙ্গেচুরে খান হয়ে যায়, অথচ সেই রেকর্ডের 'বক্তব্য' কখনই নিঃশেষ ও বিলীন হয়ে যায় না? আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক এ অধ্যয়ন অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, 'চেতনা' দেহ থেকে স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন ও ভিন্নতর কোন জিনিস। আর মৃত্যু হয় দেহের, আত্মার কোন মৃত্যু নেই।

উপরের আলোচনা থেকে আরও একটা তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হল। আর তা হচ্ছে দূরত্ব ও সময়ের নিয়ম-কানুন কেবলমাত্র আমাদের বর্তমান জগতের মধ্যেই কার্যকর। মৃত্যুর পর আর একটি জগত যদি হয়, তবে তা অনিবার্যভাবে এই নিয়ম-কানুনের কার্যকারিতা ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বাইরে অবস্থিত থাকবে। বর্তমান জীবনে আমাদের প্রতিটি সচেতন কাজ সময় ও দূরত্বের নিয়ম অনুযায়ী সাধিত হয়। কিন্তু ফ্রয়েডের ব্যাখ্যানুযায়ী এই সব নিয়মের বাধ্যবাধকতামুক্ত কোন 'মানস জীবন' যদি থেকে থাকে তাহলে তার সুস্পষ্ট অর্থ হচ্ছে, আমাদের এই জীবনটি মৃত্যুর পরও অব্যাহত ও অক্ষত থাকবে। অর্থাৎ আমরা মৃত্যুর পরও

জীবিত থাকব। কেননা আমাদের এই মৃত্যুর দূরত্ব ও সময়ের (Time & Space) নিয়ম-কানুনের কার্যকরতার ফলশ্রুতি। আমাদের আসল সত্ত্বা-আর ফ্রয়েডের ভাষায় আমাদের অবচেতনা—এই সব নিয়ম কানুনের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত বলে তার মৃত্যু ঘটতে পারে না। মৃত্যু হয় কেবলমাত্র বস্তুসৃষ্ট দেহসত্তার। অবচেতনাই হচ্ছে আসল মানুষ। দেহসত্তার মৃত্যুর পরও তা পূর্বের ন্যায় অক্ষতভাবেই বেঁচে থাকে।

কেউ কেউ হয়ত এই যুক্তিকে যথার্থ বলে মেনে নিতে প্রস্তুত হবেন না। তারা বলতে চাইবেন ঃ যে 'মন' বা অভ্যন্তরস্থ সত্তাকে তুমি 'আসল মানুষ' বলছ, তা তো ভিন্নতর কিছু নয়। বাহ্যিক জগতের সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের ফলেই তার উদ্ভব। সমস্ত চিন্তা-বিশ্বাস-মতবাদ-হৃদয়াবেগ বস্তুগত কার্যক্রম চলাকালে ঠিক তেমনিভাবেই দানা বেঁধে উঠে, যেমন করে দুই টুকরা ধাতুর পারস্পরিক ঘর্ষণে তাপ বা উষ্ণতার সৃষ্টি হয়। আধুনিক দর্শন আত্মার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আদৌ স্বীকার করে না। জিম্‌স বলেছেন, 'চেতনা' একটা স্বতন্ত্র সত্তা (Entity) রূপে বর্তমান নেই। তা আছে এক ধারাবাহিক কার্যক্রম (Function) রূপে। ওটা একটা ক্রিয়া বা প্রক্রিয়া (Process) মাত্র। একালের বহু সংখ্যক দার্শনিক দৃঢ় কণ্ঠে বলেছেন, 'চেতনা' বাইরে থেকে সৃষ্ট একটা আবর্তের স্নায়ুবিক প্রতিক্রিয়া (Nervous Response) মাত্র। এই চিন্তার দৃষ্টিতে মৃত্যু—অর্থাৎ দেহ ব্যবস্থার স্পষ্টতার পর মানুষের অস্তিত্ব বর্তমান থাকার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আর এই দৃষ্টিতে মৃত্যুর পর আর একটি জীবন হওয়ার মত সম্পূর্ণ বিবেকবিরুদ্ধ।

এর জওয়াবে আমরা শুধু এতটুকুই বলতে চাই যে, এটাই যদি মানুষ সম্পর্কে চূড়ান্ত সত্য কথা হয়ে থাকে, তা হলে তো মানুষ সৃষ্টি করা আমাদের জন্য খুবই সম্ভবপর হওয়া আবশ্যক। কেননা মানবদেহ কি কি উপাদান দিয়ে তৈরি তা আজ আমরা যথার্থভাবে জানতে পেরেছি। উপাদানসমূহ পৃথিবীর যত্রতত্র বিপুল পরিমাণে পাওয়া যায়। আর তা সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নয়। মানুষের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাকে অতীব সূক্ষ্মতা সহকারে জেনেও নিয়েছি আমরা মানবদেহের সংগঠনসংস্থা ও তার কাঠামো কিভাবে নির্মিত, তা বর্তমানে আমাদের জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া আমাদের শিল্পীরাও মানুষের সঙ্গে পুরামাত্রায় সংগতিসম্পন্ন অবয়ব নির্মাণে সব সক্ষম। পূর্বোল্লিখিত মতাদর্শে বিশ্বাসী লোকেরা যদি প্রত্যয়সম্পন্ন হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁরা বহু সংখ্যক মানবদেহ নির্মাণ করে পৃথিবীর নানাস্থানে দাঁড় করিয়ে দিতে এবং বাহ্যিক দুনিয়ার প্রভাবে পড়ে সে দেহগুলি চলতে ও বলতে শুরু করে দিবে তার

অপেক্ষায় বসে থাকতে এগিয়ে আসছেন না কেন, এটা আমাদের আজও বোধগম্য হচ্ছে না।

কিছু সংখ্যক লোক আবার পরকালীন জীবন সম্পর্কিত এই বিশ্বাস পরিবেশের ফলশ্রুতি বলে মনে করে নিয়েছেন। তাঁদের ধারণা, বর্তমান জীবনে আমাদের ব্যর্থতা এক উত্তম জীবনের বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে এই বিশ্বাস জাগিয়ে দিয়েছে। তারই দরুন এই বিশ্বাসের জন্ম ও উদ্রেক। পরিবেশের পরিবর্তনে এই বিশ্বাসের অবলুপ্তি অনিবার্য, কেননা উন্নত ও স্বচ্ছন্দ পরিবেশে এইরূপ বিশ্বাস স্থিতিলাভ করতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, প্রাচীন রোমে বসবাসকারী বিপুলসংখ্যক দাস খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কেননা এই ধর্ম আকাশ মার্গে উন্নত ও স্বচ্ছন্দ জীবনের সম্ভাবনা মানুষের মনে জাগিয়ে দিয়েছিল। অথচ বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হলে এই দুনিয়ায়ই স্বচ্ছন্দ জীবন লাভ হবে এবং তখন এই বিশ্বাসটিও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সম্পর্কে একটি কথা স্বতঃসিদ্ধ। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক পরিবেশ যদি 'মৃত্যুর পর জীবন বিশ্বাসকে' ম্লানও করে দেয়, তবু এই বিজ্ঞানই যে তার পক্ষে অকাট্য প্রমাণও উপস্থাপিত করেছে তা নিঃসন্দেহ। Society for Psychial Research [২]-এর গবেষণার ফলাফল তার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কতিপয় সুনির্দিষ্ট সত্যের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করার পর কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মৃত্যুর পরও মানুষের আত্মা কোন উচ্চতর অবস্থায় বর্তমান থাকে। এই ধরনের সংগঠন সংস্থার গুরুত্ব হয়ত অনেকেই স্বীকার করবেন না। তা সত্ত্বেও এসবের গবেষণার সমালোচকগণ একথা মানতে বাধ্য হবেন যে, তার যৌক্তিক গুরুত্ব যা-ই হোক, বিজ্ঞান জগতের বর্তমান মানুষও আত্মার স্থিতি ও অবস্থিতির মতটিকে আদৌ উড়িয়ে দিতে পারে না।

বৈজ্ঞানিক উন্নতিলব্ধ স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাচ্ছল্য বৃদ্ধি পেলে 'মৃত্যুর পর জীবন' বিশ্বাসের স্বতঃই অবলুপ্তি ঘটবার ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। অতীত বা বর্তমানে তার সত্যতার কোনই প্রমাণ নেই। আমরা স্পষ্ট লক্ষ্য করছি, বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সত্ত্বেও মানুষ অত্যন্ত দ্রুততা সহকারে আত্মহত্যার দিকে চলে যাচ্ছে। তাহলে বিজ্ঞানের কোন উন্নতি মানুষের জীবনে প্রকৃত কল্যাণ এনে দিবে? বৈষয়িক সাজ-সরঞ্জামের প্রাচুর্য—'মৃত্যুর পর জীবন' বিশ্বাস বিলুপ্ত করে দিবে এ কথা প্রমাণিত। বস্তুত মানুষের জন্য মৃত্যুর বিপদ যদ্দিন থাকবে প্রকৃতপক্ষে

২ এই প্রতিষ্ঠানটি ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য দেশেও এই ধরনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। মানুষের অতিপ্রাকৃতিক যোগ্যতাসমূহের পরীক্ষণমূলক অধ্যয়নই এর উদ্দেশ্য।

তদ্দিন কোনরূপ বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণের ধারণা পর্যন্ত করা যায় না। মৃত্যুর সম্ভাব্যতার দরুন দুনিয়ার মানুষের যে কোন আনন্দ একটা সাময়িক ও অন্তঃসারশূন্য অট্টহাস্য মাত্র। তার অন্তরালে প্রকৃত চেতনার কোনই অস্তিত্ব নেই।

কার্যাবলীর রেকর্ডিং

এই মতাদর্শেরই আর একটি অংশ হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তির কার্যাবলীর রেকর্ড তৈরি হওয়া। কিয়ামতের দিন এই রেকর্ড আল্লাহ্ তাআলার সম্মুখে উপস্থাপিত করা হবে। কুরআন মজীদ উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে ঃ

"মানুষের মুখ থেকে যে শব্দই উচ্চারিত হয় তা লিখে রাখার জন্য তার ডানে ও বামে দুইজন ফেরেশ্তা নিযুক্ত রয়েছে।"

বস্তুত মানুষের সমস্ত কাজই পূর্ণ নির্ভুলতা সহকারে লিপিবদ্ধ হচ্ছে। এমনকি, মানুষ মনে মনে যা কিছু চিন্তা ভাবনা করে, তা-ও লিপিবদ্ধ হতে থাকে। তা্-ও আল্লাহ্র নিকট পেশ করা হবে। এই কথাটির যথার্থতা ও তাত্ত্বিকতা অনুধাবন করা বর্তমান সময় আমাদের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নয়। আল্লাহ্ ও ফেরেশতাদের আমরা দেখতে পাই না একথা সত্য; কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান এর সত্যতা-যথার্থতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করছে। মানুষের সমস্ত কার্যাবলী—কথা, কাজ ও ভাবনা-চিন্তা সম্পূর্ণ ও যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে, একথায় আজ আর কোন সন্দেহেরই অবকাশ নেই।

> আমাদের মনে যে সব ভাবনা-চিন্তার উদ্রেক হয়, আমরা সাধারণত খুব শীঘ্র তা সম্পূর্ণ বা আংশিক ভুলে যাই। মনে হয়, তা চিরতরে বিলীন ও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই সমস্তই পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ীভাবে সুরক্ষিত থাকে। আমরা শত চেষ্টা করলেও তা নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারিনে। এই সত্য প্রমাণ করে যে, আমাদের চেতনাই মানবীয় ব্যক্তিত্বের আসল পরিচয় নয়, আমাদের চেতনার নিম্নস্তরে মানবীয় মনস্তত্ত্বের একটা অংশ লুকিয়ে থাকে। ফ্রয়েড তার নাম দিয়েছেন Unconscious। এটি আমাদের ব্যক্তিসত্তার একটা বিরাট অংশ বটে। মানব মন যেন সমুদ্রে ভাসমান বরফ খণ্ড (Iceberg)। তার কেবলমাত্র নবম-অংশই উপরে দৃশ্যমান থাকে। আর অবশিষ্ট আটভাগ থাকে সমুদ্র-উপরিতলের নিচে। এটি হচ্ছে মানব মনের অবচেতন অংশ। আমাদের যাবতীয় চিন্তা-খেয়াল এখানেই সঞ্চিত ও সুরক্ষিত হয়ে থাকে। ফ্রয়েড তাঁর একুশতম ভাষণে বলেছিলেন ঃ

"যুক্তিবিদ্যার নিয়মাবলী বরং বিপরীতের নিয়মাবলীও অবচেতনার (১) কার্যক্রম পরিব্যপ্ত হয় না। পরস্পর বিপরীত কামনা-বাসনাসমূহ এখানে পরস্পরকে ধ্বংস না করে পাশাপাশি চিরদিন বর্তমান থেকে যায়। ..... অবচেতনায় নেতিবাচকের সাথে সামঞ্জস্যশীল কোন জিনিস নেই। আমরা এ দেখে বিস্মিত হই যে, অবচেতনার জগতে দার্শনিকদের দাবী মিথ্যা হয়ে যায়। তাঁদের দাবী হল, আমাদের মগজের সমস্ত কাজকর্ম সময় ও স্থানের (space) মাঝে সংঘটিত হয়ে থাকে। সময়ের ধারণার সাথে সামঞ্জস্যশীল কোন জিনিসই অবচেতনায় নেই। অবচেতনায় সময়ের প্রবাহের কোন চিহ্ন নেই। সময়ের অতীত হয়ে যাওয়ার মানসিক কার্যে কোনরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হয় না, এ এমন একটা মহাবিস্ময় উদ্রেককারী ব্যাপার, যার তাৎপর্য অনুধাবনের প্রতি দার্শনিকগণ এখন পর্যন্তও কোন ভ্রূক্ষেপই করেননি। Conative Impulses বা ইচ্ছার তাড়না, ঝোঁক প্রবণতা এমন, যা কখনও অবচেতনার বাইরে আসেনি। আর যে সব মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে অবচেতনায় ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে, তা সবই প্রকৃতপক্ষেই অক্ষয় ও স্থায়ী হয়ে থাকে। বহু বছর পর্যন্ত তা এমনভাবে মনের মণি কোঠায় সুরক্ষিত হয়ে থাকে, মনে হয়, যেন তা এই কাল-ই গড়ে উঠেছে।"

(New Introductory Lectures on Psycho-Analysis. London, 1949. P-99)

মনস্তত্ত্ববিজ্ঞানে ফ্রয়েডের এই মতাদর্শ বর্তমানে সাধারণভাবে গৃহীত। এ থেকে জানা যায় মানুষ যা কিছু চিন্তা-ভাবনা করে, যে চিন্তাই মানুষের মনোলোকে প্রবাহিত হয়, তা সবই মানব মনে এমনভাবে মুদ্রিত ও অংকিত হয়ে যায়, যা কখনই অবলুপ্ত, নিশ্চিহ্ন ও নির্মূল হয়ে যায় না। মানুষ নিজে তা ভুলে গেলেও সময়ের আবর্তন কিংবা অবস্থার পরিবর্তন তাতে কোনরূপ পরিবর্তন সৃষ্টি করে না। কিন্তু মানুষের মনের ইচ্ছা-বাসনা-কামনা ও বাস্তব কার্যাবলী এমন সতর্কতা ও সংরক্ষণতা সহকারে মানুষের রেকর্ড কক্ষে—অবচেতনায় সংরক্ষিত থেকে এই বিশ্বলোকে কোন মহৎ উদ্দেশ্য পূর্ণ করছে, তা অনুধাবন করা মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই কারণে তিনি এ বিষয়ে চিন্তা-বিবেচনা-গবেষণা করার জন্য দার্শনিকদের আহ্বান জানিয়েছেন, কিন্তু এই মতটিকে পরকাল বিশ্বাসের বশে রেখে বিবেচনা-পর্যালোচনা করলে এর যথার্থতা ও অন্তর্নিহিত মহাসত্য সহজেই জানতে পারা যায়। বস্তুত এই 'অবচেতনা'টাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র সংরক্ষণ কক্ষ। এখানেই প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা-ইচ্ছা কামনা-বাসনা-মানসিক ভাবধারা অত্যন্ত সুষ্ঠুতা ও শুদ্ধতা সহকারে লিপিবদ্ধ করা হয়।

অতঃপর মানুষের মুখের কথার ব্যাপারটি বিচার্য। পরকাল বিশ্বাস বলছে, মানুষ ভাল কথা কিংবা মন্দ কথা বা গালাগাল—যা-ই মুখে উচ্চারণ করে, আল্লাহ্‌র বন্দেগী কবুল করার আহ্বান জানাবার কাজে মুখকে ব্যবহার করে, অথবা শয়তানের প্রচার চালায়, সর্বাবস্থায়ই এক খোদায়ী ব্যবস্থাধীনে সে সবের পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড নির্মিত হচ্ছে। এই ব্যাপারটি বর্তমান দুনিয়ায় নিত্য সংঘটিত ও সকলের জানা ঘটনাবলীর সংগে পুরামাত্রায় সংগতিপূর্ণ। কথা বলার জন্য মানুষ যখনই স্বীয় জিহ্বাকে নাড়ায়, তখন তার চাপে বায়ুমণ্ডলে একটা তরঙ্গের সৃষ্টি হয়—নিস্তরঙ্গ পানিতে ঢিল নিক্ষেপ করলে যেমনটা হয়। এই তরঙ্গই ধ্বনিত হয়ে কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হয়। আর কর্ণযন্ত্র তা গ্রহণ করে মগজে পৌঁছে দেয়। আমরা এভাবেই একজনের কথা অনুধাবন করে থাকি। প্রচলিত কথায় একেই বলা শ্রবণ করা বা শোনা।

এই তরঙ্গমালা সম্পর্কে একথা প্রমাণিত যে, তা একবার জেগে উঠলে মহাশূন্যে তা চিরদিনের জন্য বর্তমান থাকে। এই সব ধ্বনিকে ধারণ করার ক্ষমতা বিজ্ঞান এখনও অর্জন করেনি, এ পর্যায়ে এখন পর্যন্ত বিশেষ কোন চেষ্টাও করা হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও নীতিগতভাবে একথা মেনে নেয়া হয়েছে যে, ব্রডকাষ্টিং ষ্টেশন থেকে প্রচারিত শব্দ আমরা যেমন করে রেডিওসেটের সাহায্যে শ্রবণ করি, তেমনিভাবে প্রাচীনকাল থেকে বায়ু তরঙ্গে প্রবহমান ধ্বনিসমূহ নতুন করে ধরবার ও শোনবার যন্ত্র নির্মাণ করা সম্ভব। ব্যাপারটি বাস্তবিকই বিস্ময়কর। আর এই বিস্ময়কর মতটিই ইসলামের পরকাল বিশ্বাসের বিরাট সমর্থক। পরকাল বিশ্বাসের দাবী হল, আমাদের প্রত্যেক কথা সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র নিজস্ব রেজিষ্টারে পুরামাত্রায় লিপিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এই কথারই বাস্তবতা প্রমাণ করছে। ইরানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মুসাদ্দেককে ১৯৫৩ সনে আটক করে একটা কক্ষে বন্দী করে রাখা হয় এবং সেখানে এমন একটি যন্ত্র বসিয়ে দেয়া হয়েছিল, যা তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত প্রত্যেকটি কথা স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেকর্ড হয়ে যেত। উত্তরকালে তা-ই বিচারকের সম্মুখে তাঁর অপরাধের প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা হয়। আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে, প্রত্যেকটি মানুষের সঙ্গেই এমনিভাবে আল্লাহ্‌র ফেরেশতা—বৈজ্ঞানিক ভাষায়, অদৃশ্য স্বয়ংক্রিয় রেকর্ডিং যন্ত্র-নিযুক্ত হয়ে আছে। আমাদের মুখ থেকে নিঃসৃত ও উচ্চারিত প্রত্যেকটি কথা পুরামাত্রায় নির্ভুলতা সহকারে বিশ্বলোকপটে মুদ্রিত ও অংকিত হয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারটির বাস্তবতা আমাদের পক্ষে যতই দুর্বোধ্য হোক, এর বাস্তবতাকে অস্বীকার করার—এর সত্যতা উড়িয়ে দেয়ার—ক্ষমতা আজ কারুরই নেই।

এরপর কার্যাবলী রেকর্ড হওয়ার ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করা যাচ্ছে। এই পর্যায়ে এ পর্যন্তকার অর্জিত জ্ঞান বিস্ময়করভাবে ইসলামের পরকাল বিশ্বাসের সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করছে। আধুনিক ও সর্বশেষ চিন্তা-গবেষণা প্রমাণ করছে যে, অন্ধকারে কিংবা আলোকজ্জ্বল পরিমণ্ডলে, স্থিতিশীল কিংবা গতিশীল যে কোন অবস্থায়ই থাক-না-কেন, প্রত্যেকটি জিনিসই নিজ থেকে ক্রমাগতভাবে নিরন্তর তাপ নিষ্কাশন করতে থাকে। যে-কোন জিনিস থেকে নিষ্কান্ত তাপ-তরঙ্গ (Heat Waves) ধারণ করে তার পূর্বকার অবস্থার ছবি গ্রহণে সক্ষম ক্যামেরা তৈয়ার করা একালে সম্ভবপর হয়েছে। যেমন, আমরা কিছুক্ষণের জন্য কোন হলঘরে অবস্থান করে সেখান থেকে চলে গেলে, এখানে অবস্থান কালে আমরা যে তাপ তরঙ্গ নিষ্কান্ত করেছি, তা সেখানে পুরাদস্তুর বর্তমান থাকে। পরে Heat-seeing camera -র সাহায্যে শূন্য হলঘর থেকে আমাদের সকলের তথায় অবস্থানকালীন ছবি তোলা খুবই সহজ হয়ে দেখা দিয়েছে। এই সব ক্যামেরায় Infra-red লাল উজানী আলোকচ্ছটা দ্বারা কাজ নেয়া হয়ে থাকে। এই কারণে এই ক্যামেরা অন্ধকার ও আলোকে সমানভাবে ছবি গ্রহণে সক্ষম। আধুনিক আমেরিকা ও ইংলণ্ডে এই ধরনের ক্যামেরা দ্বারা বহু কাজ নেয়া হচ্ছে। কয়েক বছর পূর্বের একটি ঘটনা উল্লেখ্য। নিউইর্য়ক শহরের উপর একটি রহস্যময় উড়োজাহাজ কয়েকবার চক্কর দিয়ে চলে যায়। তার পর পরই উপরোক্ত ক্যামেরার সাহায্যে শূন্যলোক থেকে সেই জাহাজটির 'তাপ-ছবি' গ্রহণ করা হয়। আর সেই ছবি দেখে জাহাজটি কোন্ ধরনের ছিল তা নিঃসন্দেহে জানতে পারা সম্ভবপর হয়েছিল। (Reader's Digest-Nov., 1960) এই ক্যামেরার নাম হচ্ছে Evaporagraph। এই ক্যামেরার কথা উল্লেখ করে একটি প্রখ্যাত দৈনিক পত্রিকা লিখেছিল যে, এই ঘটনার তাৎপর্য হচ্ছে, ভবিষ্যতে আমরা আমাদের অতীত ইতিহাসকে রূপালী পর্দার উপর প্রবহমান দেখতে সক্ষম হব। আর সম্ভবত অতীতকালের ঘটনাবলী সম্পর্কে এসব তত্ত্বও উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়বে, যা আমাদের বর্তমান ইতিহাস দর্শনটিকেই আমূল বদলে দিবে।

অনস্বীকার্য যে, এ এক অতীব বিস্ময়কর আবিষ্কার। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, ফিল্ম ষ্টুডিও-তে যেমন অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন ক্যামেরা অভিনেতা-অভিনেত্রীর সমস্ত গতি নৃত্য-স্থিতির ছবি গ্রহণ করে, ঠিক তেমনিভাবেই সার্বিক পর্যায়ে প্রত্যেকটি ব্যক্তির জীবনটাকে ফিল্মায়িত করা হচ্ছে। কেউ কাউকে চড়-থাপ্পড় দিলে, কারুর বোঝা বহন করে দিলে, ভাল কিংবা মন্দ কাজে ব্যতিব্যস্ত হলে—সে অন্ধকারে কিংবা আলোকে থাকুক, সর্বাবস্থায়ই তার কার্যাবলী বিশ্বলোক পর্দায়

মুদ্রিত হয়ে যাচ্ছে। আর ফিল্ম ষ্টুডিও-তে অভিনীত কাহিনীকে যেমন করে বহুদিন পর ও বহু দূরে থেকেও রূপালী পর্দায় তা এমনভাবে দেখান যায় যে, মনে হয় ঘটনাগুলি এখনই সম্মুখে সংঘটিত হচ্ছে; ঠিক এইভাবেই প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু করেছে, যেসব ঘটনার মধ্যে তার জীবন অতিবাহিত হয়েছে, সেই সব কিছুই পরকালের দিনে চোখের সম্মুখে এমনভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, যা দেখে সে চিৎকার করে উঠবে এই বলে যে, 'এ কি ধরনের আমলনামা, আমার ছোট বড় কোন একটি কাজও এই আমলনামায় লিপিবদ্ধ হওয়া থেকে বাদ পড়ে যায়নি!'

এ বিস্তারিত আলোচনা থেকে নিঃসন্দেহে জানা গেল, এই দুনিয়ায়ই প্রত্যেকটি মানুষের আমল-নামা তৈয়ার করা হচ্ছে। ব্যক্তির মনে যে চিন্তা-ইচ্ছা-কামনা-বাসনাই জাগ্রত হয়, তা চিরকালের তরেই সুরক্ষিত হয়ে যাচ্ছে। তার রসনা-নিঃসৃত ও মুখে উচ্চারিত এক-একটি শব্দ পূর্ণ নির্ভুলতা সহকারে রেকর্ডভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি মানুষের চতুঃপার্শ্বে এমন সব ক্যামেরা সংস্থাপিত হয়ে রয়েছে, যা আলো-অন্ধাকার নির্বিশেষে তার পূর্ণ ফিল্ম নির্মাণ করে নিচ্ছে। মানুষের হৃদয়ের কাজ, মুখের কাজ কিংবা আঙ্গিক কাজ—প্রত্যেকটিই নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই বিস্ময় উদ্দীপক পরিস্থিতির ব্যাখ্যাস্বরূপ একটা কথা-ই বলা যেতে পারে। আর তা হচ্ছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র আদালতে প্রত্যেক ব্যক্তিরই যে মামলা দায়ের করা হবে, এই সব কিছুই তার সাক্ষ্য বা প্রমাণস্বরূপ পেশ করার ব্যবস্থাপনা মাত্র। এই ব্যবস্থা স্বয়ং আদালতের পক্ষ থেকেই করে রাখা হয়েছে। এই অকাট্য নিঃসন্দেহে ব্যাপারটিও যদি কারুর মনে পরকাল বিশ্বাস জাগাতে না পারে, তাহলে এর অধিক কিছু বলা তার জন্য নিতান্তই অর্থহীন। এইরূপ ব্যক্তিকে নিতান্ত নির্বোধ, নিষ্পন্দ ও প্রস্তর ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন

এ পর্যন্তকার আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলামের পরকাল বিশ্বাস যে আর একটি জগত সৃষ্টি হওয়ার দাবী করছে, তা সংঘটিত হওয়া সর্বোতভাবেই সম্ভব! তাতে অসম্ভবতার একবিন্দু অবকাশ নেই। বর্তমান দুনিয়ার দৃষ্টিকোণ দিয়ে আমরা যখন মানুষ সম্পর্কে চিন্তা বিবেচনা করি, তখন আমরা নিঃসন্দেহে জানতে পারি, যা কিছু ঘটবে, তা সংঘটিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বর্তমান বিশ্বলোক স্বীয় সমগ্র ব্যাপকতা সত্ত্বেও বহু কয়টি দিক দিয়ে নিতান্তই অসম্পূর্ণ। তার অর্থ হচ্ছে, কেবলমাত্র বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে এই দুনিয়ার কোন উত্তম ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দেয়া সম্ভব নয়। বর্তমান দুনিয়ায় সংঘটিত অসংখ্য ঘটনাই

আর একটি জগত সৃষ্টির সম্ভাব্যতা সম্পর্কে আমাদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জাগিয়ে দেয়। বর্তমান জগতের অসম্পূর্ণতা-ই উদাত্ত কণ্ঠে বলে দিচ্ছে যে, আর একটি পূর্ণাঙ্গ জগতের অস্তিত্বমানতা একান্তই অপরিহার্য।

প্রাচীনতম কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিশ্ব মানবতার যতটা ইতিহাস-ই আমরা জানি, তা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছাড়া—সর্বাত্মকভাবে ন্যায়-অন্যায় বা সত্য-মিথ্যার মধ্যে মৌলিকভাবেই পার্থক্য সৃষ্টি করে এসেছে। সুবিচার ও ন্যায়পরতা বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত হোক এবং অন্যায় পাপ ও যুলুম বিজিত ও নির্মূল হোক, প্রত্যেকটি যুগে—ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়েই এই উন্নতমানের কামনা ও বাসনা মানব মনে ও সমাজে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। কোন যুগের মানুষই এই প্রয়োজনের অনুভূতি থেকে মুক্ত থাকেনি। সেই সঙ্গে এ-ও অকাট্য সত্য যে, অন্যায়কারীকে কখনই তার পূর্ণ দণ্ড দান সম্ভবপর হয়নি। সত্যাদর্শীকে দেওয়া যায়নি তার প্রাপ্য পূর্ণমাত্রার পুরস্কার বা শুভ কর্মফল। প্রখ্যাত ফরাসী চিন্তাবিদ ভলটেয়ার-এর ভাষায়

> 'History is nothing more than a picture of
> crime and misfortunes'.

'মানবেতিহাস নিছক পাপ-অপরাধ ও দুঃখদৈন্যের একটা রক্তাক্ত ছবি মাত্র।'

কামনা-বাসনা ও বাস্তবতার মাঝে এ এক দুর্লংঘ্য বৈপরীত্য। এই বৈপরীত্য অবশ্যই দূর হতে হবে। তাই মনস্তত্ত্বের ঐকান্তিক দাবী হচ্ছে, জগতের পূর্ণত্ব একদিন হতেই হবে। সহস্র লক্ষ বছরে অসংখ্য মানুষ এই দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু তাদের কারুরই মনের এই ঐকান্তিক কামনা পূর্ণ হয়নি। এই অপূর্ণ কামনা-বাসনা নিয়েই তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। তা'হলে মানুষের স্বাভাবিক মনের এই কামনা-বাসনা কি নিতান্তই অর্থহীন, অবাস্তব? এর মূলে কি কোন বাস্তবতাই নেই? তা কি কখনই বাস্তবায়িত হবার নয়? অথচ মানুষের ক্ষুধার উদ্রেক হয় স্বাভাবিকভাবেই এবং বিরাট নিসর্গ তার এই ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য বিপুল খাদ্য আহার্য নিয়ে উন্মুক্ত দ্বার হয়ে আছে। পিপাসায় মানুষের বুক শুকিয়ে যায়। এই পিপাসা নিবৃত্তির জন্য রয়েছে অফুরন্ত জল-ভাণ্ডার। মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন। তাই তো দেখতে পাচ্ছি, অক্সিজেনের একটা বিরাট পুরুস্তর পৃথিবী গোলকের চতুর্পার্শ্বে চাপিয়ে রাখা হয়েছে। অনুরূপভাবে মানুষের মধ্যে আরও বহু প্রকারের চাহিদা রয়েছে এবং সর্বপ্রকার চাহিদা পরিপূরণের ব্যবস্থা ব্যাপক আয়োজন সহকারেই এই পৃথিবীতে বিদ্যমান। তা'হলে মানব মনের সব চাইতে বড় ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবী—ন্যায় ও সুবিচার পাওয়ার

চাহিদা—কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? অথচ এই দাবীটিই মানবপ্রকৃতির সর্বাধিক প্রবল দাবি। যে মহান স্রষ্টা মানব প্রকৃতি নিহিত সর্ব প্রকার চাহিদাই চরিতার্থ করার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেছেন, তিনি কি এই চাহিদাটি পরিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম নন? বস্তুত পরকাল বিশ্বাসের সত্যতা ও যথার্থতা প্রমাণের জন্য এ এমন একটা দিক, যা এই বিশ্বাসের সত্যতা ও যথার্থতার 'লেবরেটরী টেস্ট'-এর মানদণ্ডে পুরাপুরি উত্তীর্ণ হতে পারে। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই এই 'লেবরেটরী' বিরাজমান। কোরআন মজীদে এই মানদণ্ডের নাম দেয়া হয়েছে 'নফসে লাওয়্যামাহ্'—বিবেক। এটা বড় বিস্ময়ের ব্যাপার যে, এক শ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী হার্ডী'র দর্শনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে দুনিয়াকে 'যুলুম ও নির্মমতার লীলাভূমি' মনে করতে দ্বিধাবোধ করেন না, কিন্তু এই যুলুম নিপীড়ন-জর্জরিত অবস্থা তাঁদের মনে এই প্রত্যয় জাগিয়ে দেয় না যে, আজ যা বাস্তবে নেই—অথচ মানব প্রকৃতি তার তীব্র প্রয়োজন বোধ করছে, কাল তাকে অনিবার্যভাবে বাস্তবায়িত হতেই হবে। অন্যথায় তা হবে স্বাভাবিক ব্যবস্থার সংগে সাংঘর্ষিক এক মহাব্যতিক্রম।

এটা মনস্তাত্ত্বিক দাবী। এই মনস্তাত্ত্বিক দাবীকে অনেকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু এত বড় একটা ব্যাপারকে যাঁরা অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিতে চান, তাঁরা কোন্ জিনিসটিকে যে বাস্তব বলে গ্রহণ করতে প্রস্তুত তা আমাদের বোধগম্য নয়। তাঁরা কোন একটা জিনিসকে যদি 'বাস্তব' বা 'প্রকৃত' বলে মনে করেন-ই, তবে তা কোন যুক্তির ভিত্তিতে, তা তাঁরাই বলতে পারেন। পরকাল-সংক্রান্ত ভাবনা চিন্তা যদি কেবলমাত্র পরিবেশজনিত ব্যাপার হয়ে থাকে, তা'হলে তা সাধারণভাবে মানবীয় হৃদয়াবেগের সাথে এতটা সংগঠিতসম্পন্ন হতে পারল কিভাবে? হাজার হাজার বছর ধরে এতটা ধারাবাহিকতা সহকারে মানবীয় আবেগের সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন অপর কোন জিনিসের উল্লেখ করা যেতে পারে কি? এই লোকেরা নিজেদের জ্ঞান-গবেষণা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে একটা মনগড়া জিনিসকে মানবীয় মনস্তত্ত্বের সঙ্গে পরকাল বিশ্বাসের ন্যায় এত গভীর ও নিবিড়ভাবে মিলিয়ে মিশিয়ে দিতে পারেন কি?

অনুরূপভাবে মানুষের আরও অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা এমন আছে, যা এই দুনিয়ার জীবনে চরিতার্থ বা বাস্তবায়িত হয় না। মানুষ এমন একটা জগত চায় যেখানে মৃত্যু বা ধ্বংস নেই, আছে কেবল জীবন, আছে সুখে-স্বচ্ছন্দে-নিরাপদে কেবল বাঁচা। কিন্তু এই বাসনা এ দুনিয়ায়—এই জীবনে কখনই পূরণ হবার নয়। কেননা বাস্তবে সে পেয়েছে এমন একটা জগত যেখানে জীবনের সঙ্গে মৃত্যুও অবধারিত হয়ে আছে। মানুষ স্বীয় বিদ্যা, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও চেষ্টা

শ্রম-সাধনার ফলে যখন সফলতর জীবন শুরু করার যোগ্য হয়ে ওঠে ঠিক তখনই তার সামনে উপস্থিত হয় মৃত্যুর রাহুগ্রাস। আমেরিকার ব্যবসায়ীদের পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে, অব্যাহত শ্রম সাধনা ও অধ্যবসায়ের পর ৪৫-৬৫ বছর বয়সের মধ্যে যখন তারা নিজেদের কায়কারবারকে খুব গুছিয়ে জমিয়ে তুলতে সক্ষম হয় এবং পাঁচ হাজার পাউণ্ড থেকে দশ হাজার পাউণ্ড বার্ষিক আয়ের ব্যবস্থা করে নেয়, ঠিক সেই সময়ই সহসা একদিন তাদের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেমে যায়। তাদের ছড়িয়ে থাকা ও জাঁকিয়ে বসা বিরাট ব্যবসায় রেখে তারা পরপারে চলে যেতে বাধ্য হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, জীবনের এই নাটক কি শুধু এতটুকু সময়ের জন্যই নির্দিষ্ট? সাবানের ফেনার অধিক কোন মূল্য বা স্থায়িত্ব কি এই জীবনের নেই?

অবশ্য স্থিতি ও স্থায়িত্বের এই ধারণাকেও কেউ কেউ ভুল বড়ত্ববোধের (Superiority complex) ফলশ্রুতি বলে আমার উপরোক্ত কথার গুরুত্ব অস্বীকার করে বসতে পারেন। কিন্তু আমি বলব, এই লোকদের মন-মানসিকতা সমসাময়িক পরিবেশে এতই প্রভাবিত যে, ভিন্নতর কোন দৃষ্টিভঙ্গীর কথা তারা ভাবতেই পারেন না। এঁদের সম্মুখে যত যুক্তি প্রমাণই পেশ করা হোক, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গেই তাকে 'অবাস্তব' 'শব্দসর্বস্ব' বলে উড়িয়ে দেবেন। এটা তাঁদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। এদের সম্পর্কে দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক জেম্‌স-জিন্‌স্-এর একটি কথার উদ্ধৃতি দেয়াই যথেষ্ট। তিনি তাঁর Mysterious Universe গ্রন্থের শেষ ভাগে লিখেছেন :

> 'আমাদের আধুনিক মন-মানসিকতা ঘটনাবলীর বস্তুগত ব্যাখ্যাদানের ব্যাপারে এক ধরনের রক্ষণশীলতায় ভুগছে।'

(Modern Scientific Thought, P-103)

পরকাল বিশ্বাসের অসারতা প্রমাণের জন্য কেউ কেউ বলে থাকেন, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই এই স্বতন্ত্র ব্যক্তি সত্তা মনে করার ফলেই পরকালের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হচ্ছে। অথচ এক সামান্য নগণ্য ব্যক্তি সত্তার স্থিতির তুলনায় মানব-বংশের মানবজাতির স্থিতি ও স্থায়িত্বের গুরুত্ব অনেক বেশী। এই দুনিয়ায় আরও সহস্র লক্ষ প্রকারের জীবের জন্ম হয় এবং মরে যায় যেমন করে, মানব-ব্যক্তিরাও ঠিক তেমনিভাবে জন্মে এবং মরে যায়। এভাবে হতেই থাকবে অনন্তকাল পর্যন্ত। অবশ্য মানব বংশ তথা মানব জাতি বেঁচে থাকবে। এমন কি ভবিষ্যতে আরও উন্নত কোন আকার আকৃতিও তারা লাভ করতে পারে।

এই কথাটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং অপ্রমাণিত। কেননা প্রত্যেক মানুই যে এক-একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি সত্তা, একথা প্রমাণ করার মত অসংখ্য কারণ বিদ্যমান। কাজেই প্রত্যেক ব্যক্তিকেই স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে বেঁচে থাকতে হবে, এতে একবিন্দু সন্দেহ থাকতে পারে না। প্রথমে যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার কথা-ই ধরা যাক। জন্তু ও প্রাণীকুলের মধ্যে যে যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা রয়েছে তা হচ্ছে প্রজাতীয় পর্যায়ের, তা ব্যক্তি সত্তা বিশেষত্বসম্পন্ন নয়। একটি বাবুই পাখী যে ধরনের নীড় রচনা করে, সমস্ত বাবুই পাখী-ই সেই একই ধরনের বাসা নির্মাণ করে। তাতে বৈচিত্র্য বা পার্থক্য তেমন কিছুই থাকে না। একটি মৌমাছি যে রকমের 'চাক' রচনা করে সমস্ত মৌমাছিই তাই করে। কিন্তু মানুষের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নতর। একজন মানুষের চেহারা আকার আকৃতিতে যেমন মিল নেই, তেমিন তাদের কাজও সাদৃশ্যহীন, মানুষের মাঝে এই বৈচিত্র্য ও বিশেষত্বহীনতা কোথাও এবং কখনই খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ কোন প্রজাতীয় পর্যায়ের সৃষ্টি নয়। মানুষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন সত্তা। প্রত্যেকটি মানুষ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিশেষত্বের মহিমায় মণ্ডিত। এই কারণে পরিণতির ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি মানুষের সহিত স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা হিসাবেই আচরণ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়, প্রজাতীয় পর্যায়ে নয়। এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বেরই ঘোষণা বহু পূর্বে হয়েছে কুরআন মজীদে। বলা হয়েছে ঃ

وَيَأْتِينَا فَرْدًا (مريم-٨٠)

"মানুষ আমার নিকট ব্যক্তিসত্তা হিসেবেই আসবে।"

وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا (مريم-٩٥)

'তাদের সকলেই কিয়ামতের দিন তাঁর নিজ স্বতন্ত্র ব্যক্তি সত্তার মর্যাদা নিয়ে উপস্থিত হবে।'

বস্তুত, মানুষ এমন এক সৃষ্টি, যারা নিজেদেরই সমাজের অন্যান্য মানুষের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। হিংস্র রক্তপিপাসু শ্বাপদ ও পারস্পরিক মিল-মিশ রক্ষা সহকারে পরম শান্তিতে বসবাস করে। কিন্তু কেবল মানুষই মানুষকে যন্ত্রণা দেয়, নিপীড়ন চালায়, হত্যা করে। মানুষ মানুষকে ঘৃণা করে। মানুষ অত্যাধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে মানুষকে লুণ্ঠন করে, তার সর্বস্ব অপহরণ করে। তাহলে কি বলতে হবে, নৈতিকতার বিচারে মানুষ এখনও জীব-জন্তু থেকেও পশ্চাতে পড়ে রয়েছে? জৈবতাত্ত্বিক বিচারে যে-জীবটি সর্বাগ্রগণ্য, নৈতিক বিকাশ লাভে সে-ই

থেকে গেল সকলের পশ্চাতে? কিন্তু কেন? এই অবস্থাই প্রমাণ করে যে, 'প্রজাতীয় বিবর্তন' বিশ্বাস নিয়ে বিশ্বের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভবপর নয়। এই কারণেই প্রত্যেকটি মানুষকে স্বতন্ত্র বিশেষত্বসম্পন্ন সত্তা বলে বিশ্বাস করা এবং তারা প্রত্যেকেই এই দুনিয়ায় 'পরীক্ষার্থী' হয়ে আছে বলে মেনে নেয়া ছাড়া কোনই উপায় নেই।

মানুষকে সত্য ও ন্যায়পরতার পথে কি করে চালিয়ে নেয়া ও তার উপর অবিচল করে রাখা সম্ভব? প্রাচীনতম কাল থেকেই এটা একটা কঠিন প্রশ্ন এবং এ প্রশ্ন নিয়ে মানুষের চিন্তা ভাবনার কোন অন্ত নেই। এই উদ্দেশ্যে কতিপয় ব্যক্তিকে যদি একটা দেশের সমস্ত মানুষের উপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ চালাবার দায়িত্ব দিয়ে বসিয়ে দেয়া হয়, তা হলে সাধারণ মানুষ হয়ত ধরা পড়ার ভয়ে সর্বক্ষণ সন্ত্রস্ত হয়ে থাকবে ও কোনরূপ সীমালংঘনমূলক কাজ করবে না। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থায় কর্তৃত্বশালী নিয়ন্ত্রণকারী লোকদের নিরপেক্ষ সুবিচার ও ন্যায়পরতার উপর অবিচল রাখার কোন অনুপ্রেরণাই থাকবে না। তখন তাদের অত্যাচার-নিপীড়নে সাধারণ মানুষ যে আর্তনাদ করে উঠবে, তাতে আল্লাহ্‌র আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠবে। এ উদ্দেশ্যে আইন রচনা করা হলে এবং পুলিশী শক্তির সাহায্যে তার প্রয়োগে সাফল্য অর্জন সম্ভব হলে যেখানে পুলিশ অনুপস্থিত এবং তার ফলে আইনের প্রয়োগ ও কার্যকারিতা বন্ধ হয়ে যায়, সেখানে সাধারণ মানুষের অবস্থা কি দাঁড়াবে? যদি এ উদ্দেশ্যে আবেদন নিবেদন করা হয়, ন্যায় ও সত্যের ব্যাপক প্রচারণার অভিযান চালানো হয়, তা হলে তার সাফল্যের সম্ভাবনা কতটুকু? মানুষ কি শুধু আবেদন উপদেশ ও প্রচারণা শুনেই স্বার্থ ত্যাগে প্রবৃত্ত হবে? আসল কথা হল, দুনিয়ার শাস্তির ভয় কখনই পাপ ও দুষ্কৃতির পথ বন্ধ করতে পারে না। মিথ্যা উক্তি, মিথ্যা সাক্ষ্য, ঘুষ, সুপারিশ, স্বজনপ্রীতি, প্রভাব খাটানো ও এই ধরনের আরও বহু প্রকার উপায়ই মানুষকে যে কোন অপরাধের শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি লাভের নিশ্চয়তা দিতে পারে। বর্তমান সময়, তাই চলছে। তাই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতে হচ্ছে, একমাত্র পরকাল বিশ্বাস—পরকালের জবাবদিহির নির্মমতা ও ক্ষমাহীনতার অনুভূতিই মানুষকে সর্বপ্রকার পাপ-অপরাধ ও সীমালংঘনমূলক কার্যাদি থেকে বিরত রাখতে ও ন্যায়পরতা ও সত্য সততার উপর অবিচল করে রাখতে সক্ষম। এই কথার সত্যতা নির্ভুলতা হাজার হাজার বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই প্রমাণিত। পরকাল বিশ্বাসে একটি প্রবল চালিকা বা অনুপ্রেরক বিদ্যমান। তা প্রত্যেকটি মানুষের নিকট সে যে-ই হোক-না-কেন সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই চালিকা ও অনুপ্রেরক হচ্ছে, 'আল্লাহ্ তাকে দেখছেন

এবং তিনি তাকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করবেন ও তাকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।' এই অমোঘ বিশ্বাস।

পরকাল বিশ্বাসের এই দিকটির গুরুত্ব সর্বপ্রকার প্রশ্নের ঊর্ধ্বে। যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, বিচারের একটা দিন অবশ্যই আসবে এ যারা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়, ইতিহাসের তীক্ষ্ণ শানিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তারা অন্তত একথা মেনে নিতে প্রস্তুত যে, মানুষকে নিয়ন্ত্রণ এবং ন্যায় ও সত্যের পথে তাদেরকে অবিচল করে রাখার জন্য এর চাইতে কার্যকর উপায় আর কিছুই নেই, হতে পারে না। প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক কান্ট্ আল্লাহ্‌র বিরাজমানতার কোন অকাট্য প্রমাণ খুঁজে পাননি বলে আল্লাহকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে 'ধর্মবিশ্বাসের পক্ষে Theoritical Reason কিছু নেই। তবে নৈতিকতার বিচারে বাস্তব যৌক্তিকতা (Practical Reason) অবশ্যই স্বীকৃতব্য'। (Story of Philosophy, p-279) ভলটেয়ার কোন অতি প্রাকৃতিক সত্য ও সত্তাকে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর নিকটও :

> "আল্লাহ্ ও পরকালীন জীবন বিশ্বাসের গুরুত্ব এ হিসাবে খুবই বেশী যে, তা নৈতিকতার পক্ষে 'স্বতঃসিদ্ধতার' (Postulates of the Moral Feeling) কাজ করে। তাঁর মতে কেবলমাত্র এর সাহায্যেই উত্তম নৈতিক পরিবেশ গঠন সম্ভব। এই বিশ্বাসটিও নিঃশেষ ও বিলীন হয়ে গেলে উত্তম কাজ ও আচার-আচরণের জন্য কোন 'অনুপ্রেরক'ই অবশিষ্ট থাকবে না। আর তার ফলে সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলার স্থিতি স্থায়িত্ব অসম্ভব হয়ে পড়বে।"
>
> (History of Philosophy by Windelband N:Y-1950, p. 196)

পরকাল বিশ্বাস যদি প্রকৃতই অবাস্তব, অমূলক বা অসত্য হত, তা হলে তা আমাদের জন্য এতটা অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ কেন? এই বিশ্বাসকে বাদ দিয়ে সত্যিকারভাবে কোন সামষ্টিক-সামাজিক ব্যবস্থাই গড়ে তোলা কেন অসম্ভব? এই বিশ্বাস মানব মনে দৃঢ়মূল হয়ে না থাকলে মানুষের গোটা জীবনই নিষ্ফল ও অর্থহীন হয়ে যায় কেন? কেন হয় তা লণ্ড-ভণ্ড বিপর্যস্ত? কোন অপ্রকৃত ও মনগড়া জিনিস যে কখনই এতটা গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারে না, একথা অবধারিত। যে জিনিস বাস্তবে অবর্তমান, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা নিতান্তই সত্য ও প্রকৃত, এমন কোন নিজিসের দৃষ্টান্ত কি এই বিশ্বলোকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে? জীবনের সাথে সম্পর্কহীন কোন জিনিসই কি মানবজীবনের সঙ্গে এতটা গভীর ও নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে? জীবনের সুষ্ঠু ও সুবিচারপূর্ণ সংগঠন গড়ে তোলার জন্য পরকাল বিশ্বাসের এই অপরিহার্যতাই অকাট্যভাবে প্রমাণ

করছে যে, পরকাল-ই হচ্ছে এই জীবনের সবচেয়ে বড় ও প্রকৃত সত্য, চূড়ান্ত পরিণতি। আমরা এই দুনিয়ায় থেকে পরকালকে নিজেদের চক্ষে দেখতে না পেলেও তা-ই দৃশ্যমান সমস্ত জিনিসের তুলনায় অধিক সুস্পষ্ট প্রতিভাত, ভাস্বর এবং দৃঢ় প্রত্যয়মূলক। হুশ-জ্ঞান বহাল থাকা অবস্থায় তা অস্বীকার করা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, পরকাল সম্পর্কিত প্রশ্নটির গোড়াতেই রয়েছে এই প্রশ্ন 'এই বিশ্বলোকের স্রষ্টা আল্লাহ্' আছেন, কি নেই? যদি 'আল্লাহ্' থেকেই থাকেন, তা' হলে বান্দাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে থাকা আবশ্যক। কিন্তু তা হবে কবে, কোনদিন? বর্তমান বস্তু জগতে যে সেই সম্পর্ক প্রকটিত হয়ে উঠা কিছুতেই সম্ভবপর নয়, তা বলাই বাহুল্য। এই দুনিয়ায় আল্লাহে অবিশ্বাসী, আল্লাহ্ অমান্যকারী ব্যক্তিরাও উঁচুদরের নেতৃত্ব এবং রাষ্ট্রশাসনের কর্তৃত্ব লাভ করছে। অথচ এই দুনিয়ায় আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা-সাধনায় যারা প্রাণান্ত হচ্ছে অহর্নিশ, রাষ্ট্র পরিচালকরা তাদেরই তৎপরতাকে বেআইনী ঘোষণা করে দিচ্ছে। আল্লাহকে যারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, নির্লজ্জ কণ্ঠে বলে বেড়ায় 'আমাদের রকেট মহাশূন্য ঘুরে এল; কিন্তু পথে কোথায়ও আল্লাহকে দেখতে পেল না.' তাদের এসব প্রলাপ প্রচারের জন্য সংখ্যাতীত মাধ্যম ও সংস্থা-প্রতিষ্ঠান দিন রাত নিয়োজিত হয়ে আছে। অসংখ্য প্রেস, বেতারযন্ত্র ও কাগজকল এজন্য রাতদিন অবিশ্রান্ত কাজ করে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্ ও পরকাল বিশ্বাস এক কথায় দীন ও ধর্মে বিশ্বাসী, দুনিয়ার সব বিশেষজ্ঞ ও মনীষী-পণ্ডিতরা একবাক্যে তাদেরকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' ও 'সেকেলে' বলে গালাগাল করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে নানাভাবে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন। এরূপ অবস্থায় আমাদের দৃষ্টিতে আসল প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা আল্লাহ্য় বিশ্বাস করছি কিনা, আল্লাহকে মেনে চলতে প্রস্তুত কি না? আল্লাহে বিশ্বাস থাকলে পরকালকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে, মানতে হবে। কেননা এই দিনটি ব্যতীত আল্লাহে ও বান্দাদের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রকাশ পাওয়ার আর কোন দিন বা উপায়ই নেই।

ডারউইন বিশ্বলোকের স্রষ্টা মানলেও মানবজীবন সম্পর্কে তার দেয়া ব্যাখ্যায় স্রষ্টা ও সৃষ্টির পারস্পরিক কোন সম্পর্ক প্রমাণিত নয়। বিশ্বলোকের এমন কোন পরিণতির সন্ধানও তাতে পাওয়া যায় না, যেখানে এই সম্পর্ক প্রকাশ লাভ করতে পারে। ডারউইন দর্শনের এই জীবতাত্ত্বিক শূন্যতা কি করে পূরণ করা সম্ভব, তা বোধগম্য নয়। সর্বোপরি এই বিশ্বলোকের স্রষ্টা ও পরিচালক একজনকে' স্বীকার করার পর সৃষ্টির সহিত তার সম্পর্ক না থাকার কথায় যে বিরাট অসংগতি ও

বৈপরিত্য, একালের বিজ্ঞানী-মনীষীরা তা কেন বুঝতে প্রস্তুত নন? বান্দাহদের অপেক্ষা স্রষ্টার কর্তৃত্ব যে অমোঘ ও অধিক কার্যকর, তা কখনও লোক-সমক্ষে প্রতিভাত হবে না, এই বিরাট বিশাল বিশ্বলোক নিঃশেষ হয়ে যাবে, অথচ তার স্রষ্টা নির্মাতাকে এবং কোন উদ্দেশ্যে এই সৃষ্টি ও নির্মাণ, তা চিরকালের তরে অস্পষ্ট ও অপ্রকটিত থেকে যাবে, এমন কথা বিকৃত মন-মগজের পক্ষে চিন্তা করাই সম্ভব।

পরকালের সত্যতা, অনিবার্যতা ও অবশ্যম্ভাবিতা পর্যায়ে এই আলোচনায় যা কিছু বলা হল, তা বিদ্বেষশূন্য উন্মুক্ত মনে বিবেচনা করা হলে প্রত্যেকের বিবেকই উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠবে ঃ পরকাল অবশ্যই হবে, এ বিষয়ে অন্তত আমার কোন সন্দেহ নেই। পরকাল বরং নিজের চোখের সামনেই ভাস্বর হয়ে দেখা দিবে। স্পষ্ট মনে হবে, গর্ভবতীর গর্ভ যেমন প্রসূত হওয়ার জন্য প্রতিমুহূর্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করছে ও অস্থির হয়ে আছে, পরকাল সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারটিও ঠিক তারই মত। বিশ্বলোক গর্ভে পরকাল অপ্রতিরোধ্য হয়ে আছে। যে কোন মুহূর্তে তা বিস্ফোরিত হয়ে যেতে পারে। কুরআন মজীদের এই ঘোষণা সর্বক্ষণই স্মার্তব্য ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَآ اِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً (اعراف-١٨٧)

"লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কিয়ামত কোথায়-কবে কখন হবে? তুমি বলে দাও, সে সম্পর্কে কেবলমাত্র আল্লাহই জানেন। তিনি যথাসময়ে তা সংঘটিত করবেন। বিশ্বলোকের পক্ষে তা দুর্বহ হয়ে রয়েছে। তা অতি আকস্মিকভাবেই তোমার উপর এসে পড়বে"। (সূরা আরাফ ঃ ১৮৭)

তাক্‌দীর ও কর্মে স্বাধীনতা*

অধ্যাপক শাইখ আবদুর রহীম

তাকদীর বলতে আমরা সাধারণতঃ যা বুঝি ইসলামী পরিভাষায় তাকে বলা হয় قضاء وقدر এবং সংক্ষেপে তাকেই বলা হয় قدر قدر و تقدير শব্দ দু'টোর অর্থ একই, তা হচ্ছে এই ঃ

কোন ঘটনা ঘটবার পূর্বে সম্ভাব্য ঘটনাটি অনুমান করে স্থির করা। বহু বিষয় সম্পর্কে মানুষ পূর্ব থেকে এই রকম অনেক কিছু অনুমান করে নিজ কর্মসূচী স্থির করে থাকে। একেই বলা হয় কাদর বা তাকদীর। তারপর মানুষের জ্ঞান ত্রুটিযুক্ত বলে বাস্তব ক্ষেত্রে তার এই অনুমানের কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটে থাকে ঃ

তাকদীরের এই ভাষাগত অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে কোন কোন মুসলিম দল ইসলামী পরিভাষা হিসাবে তাকদীরের তাৎপর্য এইরূপ করে থাকে ঃ

"মাখলুকাতকে অস্তিত্ব দানের বহু পূর্বে আল্লাহ্‌ তা'আলা কুল মাখলুকাতের সৃজনেরকাল স্থান, রূপ, আকৃতি, প্রকৃতি ইত্যাদি, তাদের স্থিতিকালের পরিমাণ, স্থিতিকালীন অবস্থা ইত্যাদি, তাদের শেষ পরিণতি ও ধ্বংসের কাল, অবস্থা ইত্যাদি তাদের পারলৌকিক অবস্থা ইত্যাদি নিরূপণ, নির্ণয় ও নির্ধারণ করে রেখেছে বলে যে নীতি ইসলামী শরী'আতে ঈমানের অংশরূপে গৃহীত হয়েছে সেই মূলনীতিটিকে কাদর বা তাকদীর বলা হয়।'

তাকদীরের উল্লিখিত ব্যাখ্যায় তাকদীরকে আল্লাহর ইলমের সাথে গোল পাকিয়ে ফেলা হয়েছে। তাই তাকদীরের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে একে ইল্‌ম থেকে আলাদা করে দেখাবার চেষ্টা করছি।

আল্লাহ্‌ তা'আলার আদি ইলম গুণের তাৎপর্য এই যে, দুনিয়াতে যা কিছু ঘটেছে, ঘটছে এবং ঘটবে সবই আল্লাহ্‌ তা'আলা অনাদিকালে বর্তমানের মত জানতেন। অনাদিকালে তার ইলমে যা ঘটবার ছিল তা না ঘটাও যেমন অসম্ভব তাঁর ইলমে যার অস্তিত্ব আসে নাই তা ঘটাও তেমনি অসম্ভব। এই জগৎ সৃষ্টির বহু পূর্বে অনাদিকালে আল্লাহ্‌ তা'আলা এই জগতের সৃজন ও যাবতীয় অবস্থা সমন্ধে পরিষ্কাররূপে অবহিত ছিলেন এবং তখন তাঁহার ইল্‌মে বিদ্যমান ছিল এ জগৎ কখন কী ভাবে ধ্বংস হবে।

---

* [প্রবন্ধটি ইফা পত্রিকা ১৯৭০সন ১০ বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা থেকে সংগৃহীত]

ফলকথা আযল ازل। যুগে যখন সব কিছুই ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রাখা হয়েছিল তখন যাবতীয় ভবিষ্যত ঘটনা আল্লাহ্ তা'আলার ইল্‌মে বর্তমানের ন্যায় প্রতিভাত ছিল।

এ হল আল্লাহ্ তা'আলার ইলম গুণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। আল্লাহ্ তা'আলার এই 'ইল্‌ম' গুণটি মুসলিমদের সকল দলই স্বীকার করে থাকে।

এখন তাকদীরের স্বরূপ বলি। ইলমুল কালামে তাকদীর শব্দ ব্যবহৃত হয় না। পরিভাষা হিসাবে 'কাদর' শব্দই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবার কাদর قدر উল্লেখ করতে গিয়ে প্রায়ই কাযা قضاء শব্দটি যুক্ত করা হয়। শুধু কাদর না বলে প্রায়ই বলা হয় قضاء ও قدر এই قضاء শব্দটি যুক্ত হয়ে তাকদীরের প্রকৃত তাৎপর্য পরিষ্কার ও স্পষ্ট হয়ে উঠে। قضاء শব্দের অর্থ হুকুম করা, বিধিবদ্ধ করা ও চূড়ান্ত ফয়সালা। কাজেই قدر ও. قضاء এর অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহ্ তা'আলার নির্ণায়ন ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি।

أهل السنة و الجماعة এর আকীদা মতে আল্লাহ্ তা'আলার قضاء و قدر তথা قدر গুণটির তাৎপর্য এই ঃ

আযল ازل। তথা অনাদিকালে আল্লাহ্ তা'আলা চূড়ান্তভাবে ফয়সালা করে রেখেছেন ভবিষ্যতে কখন কী ঘটবে। এই ফয়সালা মত সব কিছু সম্পাদিত হতে বাধ্য। এই ফয়সালার ব্যতিক্রম কোন ক্রমেই হতে পারবে না। এই ফয়সালা এড়াতে মানুষ যতই চেষ্টা করুক যতই ব্যবস্থা অবলম্বন করুন, পরিণামে সব চেষ্টা সব ব্যবস্থা ব্যর্থ ও নিষ্ফল প্রতিপন্ন হবে এবং এ ফয়সালা বাস্তবায়িত হওয়ার অনুকূলে অবস্থা ব্যবস্থাদির অবশ্যই উদ্ভব হবে। এই হচ্ছে قدر এর প্রতি বিশ্বাসের স্বরূপ। এক কথায় আল্লাহ্ তা'আলা ازل। এ যা কিছু সম্পাদিত হবার ফয়সালা করে রেখেছেন তা কেউ ঠেকাতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে বহু আদেশ নিষেধ করেছেন এবং এই আদেশ নিষেধগুলো পালন করে চলা তিনিই প্রত্যেক মানুষের জন্য ফরয করেছেন। এই নীতিকে শরী'আতে تكليف তাকলীফ বলা হয়।

قدر এর প্রতি ঈমান আপাতদৃষ্টিতে তাকলীফ নীতির পরিপন্থী। কারণ تكليف সম্পর্কিত আদেশ পালনের জন্য আদিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে ইখতিয়ার اختيار। কর্ম স্বাধীনতা থাকা হচ্ছে অপরিহার্য শর্ত; কিন্তু قدر এর প্রতি

বিশ্বাসে মানুষের সেই কর্ম-স্বাধীনতা অস্বীকার করা হয়।

দ্বিতীয়ত ঃ বান্দাকে পুরস্কার ও শাস্তিদানের ভিত্তি হচ্ছে বান্দার ইখতিয়ার কর্ম-স্বাধীনতা; আর কাদ্‌র قدر এর বিশ্বাসে যেহেতু কর্ম স্বাধীনতার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না, কাজেই বান্দাকে তার কর্মের জন্য পুরস্কৃত বা দণ্ডিত কর' যেতে পারে না।

তৃতীয়ত ঃ তাকদীর নীতির ফলে যখন একথা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়েই রয়েছে যে অমুক ব্যক্তির অমুক কাজ, তখন ঐ কাজের বিপরীত কোন কাজ সম্পাদন করতে যদি তাকে আদেশ করা হয় তাহলে প্রকৃত প্রস্তাবে তা একটা অসম্ভব কার্য সম্পাদনের জন্য আদেশ হয়ে দাঁড়ায়, আর অসম্ভব কার্য সম্পাদনের আদেশ দেওয়া ও সেই আদেশ অমান্যের জন্য শাস্তি দেওয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অসঙ্গত।

এই নীতিদ্বয়ের সমন্বয় সাধনে সক্ষম হয়ে অথবা কোন একটি নীতির প্রতি অযথা পক্ষপাতবশতঃ কোন কোন মুসলিম দল কাদ্‌র- قدر নীতিকে একেবারে বর্জন করে তাকলীফ- تكليف নীতিকে আকড়ে ধরেছে; এবং কোন কোন দল তকলীফ নীতিকে একেবারে বর্জন করে কাদ্‌র- قدر নীতিকে সর্বেসর্বা বলে বিশ্বাস করেছে। মুতাযিলা প্রমুখ কয়েকটি দলের মতই এই যে, আল্লার কালামে ও নবীর হাদীসে কাদ্‌র قدر এর সমর্থনে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তার তাৎপর্য এবং আল্লাহ্ তা'আলার ইল্‌ম গুণের তাৎপর্য হুবহু একই। ইল্‌ম ও কাদর দুটি স্বতন্ত্র নীতি নয়।

আবার মুরজিয়া- مرجئة প্রমুখ কোন কোন মুসলিম দল قدر নীতিকে সর্বেসর্বা রূপে গ্রহণ করে বলে মানুষের মধ্যে কোন প্রকার কর্ম-স্বাধীনতা নেই। যে যন্ত্রচালিতের মত কাদ্‌র- قدر ফয়সালা মত সকল কাজ সম্পাদন করে চলে।

পক্ষান্তরে اهل السنة و الجماعة দল এই উভয় নীতিকে স্বীকার করার সঙ্গে দাবী করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইলম ও তাঁর কদর এক নয়। তাদের সত্তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ সম্পর্কে اهل السنة و الجماعة এর মৌলিক চিন্তার ধারা এইরূপ ঃ

"যে সকল বিষয় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পরিষ্কার ও স্পষ্টরূপে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আছে, তার কোনটিই অস্বীকার করা যায় না। এই বিষয়গুলির কোন কোনটি যদি পরস্পর বিরোধী হয়, তবে তাদের সত্তা স্বীকার করে সমাধান

অনুসন্ধান করতে হবে।" এই নীতির উপর ভিত্তি করে তারা 'কাদর ও তাকলীফ' উভয়েরই যথার্থতা স্বীকার করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাদর গুণ ও ইলম গুণের স্বতন্ত্র সত্তাও স্বীকার করে বিরোধের মীমাংসা ও সমাধান দিয়ে থাকে। সে সব মীমাংসা ও সমাধানের কথা বলবার আগে এ সম্বন্ধে কুরআন ও হাদীসে যে সকল প্রমাণ ও যুক্তি রয়েছে তা বলছিঃ

সূরা নিসা-এর ৭৮-৭৯ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

"মুনাফিক ও ইয়াহূদীদের উপর যদি কোন মঙ্গল পৌছে তবে তারা বলে, 'এ মঙ্গল আল্লাহ্র তরফ থেকে এসেছে।' আর তাদের উপর যদি কোন অমঙ্গল পৌছে তবে তারা বলে, 'এ অমঙ্গল আপনার কারণে এসেছে।' হে নবী, ঘোষণা করুন, মঙ্গল, অমঙ্গল প্রত্যেকটিই আল্লাহ্র তরফ থেকে আসে। আর মুনাফিক ইয়াহূদীগণ অমঙ্গলের জন্য যদি একান্তই কোন মানুষকে দায়ী করতে চায় তবে তাদের বলে দিন যে, যার প্রতি সে অমঙ্গল আসে সেই অমঙ্গলের জন্য তারই কর্মকে দায়ী করা যেতে পারে, আর তার জন্য হে নবী, আপনি কোন ক্রমেই দায়ী নন; কারণ আমি তো আপনাকে লোকদের নিকটে নবী করে পাঠিয়েছি। কাজেই আপনার কারণে কারোই অমঙ্গল হতে পারে না।"

'আর তোমার প্রতি যে অমঙ্গল আসে তা তোমার নিজের কারণে' এই আয়াত অংশটি পূর্ববর্তী আয়াতের كل من عند الله (মঙ্গল অমঙ্গল সবই আল্লাহ্র নিকট থেকে আগত) অংশটির বিরোধী।

এদু'টো কথার মধ্যে كل من عند الله ই হচ্ছে ইসলামী নীতি। আর যেহেতু মুনাফিকেরা অমঙ্গলের জন্য নবী করীম (সা)-কে দায়ী বলে ঘোষণা করতো তাই বলা হল, প্রথমত এবং মূলত অমঙ্গল ও আল্লাহ্ তা'আলাই সাধন করে থাকেন। কিন্তু তারা এর জন্য কোন মানুষকে দায়ী করতে গিয়ে যখন নবী (সা)-কে দায়ী করে ফেলল তখন তাদের ঐ দাবীর পাল্টা জওয়াব স্বরূপ বলা হল যে, তারা যদি এ সম্পর্কে কোন মানুষকে দায়ী করতে চায় তবে বলা যেতে পারে যে, এসব অমঙ্গলের জন্য তারাই দায়ী। তাদের দুষ্কর্মই তাদের প্রতি এ দুর্ভোগ টেনে এনেছে। ফল কথা, অমঙ্গল দিয়ে থাকেন আল্লাহ্, কিন্তু অমঙ্গল আগমনের কারণ হচ্ছে মানুষের দুষ্কর্ম ও কুকীর্তি। আয়াতে অমঙ্গল বলতে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি বুঝায়। মানুষের 'পাপ-পুণ্য নেককাজ বা বদকাজ' আয়াতে উল্লেখিত মঙ্গল-অমঙ্গলের মধ্যে পড়ে না। কারণ, পাপ-পুণ্যের বেলায় বাক্য গঠনকালে পাপ-পুণ্য শব্দ দুটি اصاب। ক্রিয়ার কর্মকারক হয়ে থাকে, কর্তৃকারক হয় না। আর বিপদ-আপদের বেলায় বিপদ

শব্দটি اصاب ক্রিয়ার কর্তৃকারক হয়ে থাকে। অতএব ان تصبهم سيئة ان اصابوا سيئة ما ان اصابوا না হয়ে যদি وان تصبهم حسنة حسنة থাকত, তাহলে পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে অনুরূপ উক্তি সম্ভব হত। কাজেই আয়াত দুটিতে মানুষের নেককাজ ও বদকাজ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না।

সূরা আল-হাদীদের ২২ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

"না পৃথিবীতে এমন কোন মঙ্গল-অমঙ্গল আসতে পারে, না তোমাদের নিজ সম্পর্কে এমন কোন মঙ্গল-অমঙ্গল আসতে পারে যা মখ্লুকাত সৃষ্টির পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। আর পূর্বাহ্নের এই লিখন আল্লাহ্র পক্ষে সহজ। কোন মঙ্গল তোমাদের হস্তগত না হওয়ার কারণে তোমাদের যাতে আফসোস করতে না হয় এবং আল্লাহ্ তোমাদের যে মঙ্গল দান করেন তার ফলে তোমরা যাতে আনন্দে অধীর না হও, এই উদ্দেশ্যেই আমি এ ব্যবস্থা করে রেখেছি।"

আয়াতদ্বয়ের তাৎপর্য এই যে, অনাবৃষ্টি, শস্য ও ফল উৎপাদনহ্রাস, মূল্যবৃদ্ধি, দুর্ভিক্ষ, রোগ-ব্যাধি, অভাব-অনটন, সন্তান-মৃত্যু, প্রভৃতি অমঙ্গল এবং এ সকলের বিপরীত মঙ্গলগুলো সবই আল্লাহ্ তা'আলা মখলুকাত সৃষ্টির পূর্বে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র) এই আয়াতের তফসীরে বলেন, তফসীরকার الزجاج। বলেছেন যে, কাযা ও কাদরের অনিবার্য ফলস্বরূপ লোকে জান্নাতে ও জাহান্নামে যাবে—ইহাও এই কালামের আওতায় পড়ে। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী আরও বলেন ولا فى انفسكم এর মধ্যে মানুষের যাবতীয় মুসিবতের কথা বলা হয়েছে আর মানুষের কুফর ও অন্যান্য গুনাহ্ ও মানুষের মুসিবত বিশেষ। কাজেই স্বীকার করতে হবে যে, মানুষের পাপ ও পুণ্য এই নীতির প্রভাব দ্বারা প্রভাবান্বিত।

أهل السنة و الجماعة দল এই তাকদীরের যে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে তা বহু সহীহ হাদীসের ওপর ভিত্তি করে গৃহীত হয়েছে। তা থেকে কেবলমাত্র সহীহ বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থে বর্ণিত কয়েকটি হাদীস বলছি ঃ

১। আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "আসমান-যমীন সৃজনের পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আল্লাহ্ তা'আলা কুল মাখলুকাতের অবস্থাসমূহ লিপিবদ্ধ করেন—সে সময়ে ছিল কেবল মাত্র পানি ও 'আরশ' এবং আল্লাহ্র 'আরশ' পানির ওপরে স্থাপিত ছিল। (মুসলিম)

২। ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, প্রত্যেকটি বিষয়—এমনকি অক্ষমতা এবং বুদ্ধিও কাদরের ফয়সালা অনুযায়ী ঘটে থাকে। —মুসলিম।

৩। ইবনে মসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে এই বাণী শুনান—তোমাদের প্রত্যেকের সৃজন-ব্যবস্থা এই ঃ তাকে তার মায়ের জরায়ুর মধ্যে ৪০ দিন যাবৎ নুৎফা বা সামান্য পানিরূপে একত্রিত করা হয়; তারপর সে অনুরূপ কাল ধরে রক্ত পিণ্ডের আকারে থাকে; তারপর অনুরূপ কাল ধরে মাংসপিণ্ডের আকারে থাকে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফিরিশতাকে চারটি বিষয়সহ তার দিকে পাঠান—ফলে সেই ফিরিশতা লিখে নেন তার কাজের বিবরণী, তার আয়ুষ্কাল ও তার রিযকের পরিমাণাদি এবং সে ভাগ্যবান না হতভাগা (জান্নাতী হবে, না জাহান্নামী)। তারপর তার মধ্যে রূহ্ সঞ্চারিত করা হয়। যিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই তাঁর কসম, তোমাদের কেহ এমনও হতে পারে যে, সে জান্নাতীর আমল করতে করতে এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছে যে, তার মধ্যে ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকে। এমন সময় তার ঐ লিখন তার ওপরে প্রভাব বিস্তার করে, ফলে, সে জাহান্নামীর কাজ করতে করতে জাহান্নামে চলে যায়। সেইরূপ তোমাদের কেহ এমনও হতে পারে যে, সে জাহান্নামীর কাজ করতে করতে এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছে যায় যে, তার মধ্যেও জাহান্নামের মধ্যে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকে। এমন সময়ে তার ঐ লিখন তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে, সে জান্নাতীর কাজ করতে করতে জান্নাতে চলে যায়।—বুখারী ও মুসলিম।

৪। হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য তার স্থান জান্নাত অথবা জাহান্নামে হওয়া লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। সাহাবীগণ বলেন, আল্লাহর রাসূল, তাহলে কি আমরা আমাদের ঐ লিখনের উপর ভরসা করে আমল ত্যাগ করতে পারি না? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, 'তোমরা কাজ করে চল; কারণ যার জন্য যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই ধরনের কাজই তাকে যোগান হবে ও তার জন্য সহজসাধ্য করা হবে। সে যদি ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তবে তার জন্য সৌভাগ্য লাভের কাজগুলো সহজসাধ্য করা হবে। আর সে যদি হতভাগ্যদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য দুর্ভাগ্যের কাজগুলোই সহজসাধ্য করা হবে। নবী (সা) এই কথা বলবার পর কুরআন মজীদের কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করেন। আয়াতগুলির তরজমা এই ঃ "অনন্তর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাহে দান-খয়রাত করল অধর্মাচরণ থেকে দূরে থাকল এবং লা ইলাহা ইল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ বিশ্বাস করল তার জন্য আমি এমন সব কাজ সহজসাধ্য করব যা তাকে আরামস্থল জান্নাতে নিয়ে যাবে, আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করল, আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করল এবং তাওহীদ ও

নবূওয়ত অবিশ্বাস করল, তার জন্য আমি এমন সব কাজ সহজসাধ্য করব যা তাকে শাস্তিস্থল জাহান্নামে নিয়ে যাবে।"

তারপর কর্মের কথা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَاسَعٰى মানুষ যার জন্য চেষ্টা পরিশ্রম করে তাছাড়া তার আর কিছুই প্রাপ্য নেই। অর্থাৎ মানুষ যেমন কাজ করে তাকে সেইরূপ ফল দেওয়া হয়। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদের বহুস্থানে মানুষকে নেকআমল করবার জন্য এবং বদআমল থেকে দূরে থাকবার জন্য আদেশ করেছেন এবং এও বহুস্থানে বলেছেন যে, সৎকাজ করলে তাকে পুরস্কৃত করা হবে এবং অন্যায় কাজ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

সমস্যার সমাধান—ইসলামী শরীয়াতের কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে সম্পূর্ণ কুরআন মজীদ এবং নবী (সা)-এর যে সকল হাদীস আমাদের হস্তগত হয়েছে, সেইসব হাদীস সমষ্টিগতভাবে আলোচনা করে দেখাই সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত। কারণ, কোন আইন গ্রন্থের কোন বিশিষ্ট ধারাকে সম্পূর্ণ আইন গ্রন্থ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কখনই বিচার করা হয় না। কাজেই কোন একটা বিশেষ আয়াত অথবা কোন একটা বিশেষ হাদীসকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করা যেতে পারে না। সূরা النجم এর ৩৯ নং আয়াত لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَاسَعٰى 'মানুষ যেমন পরিশ্রম করে তেমনি তার ফল পায়।' এর ওপরে আমাদের যেমন আমল করতে হবে, তেমনি সূরা الحديد এর مَا اَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِىْ اَنْفُسِكُمْ اِلاَّ فِىْ كِتٰبٍ আয়াতটিতে বর্ণিত বিষয়ও আমাদের মানতে হবে। কাজেই এর যে সমাধান রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলীর যবানী বর্ণিত হাদীসটির মধ্যে দিয়েছেন সেই সমাধানটিকে সর্বোত্তম বলে গ্রহণ করে আমাদেরকে সেই অনুযায়ী চলতে হবে; তা এই মানুষকে কর্ম করে যেতে হবে। তাকদীরের উপর নির্ভর করে আমল বর্জন করা চলবে না। আশা করা যায়, যে যেমন কাজ করবে তার পরিণাম সেই রকমই হবে।

দ্বিতীয় সমাধান ঃ সূরা الحديد-র যে আয়াতটিতে কাদরের কথা বলা হয়েছে, তার পরবর্তী আয়াতটির মধ্যেই তার সমাধান নিহিত রয়েছে। সমাধানটি এই ঃ

'মানুষ যদি তার কোন অভীষ্ট লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করার পরে অবশেষে ঐ অভীষ্ট লাভে অকৃতকার্য হয়, তবে তার মনে আফসোস হওয়া স্বাভাবিক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার মন এতদূর ভেঙ্গে পড়তে পারে

যে, তার পক্ষে অদূর ভবিষ্যতে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। ঐ অবস্থার প্রতি সূরা الحـــديـد এর ২৩ নং আয়াতটি প্রযোজ্য। ঐ কালামের তাৎপর্য এই—তোমরা যখন চেষ্টা পরিশ্রম করে অকৃতকার্য হও তখন বিশ্বাস রেখো যে, ঐ অভীষ্ট তোমার তাকদীরে ছিল না। এই বিশ্বাস হৃদয়ে জাগরূক রেখে আবার নূতন উদ্যমে অগ্রসর হতে থাকবে। পরবর্তী বিষয়টিতে হয়ত বা কৃতকার্য হবে। অনন্তর যদি কৃতকার্য হও, তবে বিশ্বাস রেখো যে, ঐ কৃতকার্যতা তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলাই দিয়েছেন। কাজেই আহলাদে আটখানা হয়ে আল্লাহকে ভুলে যেওনা। বিশ্বাস রেখো, পূর্বাহ্নেই আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য এ কৃতকার্যতা বরাদ্দ করে রেখেছিলেন বলেই তুমি তা পেয়েছ। শ্রম—তদবীর, ফল কথা, চেষ্টা-যত্ন, পূর্ণ মাত্রায় করার পরে কৃতকার্য অথবা অকৃতকার্য হলে তখন ওঠে তাকদীরের কথা; কর্ম আরম্ভ করবার পূর্বে বা কর্ম চলতে থাকাকালে তকদীরের কোন কথাই ওঠেনা। কাজেই কর্ম থাকবে; আর তকদীর থাকবে তার নিজ স্থানে। ফলে, তাকদীরে বিশ্বাস কিছুতেই আমলের পরিপন্থী হতে পারে না।'

তৃতীয় সমাধান ঃ মানুষ যেমন তাকদীরের উপর ভরসা করে আমল বর্জন করতে পারেনা, তেমনি সে আমলের উপরও সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে পারেনা। কারণ, মানুষের কোন আমলই দোষ ত্রুটিহীন হতে পারেনা। অতএব মানুষ এক মাত্র নির্ভর করতে পারে আল্লাহ্র উপরে। তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন—কোন কিছু করতে তিনি বাধ্য নন। তাঁর যা ইচ্ছে হয় তাই তিনি করতে পারেন ও করে থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলার এই সর্বময় ইচ্ছাকে স্বীকৃতি দিতে গিয়ে বিশ্বাস করতে হয়—তাকদীরে, বিশ্বাস করতে হয় যে, তকদীরের ভাল-মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গল সবই এসে থাকে ঐ এক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নিকট থেকে। আল্লাহ্ তা'আলার এই সর্বময় ইচ্ছার অভিব্যক্তি পাওয়া যায় তাক্দীর সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীসসমূহে।

উল্লেখিত শেষ হাদীসটির তাৎপর্য এই যে, কোন মানুষ সারা জীবন নেক কাজ করতে থাকলে তাকে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে দাখিল করবেন, কিন্তু তার পক্ষে জান্নাতী হওয়া অবধারিত নয়। তার জান্নাতী হওয়া নির্ভর করে কদরের ওপর।

কাদর ফয়সালার কাল

আল্লাহ্ তা'আলার কালামে ও নবী (সা)-এর হাদীসে কাদর-ফয়সালার কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন কালের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া জ্ঞান-বুদ্ধি কদর-ফয়সালার আর একটি কালের দিকে ইঙ্গিত করে। এইভাবে যে কয়টি কাল পাওয়া যায় তা এই ঃ

(এক) জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু ازلى। অনাদি এবং قدر ফয়সালা যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার একটি অবিচ্ছেদ্য গুণ, কাজেই قدر ফয়সালা নিশ্চিতভাবে ازل। অর্থাৎ অনাদিকালে সম্পাদিত হয়েছে।'

(দুই) সহীহ মুসলিম হাদীস গ্রন্থে আবদুল্লা ইব্‌ন আমর (রা)-এর যবানী যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, "আসমান-জমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আল্লাহ্ তা'আলা কুল মাখলুকাতের অবস্থাদি লিপিবদ্ধ করেন।

(তিন) আবু দাউদ, তিরামিযী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে واذ اخذ ربك من بنى ادم من الخ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত ওমর (রা) এর যবানী যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে আদমকে পয়দা করার পরে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ ডান হাত দিয়ে আদমের পিঠে মৃদু স্পর্শ করে আদমের একদল বংশধর বের করেন, এবং বলেন; আমি এদের জান্নাতের জন্য পয়দা করলাম এবং এরা জান্নাতীদের কাজই করবে। আবার আল্লাহ্ তা'আলা আদমের পিঠ স্পর্শ করে আদমের আর একদল বংশধর বের করেন এবং বলেন, এদেরে আমি জাহান্নামের জন্য পয়দা করলাম এবং এরা জাহান্নামীদের কাজই করবে।"

(চার) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর যবানী যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, "গর্ভ সঞ্চারের চার মাস পরে প্রত্যেক ভ্রূণের কদর ফয়সালা লিপিবদ্ধ হয়।"

(পাঁচ) মুসতাদরাক হাদীস গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা)-এর যবানী বর্ণিত আছে যে, "বিপদ যখন عالم ملكوت থেকে ছাড় লাভ করে সংঘটিত হবার জন্য দুনিয়ার দিকে আসতে থাকে সেই সময় যদি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে করুণ দু'আ প্রার্থনা সাধিত হয় তবে ঐ দুয়া ঐ বিপদকে পথিমধ্যে বাধা দিতে থাকে।"

এ থেকে জানা যায় যে, "ঘটনা ঘটবার অব্যবহিত কিছুকাল আগে কাদর-ফয়সালা নিষ্কৃতি লাভ করে। এই পর্যায়গুলোর প্রত্যেক পর্যায়ে কাদর ফয়সালার রূপ ও অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে মুসলিম জগতের সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ ইসলামী শাস্ত্রবিদ ও বিচক্ষণ দার্শনিক হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ (র) তাঁর حجة الله البالغة গ্রন্থের ايمان بالقدر অধ্যায়ে এক নাতিদীর্ঘ স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। নিষ্প্রয়োজনবোধে তাঁর ঐ ব্যাখ্যাটি দিচ্ছিনা। তবে আমি এতটুকু বলতে পারি যে, এই পাঁচ পর্যায়ের কাদর-ফয়সালাই সূরা الحديد। এর

২২ নং আয়াতের আওতায় পড়ে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ (র)-এর মধ্যে যে জনকল্যাণ উপলব্ধি করেছেন তার উল্লেখ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। তিনি বলেন ঃ শ্রেষ্ঠ পুণ্যগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে কাদরের প্রতি ঈমান। কারণ যে একক পরিচালন নীতি জগতসমূহে পরিব্যপ্ত হয়ে রয়েছে তা মানুষ কাদরের প্রতি ঈমানেরই সাহায্যে অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করতে পারে।

যে ব্যক্তি সঠিকভাবে এই ঈমান রাখে তার দৃষ্টি আল্লাহ্র কাছে যা-রয়েছে তারই দিকে নিবদ্ধ থাকে। সে দুনিয়া ও দুনিয়ার সব কিছুকে আল্লাহ্র কাছে যা রয়েছে তারই ছায়াবৎ জ্ঞান করে; এবং আল্লাহ্র কথার সামনে বান্দার ইখ্তিয়ার কর্ম-স্বাধীনতাকে দর্পণে প্রতিফলিত আকৃতির ন্যায় মনে করে। ফলে আল্লাহ্র নিকটে যে একক পরিচালন নীতি রয়েছে তা দুনিয়াতে হউক আর না হউক—অন্ততঃ আখিরাতে পরিষ্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য তার এই বিশ্বাস ও জ্ঞান তাকে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ও উপযুক্ত করে তোলে।

মহান পুণ্যগুলোর মধ্যে কদরের প্রতি ঈমান ঈমানের গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "যে ব্যক্তি কাদরের মঙ্গল-অমঙ্গলের প্রতি ঈমান রাখেনা তার থেকে আমি সম্পূর্ণ ছিন্ন, নারায।" তিনি আরও বলেন 'কোন বান্দা তাকদীরের মঙ্গল অমঙ্গলের প্রতি যে পর্যন্ত ঈমান না আনে এবং একথা বিশ্বাস না করে যে তাকে যা দেওয়া হয়েছে তা কোন ক্রমেই ওর থেকে ফসকাবার ছিল না এবং যা ওর থেকে ফসকে গেছে তা কোন ক্রমেই তার কাছে পৌঁছুবার ছিলনা—সে পর্যন্ত সে মু'মিন হতে পারে না।"

ইসলাম ও ফিতরাত*

মোহাম্মদ জাফর পাহ্‌লোয়ার্দী

[লাহোর 'ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক কালচার'-এর মাসিক উর্দু মুখপত্র' 'সাকাফাত'-এর গত জানুয়ারী, মার্চ ও মে সংখ্যায় প্রবন্ধটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধকার মোহাম্মদ জাফর পাহ্‌লোয়ার্দী উক্ত ইনস্টিটিউটের সাহিত্য শাখার অন্যতম সদস্য।]

আমরা সবাই সুদীর্ঘকাল ধরে এ দাবী শুনতে অভ্যস্ত যে, "ইসলাম ফিতরাতের দীন" (প্রকৃতির ধর্ম)। মসজিদের মিম্বর, প্যাণ্ডেলের মঞ্চ এবং কিতাবের পাতায় সর্বত্র একই দাবীর পুনরাবৃত্তি চলছে—'ইসলাম প্রকৃতই ফিতরাতের অনুকূল জীবন-ব্যবস্থা। উক্ত দাবীর সপক্ষে আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করা হয়ে থাকে। "فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا —তা-ই আল্লাহ্‌র ফিত্‌রাত—যার উপর সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষকে।" গূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধির চেষ্টা না করেই ইসলামের মুলনীতিগুলোর যথার্থ স্বীকার করে নিয়ে যারা সম্পূর্ণ নিরাপদে ঈমানের সাথে জীবন-পাত করে গিয়েছেন, মানুষ হিসেবে তাঁরা ছিলেন খুবই মহৎ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা এসে পড়েছি এক বিস্ময়কর এবং অদ্ভুতকালের আবর্তে—ইতিপূর্বে যাছিলো কল্পনারও অতীত সে সব সমস্যা ও বিতর্কমূলক বিষয়ও আমাদের সামনে উপস্থিত। প্রত্যেকটি সমস্যার আজ সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ ও নিশ্চিত সমাধানের চেষ্টা হচ্ছে জ্ঞান, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বাস্তব দৃষ্টিভংগীর ভিত্তিতে। প্রত্যেকটি সমস্যাকে সকল দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তার নিত্য-নতুন সমাধানও আবিষ্কার হচ্ছে। অন্য কথায় বলা যায়—আবেগের শূন্যস্থান পূরণ করা হচ্ছে যুক্তি দিয়ে। এসব কিছুর উৎসমূলে প্রেরণা যোগাচ্ছে একমাত্র ফিতরাতই। কারণ, মানুষের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান পরস্পরকে ধাপে ধাপে এগিয়ে দিচ্ছে প্রগতির দিকে। আধুনিক কালের মানুষের বুদ্ধি অদৃশ্যে ঈমানকেও বাস্তবের পরিচ্ছদে উজ্জ্বলরূপে দেখতে উৎসুক, অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে প্রমাণাদি অন্বেষণে লিপ্ত। এই সংঘর্ষ-সংকুল প্রগতির যুগে যখন আমাদের সম্মুখে এই দাবী উত্থিত হয় যে, "ইসলাম ফিত্‌রাতের দীন", বিবেকের মধ্যে তখন অজস্র প্রশ্ন জাগে,

---

* [প্রবন্ধটি ইফা পত্রিকা ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সন ৩,৪ বর্ষ ৩য়, ৪র্থ ১ম, ২য় ও ৩য় সংখ্যা থেকে সংগৃহীত]

দাবীর সমর্থনে প্রমাণাদি তলব করে এবং মুসলমানের অন্তরে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। অর্থাৎ, যদি বলা হয় যে, ইসলাম ফিতরাতের প্রতিকূল জীবন-বিধান, তাতে যেমন সংকটের সম্মুখীন হতে হয়, তেমনি ইসলাম ফিতরাতের অনুকূল, একথা বললেও একইরূপ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। কারণ, ইসলাম ফিতরাতের প্রতিকূল, একথা স্বীকার করে নিলে সকল তরফ থেকেই প্রশ্ন উঠবে—"তবে কেন একটি ফিতরাত-বিরোধী ব্যবস্থার দিকে এই আহ্বান?" ইসলাম ফিতরাতের একান্ত অনুকূলে, এই দাবী করা হলেও প্রশ্ন উঠবে—"তবে বিশ্ব-মানব সকল ফিতরাত-বিরোধী জীবন-ব্যবস্থাকে পরিহার বা পরিত্যাগ করে ইসলামী জীবনাদর্শকে গ্রহণ করে নিচ্ছে না কেন?" ইসলামের বিধান কি? বিধানগুলো সবই কি ফিতরাতের অনুকূল? শূকরের গোশ্‌ত খাবে না, সূদ নেবে না, রীতিমতো যাকাত দিবে, হয্‌ব্রত পালন করবে, —অনুরূপভাবে লেন-দেন, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ব্যবহারিক ইত্যাদি হাজারো রকম বিধান ইসলামে রয়েছে। এ সবই কি ফিতরাতের অনুকূল এবং ফিতরাতের সাথে এগুলোর কী সম্পর্ক?

শতকরা নিরানব্বই জন্যই স্বাভাবিকভাবেই উক্ত বিধানগুলোর প্রতি ভীষণ বিদ্বেষভাব পোষণ করে একারণে যে, এসবের বাস্তবায়নে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শক্তি প্রয়োগ ও কঠোরতা অবলম্বনের প্রয়োজন হয়। এ সত্যটি আমরা সর্বত্রই দেখতে পাচ্ছি। এমতাবস্থায়, উক্ত বিধানগুলো ফিতরাতের যথার্থ অনুকূল, এ দাবী প্রতিষ্ঠার পন্থা কী? ক্ষুধার্তকে খাদ্য গ্রহণের জন্য আইন বা শাসনের চাপ প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন। ক্ষুধা পেলে অতি স্বাভাবিকভাবেই সে খাদ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। ক্ষুধা যদি না থাকে বা ফিতরাত যদি তাকে খাদ্য গ্রহণে বাধা প্রদান করে, তখনই অনুশাসনের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

চিন্তার এ পর্যায়ে পৌঁছতেই, فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا "তাই আল্লাহ্‌র ফিতরাত যার উপর সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষকে"—এর আবেদন ও দাবী কি, আমাদের গভীরভাবে বিচার করে দেখা আবশ্যক। প্রথমতঃ যদি ফিতরাতের যথার্থ উপলব্ধি সম্ভব হয় এবং আল-কুরআনের সাহায্যেই এর প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়, তাহলে উক্ত আয়াতের দাবী স্বচ্ছ হয়ে যাবে এবং "ইসলাম প্রকৃত ফিতরাতের দীন" এই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত সকল জটিলতারই মীমাংসা সম্ভবপর, এ কথা আশা করা যায়। "ইসলাম ফিৎরাতের খেলাফ" এ দাবী শুধু অসম্ভব নয়, অশোভনও বটে। "প্রকৃত ফিৎরাতই যে ইসলাম" স্থান-কাল নির্বিশেষে এ-ই অনস্বীকার্য সত্য। একে ভিত্তি করেই অধিকার পেয়েছি আমরা বিশ্ব-মানবকে ইসলামী জীবনাদর্শের প্রতি আহ্বান করার। ইসলাম

ফিৎরাত-বিরোধী জীবনাদর্শ বলে একে আমরা গ্রহণ করিনি, বা একারণে আমরা কাউকে ইসলামের দিকে আহ্বান করি না।

উল্লেখিত আয়াতে কারীমার নির্গলিতার্থ উপলব্ধি করতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা কর্তব্য ঃ (১) ফিতরাতের আভিধানিক ও কুরআনিক অর্থ কি? ফিতরাত মূলতঃ কি? (৩) মানুষের ফিৎরাত কি? (৪) ইসলাম কি অর্থে ফিৎরাতের দীন? (৫) ইসলাম কোন্ কোন্ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশ্ব-প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে চায়?

এধরনের অনেক প্রশ্ন আছে, যার সমাধানের উপর ইসলাম ফিতরাতের অনুকূল কি প্রতিকূল জীবন-ব্যবস্থা, এ প্রশ্নের চূড়ান্ত সমাধান নির্ভরশীল।

আদিতেই এর আভিধানিক অর্থ আলোচনা করা যাক ঃ

একার্থবোধক শব্দ

ফাতের (فاطر), খালেক (خالق), বারী (بارى), মাব্‌দী (مبدى), বাদী (بديع), মুনশী (منشى) ইত্যাদি শব্দগুলো আরবী ভাষায় অনস্তিত্ব থেকে কোন পদার্থকে অস্তিত্বে আনয়নকারীর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলো সবই আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম। প্রতিটি শব্দই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি-নৈপুণ্যের ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য ও গুরুত্বের পরিচায়ক ও পরিবাহক। অর্থাৎ প্রত্যেকটি শব্দের মধ্যেই "সৃষ্টি" ক্রিয়ার অর্থ যৌথভাবে থাকলেও এগুলো সৃষ্টি ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্তর ও অবস্থার পরিচায়কও বটে। "ফাতের" শব্দটিই এখানে আলোচ্য। অর্থের দিক থেকে অন্যান্য শব্দগুলোর সাথে "ফাতের" শব্দের সামঞ্জস্য থাকলেও এর একটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে—"ফাতের" অর্থ সাধারণ স্রষ্টা নয়, বরং কোন জীবের বিশেষ নির্দিষ্ট ফিতরাত-এর উপর সৃষ্টিকারীকে "ফাতের" বলা হয়। বিশ্ব-মানব ও আকাশ-পাতাল সৃষ্টির ব্যাখ্যায় ও আল-কুরআনের পরিভাষায় এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ঃ

১। الذى فطر كم اول مرة। — যিনি তোমাদের প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন। (৫৬ ঃ১৭)

২। فاطر السموات والارض। — (আল্লাহ) আকাশ-পৃথিবীর স্রষ্টা। (৬১ ঃ ৬)

সাধারণ অর্থে ঃ

এখন প্রশ্ন হলো যে, 'ফিতরাত' শব্দের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য কী? ফিতরাত শব্দের আভিধানিক অর্থ একাধিক। তবে, ঐ সবের মধ্যেই একটি বিশেষ সাধারণ

বোধগম্য ভাব আছে। সর্বাগ্রে আমাদের একথা জানা আবশ্যক।

ফিতরাত (ف–ط–ر) ধাতু নির্মিত হলে, কোনো বাধা অতিক্রম করা বা করানোর অর্থ বুঝায় ঃ যথা — فطر الشئ — (ফাতারাশ্‌শাই) একে খণ্ডিত করে দিয়েছে, অর্থাৎ, এমনি করে ফাটল ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে ভিতরকার বস্তু প্রকাশমান হয়ে পড়েছে।

فطرت ناب البعير — উষ্ট্রের দাঁত গজিয়েছে অর্থাৎ দাঁত মাঢ়ী ভেদ করে প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

فطرت الشاة — অংগুলি স্পর্শে ছাগীর দুগ্ধ দোহন করেছে, অর্থাৎ স্তন থেকে বের করেছে।

فطر الامر — একে সৃষ্টি করেছে বা কাজটি আরম্ভ করে দিয়েছে, অর্থাৎ অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে নিয়ে এসেছে।

فطر الصائم — অনশন ছেড়ে দিয়েছে অর্থাৎ পানাহারের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে। এ তহলো তিন অক্ষরে গঠিত শব্দের উদাহরণ, চার বা ততোধিক অক্ষর দ্বারা গঠিত শব্দের উদাহরণও কিছু শুনুন : যেমন

فطر الصائم—অনশন ভেঙেছে।
فطر الصائم—অনশন ভাঙিয়াছে। } ভাব একই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

فطر الشئ—বিদীর্ণ করেছে।
تفطر الشئ وانفطر—বিভক্ত হয়ে গিয়েছে } ভাবার্থ

تفطرت انفطرت الارض بالنبات — পৃথিবীর বুক চিরে উদ্‌গম করে দিয়েছে উদ্ভিদের অংকুর।

تفطرت انفطرت القضيب — আবিষ্কার করেছে অর্থাৎ পর্দার অন্তরাল থেকে প্রকাশ্যে আনীত হয়েছে।

এবারে উৎপাদিত বিশেষ্য সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যাক। যেমন الفطر। ক্রিয়া অর্থ বিভক্ত হওয়া। الفطر। যে আঙুরের ছড়া বের হয়েছে। عيد الفطر। শাওয়াল মাসের নব চন্দ্র উদিত হওয়ার পরের ঈদ। الفطر। মাটি ফুঁড়ে প্রকাশিত উদ্ভিদ। বেঙের ছাতাকেও الفطر। বলে। الفطير। নূতন রুটি, নূতন দুগ্ধ। لافطور। মুখমণ্ডল বা নাসিকার ছিদ্র। الفاطر। দাঁত উঠেছে। এমন ব্যক্তি।

ফিতরাত ও ফাতের

উপরে শব্দের রূপান্তরক্রমে যেসব পরিভাষায় বর্ণনা দেয়া হলো, সে সবের মধ্যেই একটি সর্বাত্মক ভাব নিহিত রয়েছে সে হচ্ছে কোন বস্তুর অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে বা গোপনীয়তা থেকে প্রকাশ্যে আসা বা আনা অথবা বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া বা করা। এখন ভেবে দেখা দরকার, 'ফিতরাত্' ও 'ফাতের', ঐ শব্দ দু'টি সম্পর্কে। ফিতরাতের আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ ঃ

১. সকল পদার্থের মধ্যে আজন্ম বর্তমান একটি বিশেষ গুণের নামই ফিতরাত।

২. পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবমুক্ত মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক গতিই ফিতরাত্।

৩. আদ-দীন অর্থাৎ আইনের বিধান।

৪. আস-সুন্নাত অর্থাৎ প্রকৃতি বা রীতি-নীতি।

৫. নূতন সৃষ্টি। সকল পদার্থের মধ্যে আজন্ম বর্তমান বিশেষ গুণটিকেই বলা হয় ফিতরাত্ এটিই উপরের অর্থগুলোর মৌলভাব। অপরাপর অর্থগুলো এরই বিভিন্ন দিক মাত্র।

ফিতরাতের প্রকারভেদ

আলোচ্য তত্ত্বটিকে এভাবে আরো স্পষ্ট করা যেতে পারে যে, প্রত্যেকটি সৃষ্টিই কোন না কোন একটি বিশেষ প্রকৃতির সমন্বয়ে গঠিত যা সর্বক্ষণই তার মাঝে বিদ্যমান থাকে। এগুলো অধীন, স্বাধীন, জ্ঞাত, অজ্ঞাত, নানাবিধ হয়ে থাকে। পানির গতি নিম্নমুখী এটা পানির ফিতরাত বটে। কিন্তু এতে পানির কোনই প্রভাব নেই, বরং এটা সৃষ্টিগত। ছাগল ঘাস খায়, এও তার ফিতরাত্; কিন্তু এতে ছাগলটির স্বাধীনতার প্রভাব রয়েছে। এখানে নিম্নের বিষয়গুলো সম্পর্কেও একটা পরিচ্ছন্ন ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক।

১. কোন পদার্থই একটি মাত্র ফিতরাতের ধারক নয়, বরং তাতে রয়েছে নানাবিধ ফিতরাতের একত্র সমাবেশ। যেমন, নিম্নগমন পানির একমাত্র ফিতরাত্ নয় বরং এক বিশেষ পর্যায়ের শীতলতায় জমে যাওয়া এবং এক নির্দিষ্ট পরিমাণের উত্তাপ পেলে বাষ্পে পরিণত হয়ে উড়ে যাওয়াও পানির ফিতরাত। ঘাস খাওয়াই ছাগলের একমাত ফিতরাত বা প্রকৃতি নয়; হাঁটা, চলা, দৌড়ানো, শত্রুর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, ভীত হওয়া প্রজাতীয়তার মোহে মত্ত হওয়া এবং আহারান্তে জাবর কাটা ইত্যাদিও ছাগলের ফিতরাত্।

২. দু'টি শ্রেণীর ফিতরাতের মধ্যে হুবহু মিল ও সামঞ্জস্য থাকা নিষ্প্রয়োজন। সাদৃশ্য ও পরস্পর-বিরোধী দু'রকমের ফিতরাতই থাকতে পারে। একটি ফিতরাত ছাগল, বানর ও বিড়ালের মধ্যে হুবহু পাওয়া গেলেও এদের প্রত্যেকেরই একটা

স্বতন্ত্র ফিত্‌রাত রয়েছে যা একে-অপরের বিরোধী। ক্ষুধা, প্রজাতীয় টান, দৌড়াদৌড়ি, ভীতি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদি ব্যাপারে এদের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও আহারের রুচিবোধ ইত্যাদিতে এরা বিভিন্ন।

৩. ফিতরাতের সমস্ত গুণগুলোই যে স্থায়ী হবে, এমন নয়; কোন কোনটি পরিবর্তনশীলও বটে। সুতরাং এ পরিবর্তন ফিতরাতেরই অন্তর্ভুক্ত। বাঘ ও ছাগীর বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হয়েই দুগ্ধ পানে লেগে যায়। এখানে উভয়ের ফিতরাতে সামঞ্জস্য থাকলেও পরে উভয়ের ফিতরাতই পরিবর্তন হয়ে যায়। একটি ঘাসে অপরটি মাংসে আকৃষ্ট হয়, এ পরিবর্তনও উহাদের নিজ নিজ ফিতরাতের বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ দুগ্ধ পানের ন্যায় দুগ্ধ ত্যাগও যেমনি উভয়ের ফিতরাত, তেমনি তাদের ফিতরাত পরবর্তী কালে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া।

মোটকথা, বিদ্যুৎ, পাথর, উদ্ভিদ্‌, চতুষ্পদ জন্তু এবং মানুষ ইত্যাদি বিশ্ব-সৃষ্টির মধ্যে সদৃশ ও পরস্পর-বিরোধী উভয় প্রকারের ফিতরাতই বিদ্যমান রয়েছে এবং সৃষ্টির মধ্যে শ্রেণী-বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও সকলের ফিতরাতের মধ্যে কিছু কিছু মিলও পরিলক্ষিত হয়।

ফিতরাতের সংজ্ঞা

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সংক্ষেপে ফিতরাতের সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে— জীবনের মূলনীতি বা বাস্তব বিধানাবলীর সাথে যা সাদৃশ্য ও সংগীতপূর্ণ তা-ই প্রকৃত ফিতরাত্‌— উহা পরিবর্তনশীল অথবা স্থিতিশীল, ইচ্ছাধীন অথবা স্বাধীন, জ্ঞাত বা অজ্ঞাত যেরূপই হোক না কেন।

কোন বস্তুর গোপনীয়তা বা বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া বা মুক্ত করা ف-ط-ر ধাতুর এ' অর্থের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ও অন্তর্নিহিত বোধগম্য ভাব ফিতরাতের উক্ত সংজ্ঞার মধ্যে সাধারণভাবে পাওয়া যায়। যে গুণ কোন পদার্থের জাত থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মপ্রকাশ করে, সেটাই সে পদার্থের ফিতরাত্‌। কোন মূল পদার্থের বাহ্য রূপ ও তা' থেকে কোন বিশেষ গুণের প্রকাশ বা বিকাশ এক কথা নয়। ফিতরাত্‌ এমন একটি সত্তা যা কোন পদার্থে সুপ্ত থাকে, আবার সুযোগ পেলেই তা' থেকে বেরিয়ে পড়ে।

ফাতের শব্দের মর্মার্থ

"ফিতরাত" শব্দের মূলতত্ত্ব অবগতির পর 'ফাতের' শব্দের আসল অর্থজ্ঞান লাভ করা অতি সহজ। আল্লাহ্‌ বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা, এতেই ফাতের শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ হয় না; বরং বিশ্ব-প্রকৃতিরও স্রষ্টা তিনিই, শব্দটি এ অর্থেরও দাবী রাখে। অন্যভাবে বলা যায় যে, "ফাতের" অর্থ এক নির্দিষ্ট বা বিশেষ ফিতরাত্‌ সম্বলিত পদার্থের স্রষ্টা।

মানব-ফিতরাতের অনুসন্ধান

এবার অনুসন্ধান করা যাক— মানুষের ফিতরাত্ কী, ফাতের তাদের মধ্যে কী কী ফিতরাত্ বা স্বভাব দান করেছেন এবং মানুষের মধ্যেকার কোন্ কোন্ ফিতরাত বা স্বভাব পরস্পরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং কোনগুলো পরস্পর-বিরোধী। এসব বিষয়ের সম্যক জ্ঞান লাভ হলেই ইসলাম কী অর্থে ফিত্‌রাতের দীন, তা উপলব্ধি করা সহজতর হয়ে যাবে।

মানুষের ফিতরাত সম্পর্কে পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদদের ধারণা

মানুষের ফিতরাত্ কী? এর উত্তরে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের পরস্পর-বিরোধী অনেক অভিমত রয়েছে। কোন কোন চিন্তাবিদের অভিমত পারিপার্শ্বিকতার স্পর্শ ও বহির্জগতের সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ব্যক্তির জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত বৈশিষ্ট্যগুলোই মানুষের ফিত্‌রাত্। ফিত্‌রাতের উল্লিখিত সংজ্ঞাটি শব্দ-গঠনের দিক থেকে বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বটে; কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিতে একেবারেই অর্থহীন। একেই বলে (تعليق المحال بالمحال) অসাধ্য সাধনে অসম্ভব শর্তারোপ। কারণ, জন্মেই কোন ব্যক্তি একাকী লালিত-পালিত হতে পারে না। তর্কের খাতিরে একথা মেনে নিলেও, অনুরূপ ব্যবস্থাধীনে পালিত দুই ব্যক্তির জীবন-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সংহতি থাকবেই এমন কী নিশ্চয়তা আছে? মেনে নিলাম, হয়ত এও সম্ভব, কিন্তু উক্ত ব্যক্তির জীবনীয় বা জীবনোপকরণ, আবহাওয়া এবং অন্যান্য ক্রিয়াশীল পারিপার্শ্বিকতা অপরাপর মানুষের স্বভাবকেও অনুরূপভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করবে না, একি কোনদিন সম্ভব? সুতরাং এ থেকে মানুষের ফিত্‌রাত্ নামে আখ্যায়িত করা যায়, এমন কোন বৈশিষ্ট্য নিরূপণ একান্ত অসম্ভব। অতএব অনুরূপ অবস্থায় সৃষ্ট বৈশিষ্ট্য মানুষের ফিত্‌রাত্ বা ফিত্‌রাতের অনুকূল কিনা, এ প্রশ্নই অবান্তর।

পাশ্চাত্যের কারো কারো মত যে, দেশ, কাল ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে গোটা মানব-ইতিহাসের পক্ষপাতহীন পর্যালোচনার মাধ্যমে যে সাদারণ ধর্ম বা গুণটি পাওয়া যায়, তা-ই মানুষের ফিত্‌রাত। প্রথমটির মত ঐ সংজ্ঞাটিও অর্থহীন। কারণ, মানব-ইতিহাসের এরূপ একটি গাদা সংগ্রহ করা অসম্ভব। তর্কের খাতিরে সম্ভব বলে স্বীকার করে নিলেও গবেষণা ও মীমাংসার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বিশ্বস্ততা ও নিরপেক্ষতার সাথে কর্তব্য সম্পাদন করবে এবং তাদের কোন ভুল ভ্রান্তি হবে না, এর কী নিশ্চয়তা আছে? এবং এদের স্বাতন্ত্র্য প্রবণতার উর্ধ্বে থাকার কোন উপায় আছে কী? এক কথায় এ সংজ্ঞাটি কোন তত্ত্বের নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি নয়।

কোন কোন চিন্তাবিদ্ মনে করেন, মানুষ যে যুগে মরুচারী জীবন যাপন করত, সে যুগের লোকরা ছিল পবিত্র, পরবর্তী সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে অপরিচিত এবং প্রকৃত ফিত্‌রাতের অনুসারী ও অনুবর্তী। তারা যা-ই করতো ফিত্‌রাতের তাগিদেই করতো। ঐ সংজ্ঞাটিও উল্লেখিত সংজ্ঞাগুলোর প্রায় অনুরূপ। কারণ, এখানে ইংগিত করা হয়েছে প্রাগ্-ঐতিহাসিক জীবন ধারার প্রতি—অথচ এ ব্যাপারে সঠিক কিছু জানা মুশকিল, যদিও আধুনিক বন্যদের দেখে কিছুটা অনুমান করা যায়। কিন্তু দেশ বিশেষে বন্যদের স্বভাবেও পার্থক্য হয়, একথাও সত্য। বিভিন্ন রকম স্বভাবের সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ে একটি সাধারণ ধর্ম বা গুণ সৃষ্টি করা সম্ভব বটে। কিন্তু তা হবে অজ্ঞতা, বর্বরতা, লজ্জাহীনতা এবং ভাবপ্রবণতা ইত্যাদিরই অদ্ভুত সমাবেশ। একে মানুষের ফিত্‌রাত্ নামে আখ্যায়িত বা এর কষ্টিপাথরে কোন আইন-কানুনের সত্যাসত্য যাচাই করা শুধু অসম্ভবই নহে, অশোভনও বটে।

কোন কোন চিন্তাবিদ্ সদ্যোজাত শিশুর স্বভাবকে মানুষের ফিত্‌রাত নাম দিয়ে থাকেন কিন্তু এও যে অভ্রান্ত নয়, একটু চেষ্টা করলেই তা জানা যায়। শিশুদের অংগভংগী সত্যি যদি মানুষের ফিত্‌রাত্ হয়, তবে তা নিয়ে বড়দের হাস্‌বার কোনই কারণ নেই। সারকথা এই যে, মানুষের প্রকৃত ফিত্‌রাত্ নিরূপণের ব্যাপারে বড় বড় চিন্তাবিদ্‌গণও কোন নিখুঁত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি, মতানৈক্য রয়েছেই। এতদসত্ত্বেও মানুষের ফিত্‌রাত কী, জান্‌বার জন্য মানুষের মনে উৎকণ্ঠা জাগে। এবং কোন বস্তু বা ক্রিয়া মানব-ফিত্‌রাতের অনুকূল অথবা প্রতিকূল এ কেমন করে জানা যায়, এজন্য মন সর্বদাই ব্যাকুল। সুতরাং মানুষের ফিত্‌রাত কী, পূর্বাহ্নেই এ তত্ত্বটির অনুসন্ধান হওয়া অপরিহার্য, অতঃপর ইসলাম কী অর্থে দীনুল ফিত্‌রাত, বিচার করে দেখতে হবে।

মানুষের ফিত্‌রতী (প্রকৃতিগত) চাহিদাগুলো দু'রকমের—জৈবিক ও আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক চাহিদাগুলোকে বাদ দিয়ে জৈবিক চাহিদাগুলোকেই যদি পরখ করে দেখা হয়, তবে মানুষ ও সাধারণ জীবের মধ্যে নিছক রুচিবোধ ছাড়া বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না এবং রুচিবোধতো এই যে, ছাগল ঘাস খায়, বাঘ খায় গোশ্‌ত, আর মানুষ এগুলোকেই একটু কষ্ট করে রেঁধে খায়। জীবন-ধারণের জন্য পানাহার এবং বংশ বৃদ্ধির ব্যাপারে যৌন প্রবৃত্তির যতটা সম্পর্ক তাতেও মানুষ ও সাধারণ জীবের মধ্যে পার্থক্য মাত্র রুচিবোধেরই। একমাত্র নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতাই সাধারণ জীব থেকে মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশক। সুতরাং মানুষের ফিত্‌রাত্ সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনার দৃষ্টিভংগী এই হওয়া আবশ্যক।

এবার আমরা যদি মানুষের নৈতিক ফিত্‌রাতগুলোর দিকে তাকাই— দেখতে পাব যে, প্রায় মানুষের মধ্যেই পরস্পর-বিরোধী ফিত্‌রাত বর্তমান রয়েছে—যথাঃ দয়া ও নিষ্ঠুরতা, দানশীলতা ও কৃপণতা, বীরত্ব ও ভীরুতা, সভ্যতা ও অসভ্যতা, লোলুপতা ও অল্পে তুষ্টতা, ধীরতা ও দ্রুততা, কঠোরতা ও কোমলতা, লজ্জাশীলতা ও নির্লজ্জতা, শীতলতা ও উষ্ণতা, সম্মতি ও অসম্মতি, ধৈর্য ও ক্রোধ, ভালবাসা ও শত্রুতা ইত্যাদি। ভাল-মন্দ সকল গুণই কম-বেশী প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই পাওয়া যায়। এবং সবই ফিত্‌রাতের অবদান। এখন প্রশ্ন এই যে, মানুষের আসল ফিত্‌রাত কি সদ্‌গুণ না অসৎগুণ? প্রীতি না বিদ্রোহ? কৃতজ্ঞতা না কৃতঘ্নতা? সুবিচার না অত্যাচার?

কুরআন ও মানুষের প্রকৃতিগত অপরাধ

মানুষের অসৎগুণগুলোকেও কুরআন প্রকৃত ফিত্‌রাত আখ্যা দিয়েছে ঃ

১. وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا — মানুষ অত্যন্ত হীনমনা। (১৭ ঃ ১০০)

২. إِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا — সম্পদ পেলেই সে কৃপণ হয়ে যায়। (৭০ ঃ ২১)

৩. وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا — তোমাদের সম্পদে অসীম ভালবাসা। (৮৯ ঃ ২০)

৪. اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ — মানুষ ধন-প্রীতিতে বেশ পাকাপোক্ত। (১০০ ঃ ৮)

৫. يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا — সে বলে যে অনেক মাল সে বিলিয়ে দিয়েছে।

৬. كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغَى؛ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى — মানুষ ন্যায়-নীতিকে অতিক্রম করে। কারণ সে নিজেকে বেপরওয়া মনে করে।

৭. اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا — নিশ্চয় মানুষ জন্মগতভাবেই অস্থির চিত্ত। (৭০ ঃ ১৯)

৮. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا — যখন তাকে অমংগল স্পর্শ করে তখন সে বিষণ্ন হয়। (৭০ ঃ ২০)

৯. وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا —এবং অমংগলের জন্য সে প্রার্থনা করে যা তার মংগলের জন্য করা উচিত। কেননা মানুষ (স্বভাবতই) ব্যস্তবাগীশ। (১৭ ঃ ১১)

১০. خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ — মানুষের সৃষ্টিই হয়েছে (যেন) ত্বরা থেকে। (২১ ঃ ৩৭)

১১. فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ — অতঃপর সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী হয়েছে। (১৬ ঃ ৪)

১২. وَكَانَ النَّاسُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً — মানুষ সবচেয়ে বড় বিতণ্ডাকারী।

১৩. وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ اِنَّهُ لَيَئُوْسٌ كَفُوْرٌ — এবং মানুষকে যদি আমি আস্বাদন করাই আমার অনুগ্রহ, তৎপর ইহা সরিয়ে নেয়া হয় তাহার কাছ থেকে তখন নিশ্চয় সে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে। (১১ ঃ ৯)

১৪. وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰبِجَانِبِهٖ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوْسًا — এবং আমি মানবের প্রতি যখন অনুগ্রহ সম্পদ দান করি তখন সে বিমুখ হয়ে পড়ে ও স্বীয় পার্শ্ব পরিবর্তন করে; এবং যখন দুঃখ তাকে স্পর্শ করে তখন সে নিরাশ হয়ে থাকে। (১৭ ঃ ৮৩)

১৫. وَاِذَا اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ — এবং যখন আমি মানবদিগকে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন তারা তাতেই পরিতুষ্ট থাকে এবং যদি তাদের নিকট কোন অমংগল উপস্থিত হয়—তাদের হস্তসমূহ যা পূর্বে প্রেরণ করেছিল (তার পরিণাম স্বরূপ) তারা নিরাশ হয়ে যায়। (৩০ ঃ ৩৬)

১৬. لَايَسْئَمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَاِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوْسٌ قَنُوْطٌ — মানুষ কল্যাণ প্রার্থনায় পরিশ্রান্ত হয় না এবং যদি অনিষ্ট তাহাকে স্পর্শ করে তারা নিরাশায় হতাশ হয়ে যায়। (৪১ ঃ ৪৯)

১৭. اِذَ مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهٖ اَوْقَاعِدًا اَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَا اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهُ — এবং যখন মানুষকে অমংগল স্পর্শ করে তখন সে এলায়িত অথবা উপবিষ্ট কিংবা দণ্ডায়মান অবস্থায় আমাকে আহ্বান করে; অনন্তর আমি যখন তাহার উপর থেকে অমংগল অপসারণ করি তখন সে আমাকে ত্যাগ করে যেন সে আমাকে আহ্বান করেনি। (১০ ঃ ১২)

১৮. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ — মানুষ প্রকৃতই একান্ত অত্যাচারী ও কৃতঘ্ন। (১৪ ঃ ৩৪)

১৯. وَكَانَ النَّاسُ لَكَفُوْرٌ - إِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُوْرًا — মানুষ অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ।

২০. وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ نَاٰبِجَانِبِهٖ- وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْ دُعَاءٍعَرِيْضٍ — এবং আমি যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ দান করি তখন সে মুখ ফিরাইয়া লয়; এবং যখন অমংগল তাকে স্পর্শ করে তখন সে সুদীর্ঘ প্রার্থনা করতে থাকে।

২১. فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَامَا ابْتَلٰهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّىٓ اَكْرَمَنِ - وَاَمَّا اِذَا مَاابْتَلٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّىٓ اَهَانَنِ- — কিন্তু এই মানুষ যখন তার "রব" (প্রতিপালক) তাকে পরীক্ষা করেন, পরে তাকে সম্মানিত করেন এবং তাকে সুখ-সম্পদ দান করেন, তখন সে বলে যে আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন এবং আবার যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন, তৎপর তার জন্য উপজীবিকা হ্রাস করেন, তখন সে বলে যে, আমার প্রতিপালক আমাকে লাঞ্ছিত করেছেন। (৮৯ ঃ ১৫-১৬)

২২. اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ — মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি চরম কৃতঘ্ন।

২৩. بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ — মানুষ ভবিষ্যতে অসৎ কর্মের প্রত্যাশা রাখে।

২৪. اُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ — কৃপণতা ও লোলুপতা মানুষের স্বভাব। (৪ ঃ ১২৮)

২৫. اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلاً — মানুষ বড় অত্যাচারী এবং অজ্ঞ।

২৬. اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ — নিশ্চয় মানুষ আত্মম্ভরী ও অহংকারী। (১১ ঃ ১০)

উপরের আয়াতগুলোকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় জন্মগত ও প্রকৃতিগতভাবেই মানুষ হীনমনা, কৃপণ, লোভী, অবাধ্য, অস্থিরচিত্ত, চীৎকার স্বরে আহ্বানকারী, ত্বরাকারী, বিতণ্ডাকারী, কৃতঘ্ন, নৈরাশ্যপ্রবণ, আল্লাহ্ বিস্মৃত, অত্যাচারী এবং অকৃতজ্ঞ ইত্যাদি। লক্ষণীয় যে, একস্থানে বলা হয়েছে, "মানুষকে বেগবান পানি

দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে" এবং অন্যত্র বলা হয়েছে "মানুষকে ত্বরা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে"। নৈসর্গিক সৃষ্টি-নিয়মেই ফিত্‌রাতগুলোও জন্ম নিয়েছে, সৃষ্টি ও তার স্বভাব উভয়ের মধ্যেই যেন ফিত্‌রাতের বহিঃপ্রকাশ রয়েছে; আলোচ্য আয়াতদ্বয়কে পরস্পর মিলিয়ে দেখলেই এই সত্যটি সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান লাভ করা যায়।

একটি সমস্যা

নিন্দনীয় গুণগুলোও মানুষের ফিত্‌রাতের মধ্যে শামিল, কুরআনের অনেক আয়াত দ্বারাই একথা প্রমাণিত হয়। "প্রত্যেক শিশুই ফিত্‌রাতের উপর জন্মগ্রহণ করে, তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহূদী, খ্রীস্টান বা অগ্নিউপাসক করে"—এ হযরত (সা)-এর বাণী। এখন প্রশ্ন হলো, কুরআনে বর্ণিত শীঘ্রগতি, লোলুপতা, কৃতঘ্নতা, অজ্ঞতা এবং অত্যাচার ইত্যাদিই কি মানুষের ফিত্‌রাত? এসব ফিত্‌রাত নিয়েই কি শিশু জন্মগ্রহণ করে না? তাই যদি হয়, ইহাই সুন্নাহ্য় বর্ণিত ফিত্‌রাত এবং ইহাই কি ইসলাম ও দীনের ফিত্‌রাত?

সাধারণ মানুষের মত শিশুরাও অন্যের জিনিস জবরদখল করতে চায়, না পেলে কাঁদে, গড়াগড়ি দেয় ও মাটিতে লুড়িয়ে পড়ে, এ সবই শিশুর প্রকৃত ফিত্‌রাত। কোন কোন সময় শিশুটিকেও তার নিজের জিনিস নেহাত দানশীলতার সাথে অপরকে উৎসর্গ করতে দেখা যায়, এও তার ফিত্‌রাত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শিশুর আসল ফিত্‌রাত কি, যার উপর তার জন্ম—জবরদস্তি ছিনিয়ে নেওয়া, না অকাতরে বিলিয়ে দেওয়া?

বয়স্ক এবং সুধীমণ্ডলীকে বিচার করলেও দেখতে পাবো, তাদের ফিত্‌রাতের পারস্পরিক প্রতিকুলতা ও বৈপরিত্য অনেকটা শিশুদের মতই। একজন খুব দানশীল—ভবিষ্যতের চিন্তা বাদ দিয়ে সে তার যথাসর্বস্ব পরার্থে বিলিয়ে দেয়, অন্যজন স্বার্থের জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত এবং অপরকে চাওয়ার সুযোগ দিতেও তৈরি নয়। এ দু'টিই ফিত্‌রাত এবং এরা দুটো বিপরীত ফিত্‌রাত্ নিয়ে জন্মেছে। জিজ্ঞাস্য এই যে, এ দুটিই কি ইসলামী ফিত্‌রাত? প্রমাণ যদিও "হাঁ" বলে, বিবেক কিন্তু কখনও তা স্বীকারে রাযী নয়।

সমস্যা ও সমাধান

এবার আসুন আমরা এ সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করি। তবে সমস্যা খুব জটিল নয়। সোজা কথায়, মানুষের অন্তরের সহজাত প্রবণতাগুলোই ফিত্‌রাত। এগুলোকে শিথিল করা আল্লাহ্‌র আদৌ উদ্দেশ্য নয়। যদি তাই হতো, এগুলো দেয়ার কোনো সার্থকতা থাকতো না। নিজেই পরস্পর-বিরোধী গুণাবলীর মালিক এবং মানুষ তাঁর ঐ সমস্ত বিপরীত গুণসমূহের বাস্তব দৃষ্টান্ত। মানুষের কোন

গুণকে বিলুপ্ত করবার বাসনা আল্লাহ্‌র নেই, বরং এগুলোর যথাযথ বাস্তবায়নই তাঁর কাম্য। এ ফিত্‌রাতগুলোকে তোমরাও আমার মত ন্যায়সংগতভাবে যোগ্যস্থানে ব্যবহার কর—আল্লাহ্ যেন বিশ্বমানবকে একথা ঘোষণা করে জানিয়ে দিচ্ছেন। বান্দাদের নিকট আল্লাহ্‌র এ দাবীও ফিত্‌রাতেরই দাবী। এ ব্যাপারে একটু পরেই আমরা জানতে পারবো।

ন্যায়পরায়ণতা

আরো এগোনোর পূর্বে দু'একটি জরুরী কথা হৃদয়ংগম করে নেওয়া আবশ্যক। ইচ্ছে করলে আমরা আল্লাহ্‌র সমস্ত গুণকেই তিনটি শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করতে পারি—রহমত, রবুবিয়াত (প্রতিপালন) ও ন্যায়পরায়ণতা। বিশ্ব সৃষ্টির প্রতিটি অনু-পরমাণুতে উক্ত তিনটি গুণের কার্যকারীতাই দৃশ্যমান এবং সূরা ফাতেহাতে এগুলো একস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। যথা رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ- اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ। আল্লাহ্‌র অবশিষ্ট গুণগুলো এ তিনেরই ভিন্ন ভিন্ন দিক। প্রথম দুটো নিয়ে আমরা আলোচনা এখানে করব না, শেষোক্ত গুণটিই (ন্যায়পরায়ণতা) আমাদের এখানে আলোচ্য বিষয়।

আল্লাহ্‌র একটি গুণ ন্যায়পরায়ণতা। এ গুণটির বদৌলতেই সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে বিশ্বের নিয়ম ও শৃংখলা এবং মানব-জীবন-বিধানের সত্যিকার ভিত্তিও ইহাই। ন্যায়পরায়ণতার বিরোধী গুণটিই হলো 'যুলুম' অর্থাৎ কোন বস্তুর অযথা ব্যবহার। প্রয়োগস্থল ঠিক হলেও কোন বস্তুর ব্যবহার ন্যায্য না হয়ে যুলূম হতে পারে, যদি ব্যবহার বা প্রয়োগের মধ্যে সংগতি না থাকে। এ কারণেই ন্যায়পরায়ণতা ও যুলূম উভয়েরই উল্লেখ আমরা এখানে করেছি। যথাযোগ্য স্থান ও যথোচিত সংগতি এ দৃষ্টিকোণ থেকেই গোটা বিশ্ব-সৃষ্টিকে নিরীক্ষণ করতে হবে এবং যেসব স্বভাবকে আমরা ফিত্‌রাত বা তার অবদান বলি সেগুলোরও ব্যবহার করতে হবে এরই ভিত্তিতে।

মানুষের মধ্যে কোমলতা ও কঠোরতা দুই-ই রয়েছে। এর কোনটিকেই আল্লাহ্ বিলুপ্তির নির্দেশ দেন না, বরং এদের যথাস্থানে ভারসাম্যমূলক প্রয়োগই তাঁর কাম্য। কোমল স্থানে কোমলতারই দরকার—কঠোরতা সেখানে অবান্তর, এ কারণেই একে অত্যাচার বলা হবে। কঠোরতাস্থলে কঠোরতাই শোভনীয়, কোমলতা সেখানে অবিচার রূপে গণ্য হবে। এ তো হলো স্থল বিশেষের কথা। কোমল স্থলে কোমলতারই প্রয়োগ হলো বটে, কিন্তু প্রয়োজনের প্রতি আদৌ দৃক্‌পাত করা হলো না। এখানে কোমলতার ব্যবহার যথাস্থানে হওয়া সত্ত্বেও তা যুলুম হবে। কারণ কোমলতার ব্যবহারে স্থান ঠিক থাকলেও এর মধ্যে প্রয়োজনীয় ভারসাম্য রক্ষিত হয়নি।

একটি জরুরী কথা

একটি মাত্র গুণ রয়েছে যেখানে, সেখানে যে ভারসাম্য বজায় রাখার কোন প্রশ্নই ওঠে না, একথা সহজবোধ্য সত্য। বরং দুটি বিপরীত ও বিরোধী গুণের সমন্বয়ের ক্ষেত্রেই প্রশ্ন ওঠে ভারসাম্যের। দুটো বিপরীত বা বিরোধী গুণের যথোচিত ও অনুরূপ সংমিশ্রণের নামই ভারসাম্য। কোমলতা ও কঠোরতা—সর্বত্রই এ দুটো গুণ থাকা দরকার বটে; কিন্তু থাকা চাই নির্ধারিত নিয়মে বা পরিমাণে। কোমলতা ও কঠোরতা দুটো আপেক্ষিক গুণ। এ কারণেই কঠোরতাকে বাদ দিয়ে কোমলতার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। তবে কোমলতা কঠোরতার উপর জয়ী হবে। এ ধরনের কঠোরতার উদ্দেশ্য নিষ্ঠুরতা নয়, বরং নম্রতা।

আল্লাহ্‌র ফিত্‌রাত

ইহাই আল্লাহ্‌র ফিত্‌রাত এবং এরই ভিত্তিতে তিনি সৃজন করেছেন মানব জাতিকে। অনু-পরমাণু পর্যন্ত প্রত্যেকটি সৃষ্ট বস্তুর স্বতন্ত্র ফিত্‌রাতের সাথে স্রষ্টার ফিত্‌রাত্‌ ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। কুরআন এ সত্যটিকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করেছে 'সুন্নাতুল্লাহ্‌' অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র রীতি' বলে। আল্লাহ্‌র ফিত্‌রাত সম্পূর্ণ ও অসীম। সসীমের পক্ষে এর পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করা অসম্ভব। কিন্তু মানুষের যা জ্ঞান তাতেও জানা যায়—এই অগণিত সৃষ্টি-সংসারের মধ্যে স্বতন্ত্র একটি ফিত্‌রাত্‌ কার্যকরীভাবে বিরাজ করছে। ইহাই আল্লাহ্‌র ফিত্‌রাত্‌। এ ফিত্‌রাতের মধ্যে উপরে বর্ণিত যোগ্যস্থান ও ভারসাম্যের পরিচয় পাওয়া যাবে। আল্লাহ্‌র এ ফিত্‌রাতের বদৌলতে বিশ্ব-জগতের জীবন, অবস্থান ও স্থীতিশীলতা। এ তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর মানুষ বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র ফিত্‌রাতের উপর সৃষ্ট, এ সত্যটি আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পানির সৃজন-নৈপুণ্যের পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, এতে রয়েছে দুটি উপাদানের সংমিশ্রণ এক ভাগ অক্সিজেন ও দু'ভাগ হাইড্রোজেন। এ পরিমিত সংমিশ্রণ পানির ঘণত্ব ও স্থুলতার দিক থেকে। ওজনের দিক থেকে পানির পরিমিত সমন্বয় ও মিশ্রণ বিপরীত বা উল্টা ধরনের অর্থাৎ এক ভাগ হাইড্রোজেন ও আট ভাগ অক্সিজেন। উক্তরূপ মিশ্রণের মাধ্যমে যখন এ দু'রকমের গ্যাস পরস্পর মিলিত হয়, তাকেই বলা হয় পানি বা জীবন ধারণের জন্য একটি বিশেষ উপকরণ। আল্লাহ্‌ বলেন, "জীব মাত্রকেই আমি পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছি"। কিন্তু উক্ত মিশ্রণবিধির মধ্যে যদি অনু পরিমাণ বেশ-কমও হয়, তা হলে কী দাঁড়াবে? হবে জীবননাশক বিষ। অন্যভাবে বলা যায়, এ সুনির্দিষ্ট নিয়মের মিশ্রণেই পানির অস্তিত্ব বা সার্থকতা এবং এরই কল্যাণে টিকে আছে সমগ্র জগৎ। মিশ্রণের মধ্যে

যদি সামান্যতম ত্রুটিও ঘটে, তবে উক্ত প্রাণ ধারণের বস্তুই জীবন নাশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

মানুষকে বিশ্লেষণ করে দেখি, সেও বিপরীত ও বৈষম্যমূলক পদার্থের সমন্বয়ে সৃষ্টি—সপ্তদশমাংশ পানি, অবশিষ্টাংশ লৌহ, চুন, কার্বন—আল্লাহ্ই জানেন আরো কত কিছু। কিন্তু সব কিছুই রয়েছে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে। জড় জগৎকে বাদ দিয়ে আরো সূক্ষ্ম বিষয়ে চিন্তা করলে দেখা যায় উষ্ণতা, আর্দ্রতা ও শুষ্কতা, বদমিজাজ ও মধুর স্বভাব—এ সবই মানুষের মধ্যে বিরাজমান? কিন্তু খামখেয়ালীভাবে নয়, বরং একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে। এই মিশ্রণের মধ্যে পরিমাণ ও পরিমাপের কোন ত্রুটি ঘটলেই সৃষ্টি হয় রোগ বা মৃত্যু। মানবিক পদার্থগুলোকে আরো সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে দেখি—ব্যক্তির মেজাজ ও মন-মস্তিষ্কের সংগঠনে রয়েছে বহু প্রকারের ধ্যান-ধারণার সংমিশ্রণ এবং ইহাই তার চরিত্রের ভিত্তি। এক্ষেত্রেও স্বাভাবিক গুণাবলীর মিশ্রণ-প্রণালী ও পরিমাপের মধ্যে কোন রকম বিশৃংখলা সংগঠিত হলেই সৃষ্টি হয় চারিত্রিক রোগ এবং আত্মপ্রকাশ করে চরিত্রগত মৃত্যু।

এভাবে যোগ্যস্থানে পরিমিত মিশ্রণপ্রণালীর অধীনে ফিত্‌রাতের আবেদনগুলো বাস্তবরূপ লাভ করুক, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের নিকট ইহাই দাবী করেন। এখানে একটি সূক্ষ্ম অথচ প্রয়োজনীয় কথা স্মরণ রাখা দরকার—ফিত্‌রাতের আবেদন-গুলোকে সঠিক পন্থায় ব্যবহার করার যে দাবী, তাও প্রকৃত ফিত্‌রাতের দাবী। এ দাবী ফিত্‌রাতের আদৌ বিরোধী নহে।

সঠিক ব্যবহারের প্রকৃতিগত দাবী

মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনেও একটি নিয়ম পালন করে থাকে— সর্বদাই সে চেষ্টা করে, যাতে বিভিন্ন পদার্থের ব্যবহার হয় যথারীতি, মিশ্রণ হয় যথাযথ ও পরিমিত এবং প্রতিষ্ঠিত থাকে এ সবের মধ্যে যথোচিত ভারসাম্য। মানুষ রন্ধন করে; কিন্তু লবণ, মরিচ, ঘি, মসল্লা গোশ্‌ত এবং সবজী, এ সবই মিশ্রিত করে এক নির্দিষ্ট পরিমাণে। সে অগ্নি ও পানি একস্থানেই জমা করে। কিন্তু এমনি বুদ্ধিবৃত্তির সাথে তা' সে করে, যেন পানি নির্বাপিত করতে না পারে অগ্নিকে এবং অগ্নি-পানিকে না বিনষ্ট করতে পারে। অগ্নিতে পানি নিক্ষিপ্ত হলে যেমনি ভ্রান্ত পরিণতি ঘটবে, গোশতে সম পরিমাণ লবণ মিশ্রণের ফলেও তেমনি ফলবে অবাঞ্ছিত ফল। কারণ, পানির ব্যবহার যেমনি হয়েছে অযথা স্থানে, গোশ্‌ত-লবণের মিশ্রণও হয়েছে তেমনি অনিয়মিতভাবে। অনুরূপভাবে মানুষ শীতে আগুন পোহায়; কিন্তু নিজেকে অগ্নিকুণ্ড থেকে এক নির্দিষ্ট ও সীমিত দূরত্বে রাখে, যাতে অসহ্য

তাপও না লাগে, আর তাপ থেকে বঞ্চিতও সে না হয়। এখানেও সে জ্ঞানসুলভ মাধ্যম কেন্দ্র নির্দিষ্ট করে নেয় যেন সে প্রয়োজনানুপাতে তাপ গ্রহণে সমর্থ হয়। আরো প্রণিধানযোগ্য যে, মানুষ রুটি দ্বারা দেহাচ্ছাদন এবং কাপড় দ্বারা উদর পূরণ করে না। কারণ, এ ধরনের ব্যবহার যেমনি অযথাস্থানে, তেমনি অজ্ঞতাজনিত।

এক কথায়, সকল পদার্থের সঠিক ব্যবহার ও পরিমিত এবং নির্দিষ্ট পরিমাপের যথাযথ সংমিশ্রণের যে স্বাভাবিক ও সাধারণ নিয়মটি আমরা দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যক্ষ করছি, উহা ফিত্‌রাতেরই অবদান। তার সীমাবদ্ধ স্বার্থের জগতের বাইরেও যে উক্ত সঠিক ব্যবহার এবং জ্ঞানলব্ধ ভারসাম্যের নীতি রক্ষা করা উচিত, একথা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ বিস্মৃত হয়ে যায়, ইহাই একমাত্র অপরাধ। প্রতিবেশীর সাথে কোন কারবার করার সময় মানুষ ফিত্‌রাতের আবেদগুলোর মধ্যে না সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখে, না এদের সঠিক ব্যবহার-বিধির প্রতি কোন যত্ন নেয়। প্রকৃত পক্ষে ফিত্‌রাতের আবেদনগুলোর সঠিক ব্যবহার এবং এর মধ্যে জ্ঞানসুলভ সাম্য রক্ষা করা ফিত্‌রাতেরই দাবী, উপরের আলোচনা দ্বারা একথা সন্দেহাতীত রূপেই প্রমাণিত হয়।

আয়াতে কারীমার অর্থ

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا — "তাই আল্লাহ্‌র ফিত্‌রাত যার উপরে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষকে", এতক্ষণে এ কথাটির মূল ভাব অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসছে। যে ফিতরাতের উপর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্‌র সে ফিত্‌রাতকে গ্রহণ কর, এই হলো আলোচ্য আয়াতটির শাব্দিক ভাব। ফিত্‌রাতুল্লাহ্ শব্দটিকে পুনর্বার অনুধাবন করবার চেষ্টা করুন। উপরে ফিত্‌রাতের একটি অর্থ ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র একটি পরিপূর্ণ ফিত্‌রাত রয়েছে। ন্যায়পরায়ণতা, সাম্য, যথাযোগ্য ব্যবহার ও জ্ঞানসুলভ সংমিশ্রণপ্রণালী ইত্যাদি সামগ্রিক জগতের গুণগুলো সবই আল্লাহ্‌র উপরোল্লেখিত ফিত্‌রাতেরই বাস্তব দৃষ্টান্ত। সুতরাং, মানুষেরও উচিত, নিজের জীবন পথে ইনসাফ ও সাম্যের বিধানগুলো মেনে চলা। কথাটি এভাবেই বলা যায় যে, নিজেদের ফিত্‌রাতকে আল্লাহ্‌র ফিতরাতের অনুরূপ করে তোলার চেষ্টা করা প্রত্যেকের কর্তব্য। কারণ, মানুষ নিজেই আল্লাহ্‌র গুণাবলীর প্রকাশক। মানুষের ফিত্‌রাত আল্লাহ্‌র ফিত্‌রাতের অনুরূপ না হলে, ফিতরাতের সহজাত প্রবণতাগুলোর বাস্তবায়ন বা সেগুলোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা সম্ভব নয়; ফলে হবে শুধু বিশৃংখলা আর বিশৃংখলা। 'আল্লাহ্‌র ফিত্‌রাত' শব্দটির দ্বিতীয় অর্থ, আল্লাহ্ প্রদত্ত ফিত্‌রাতকে গ্রহণ কর, যার উপর তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে। অর্থাৎ গোটা জীবনটাকে

আল্লাহ্ প্রদত্ত মূল ফিত্‌রাত (যা বিশ্বমানবের মধ্যে বিদ্যমান এবং যার বাস্তব দৃষ্টান্ত রয়েছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি স্তরে, যার বর্ণনা একটু পূর্বেই করা হয়েছে)-এর ছাঁচে ঢেলে গড়ে তোলার চেষ্টা করা। এই ফিত্‌রাত কী? উপরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মানুষের মধ্যে যথাযথ প্রয়োগ ও ভারসাম্যমূলক প্রয়োগ-পদ্ধতি অনুসরণের স্বতঃস্ফূর্ত স্পৃহাটিই ফিত্‌রাত। ইহাকে গোটা জীবনে বাস্তব রূপদান করাই আলোচ্য আয়াতের দাবী বা লক্ষ্য। বাহ্যতঃ অর্থ দুটোর মধ্যে সামান্য পার্থক্য দেখা গেলেও মূলতঃ তেমন কোন পার্থক্য নেই।

আলোচ্য আয়াতের অবশিষ্টাংশ

لَاتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ - ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ "আল্লাহ্‌র সৃজন-বিধানে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের আদৌ কোন অবকাশ নেই। ইহাই প্রতিষ্ঠিত বিধান। কিন্তু অনেকেই বোঝে না।" আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম ঃ আল্লাহ্‌র সৃজন-বিধিতে দু'টি বস্তু রয়েছে—ইনসাফ্ বা পরিমিত অন্বয় এবং উহার পরিণতি। সৃজন-বিধিগুলোর ফলিত ফল সবই স্ব স্ব স্থানে একটি অপরিবর্তনীয় সত্য। অর্থাৎ বিশ্ব সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণকারী ভিত্তি ও পরিণতি এবং কারণ ও কর্মের নৈসর্গিক নিয়মটি একটি মযবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কোনই অবকাশ নেই। মানুষের এখতিয়ারভুক্ত জীবন ফিত্‌রাতের বিধানের সাথে সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়, অন্যথায় বিশ্ব-জগতে প্রকৃতির নিয়ম ভংগের ফলে যা ঘটে থাকে মানুষের ক্ষেত্রেও তাই ঘটবে। ইহা একটি অপরিবর্তনীয় মৌল নীতি। চিনিতে তরকারী লবণাক্ত হয় না, অতিরিক্ত লবণ দিলে উহা তেতো হবেই এবং অধিক উষ্ণতা পেলে শরীরে জ্বর বা উন্মত্ততা আসবে অনিবার্যরূপে; এসব ফিতরাতেরই বিধান। অনুরূপভাবে ফিতরাতের কোন ভুল প্রয়োগ বা বিভিন্ন প্রবণতার ভারসাম্যহীন ব্যবহার জীবন ব্যবস্থাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। এও প্রকৃত ফিত্‌রাতের নিয়ম। সর্বত্র ফিত্‌রাতের মৌল নীতিগুলো কার্যকরী হোক এবং আল্লাহ্‌র ফিত্‌রাতের ছাঁচে মানবিক জীবনের নক্‌শা প্রস্তুত হোক 'দীনে কাইয়েম' (প্রতিষ্ঠিত বিধান) শব্দটির লক্ষ্য ইহাই।

একটি মারাত্মক ভ্রম-সংশোধন

মানুষের ফিত্‌রাত যে কী, সে জিজ্ঞাসা এখনো রয়েছে। মানুষের অন্তর্নিহিত প্রবণতাগুলো সবই মানুষের ফিত্‌রাত, এ ব্যাপারে কিছুটা আলোচনা আমরা উপরে করেছি। মানুষ তার কোন ফিত্‌রাতকে বিলুপ্ত করে দিক, এ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা নয়। বরং তিনি চান যেন মানুষ উক্ত প্রবণতাসমূহের রূপায়ণের জন্য যথাযোগ্য স্থান বেছে নিক এবং পরস্পর-বিরোধী প্রবণতাসমূহের মধ্যে এমনি সুষ্ঠু ও

ভারসাম্যমূলক প্রয়োগ-পদ্ধতি অনুসরণ করুক—যাতে করে সে সবের মধ্যকার বিরোধিতা ও প্রতিকূলতা পাস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতায় রূপান্তরিত হয়। এখানে জিজ্ঞাস্য যে, পর-সম্পদ কেড়ে নেওয়ার উদ্যোগ শিশুদের ফিত্‌রাত, চৌর্যবৃত্তি চোরের ফিত্‌রাত, পরচর্চা করা পরোক্ষে নিন্দাকারীর ফিত্‌রাত এবং অপ্রয়োজনে অত্যাচার করা যালেমের ফিত্‌রাত—এক কথায় এমনি অসংখ্য অপকর্ম রয়েছে যেগুলো অসৎ লোকদের শুধু অভ্যাসই নয়—বরং তাদের ফিত্‌রাতের রূপ গ্রহণ করেছে। এমতাবস্থায়, এই সব অসৎ লোকদের নৈতিক জীবন আমাদের আলোচ্য ফিত্‌রাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া কি বাঞ্ছনীয়?

প্রকৃতপক্ষে এ সন্দেহ একটি ভ্রম। কারণ, আমাদের দৃষ্টি সত্যিকারের ফিত্‌রাতের দৃশ্যমান দিকটিতেই সীমাবদ্ধ, উহার অন্তরালে ফিত্‌রাতের যে দিকটি রয়েছে তা আমাদের নজরে পড়ে না। ধরা যাক, একটি জন্মগত চোর, অপহরণের অভ্যাস তার ফিত্‌রাতেরই অন্তর্গত; হাজারো উপদেশ বা অসহ্য যাতনা কিছুই কাজ করবে না—চুরি সে ছাড়বেই না। হযরত (সা)-এর সময় দু'হাত ও দু' পা কাটা একটি চোর ধরা পড়ে, বারবার চুরি করার দরুন তার এ দশা হয়। হযরত (সা)-এর উপদেশ এবং শাস্তি তাকে কোনই ক্রিয়া করেনি। সুতরাং পঞ্চম দফা চৌর্যবৃত্তির অপরাধে তার মৃত্যুদণ্ড হয়। এতদ্দর্শনে বাহ্যত এই মনে হয় যে, সে ছিল জন্মগত চোর এবং চুরির ফিত্‌রাত নিয়েই সে জন্মেছে। ধরুন, তার বিশ্বাস মতে অপহরণ অপরাধ নয়, বরং সম্পূর্ণ জেনে-শুনেই সে চুরি করতো। কিন্তু তার ঘরেই যদি কোন চোর ঢোকে আর ধরা পড়ে, তখন দেখবেন সে কত উপদেশের বাণী শুনায় এবং তাকে কী রকম শাস্তি প্রদান করে। তখন তাকে বলুন—ভাই তুমি যে পুণ্যের কাজটি করছ, সেওতো তাই করেছে—সুতরাং তাকে আশীর্বাদ করে ছেড়েই দাও না। কিন্তু সে তা না করে তাকে শাস্তিই দিতে থাকবে। এর কারণ, এ-ই হচ্ছে মানুষের আসল ফিত্‌রাত—যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মপ্রকাশ করে। সে চোরকে গালি দেয় না, বরং "চুরি রূপ দুষ্কর্মের জন্য নিন্দাও করে, যে প্রবৃত্তি তার নিজের মধ্যেও আছে। ইহা প্রকৃত ফিত্‌রাত। কিন্তু নিজে চুরি করার কালে সে ভুলে যায়। কিন্তু যখন তার নিজের ঘরে চুরি হয়, তখন উক্ত ফিত্‌রাত্ ভিতর থেকে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম দিকে আলোচিত 'ফিত্‌রাত'-এর শাব্দিক অর্থ সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যাবে—ভিতরকার বাধা বা গোপনীয়তার যবনিকা অতিক্রম করে অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশের প্রবৃত্তি উক্ত শব্দের মধ্যেই বর্তমান।

এর ভিত্তিতে ফিত্‌রাতের সমস্ত আবেদনগুলোকেও অনুমান করা যায়। অজ্ঞান শিশু অন্যের পুতুল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা অবশ্যই করে থাকে এবং এ তার

ফিত্‌রাত বলে মনে হয়। কিন্তু অপর কোন শিশু যদি তার থেকে কোন কিছু কেড়ে নেয় তখন আর আসল ফিত্‌রাত হঠাৎ সজাগ হয়ে ওঠে এবং সম্ভাব্য সকল উপায়ে তা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা শুরু করে। কেন? কারণ, তার আসল ও অন্তর্নিহিত ফিত্‌রাত ভিতর থেকে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে। মানুষের প্রকৃত ফিত্‌রাত ইহাই। দুষিত পরিবেশ, অজ্ঞতা বা কুশিক্ষার প্রভাবে উহা দুর্বল হয়ে পড়ে। শিশুদের মধ্যে যেমনি অপরের কিছু ছিনিয়ে নেওয়ার প্রবণতা রয়েছে তেমনি রয়েছে তার মধ্যে ঝগড়া করার স্বভাব, যদি কেউ তার কিছু ছিনিয়ে নেয়। এমতাবস্থায় প্রথমটি শিশুর ফিত্‌রাত আর দ্বিতীয়টি ফিত্‌রাত নয়, এ ধারণা করার কোন যুক্তিসংগত কারণ আছে কি?

এ সত্যটিকে এভাবেও প্রকাশ করা যায়—শিশু তার লেন-দেন সম্পর্কিত ফিত্‌রাতের আবেগ-সমূহকে সঠিক স্থানে ব্যবহার করে না। এ ব্যাপারটি পরে আলোচিত হবে।

ফিত্‌রাতের দুটো দিক

মানুষের ফিত্‌রাত্‌ স্বভাবতই দু'ভাগে বিভক্ত—বিকৃত ফিত্‌রাত ও সুস্থ ফিত্‌রাত। বিকৃত ও সুস্থ উভয় ফিত্‌রাতই মানুষের মধ্যে প্রকাশ পায় বটে—তবে প্রথমটি অজ্ঞতা, দুষিত পরিবেশ বা ভ্রান্ত পথপ্রদর্শকেরই পরিণাম, এবং দ্বিতীয়টিই হলো অকৃত্রিম স্বচ্ছ, নির্মল, পরিচ্ছন্ন এবং নিষ্কলংক ফিত্‌রাত—অজ্ঞতা, দূষিত পরিবেশ বা কুশিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত না হলে কখনো উহা বদলায় না। কখনো যদি উহা কুসংস্কারের প্রভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে কোন এক মুহূর্তে তা অকস্মাৎ আত্ম-প্রকাশ করে। কিন্তু যদি এতোটা দুর্বল হয়ে পড়ে যে কখনো আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা নেই আর থাকে না, তখন বুঝতে হবে যে, আল্লাহ্‌ যাদের অন্তরে সীলমোহর মেরে দিয়েছেন সে তাদেরই দলভুক্ত হয়ে পড়েছে। অন্যথায় সকল মানুষের মধ্যেই সুস্থ ফিত্‌রাত আছে, উহা কখনও চাপা থাকে, আবার আত্মপ্রকাশ করে।

কুরআনের ইঙ্গিত

ফিত্‌রাতদ্বয়কে কুরআন নিজস্ব বিশিষ্ট পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। যেমন بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ। "নিজের ভাল-মন্দ মানুষ নিজেও বোঝে"। فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا "আল্লাহ্‌ প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহ্‌দ্রোহিতা ও আল্লাহ্‌ভীরুতার পার্থক্য নিরূপণের ক্ষমতা দান করেছেন।" এছাড়া নিচের আয়াতেও আলোচ্য বিষয়ের ইংগিত মিলে। আয়াতটির প্রথমাংশ নিম্নরূপঃ بَلِ اتَّبَعَ

الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ - فَمَنْ يَّهْدِىْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ - وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِيْنَ "বরং যালেম তো নিজের অজ্ঞতার দরুনই প্রবণতার অনুসরণ করে, তবে আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন কে তাকে পথ দেখাতে পারেন? এবং তাদের এই জীবনপদ্ধতি তাদের কোনই উপকারে আসবে না।"

পরবর্তী আয়াত

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا - لَاتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ - ذَالِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ - وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ-

"সুতরাং একাগ্রমনে দীনের প্রতি মনোনিবেশ কর, অর্থাৎ আল্লাহ্র ফিত্রাতকে অবলম্বন কর, যার উপর সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষকে, আল্লাহ্র সৃজন-বিধির মধ্যে রদবদলের কোনই অবকাশ নেই; ইহাই প্রতিষ্ঠিত দীন বা জীবন-বিধান; কিন্তু অনেকেই উহা বুঝে না।"

উক্ত আয়াতদ্বয়ে পরস্পর-বিরোধী দুটো জীবন-পদ্ধতির বিবরণ রয়েছে—ভাবাবেগের অনুসরণ এবং দীনে-এলাহীর অনুকরণ; এ দু'টোই ফিত্রাত। কিন্তু প্রথমটি দুষ্ট ফিত্রাত, দ্বিতীয়টি সুস্থ ফিত্রাত। বিকৃত ফিত্রাত অজ্ঞতার পরিণাম এবং দ্বিতীয়টি সুশিক্ষার পরিণাম, যে শিক্ষা মানুষের ফিত্রাতকে আল্লাহ্র ফিত্রাতের অনুরূপ করে তোলে।

আল-কুরআনের স্মরণী

কুরআন নিজেকে নিজে 'স্মরণ ও স্মারকলিপি' বলে আখ্যায়িত করেছে—হযরত (সা)-কেও নির্দেশ দেয় (তাযকীর) স্মৃতি জাগ্রত করানোর জন্য এবং হযরত (সা)-কে 'স্মৃতিজাগ্রতকারী' আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়েছে। 'তাযকীর' অর্থ স্মরণ করানো। বিস্মৃতি ও ঔদাসীন্যের ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয় স্মৃতির উদ্বোধন ও স্মরণ করানোর। আমাদের বিস্মৃতি ও শৈথিল্যের অন্তরালেও কিন্তু বস্তু লুপ্ত আছে, 'তাযকীর'-এর শাব্দিক অর্থ থেকেই আমরা এ তত্ত্বটির পরিষ্কার ইঙ্গিত পাই। কুরআন উক্ত বিস্মৃত লুপ্ত তত্ত্বটিকেই উদঘাটিত করে দেয়। উক্ত বিস্মৃত তত্ত্বটি কি? উহা বিকৃত ফিত্রাতের অন্তরালে লুপ্ত এবং উহার প্রভাবে পিষ্ট সুস্থ ফিত্রাত। একটি শিশু নিজের অজ্ঞতাবশত ভাবাবেগের অনুসরণ করতে গিয়েই অন্যের পুতুল বলপ্রয়োগে আত্মসাৎ করতে চায়। কিন্তু তার নিজের কিছু অন্যে নিলেই সে চিৎকার করে বা রাগান্বিত হয়। লক্ষ্য করার বিষয়, শিশুটি নিজের

স্বার্থে যে নীতিকে বৈধ মনে করে, অপরের বেলায় তা ভুলে যায়—অপরের জন্য যা ন্যায্য জ্ঞান করে, নিজের ব্যাপারে তা বিস্মৃত হয়। এই বিস্মৃত ফিত্‌রাতকেই স্মরণ করিয়ে দেয় কুরআন। ইহা সেই সুস্থ ফিত্‌রাত, যা প্রবণতার অনুসারী বিকৃত ফিত্‌রাতের অন্তরালে বিস্মৃত সত্যের ন্যায় লুক্কায়িত থাকে এবং একেই কুরআন স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত করে দেয়। অতএব, কুরআন মানুষের ফিত্‌রাতের পথ-নির্দেশক বা পরিচালক—এই দৃষ্টিভংগিতে যে, পরস্পর-বিরোধী দুটি ফিত্‌রাতের একটিকে আল-কুরআন উজ্জ্বলরূপে বর্ণনা করে এবং সফল ফিতরাতের জন্য সঠিক স্থান নির্দেশ করে দেয় এবং সে সবের মধ্যে ভারসাম্যমূলক ও সুমিত অন্বয় ঘটিয়ে দেয়।

একটি হাদীস

উক্ত ফিত্‌রাত সম্পর্কে সাবধান করে রাসূল (সা) বলেন ঃ

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ তোমরা কেহই পরিপূর্ণ মোমিন হতে পারবে না, যদি না তোমরা অন্য ভাই-এর জন্য তাই অনুমোদন করো, যা তোমরা নিজের জন্য পছন্দ কর।" এই ভ্রাতৃত্বকে মুসলিমদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না করাই উত্তম—কারণ, তাহলে বিশ্ব-মানবের মধ্যেই ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হবে। "বস্তুত সকল মানুষই ছিল একই সম্প্রদায়ভুক্ত।" রাসূলে কারীম (সা) আমাদেরকে এমন একটি মাপকাঠি দান করেছেন, যা কুরআনের প্রকৃত মর্মানুরূপ। এই কষ্টিপাথরের সাহায্যে মানুষের ফিত্‌রাত—সুস্থ ফিত্‌রাতের ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ও উহার সঠিক পরিচালনা করা সম্ভবপর হয়। যে ব্যক্তি অপরের প্রিয় বস্তুর প্রতি নেহায়েত লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায় এবং সময় বিশেষে উহা বিনষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টাও পায়— সে যদি অনুরূপ লোভনীয় বস্তুর অধিকারী হয়, তৎক্ষণাৎ তার সুস্থ ফিত্‌রাত দুষ্ট ফিত্‌রাতের উপর জয়যুক্ত হয়। এ হাদীসটি কষ্টি-পাথরে ফিত্‌রাতকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ইসলাম কি প্রকৃতই ফিত্‌রাতের অনুকূল জীবন ব্যবস্থা কিনা, অতি সহজেই একথার সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। ইনসাফ ও ভারসাম্যকে প্রতিষ্ঠিত রাখবার জন্য ইহাই এক মাত্র কষ্টি-পাথর।

কর্মক্ষেত্র বা প্রয়োগস্থল

কর্মক্ষেত্রের আলোচনাকে বাদ দিলেও, একথা অতি সত্য যে, ফিত্‌রাতের মধ্যে বর্তমান যাবতীয় আবেগ বা আকুলতা কাজে লাগাবার জন্যই, ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য নয়। বাহ্যতঃ আমাদের মতে যেসব গুণ 'অন্যায়' সেগুলোর ব্যবহারের জন্যও নির্দিষ্ট স্থান আছে। ক্রোধও ফিত্‌রাতেরই একটি গুণ—যদি

উহা অসৎ বৃত্তিকে দমন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। অধিক লোলুপতাও ফিতরাতের আবেগ বটে, কিন্তু শুধু শুভ কর্মের জন্যই এ লোলুপতা সমর্থনীয়! কার্পণ্যও অনুরূপ ফিত্‌রাত এবং প্রশংসনীয়ও বটে, যদি উহার বৃত্ত স্বীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অহংকারও ফিত্‌রাতেরই অঙ্গ, কিন্তু এর ন্যায্য ক্ষেত্র বিশ্ব-মানবকে সকল সৃষ্টির সেরা জ্ঞান করা। কামভাব একটি ফিত্‌রাত—লব্ধ উন্মাদনা এবং তারও একটি সঠিক ও নির্দিষ্ট ক্ষেত্র রয়েছে। যে, ক্ষেত্রে কামভাব চরিতার্থ হলে উহা তার জীবনের সহায়ক হবে, তা-ই কামভাবের সঠিক ব্যবহারের স্থান। যুদ্ধ-বিগ্রহও ফিত্‌রাতেরই প্রেরণা—উহার সঠিক ব্যবহার হবে তখন উহা যখন পরিচালিত হয় কু-প্রবৃত্তি ও যালেমের বিরুদ্ধে। এক কথায় ফিত্‌রাতের প্রত্যেকটি আবেদনের জন্য সঠিক কর্মক্ষেত্র আছে, তবে তাদের ব্যবহারবিধিতে শৃংখলা ও ভারসাম্য বজায় থাকা অপরিহার্য। আমাদের বর্ণিত উদাহরণগুলো তাদের স্ব স্ব উল্লেখিত ক্ষেত্রেই সীমিত নয়, বরং অন্য ক্ষেত্রেও এগুলোর প্রয়োগ হতে পারে। অনুরূপভাবে অন্যান্য বদঅভ্যাসগুলোর জন্যও ক্ষেত্র নির্দিষ্ট রয়েছে।

অনুরূপভাবেই ভ্রান্ত ব্যবহারের দরুন প্রশংসনীয় গুণগুলোও দূষণীয় হয়ে যায়। "করুণা" অত্যন্ত ভাল ও প্রশংসনীয় ফিত্‌রাত-লব্ধ গুণ। কিন্তু সাপ, বিচ্ছু বা হিংস্র জন্তুর প্রতি যদি করুণা প্রদর্শন করা হয়, তবে ইহা সমর্থনযোগ্য নয়। 'দানশীলতা' নেহায়েত সৎগুণ বটে। কিন্তু ইহা যদি অপ্রয়োজনে বা বিলাসের জন্য হয় এবং ন্যায্য দাবীদাররা দানের ফলে বঞ্চিত হয়, তখন এ দানশীলতা হয় সমাজ-চক্ষে ঘৃণিত ও নিন্দিত। এক কথায়, সৎগুণগুলোর যেমনি অসৎ ব্যবহার করা যায়, অসৎ গুণগুলোরও তেমনি সৎ ব্যবহার করা যায়, ফিতরাতের কোন একটি আবেগকেও বিলুপ্ত বা বিনষ্ট করা অনুচিত, বরং উহাদের লক্ষ্য নির্ধারণ ও যথাযথই ব্যবহার উচিত।

কুরআন মজীদ আমাদের পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে, ফিত্‌রাত-লব্ধ আবেগগুলোকে কেমন করে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। যেমন, প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব একটি ফিত্‌রাত-লব্ধ স্পৃহা। উহার যথার্থ স্থান কুরআন এভাবে বয়ান করেছে ঃ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ "শুভ কাজে তোমরা একে-অপরকে অতিক্রম করার চেষ্টা কর।" ফিত্‌রাতের সৎব্যবহার কামনা করেন, এমন ব্যক্তি এই একটি মাত্র উদাহরণ থেকেই একটি সর্বাত্মক মূলনীতি পেতে পারেন।

যথার্থ লক্ষ্য নির্ধারণের পর কুরআনের দ্বিতীয় কাজ হলো ফিত্‌রাতগুলোকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশৃংখলা থেকে রক্ষা করা, অর্থাৎ ফিত্‌রাতের আবেগসমূহ

কার্যকরী করার ব্যাপারে আল-কুরআন কতক সীমা নির্ধারণ করে দেয়। তবে এ সীমা নির্ধারণও মানুষের প্রকৃত ফিত্‌রাত। সীমা নির্ধারণই প্রকৃত ভারসাম্য এবং উপরেও আমরা বলেছি যে, ভারসাম্য রক্ষাও মানুষের ফিত্‌রাত।

জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল কর্মে মানুষ শেষ পর্যন্ত ভারসাম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকেই অবলম্বন করে থাকে। কোথাও যদি কোন ব্যতিক্রম পবিলক্ষিত হয় তখনও বলা যায় না যে উহা ফিত্‌রাত নয়। তবে, একথা নিশ্চিত বলতে পারা যায় যে, ইহা দুষ্ট ফিত্‌রাতেরই কার্যক্রম এবং দুষ্ট ফিত্‌রাতের উপর সুস্থ ফিত্‌রাতের প্রাধান্য দেওয়াও মানুষের ফিত্‌রাত।

সংক্ষিপ্ত সার

এযাবৎ আমাদের আলোচিত বস্তুর সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

১. (ف-ط-ر) ধাতুগত ফিত্‌র শব্দের ভাবগত অর্থ কোন বস্তুর বহিরাগমন করা।

২. ফিত্‌রাত একটি বস্তু যা প্রত্যেক পদার্থের বা সৃষ্টির জন্যই আজন্ম বর্তমান থাকে এবং যথাসময় আত্মপ্রকাশ করে।

৩. বিশ্ব-সৃষ্টির সকল পর্যায়েই দু'রকম ফিত্‌রাত পাওয়া যায়—কিছু সর্বাত্মক ও কিছু পরস্পর স্বতন্ত্র।

৪. "ফাতের" সেই পরমাত্মা, যিনি সকল সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা ও সকল সৃষ্টির মধ্যে ফিত্‌রাতের জন্মদাতা।

৫. এ ফিত্‌রাতগুলো কিছু ইখ্‌তিয়ার বহির্ভূত, কিছু ইখতিয়ার ভুক্ত, কিছু জ্ঞাত, কিছু অজ্ঞাত, কিছু বিবেকসম্মত ও কিছু অবোধ্য।

৬. ফাতের (স্রষ্টা)-এর একটি নিজস্ব ফিত্‌রাত আছে, তবে উহার সম্যক জ্ঞানলাভ অসম্ভব।

৭. আলোচ্য সর্বাত্মক ফিত্‌রাতের যেসব বাস্তব নিদর্শন সৃষ্টি-জগতের মধ্যে আমরা দেখতে পাই, তা প্রত্যেক বস্তুর যথাস্থানে যথার্থ ব্যবহার এবং বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে ভারসাম্যমূলক প্রয়োজন অনুসরণের মধ্য দিয়েই।

৮. অপরাপর গুণগুলোর ন্যায় স্রষ্টা মানুষকে একটি সুস্থ ফিত্‌রাত অর্থাৎ যথার্থ ব্যবহার ও ভারসাম্য রক্ষার প্রবণতাও দান করেছেন।

৯. সুস্থ ফিত্‌রাতের সাথে সাথে মানুষের মধ্যে ভ্রান্ত ব্যবহার ও অসাম্যের ফিত্‌রাতও রয়েছে (বিকৃত ফিত্‌রাত)।

১০. সুস্থ ফিত্‌রাত সকল মানুষের মধ্যেই আছে বটে, কিন্তু অনেক সময় বিকৃত ফিত্‌রাতের (যার কারণ অজ্ঞতা ও অশিক্ষা) প্রভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে।

১১. ইসলাম উৎসাহিত করে উপরোক্ত সুস্থ ফিত্রাতকে, এই অর্থেই ইসলাম ফিত্রাতের অনুকূল দীন জীবন-বিধান।

১২. মানুষের ফিত্রাতকে উন্নীত করে ইসলাম সংযুক্ত করতে চায় আল্লাহ্র ফিত্রাতের সাথে, অন্য কথায় ইসলাম সুস্থ ফিত্রাতের প্রতিপালক।

১৩. উক্ত ফিত্রাতের জাগরণ চারিত্রিক বা নৈতিক মূল্যমানগুলোকে সংরক্ষণ ও সংগঠন করে এবং মানুষকে চতুষ্পদ জন্তু থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করে।

ফিত্রাত সম্পর্কিত হাদীস

مَـامن مَـولود الايولد على الفطرة فـابواه يهـودانـه اوينصرانـه اويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا هل تحسون فيها من جدعا ثم يقول فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسِ عَلَيْهَا لاَتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ - ذَالِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمِ-

—"প্রত্যেক শিশুই ফিত্রাতের উপর জন্মগ্রহণ করে, পরে তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহূদী, খ্রীস্টান ও অগ্নি-উপাসক করে। যেমন একটি চতুষ্পদ জন্তু নিখুত কর্ণসহকারে জন্মগ্রহণ করল, তখন তোমরা কি উহার মধ্যে কানকাটা জন্তুর কোন চিহ্ন দেখতে পাও? অতঃপর হযরত (সা) বলেন ঃ 'তাই আল্লাহ্র ফিত্রাত, যার উপর সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষকে; আল্লাহ্র সৃজনবিধির মধ্যে রদবদলের কোন অবকাশ নেই; ইহাই প্রতিষ্ঠিত দীন বা জীবনবিধান।

হাদীসটির ভাব অতি পরিষ্কার, অর্থাৎ জন্ম থেকেই কোন জন্তু কান-কাটা হয় না। এ কাটা ছেঁড়া মানব-হস্তের লীলা। একান্ত অনুরূপভাবেই মানুষ ফিত্রাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। তার মাতা-পিতাই তার ফিত্রাতকে নষ্ট করে ফেলে। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়, শিশুদের মধ্যে ভুল ধারণা থাকতে পারে বটে, কিন্তু তারা কখনও মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত নয়। প্রথম সে সত্যই বলবে এবং পরেও তা-ই করবে। কিন্তু সত্য বললে কোন ভয় বা ক্ষতি হবে, পরিবেশ যখন তার অন্তরে এ অনুভূতি জাগায়, তখন উহা থেকে রক্ষা পাওয়ার মানসে সে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। সাধুতাই তার ফিত্রাত্ এবং ইহাই সুস্থ ফিত্রাত্, তবে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে পরিবেশ যখন তার অন্তরে স্বার্থপর মনোভাবের সৃষ্টি করে দেয়, সুস্থ ফিত্রাত্ তখন তার বিকৃত ফিত্রাতের অন্তরালে চাপা পড়ে যায়। অতঃপর স্বার্থানুযায়ী সত্য-মিথ্যায় অভ্যস্থ হয়ে পড়ে।

অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ সাদেক

মানব ধর্ম আল-ইসলাম*

ড. মোহাম্মদ রুহুল আমীন
ড. এ.কে.এম. নূরুল আলম

আমরা বিশ্বাস করি ইসলাম ফিত্‌রাতের ধর্ম। ফিত্‌রাত অর্থ প্রকৃতি, তবিয়ত, স্বাভাবিকতা, সহজ পন্থা, স্বকীয়তা। ইসলাম ফিত্‌রাতের ধর্ম-এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, ইসলাম জীবন বিধান হিসাবে এমন একটি জীবন ব্যবস্থা, যা মানুষের জন্মগত স্বভাবপ্রকৃতি ও স্বকীয়তাকে পরিপূর্ণভাবে স্বীকৃতি জানিয়ে মানব কল্যাণে নিজের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ দু'টো কথার গূঢ় রহস্য হচ্ছে এই যে, যেহেতু মানুষ এবং ইসলাম উভয়ের স্রষ্টা হচ্ছে এক ও অভিন্ন সত্তা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এবং যেহেতু আল্লাহ্ তাঁর এক সুমহান উদ্দেশ্য সাধনে পৃথিবীতে খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করে মানুষকে প্রেরণ করেছেন এবং তার চলার পথের সঠিক দিশারী হিসাবে উপহার দিয়েছেন আল-ইসলাম, সুতরাং নিঃসন্দেহে ইসলাম ফিত্‌রাতের ধর্ম। আল-কুরআনের ভাষায় ঃ "তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দীনসহ সকল দীনের উপর উহাকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য, যদিও মুশরিকগণ তা অপছন্দ করে।"[১]

ইসলাম এ জন্য ফিত্‌রাতের ধর্ম যে, এতে মানব স্বভাব ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ কোন বিধি-বিধান বা আইন-কানুনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্য কথায় মানুষের স্রষ্টা হিসাবে মহান আল্লাহ্ তাঁর স্বভাবজাত প্রকৃতি আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং মনের কোণে লুকায়িত কামনা-বাসনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল হওয়ার কারণে তিনি মানব জাতির জন্যে যে জীবন-বিধান উপহার হিসাবে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে প্রদান করেছেন, তা মানব জাতির জন্যে এমন এক স্বভাবসিদ্ধ মধ্যম পন্থা, যাতে মানুষের প্রকৃতি, আশা-আকাঙক্ষা বা কামনা-বাসনা বিরোধী কোন কিছুই থাকতে পারে না।

ইসলাম এ জন্যে ফিত্‌রাতের ধর্ম যে, এতে অনাবশ্যক অতিরঞ্জন কিংবা বাড়াবাড়ির কোন স্থান নেই। সহজ, সরল, স্বাভাবিক ও সঠিক জীবন পদ্ধতিই

---

*. [প্রবন্ধটি ইফা পত্রিকা ১৯৯৩ সন ৩৩ বর্ষ ২য় সংখ্যা থেকে সংগৃহীত]

১. সূরা আস-সাফফ ঃ ৯।

হচ্ছে আল-ইসলাম। আমরা বিশ্বাস করি যে, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেও একথা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে মানুষের ব্যক্তি জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজকর্মের সহজ-সরল ও স্বাভাবিক দিক-নির্দেশনা যেমন ইসলাম দিয়েছে, তেমনি এতে আছে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তরাষ্ট্রীয় তাবত সমস্যাবলীর পথ-নির্দেশনা। আর এ কারণেই ইসলাম হচ্ছে সার্বজনীন ও শাশ্বত জীবন বিধান। আমরা বিশ্বাস করি যে, বিশ্বের প্রথম মানব হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত অসংখ্য নবী-রাসূলকে আল্লাহ্ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের মিশন ছিল এক ও অভিন্ন— আল্লাহ্র একত্ববাদ তথা তাওহীদের মর্মবাণীর প্রচার-প্রসার। বিভিন্ন নবী-রাসূলদের শরীয়াতের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও মূলত তাঁদের প্রত্যেকের দীন ছিল এক ও অভিন্ন আল-ইসলাম।[২] আর যেহেতু এই দীনের পূর্ণতা প্রদান করা হয়েছে সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর মিশনের মাধ্যমে এবং যেহেতু তাঁর পরে আর কোন নবী-রাসূলের আবির্ভাব হবে না, সেহেতু আল-ইসলাম হচ্ছে সর্বকালীন সার্বজনীন জীবন বিধান[৩]। অপরদিকে মানব রচিত যে কোন জীবন বিধান ইসলামের মুকাবিলায় ভ্রান্ত; ত্রুটিপূর্ণ ও অসাড় হতে বাধ্য। কারণ, আল-ইসলাম হচ্ছে সার্বজনীন, সর্বকালীন ও ভারসাম্যপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণ মানব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়কেই দিক নির্দেশনা থেকে বাদ দেননি এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের দিক নির্দেশনাই হচ্ছে সর্বোত্তম, সঠিক ও স্বভাবজাত। এজন্যই এর মুকাবিলায় যে কোন মতবাদ ত্রুটিপূর্ণ, ভ্রান্ত ও ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। কেননা, তা হবে মানব প্রকৃতি বা ফিত্‌রাতের পরিপন্থী। আর মানব প্রকৃতি সম্পর্কে তো আল্লাহ্ই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞাতা।

মানব রচিত জীবন বিধানসমূহের অন্যতম হলো সমাজতন্ত্র। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত যে মতবাদের গুণগানের কথা বলে শেষ করা যেত না। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে এ মতবাদের বাজার ছিল রমরমা দবদবা। এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি ও প্রগতিবাদীদের কথায় ও লেখনীতে যে মতবাদের বিজ্ঞানময়তা ও সাফল্যের কথা উচ্চারিত হয়েছে প্রতিনিয়ত, আজ সে মানব রচিত সমাজতন্ত্র মানব জাতির কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। সমাজতন্ত্রের

---

২. বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ 'নবীগণ সকলেই যেন একই পিতার ঔরসে ভিন্ন ভিন্ন মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী ভাই। তাদের জননী ভিন্ন কিন্তু তাঁদের দীন এক ও অভিন্ন। বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদ এ হাদীসটি তাখরীজ করেছেন।

৩. আল-কুরআনে বলা হচ্ছে ঃ 'আজ তোমাদের দীন পূর্ণাংগ করিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করিলাম'। আল- মায়িদা ঃ৩।

জন্মস্থান সোভিয়েত ইউনিয়নে তাঁর জনক কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ও লেনিন (১৮৭০-১৯২৪) মানবতার অভিশাপ হিসাবে চিহ্নিত। কিন্তু কেন?

এ প্রশ্নের জবাবে সেই ফিতরাতের কথাই এসে যায়। সমাজতন্ত্রের পতনের বহুবিধ কারণ থাকতে পারে। আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদগণ হয়তো বা তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে এর পতনের কারণসমূহ খুঁজে ব্যাখ্যা দিবেন। কিন্তু আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, সমাজতান্ত্রিক নীতিমালা ও বিধি বিধানের ভিতরেই এর পতনের কারণসমূহ নিহিত ছিল। এর মৌল নীতিমালা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, তা প্রথমতই মানব প্রকৃতি বা ফিত্‌রাতের পরিপন্থী। দ্বিতীয়ত, ইসলাম যেহেতু ফিত্‌রাতের ধর্ম, সুতরাং ইসলাম বিরোধীও বটে। সমাজতন্ত্র তার গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলার ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখলে সর্বপ্রথম এর প্রধান সংবিধি ব্যক্তি মালিকানার উচ্ছেদ সম্পর্কে আলোচনা করা যায়। সমাজতন্ত্রের থিওরীতে ব্যক্তি মালিকানার কোন স্থান নেই। সকল সম্পদের একমাত্র মালিকানা রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের অধীনস্থ নাগরিকগণ তাদের রুটি রুজির জন্যে কেবল দিনমজুরের ন্যায় খেটে যাবে। অন্যভাবে বলা যায় যে, নাগরিকগণ যন্ত্রের ন্যায় সম্পদ উৎপাদনে অবিরত শ্রম দিয়ে যাবে আর বিনিময়ে রাষ্ট্র তাদের থাকা খাওয়া ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর গ্যারান্টি দিবে। কিন্তু যারা তা করতে ব্যর্থ হবে তারা না খেয়ে মৃত্যুবরণ করলেও রাষ্ট্রের কোন প্রকার মাথাব্যাথ্যা থাকবে না। বরং যারা কাজ করবে না তারা খেতে পাবে না-এটাই নিয়ম।

সমাজতান্ত্রিক নীতির এ পুরো ব্যাপারটি মানব তথা ফিত্‌রাতের পরিপন্থী, এমন কি যদি সমাজতন্ত্রের জন্মভূমি রাশিয়ার কথাও মেনে নেয়া হয়, যেখানে সবাই খাবে দাবে আর ফূর্তি করবে, কিন্তু সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা থাকবে না তবু তাতে একজন মানব সন্তান পরিতুষ্ট থাকতে পারে না। কারণ স্বভাবতই সে মালিকানার প্রতি আকৃষ্ট। আর সে মালিকানার অধিভুক্ত সম্পদের পরিমাণ যত সামান্যই হোক না কেন, অধিকারবিহীন অট্টালিকায় বাস করার চেয়ে সে নিজের মালিকানাধীন কুঁড়ে ঘরে নিজের পছন্দমত বসবাস করাকেই শ্রেয় মনে করবে।

মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানব সৃষ্টির আদিলগ্নেই তার চরিত্রে এ প্রকৃতি বা স্বভাব-সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর তার প্রমাণ রয়েছে আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে। এবং অবশ্যই সে ধন-সম্পদের আসক্তিতে প্রবল।[৪] এবং তোমরা ধন-সম্পদ অতিশয় ভালবাস।[৫] তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষা, আল্লাহ্‌রই নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার।[৬]

৪. সূরা আল-আদিয়াত ঃ ৮।

৫. সূরা আল-ফাজর ঃ ২০।

৬. সূরা আত-তাগাবুন ঃ ১৫।

"ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্চিত হিসাবেও উৎকৃষ্ট[৭]।" এখানে লক্ষণীয় যে, উপরোক্ত আয়াতসমূহের কোনটিতেই সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বা তার পতনের কোন কারণ সম্পর্কে সরাসরি কোন বক্তব্য নেই। আমরা এখানে এ আয়াতগুলো উদ্ধৃত করেছি কেবল সম্পদের প্রতি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি তথা ব্যক্তি মালিকানার প্রতি তার জন্মগত আকর্ষণ প্রমাণ করার জন্যে। সমাজতন্ত্রে মানুষের এ জন্মগত প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করা হয়েছে নির্মমভাবে। সুতরাং সমাজতন্ত্রের পতনের এটি একটি অন্যতম কারণ বলে আমরা বিশ্বাস করি।

দ্বিতীয়ত, সমাজতন্ত্রের নীতিতে বলা হয়েছে দৃশ্যমান বস্তুর সব কিছুই দৃশ্যমান। বস্তুজগতের বাইরে অন্য কোন জগতের অস্তিত্বের কথা সমাজতন্ত্র স্বীকার করে না। অনুরূপভাবে অস্থি-মজ্জা ও রক্ত-মাংস বিশিষ্ট দৃশ্যমান দেহের ভিতর দেহাতীত কোন হৃদয়, মন বা অন্তরের অস্তিত্বও কল্পনাতীত। আর যেখানে হৃদয় মনের অস্তিত্বই কল্পনাতীত ব্যাপার, সেখানে হৃদয়ঘটিত কোন ব্যাপার বা হৃদয়ের চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপারটি নিতান্তই অবান্তর। এক কথায় গায়েব বা অদৃশ্য কোন বিষয়ে বিশ্বাস না করাই সমাজতান্ত্রিক নীতি। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, সমাজতন্ত্রের এ নীতি পুরোপুরি ভ্রান্ত। আল্লাহ্, আখিরাত, ফেরেশতা, জীন ইত্যাদি অদৃশ্য অস্তিত্বের কথা না হয় বাদ দিলেও মানুষের মধ্যে ভালবাসা, ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভয়-ভীতি ইত্যাদি বিষয় কি অস্বীকার করা সম্ভব? বস্তুত মানুষের অন্তর্নিহিত এমন একটি সত্তা বিদ্যমান থাকে, যাকে এক কথায় আধ্যাত্মিকতা বা রূহানিয়াত বলা যায়। এ আধ্যাত্মিকতা বা রূহানিয়াতই হচ্ছে মানুষের প্রেম-ভালবাসা, ভক্তিশ্রদ্ধা, ভয়-ভীতি, ইবাদত-বন্দেগী, ভজন-তপস্যা, আরাধনা ইত্যাদি সব কিছুর আধার। এটা এক ধরনের ক্ষুধা বা চাহিদা। মানুষের দেহ যতক্ষণ সজীব থাকে ততক্ষণ এর যেমন খাদ্যের চাহিদা বা তাকিদ অবশিষ্ট থাকে তেমনিভাবে আধ্যাত্মিকতার চাহিদাও অনস্বীকার্য সত্য। আধ্যাত্মিকতার এ তাকিদই মানুষ পরিণত করে সাধু সন্ন্যাসী, পীর, মুর্শিদ, আউল-বাউল, সূফী দরবেশ, সংসার বিরাগী প্রেমিক, ধ্যানযোগী তাপস ইত্যাদিতে। কেউবা পৌছে যায় নির্বাণে আবার কেউবা ফানাফিল্লাহ্‌র পর্যায়ে। মোটকথা আধ্যাত্মিকতার এ তাকিদকে যেভাবেই বিশ্লেষণ করা হোক না কেন, একে অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রফেসর সাঈদুর রহমানের মত ব্যক্তিও সূফীমত সম্পর্কে স্বীকার করে গেছেন যে, "Sufism is a sort of mystic tendency. It is present among some members of every society in all ages

৭ সূরা আল-কাহাফ ঃ ৪৬

and places."[৮] আল্লাহ্ পাক মানুষের (এবং অন্য সকল সৃষ্টির) স্রষ্টা হিসেবে মানুষের এ আধ্যাত্মিকতা বা হৃদয়ের অস্তিত্বের শুধু স্বীকৃতিই দেননি বরং তিনি মানব অন্তরের সে চাহিদা পূরণের পদ্ধতিও বাতলিয়ে দিয়েছেন। "যাহারা ঈমান আনে এবং আল্লাহ্র স্মরণে যাহাদিগের চিত্ত প্রশান্ত হয়, জানিয়া রাখ, আল্লাহ্র স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।"[৯] যে আমার স্মরণে বিমুখ তাহার জীবন-যাপন হইবে সংকুচিত এবং আমি তাহাকে কিয়ামতের দিন উপস্থিত করিব অন্ধ অবস্থায়।"[১০] এবং "আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর।"[১১] কিন্তু সমাজতন্ত্র এ পুরো ব্যাপারটিকে গোড়াতেই অস্বীকার করে মানব স্বভাব বা ফিতরাতের বিরোধী কাজ করেছে যার ফলে সে তার পতনকেই ত্বরান্বিত করেছে। মানুষের অভ্যন্তরে নিহিত আধ্যাত্মিক যে ক্ষুধার কথা আমরা বললাম তাকে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করে থাকি যেমন মন, দিল, অন্তর, কলব (Mind) ও আত্মা (Spirit) দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও দেখা যাবে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ থেকে শুরু করে মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক দার্শনিকগণ মন (Mind) ও আত্মা (Spirit) নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। দু'একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে প্রায় প্রত্যেক দার্শনিক মন বা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। এটা অবশ্য সত্য যে, আধ্যাত্মিক এ সত্তার ব্যাখ্যা বিভিন্ন দার্শনিক ভিন্ন ভিন্নভাবে দিয়েছেন। আত্মার অমরত্ব নিয়েও দার্শনিকগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে। এমনকি বিষয়টি দর্শনের একটি অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসাবে স্থান করে নিয়েছে। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোকে বলা হয় আধ্যাত্মিক দ্রব্যবাদের (Soul Substance Theory)-এর জনক। তাঁর মতে মন বা আত্মা হল এক স্বনির্ভর এবং অবিনশ্বর দ্রব্য। কারণ আত্মার অস্তিত্ব আত্মা ভিন্ন অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না।[১২] আত্মা সম্পর্কে পেল্টোর এ জাতীয় ব্যাখ্যা পরবর্তী দার্শনিকদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রখ্যাত দার্শনিক টাইটাস মন্তব্য করেন ঃ "Plato's interpretation of soul, mind or reason strongly influenced the thinking of Plotinus and Augastine and through them, the Christian church. A view derived from plato was widely held during the middle ages. In this form, or as restated

---

৮. Syedur Rahman, **An Introduction to Islamic Culture and Philosophy**, 3rd Edn. p. 101

৯. সূরা আর-রাদ ঃ ২৮।

১০. সূরা তাহা ঃ ১২৪।

১১. ঐ ঃ ১৪।

১২. মুহাম্মদ আখতারুল হক, **দর্শনের রূপরেখা**, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৮০, পৃঃ ২৬০।

by Descrates, it permeats much modern thinking."[১৩] আল-কুরআন মানুষের মন (Mind) এবং আত্মা-এ উভয় সত্তার অস্তিত্বের স্বীকৃতি দিয়েছে। ক্বালব বা মন সম্পর্কে ইতিপূবে আমরা পবিত্র আয়াতসমূহ উদ্ধৃত করেছি। তাছাড়া ইসলামের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ঘোষণা করেছেন ঃ 'সাবধান দেহের অভ্যন্তরে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, যখন তা সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন হয় তখন সমস্ত দেহ নির্মল হয় আর যখন তা পংকিলতাচ্ছন্ন হয় তখন গোটা দেহই পংকিলাচ্ছন্ন হয়ে যায়-সাবধান। আর তা হচ্ছে ক্বালব বা অন্তর।" আত্মা (Spirit) সম্পর্কে আল কুরআন বলছে ঃ

"অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তাহাকে (মানুষকে) সর্বাংগ সুন্দর করিলেন এবং তাহার (আল্লাহ্র) রূহ তাহার (মানুষের) মধ্যে প্রবিষ্ট করাইলেন।"[১৪] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ[১৫] আপনি বলুন ঃ রূহ হচ্ছে আমার প্রভুর নির্দেশ। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে-'আস্‌সালাতু মিরাজুল মুমিনীন' অর্থাৎ সালাত বা নামায হচ্ছে মুমিনের মি'রাজ। এর তাৎপর্য এই যে, একজন মুমিন সালাতের সাধনার মাধ্যমে তার আত্মিক উন্নতি এত অধিক লাভ করতে সক্ষম, যা দ্বারা সে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। কারণ মি'রাজের মূল তাৎপর্যই হচ্ছে আল্লাহ্র নৈকট্য।

আধ্যাত্মিকতা সংক্রান্ত উপরের আলোচনা থেকে আমরা যে কথাটি বলতে চাচ্ছি তা হলো মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন—তাঁর সৃষ্টি কৌশলের অংশ হিসাবে মানুষের মধ্যে এই যে মাইণ্ড (Mind), সোল (Soul) বা আত্মা (Spirit) নামক শক্তি বা সত্তা প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়েছেন—এ চাওয়া পাওয়াকে কোন মতেই উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। ধরে নেয়া যাক্-যদি দুনিয়াতে কোন ধর্মমতের অস্তিত্ব না থাকতো, তবুও সেই মনের (Mind) তাগিদ ও আত্মার (Spirit) বলে মানুষ এমন একটা মত ও পথ গড়ে তুলত, যেখানে সে তার মন ও আত্মার খোরাক খুঁজে পেত। কারণ, সৃষ্টিগতভাবেই মন ও আত্মিক ব্যাপারটি মানব জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। অথচ সমাজতন্ত্র তথা কমিউনিজম বস্তুজগতে সবকিছু ধরে নিয়ে ধর্ম তথা মানব ধর্মকেই অস্বীকার করে বসেছে। ধর্মকে কমিউনিস্টরা 'জাতির পক্ষে আফিম, (Opium of the people) বলে আখ্যা দিয়েছে। তাদের আদর্শ হচ্ছে ঈশ্বরহীন,' ধর্মহীন ও শ্রেণীহীন সমাজ (Godless, Religionless and Classsless Society) গঠন করা।[১৬] কিন্তু

---

১৩. Harold H. Titus, **Living Issue in Philosophy**, Fourth Edn. India, p-167.

১৪. সূরা **আলিফ লাম মীম সাজদা** ঃ ৯।

১৫. সূরা **বনী ইসরাঈল** ঃ ৮৫।

১৬. গোলাম মোস্তফা, **ইসলাম ও কমিউনিজম**, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, পঞ্চম প্রকাশ

তাদের এ মতবাদ যে মানব প্রকৃতি বিরুদ্ধ এবং অবৈজ্ঞানিক তা আজ দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। আজ থেকে ৩০/৪০ বছর সমাজতন্ত্রের যৌবনকালে বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ গোলাম মোস্তফা কমিউনিজম ও মানবাত্মা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন, আজ তা আক্ষরিকভাবেই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ 'জড় (Matter) ও আত্মা এই দুইয়ের সমন্বয় হইয়াছে বলিয়াই মানুষ সর্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে। কমিউনিজম যখন একটিকে স্বীকার করিয়া অপরটিকে অস্বীকার করিতেছে, তখন ইহা যত ভালই হউক ঠিক পূর্ণাঙ্গ নয়, একথা নিশ্চিত। ইহার গোড়াতেই রহিয়াছে মস্তবড় গলৎ। মানুষের প্রকৃতির সহিত তার সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সামঞ্জস্য থাকিতেই হইবে, অন্যথায় ইহা অস্বাভাবিক এবং অসম্পূর্ণ হইতে বাধ্য।'[১৭]

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ইসলাম ফিতরাতের ধর্ম, তথা মানবতার ধর্ম। বস্তুত ইসলাম স্বভাবধর্ম। ইসলাম কর্মের ধর্ম। সমাজতন্ত্র তথা কমিউনিজম ধর্মকে আফিম বলে আখ্যায়িত করে অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে কতটা সত্যাসত্য উক্তি করেছে সে বিচারে না গিয়ে আমরা শুধু এতটুকু বলতে চাই যে, ইসলাম সম্বন্ধে তাদের এ ধারণা ভ্রান্ত, অসাড় ও মিথ্যা বৈ কিছু নয়।

কর্ম তথা শ্রমের মর্যাদা প্রদান করতে ইসলাম যত বেশী তাকিদ দিয়েছে, ততটা, অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদ দিয়েছে বলে আমরা জানি না। কর্মের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা এবং কর্ম সংস্থান করা মূলতঃ ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। হাদীস শরীফ থেকে এ সম্পর্কে অসংখ্য উদ্ধৃতি পেশ করা যেতে পারে। আল-কুরআনের বহু স্থানে মানুষকে কর্মের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। কর্মের সাধনার মাধ্যমে মানুষ অনেক অসাধ্যকে সাধন করতে পারে। আল-কুরআনে বলা হচ্ছে-মানুষ ততটুকুই পায়, যতটুকু সে চেষ্টা করে।[১৮] লক্ষণীয় যে, এখানে 'ইনসান' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, মুসলিম বা মুমিন বলা হয়নি। কারণ, আল-কুরআনের বিধি-বিধান শুধু মুমিন-মুসলিমের জন্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। যেহেতু তা বিশ্বস্রষ্টা ও নিয়ন্তার শাশ্বত চিরন্তন ও বিশ্বজনীন বাণী থেকে উৎসারিত। আজকের বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সহজেই এ সত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইসলাম কোন সময় গোঁড়ামি সমর্থন করে না। যে কোন প্রকার বাড়াবাড়ি ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। এমনকি এতে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করতেও নিষেধ

১৩৮৮ বাং, পৃঃ৩০।

১৭. ঐ পৃ. ৮৪।

১৮. সূরা আল-নাজম ঃ ৩৯।

করা হয়েছে।[১৯] মোদ্দাকথা, সব ব্যাপারে ইসলাম সহজ সরল, স্বাভাবিক ও মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছে। ব্যক্তি স্বাধীনতা তথা চিন্তার ক্ষেত্রেও ইসলাম উদার পন্থা অবলম্বন করেছে। ব্যক্তি স্বাধীনতা হচ্ছে মানুষের জন্মগত অধিকার এবং স্বাভাবিক ফিতরাতলব্ধ প্রবৃত্তি। আর এ কারণেই ইসলাম চিন্তার ক্ষেত্রে কোন রকম সংকীর্ণতা, একপেশে ভাব, গোঁড়ামী প্রশ্রয় দেয় না। আল-কুরআনের বহু স্থানে 'আ-ফালা ইয়াতাফাক্কারুন', "আ-ফালা ইয়াতাদাব্বা-রুন', 'ফা'তাবিরু' ইত্যাদি সব ব্যবহার করে মানুষকে স্বচ্ছ বিবেকে ভাবতে, চিন্তা এবং উপদেশ গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের কার্যক্রমে দেখা গেছে সেখানে মানুষের স্বাধীন ও সহজাত চিন্তার অধিকারকে খর্ব করা হয়েছে। একটা কঠিন বন্ধনের অনুভূতি তার মনকে সব সময় পীড়া দেয়। চিন্তার ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র এক ধরনের রেজিমেন্টেশন তৈরী করেছে যা মানুষের ফিতরাত বা জন্মগত স্বভাবের পরিপন্থী।[২০] সমাজতন্ত্রের পতনের এটিও কারণ বলে বিশ্বাস করা যায়।

আসলে আমরা উপরের আলোচনায় সমাজতন্ত্র ও এর পতন প্রসঙ্গটির অবতারণা করে যে বিষয়টি বোঝানোর প্রয়াস পেয়েছি, তা হচ্ছে প্রথমত ইসলাম হলো মানব প্রকৃতি তথা ফিত্‌রাত ভিত্তিক স্বভাব ধর্ম। এ প্রসংগে নবী করীম (সা)-এর একখানি হাদীস স্মরণ করা যেতে পারে। "প্রত্যেক সন্তান স্বীয় (ফিত্‌রাতের ধর্ম) ইসলামের উপর সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহূদী, খ্রীস্টান এবং মাজুসী (অগ্নি উপাসক) বানিয়ে দেয়। যেমন চতুষ্পদ জন্তু ভাল ও নিখুঁতভাবেই সৃষ্টি হয়। কোনটি কি কান কাটারূপে সৃষ্ট হয়? কিন্তু পরে তার কেটে নিয়ে তাকে বিকলাঙ্গ করে দেওয়া হয়।[২১] দ্বিতীয়ত ইসলামের মুকাবিলায় যে কোন মানব রচিত ধর্ম বা মতবাদ মানব ফিতরাতের পরিপন্থী হওয়ার কারণে তা ত্রুটিপূর্ণ, অকল্যাণকর ও ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। সমাজতন্ত্রের পতন এর অন্যতম দৃষ্টান্ত মাত্র।

সুতরাং তুমি একনিষ্ঠ হইয়া নিজকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহ্‌র প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই। ইহাই সরল দীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না।[২২]

---

১৯. সূরা **বাকারা** ঃ ১৫৬।

২০. গোলাম মোস্তফা, **ইসলাম ও কমিউনিজম**, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা প্রকাশ ১৩৮৪ বাং, পৃঃ ৮৯।

২১. আল্লামা হাফিয ইমামুদ্দীন, **তাফসীর ইবনে কাসীর**, বংগানুবাদ ড. এম, মুজীবুর রহমান, ঢাকা, ১৯৯১, খণ্ড ১০, পৃঃ ১০৩।

২২. সূরা **রুম** ঃ ৩০।

সালাতের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ এবং পূর্ণতা*

অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান

আল্লাহ্ তা'আলা যখন হযরত আদমকে সৃষ্টি করলেন, তখন তাঁকে তিনি বহু গুণে গুণান্বিত করলেন এবং তাঁকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন। এ নামের অর্থ সৃষ্ট সকল বস্তুর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। কুরআন শরীফে আছে ঃ এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন এবং তৎপর সে সমুদয় ফেরেশতাদের সামনে প্রকাশ করলেন এবং বললেন, এ সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' তারা বলল, 'আপনি মহান, পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের তো জ্ঞানই নেই। বস্তুত আপনি জ্ঞানময় এবং প্রজ্ঞাময়।' তিনি তখন বললেন, 'হে আদম, এদেরকে সকল নাম বলে দাও।' যখন আদম সকল নাম বলে দিলেন, তখন আল্লাহ্ বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা প্রকাশ কর এবং সংগুপ্ত রাখ, সেগুলোও আমি জানি।' (কুরআন শরীফ ঃ ২ ঃ ৩১-৩৩)

আদম সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নিবেদন বা প্রার্থনার পদ্ধতিরও জন্ম দিলেন। সে পদ্ধতি হচ্ছে সিজদা। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি সৃষ্টি লগ্ন থেকে সিজদার পদ্ধতিরও উদ্ভব হয়েছে। এর প্রমাণ আমরা সহজেই পেতে পারি। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে সিজদা বা প্রণিপাত আছে। প্রিমিটিভ বা আদিম মানুষ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সিজদা প্রথার প্রচলন আছে। পরিবর্তন এসেছে শুধু সিজদা কোন ক্ষেত্রে কার প্রাপ্য, সে বিষয়টি নিয়ে। পৃথিবীর আদিম ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে হিন্দু ধর্ম এখনও বিদ্যমান। সেখানে প্রণিপাত করার কথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। হিন্দুরা মূর্তিকে প্রণিপাত করেন অর্থাৎ তাঁরা তাঁদের আরাধ্য দেবদেবীকে প্রণিপাত করেন, গুরুকে প্রণিপাত করেন এবং তাঁদের বিচার মতে নমস্য সকলকেই তাঁরা প্রণিপাত করেন। সুতরাং আমরা সালাতের অঙ্গ হিসেবে যে সিজদাকে পাচ্ছি, তার প্রত্যয়ী প্রকাশ ঘটেছিল হযরত আদমের সময় এবং তারপর সকল মনুষ্য সমাজেই সর্বত্রই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আদিম জাতিসত্তার যে সমস্ত প্রকাশ আমরা পাই, তার মধ্যেও সিজ্‌দার প্রথাটা রয়েছে।

---

* [প্রবন্ধটি ইফা পত্রিকা ১৯৯৬ সন ৩৬ বর্ষ ১ম সংখ্যা থেকে সংগৃহীত]

কুরআন শরীফে সিজদা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু তার পদ্ধতির বর্ণনা নেই। সূরা আল-বাকারাতে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশতাগণকে নির্দেশ দিচ্ছেন আদমকে সিজ্‌দা করতে ঃ 'এবং আমরা যখন ফিরিশতাগণকে বললাম, আদমের সম্মুখে সিজ্‌দায় নত হও; তখন তারা সকলেই নত হল একমাত্র ইবলিস ছাড়া, সে অমান্য করল এবং অহঙ্কার প্রকাশ করল। সুতরাং সে সত্য অস্বীকারকারীদের মধ্যে একজন হল।" (কুরআন শরীফ ২ ঃ ৩৪) আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে সিজ্‌দা করতে কেন বললেন? যেহেতু আদম সকল বস্তুর নাম গ্রহণ করতে পেরেছিলেন এবং প্রকাশ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু ফিরিশতাগণ পারেননি। সুতরাং জ্ঞান এবং বুদ্ধির দিক থেকে এবং উপলব্ধির বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে আদম ফিরিশতাগণের চাইতে উন্নত ছিলেন। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রমাণিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা সিজদা শব্দটি ব্যবহার করে সিজদার প্রকৃতি অথবা প্রক্রিয়া স্পষ্ট করেছেন। এ শব্দটির মৌলিক অর্থ হচ্ছে ঃ 'ভূমিতে ললাট স্থাপন।' বিভিন্ন জাতিসত্তার মধ্যে ভূমিতে ললাট স্থাপনটি দু'ভাবে হয়ে থাকে আমরা দেখছি—একটি হচ্ছে ঃ বসে, তারপর উপুড় হয়ে ভূমিতে ললাট স্থাপন এবং অন্যটি হল সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করা। অর্থাৎ মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে ভূমিতে ললাট স্থাপন করা। আদিম ধর্মাচরণের মধ্যে দ্বিতীয়টি প্রচলিত। ইসলামের মধ্যে প্রথম প্রক্রিয়াটি বিদ্যমান। এই পদ্ধতিটি মানুষের শরীরিক অঙ্গ সঞ্চালনের দিক থেকে স্বাভাবিক এবং সমীচীন, সুতরাং বৈজ্ঞানিক। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি আয়াসসাধ্য এবং কঠোর।

কুরআন শরীফে সিজ্‌দার সঙ্গে সঙ্গে 'রুকু' কথাটাও এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে দণ্ডায়মান অবস্থা থেকে ঊর্ধাঙ্গ আনত করে মাথা নত করা। 'রুকু' শব্দটির মৌলিক অর্থ হচ্ছে ঝুঁকে পড়ে বিনয় প্রকাশ করা। কুরআন শরীফের সুস্পষ্ট কথাগুলো হল ঃ "এবং যারা 'রুকু' করে তাদের সঙ্গে 'রুকুতে যাও।" (কুরআন শরীফ ঃ ২ ঃ ৪৩)। একটু পরেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ "তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। এবং এ প্রার্থনা বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে কঠিন। তারাই বিনীত যারা বিশ্বাস করে যে, তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে নিশ্চিতভাবে তাদের সাক্ষাতকার ঘটবে এবং প্রতিপালকের দিকেই তারা ফিরে যাবে।" (কুরআন শরীফ ২ ঃ ৪৫, ৪৬)। সুতরাং আমরা সিজ্‌দার সঙ্গে সঙ্গে রুকুর ভঙ্গিটাও পেলাম। এ দুটো ভঙ্গির কথা আমরা এক সঙ্গে পাচ্ছি না, ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে পাচ্ছি। তাতে ধারণা করা যায় যে, আল্লাহ্‌র নিকট কৃতজ্ঞতা এবং বিনয় প্রকাশের ভঙ্গি প্রাথমিক পর্যায়ে দু'টোই ছিল একটি হচ্ছে সিজ্‌দা, অপরটি রুকু। এভাবেই ধারণা করা যায় যে, দু'ভাবেই প্রার্থনা পদ্ধতির স্বীকৃতি ছিল। এর প্রমাণ আমরা পাই ইয়াহূদীদের ব্যক্তিগত প্রার্থনার

প্রক্রিয়ায়। ইয়াহূদীরা কখনও শুধুমাত্র বসে, কখনও শুধুমাত্র সিজ্দায় গিয়ে কখনও শুধু দণ্ডায়মান থেকে এবং কখনও সামনের দিকে ঝুঁকে মাথা নত করে প্রার্থনা করে থাকে।

হযরত মূসার সময়কালে এবং পরবর্তীতে প্রার্থনা বা সালাত ছিল স্বতঃস্ফূর্ত যখনই একজন মানুষ আল্লাহ্‌র কাছে কোন কিছুর জন্য আবেদন করতে চাইত অথবা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাইত সে তখন নিজের গৃহে নিজের মত করে অর্থাৎ নিজস্ব বাণীভঙ্গিতে প্রার্থনা উচ্চারণ করত। কিন্তু যখন সমাজে অথবা দেশে কোন দুঃসময়ের সম্ভাবনা দেখা দিত, তখন সে মন্দিরে যেত একটি উপাসনালয় অর্থে 'মন্দির' শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রার্থনার জন্য বিধিবদ্ধ কোন বাণী ক্রমশ যখন লিখিত হল, তখন সেগুলো বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রার্থনার বাণী হিসেবে সম্মিলিত কণ্ঠে উচ্চারিত হত। হযরত মূসার সময়কালে প্রার্থনা বা সালাতের কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম ছিল না। তওরাতে এ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট নির্দেশ নেই। অনেক পরে ইয়াহূদী পণ্ডিতরা সমবেত হয়ে সালাতের কিছু নিয়ম প্রবর্তন করেন। ইসলামের সালাত যেমন বিশেষ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়, ইয়াহূদীদের মধ্যে সে রকম ছিল না। মুসলমানরা সালাতে প্রথম আল্লাহ্‌র গুণগান করেন এবং বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ইয়াহূদীরা সে ক্ষেত্রে তাদের সালাতে পরপর তিন ধরনের পাঠ বা উচ্চারণের ব্যবস্থা রেখেছিল। প্রথম ভাগটা ছিল পিতা-পিতামহদের প্রশংসা করা; দ্বিতীয় ভাগ ছিল মহান প্রভু আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ ক্ষমতা সম্পর্কে কিছু বলা, যে ক্ষমতা বলে কিয়ামতের দিন সকল মৃতকে তিনি জাগরিত করবেন এবং সর্বশেষ পর্যায়টা হচ্ছে ইমাম বা ধর্মনেতার প্রশংসা করা। কখনও কখনও তারা পৃথিবীতে জীবন প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত আবার কখনও কখনও পৃথিবীতে শান্তির জন্য প্রার্থনা করত, যাকে হিব্রুতে বলা হয় 'শালোম'। আরও পরে সালাতের জন্য সময়কাল নির্দিষ্ট হল। একটি প্রার্থনার সময় নির্দিষ্ট হল সকাল বেলা। আরেকটি প্রার্থনার সময় নির্দিষ্ট হল সন্ধে বেলা। সন্ধে বেলার প্রার্থনার সময়কে বলা হল 'মারিভ।' এই মারিভ সময়টি আমাদের মাগরিবের সময়ের মত নির্দিষ্ট ছিল না। এটা ছিল বিস্তারিত সন্ধ্যা থেকে রাত্রির যে কোন সময়। কিন্তু এই সকাল ও সন্ধ্যার প্রার্থনা দুটি একান্তই করণীয় যে ছিল, তা নয়। যারা ইচ্ছে করত, তারা করতে পারত। কিন্তু এ নিয়ে ইয়াহূদীদের মধ্যে বিতর্ক ছিল এবং এখনও আছে। কোন কোন 'রাবী' এ দুটি প্রার্থনাকে বাধ্যবাধকতার অধীন বলেছেন, আবার কেউ কেউ ঐচ্ছিক বলেছেন। সমাবেশগত প্রার্থনা বা সালাত—সেটির জন্ম হয় আরও অনেক পরে। যেখানে ইয়াহূদী বসতি আছে, সেখানকার প্রাপ্তবয়স্ক ইয়াহূদীরা সমাজভুক্ত সকল মানুষের কল্যাণের

জন্য উপাসনালয়ে সমবেত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ঠিক কোন সময় সমবেত প্রার্থনার নিয়মটি গড়ে ওঠে, তা আমরা জানি না। যাই হোক, ইয়াহূদী ভাষায় তারা এটাকে বলে 'প্রকাশ্য প্রার্থনা'। এই প্রার্থনাটি উপাসনালয়ে অনুষ্ঠানের নিয়ম প্রবর্তিত হয়। কতজন লোক হলে সমবেত প্রার্থনা হতে পারে, সেটা নিয়ে ইয়াহূদীদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক ছিল। কিন্তু বর্তমানে আমরা জানি যে দশ জন লোক হলে সমবেত প্রার্থনা আরম্ভ হতে পারে। ইয়াহূদীদের 'সিনাগগ' বা উপাসনালয় মাদ্রাসা হিসেবে ব্যবহৃত হত, এখনও হয়। হিব্রু ভাষায় একে বলা হয় 'মিদরাস'। ইয়াহূদীরা কোন দিকে মুখ করে প্রার্থনা করে? জেরুজালেমে ইয়াহূদীরা প্রথম উপাসনালয় যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেদিকেই মুখ করে তারা প্রার্থনা করে। এ নিয়ম বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ইয়াহূদীরা জেরুজালেমের প্রথম ইয়াহূদী উপাসনালয়ের দিকে মুখ করে প্রার্থনা সমাধা করে থাকে। এক সময় মুসলমানরাও জেরুজালেমের বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়ত। পরে কিবলার পরিবর্তন হয় এবং এখন মুসলমানরা মক্কায় কাবা-গৃহের দিকে মুখ করে নামায পড়ে থাকে।

আমি কিছুটা বিস্তারিতভাবে ইয়াহূদীদের সালাত সম্পর্কে বললাম মুসলমানদের সালাতের সঙ্গে তার পার্থক্য বুঝাবার জন্য। ইসলামে সালাত এসেছে আল্লাহ্‌র নির্দেশে। শবে মি'রাজে মুসলমানদের জন্য সালাত ফরয করা হয়। হযরত আনাস ইবনে মালিক হযরত আবূ যরের মাধ্যমে শুনেছিলেন যে হযরত রাসূলে খোদা মি'রাজের রাত্রিতে জিবরীলের সঙ্গে যখন ঊর্ধ্বলোকে যান, তখন আকাশসমূহে আদম, ইদরীস, মূসা, ঈসা এবং ইবরাহীমের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন। মহানবী নিকটবর্তী আকাশে আদমকে দেখেছিলেন এবং ইবরাহীমকে ষষ্ঠ আকাশে দেখেছিলেন, জিবরীল রাসূলকে নিয়ে ইদরীসের নিকট পৌঁছালে তিনি বললেন যে, খোশ আমদেদ হে পুণ্যবান নবী! হে পুণ্যবান ভ্রাতা! রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? জিবরীল জানালেন ইনি ইদরীস। এভাবে মূসা, ঈসা এবং ইব্‌রাহীমের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হল এবং আরও ঊর্ধ্বলোকে তিনি আল্লাহ্‌র দিদার লাভ করলেন এবং সেখানে তিনি উম্মতের জন্য পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের নির্দেশ পেলেন। এরপর হযরত আনাস রাসূলে খোদার যবানীতে মি'রাজের বর্ণনাটি দিয়েছেন ঃ "ফেরার সময় আমি মূসার নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন, আপনার উম্মতের ওপর আল্লাহ্‌ কি ফরয করেছেন? আমি জানালাম, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায। তিনি বললেন, আপনার রবের নিকট ফিরে যান। কেননা আপনার উম্মত এত নামায আদায় করতে সক্ষম হবে না। আমি ফিরে গেলাম। আল্লাহ্‌ কিছু অংশ কম করে দিলেন। তারপর আবার মূসা (আ)-এর নিকট ফিরে এসে বললাম, কিছু কম করে দিয়েছেন। তিনি পুনরায় বললেন, আবার যান। কেননা

আপনার উম্মত তা আদায় করতে পারবে না। আমি আবার ফিরে গেলাম। আল্লাহ্ আবার কিছু মাফ করে দিলেন। আমি আবার তাঁর নিকট ফিরে আসলে তিনি বললেন, আবার যান। কেননা আপনার উম্মত এও আদায় করতে সক্ষম হবে না। আমি আবার গেলাম। আল্লাহ্ বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত, এটিই (আসলে সওয়াবের দিক থেকে) পঞ্চাশ (ওয়াক্তের সমান) আমার কথার পরিবর্তন হয় না। আমি আবার মূসার নিকটে আসলে তিনি আবার বললেন, আবার ফিরে যান। আমি বললাম, আমার যেতে লজ্জা করছে। তারপর আমাকে 'সিদরাতুল মুনতাহা'য় নিয়ে যাওয়া হল। তা রঙে ঢাকা ছিল। অবশেষে আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করান হল। আমি দেখি সেখানে মুক্তার হার এবং সেখানকার মাটি কস্তুরী।"

আরবী ভাষায় সালাতের অর্থ হচ্ছে প্রার্থনা। আরবী ভাষায় কবিদের কবিতায় এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। কিন্তু ইসলামের সালাতের অর্থ দাঁড়িয়েছে রুকু, সিজ্দা এবং অন্যান্য নির্দিষ্ট কতকগুলো কার্যের নাম যা নির্দিষ্ট সময়ে কতকগুলো নির্দিষ্ট শর্ত, সিফাত ও পদ্ধতির মাধ্যমে পালিত হয়। ইমাম ইবনে জাবির (রা) বলেছেন ঃ "সালাতের মাধ্যমে একজন মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট স্বীয় কার্যের জন্য পুণ্য প্রার্থনা করে এবং তার নিকট নিজস্ব প্রয়োজন যাচ্ঞা করে। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শরীফে বলেছেন, 'ইন্নাস সালাতা তানহা 'আনিল্ ফাহ্শাই ওয়াল মুনকার।' অর্থাৎ নিশ্চয়ই সালাত নির্লজ্জতা ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে।

প্রক্রিয়াগত এবং পদ্ধতিগত দিক থেকে নামাযের যে বৈশিষ্ট্য, তা অন্য কোন ধর্মের সাধন পদ্ধতির সঙ্গে মেলে না। নামাযের প্রক্রিয়াটি অনন্যসাধারণ। মানুষের শরীরের বিভিন্ন বিভাজনকে পূর্ণভাবে ব্যবহার করার মধ্যেই নামাযের সিদ্ধি। নামাযে দণ্ডায়মান হওয়া আছে, আনত হওয়া আছে, আসীন হওয়ার ব্যবস্থা আছে এবং সিজদার ব্যবস্থা আছে। এ ব্যবস্থাগুলো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত এবং সমন্বিত। এভাবে নামাযের একটি পূর্ণতা বোধ ও সমগ্রতা আমরা লক্ষ্য করি। ইয়াহূদীদের মধ্যে সাধনার বা প্রার্থনার সমন্বিত কোন পদ্ধতি নেই। সেখানে সালাতের প্রধান নিয়ম ছিল শিরোদেশ নত করা। এ ছাড়া আসীন অবস্থায় এবং শুধুমাত্র আসীন অবস্থায়ই কেউ কেউ তাদের সালাত সম্পূর্ণ করতে পারে, তাতে দোষ হয় না। অথবা শুধু দণ্ডায়মান থেকে তারা তাদের প্রার্থনা শেষ করতে পারে। কিন্তু এগুলো পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। ইয়াহূদী 'সিনাগগে' অর্থাৎ উপাসনা-গৃহে সম্মিলিত বা জামাতে উপাসনার বিধান আছে। সিনাগগের ভিতর জেরুজালেমের দিক মুখ করে কাতার-বন্দী হয়ে উপাসকরা দাঁড়াবে এবং তাদের সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একজন রাবী বা ইমাম তাওরাত থেকে পাঠ করবেন।

এটাই তাদের সম্মিলিত প্রার্থনা। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ইয়াহুদীদের প্রার্থনার মধ্যে নানাবিধ পদ্ধতি আছে এবং একক অবশ্য করণীয় কোন পদ্ধতি নেই। ইয়াহুদীদের 'তালমুদে' বলা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ) আমলের পর ইয়াহুদীরা নানাবিধ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। তারা জেরুজালেম থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল। অবশেষে অনেক পরে জেরুজালেমে ইয়াহুদীরা যখন সংঘবদ্ধ হল তখন তারা নতুন করে তাদের উপাসনা পদ্ধতি তৈরী করল। কেননা হযরত মূসা (আ)-এর আমলের আদি উপাসনা পদ্ধতি তারা ততদিনে হারিয়ে ফেলেছিল।

ইসলামে সালাত হচ্ছে ইবাদতের প্রথম পর্যায়। এটা এমন একটি পর্যায় যা সকল প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হয়। সম্রাট বা রাষ্ট্রপ্রধান, ধনী-দরিদ্র, যুবক এবং বৃদ্ধ, পুরুষ ও নারী সুস্থ এবং অসুস্থ সকলের উপর সালাত অবশ্য পালনীয় এবং সমভাবে পালনীয়। কোন অবস্থায়ই সালাত থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানের মুক্তি নেই। যদি কেউ দণ্ডায়মান অবস্থা থেকে সালাত আদায় না করতে পারে, তা হলে সে বসে আদায় করবে। আবার কেউ যদি অসুস্থতা এবং শারীরিক বিকলতার জন্য বসে সালাত আদায় করতে অসমর্থ হয়, তা হলে সে শায়িত অবস্থায় ইশারায় আদায় করবে। (যারা উট বা ঘোড়ার পৃষ্ঠে আরোহণ করে চলমান অবস্থায় থাকে, সেই চলমান অবস্থাতেই যেদিকেই তার গমনের পথ, সেদিকেই মুখ করে সালাত আদায় করতে হবে। বর্তমানকালে যে সমস্ত যানবাহন আমরা ব্যবহার করি, সেগুলোর ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য।) ফারসীতে সালাত শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। সেখানে সালাতের পরিবর্তে 'নামায' শব্দটি ব্যবহৃত হয। কিন্তু 'সালাত' শব্দটির ব্যঞ্জনা যত গভীর এবং ব্যাপক 'নামায' শব্দটির ব্যঞ্জনা ততটা নয়। কিন্তু দীর্ঘকাল নামায শব্দটির ব্যবহারের ফলে সালাতের প্রতিশব্দ নামায আমাদের ভাষায় গ্রাহ্য হয়ে গেছে। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ "ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়ায়িয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।" এর অর্থ হচ্ছে ঃ অবশ্য আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই নিবেদিত। এর অর্থ হচ্ছে ঃ সালাত সত্যিকারভাবে আল্লাহ্‌র জন্যই হতে হবে। সকল ধর্মের প্রার্থনাই বিশ্বপ্রভুর জন্য। কিন্তু ইসলামের সালাত সম্পূর্ণভাবে বিশ্বপ্রভুর জন্য। ইয়াহুদীদের প্রার্থনার মধ্যে কয়েকটি অংশ আছে, যেগুলোর মধ্যে পার্থিব কল্যাণ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। হিন্দুদেরও তাই। মনে রাখতে হবে, সালাতের শেষে আমরা যে মুনাজাত করি, সেটা কিন্তু সালাতের অংশ নয়। মুনাজাতে অবশ্য পার্থিব কল্যাণের জন্য আমরা আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করতে পারি। সামগ্রিকভাবে সালাত হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ। সূরা আনকাবূতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ "এবং সালাত কায়েম কর;

অবশ্যই সালাত লজ্জাহীনতা এবং গর্হিত কাজ হতে বিরত রাখে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণই সর্বোত্তম বস্তু।"

হযরত আদম থেকে শুরু করে সকল পয়গম্বরদের সময়ে আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের রীতি ছিল। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন ছিল আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে জীবন রক্ষার সকল উপকরণ প্রাপ্তির জন্য। সে সমস্ত প্রার্থনার প্রক্রিয়াগত দিকটি আমরা জানি না। শুধু ইয়াহূদীদের প্রার্থনার রীতিটা আমাদের জানা আছে। ইয়াহূদীরা হযরত মূসার উপাসনার ধারা অনুসরণ করে তাদের উপাসনার পদ্ধতি তৈরি করেছে। মহান প্রভু আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশিত ইবাদতের পদ্ধতি বা সালাত পূর্ণতা পেল ইসলামে এসে এবং রাসূলে খোদার সময়ে নামাযের যে রীতি প্রকরণ আল্লাহ্‌র নির্দেশে গড়ে উঠেছিল, আজ পর্যন্ত সে রীতি প্রকরণ বিদ্যমান আছে। সুদীর্ঘ কালের মধ্যে এর কোন পরিবর্তন ঘটেনি। সালাতের মাধ্যমে আমরা ইবাদতের একটি সমগ্রতা, একটি পরিপূর্ণতা এবং একটি পরিচ্ছন্নতাকে পাই যা শুধু এক সময়ের নয়, সকল সময়ের। রাসূলে খোদা সালাতের পূর্ণতা বিষয়ে অনেকগুলো নির্দেশ রেখে গেছেন। এ পূর্ণতা হচ্ছে সালাতগত প্রক্রিয়ার মধ্যে শরীরের সকল অঙ্গের পূর্ণ ব্যবহার। এ ব্যবহারটা পূর্ণ না হলে সালাত সম্পূর্ণ হয় না। মুজাদ্দেদে আলফে সানী তাঁর একটি মকতূবে লিখেছেন ঃ "সত্য সংবাদদাতা রাসূলে করীম মন্তব্য করেছেন, 'সর্ববৃহৎ তস্কর ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় নামাযের মধ্য থেকে চুরি করে।' নিকটে সাহাবা যাঁরা ছিলেন, তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, সে তার নামাযের মধ্য থেকে কিভাবে চুরি করবে? তদুত্তরে রাসূল বললেন, 'সে নামাযের রুকু ও সিজ্‌দা পূর্ণ করে না।' রাসূল আরও বলেছেন, 'আল্লাহ্ পাক সেই বান্দার নামাযের প্রতি লক্ষ্য করেন না, যে নামায আদায়ের সময় তার রুকূ এবং সিজ্‌দার মধ্যে স্বীয় পৃষ্ঠদেশ সমতল রাখে না।' একবার তিনি এক ব্যক্তিকে নামায আদায় করতে দেখলেন যে পূর্ণরূপে রুকু-সিজ্‌দা করছিল না। তিনি তাকে বললেন, 'তুমি কি ভয় কর না যে, এ অবস্থায় তোমার মৃত্যু হলে অন্য ধর্মে তোমার মৃত্যু হবে, ইসলামে নয়?' অন্য একটি উপলক্ষে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "তোমাদের কারও নামায পূর্ণ হবে না যে পর্যন্ত না তোমরা রুকুর পর পূর্ণরূপে দণ্ডায়মান হয়ে স্বীয় পৃষ্ঠদেশ সোজা না কর এবং তোমাদের প্রত্যেকের অঙ্গ সে সময় স্বীয় স্থানে অবস্থান না করে।' অতএব নামায পূর্ণভাবে পালন করতে হলে তার আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগুলো সুষ্ঠভাবে ও পূর্ণরূপে করা আবশ্যক।"

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নামায বা সালাত একজন মানুষের শরীরগত প্রক্রিয়াজাত এমন একটি পদ্ধতি যা মানুষকে সালাত আদায়ের মুহূর্তে বহির্বিশ্বের কার্যক্রমের চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখে এবং একটি অন্তর্লীন বোধের মধ্যে

সালাত আদায়কারীকে প্রতিষ্ঠিত করে। আমাদের দেহ নানা অবয়বযুক্ত হলেও মূলত এক বা অখণ্ড। হস্তপদ-মস্তকাদি নানা অঙ্গ ভেদে বহুরূপ বিশিষ্ট এ দেহে আমাদের এক ভেবে যেমন পালন করতে হয়, তেমনি নামায বা সালাতের সময় সকল অঙ্গের বিশিষ্টার্থক সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে আমরা একটি অভিন্ন একাগ্রতা নির্মাণ করি। এখানেই যথার্থ সুখ। সংসারে আমরা হস্তপদ সঞ্চালন করেই সুখ বা দুঃখের মধ্যে বাস করি। আমরা স্থির হয়ে সর্বসময়ের জন্য অবস্থান করলে অসুস্থ হয়ে পড়ি। দেহের পুষ্টির জন্য দেহের সর্বত্র সমানভাবে রক্তকণিকা প্রবাহিত রাখতে হবে। তেমনি নামাযের সময় দেহের বিবিধ বিভঙ্গ একান্ত প্রয়োজন। সালাতের মুহূর্তে একজন সালাত আদায়কারী তার 'আমি'কে একান্তভাবে ধরে রাখে না। তাকে এই 'আমি' কিছুক্ষণের জন্য পরিত্যাগ করতে হয়, কেননা সালাত হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য। দাহকে ত্যাগ করতে হলে অগ্নিকে ত্যাগ করতে হয়, তেমনি পার্থিব কর্মের আকর্ষণ ও স্মরণ ত্যাগ করতে হলে আমি ত্যাগ করতে হয়। মানুষের মধ্যে সাধারণভাবে দুই ধরনের প্রবৃত্তিগত মানুষ পাওয়া যায়—স্বার্থাকাঙ্ক্ষী এবং পরার্থকারী। যারা স্বার্থাকাঙ্ক্ষী, তারা কখনই সালাত আদায় করার মুহূর্তে একাগ্র হতে পারবে না। অনেক সময় দেখা যায়, অনেক মানুষ রুকু-সিজ্‌দা শেষ করে তাদের কর্মক্ষেত্রে ছুটে যাচ্ছে। এসব মানুষের কাছে নামাযটি একটি প্রথামাত্র। সে জন্যই রাসূলে খোদা (সা) আদেশ দিয়েছেন যে নামাযের মধ্য থেকে নামাযের প্রকরণগুলো চুরি করবে না। নামাযে সামগ্রিক একাগ্রতা বিধানের জন্য একথা বলা হয়েছে।

বর্তমানকালে অনেক আধুনিক মানুষ সংশয় প্রকাশ করেন যে, নামাযের রুকনগুলো অনুসরণ করতে গেলে একাগ্রতা কি ভঙ্গ হয়ে যায় না? এ প্রশ্নটি হাস্যকর। তার কারণ নামাযের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রতি আমাদের একটি দায়িত্ব পালন করা; সে কারণে পৃথিবীর কর্মকাণ্ড বিস্মৃত হয়ে আল্লাহ্‌র পথে একাগ্র হওয়া। যেহেতু নামাযের বিভিন্ন অবস্থানে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ আমাদের করতে হয়, সুতরাং নামায সম্পাদনের মধ্যে বাইরের চিন্তা মনে আসার সুযোগ খুব কম। বিশেষ পদ্ধতিগত ও প্রক্রিয়াগত কারণেই একজন নামায আদায়কারী বহির্বিশ্বের চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে বাধ্য হয়। শুধু একই অবস্থানের সাধনের জন্য অন্যান্য ধর্মের সাধু-সন্যাসীকে নিভৃতলোক অনুসন্ধান করতে হয় এবং এই নিভৃতলোক সন্ধানের জন্য কেউ বনে যান। কেউ পাহাড়ের নির্জন গুহা সন্ধান করে নেন এবং সে কারণেই অন্যান্য ধর্মে যখন উপাসনালয় নির্মাণ করা হয় তখন সেগুলো এমনভাবে নির্মিত হয় যে, পৃথিবীর আলো-বাতাস-শব্দ যেন তার মধ্যে প্রবেশ না করে। উপাসনালয়গুলোকে তারা কর্মব্যস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে তৈরী করে থাকে। অন্যপক্ষে ইসলামের মসজিদ জনারণ্যের মধ্যে

স্থাপিত এবং কখনও জনবসতির বাইরে নয়। তা ছাড়া মসজিদের গঠন-কৌশলটি এমন যাতে বাইরের আলো বাতাস প্রবাহিত হতে পারে। ইসলামের মসজিদ এমনভাবে নির্মিত যে তার কিছু আবরিত, আবার একটি বিরাট অংশ উন্মুক্ত যেখানে উর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করলে আকাশ দেখা যায়। মসজিদের এই নির্মিত পৃথিবীর সকল স্থপতিকে বিস্মিত করেছে এবং অনেককে উদ্বুদ্ধও করেছে। ইসলামে সালাতটি কোন নির্জন সাধনা নয়, বরং সর্বসমক্ষে আল্লাহ্‌র প্রতি বান্দার কর্তব্য পালন।

সালাত হচ্ছে একটি ইবাদত। ইবাদত শব্দটা অত্যন্ত ব্যাপক। বাংলায় ব্যাখ্যা করতে গেলে বলতে হয় আত্মসমর্পণ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ। যে মুহূর্তে একজন মানুষ আত্মসমর্পণ করছে, ধরে নিতে হবে যে সে মুহূর্ত থেকে সে মহান আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ এবং নির্দেশ অনুসারে জীবন পরিচালনা করছে। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা যারিয়াতে বলছেন ঃ "ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়া'বুদূন" অর্থাৎ আমি সৃষ্টি করেছি জীন এবং ইনসানকে এজন্যই যে তারা আমারই ইবাদত করবে। (কুরআন শরীফ ঃ ৫১ ঃ ৫৬) অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ "তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং কোন কিছুকে তাঁর শরীক করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্থ, নিকট ও দূর, প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।" (কুরআন শরীফ ঃ ৪ ঃ ৩৬)। এ আয়াতের দ্বারা ইবাদতের ব্যাপকতা বোঝা যায়। সালাত একটি ইবাদত, কিন্তু সে সঙ্গে দরিদ্র, অভাবী, বিপদগ্রস্থকে সাহায্য করা, ক্ষুধার্তকে খাবার দেয়া, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেয়া, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেয়া এবং মযলূমকে যালিমের অত্যাচার থেকে রক্ষা করা এগুলোও ইবাদত এবং এ কাজ একজন মুসলমান যে করবে, তা কখনই দুনিয়াদারীর স্বার্থে করবে না, করবে একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্যে। সুতরাং আমরা সুস্পষ্টভাবে একটি ইঙ্গিত পাচ্ছি যে, সালাত আমাদের অবশ্যই পালন করতে হবে, কিন্তু শুধু সালাতই ইবাদতের পূর্ণতা নয়। ইবাদতের পূর্ণতা হচ্ছে যখন আমরা নাফসানিয়াত বা প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত থাকব এবং আমাদের চিন্তা, কর্ম এবং আচরণ ইত্যাদি সমস্ত কিছু একমাত্র মহান প্রভু আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মত পরিচালনা করব, তখনই আমাদের ইবাদত সম্পূর্ণ হবে এবং আমাদের সালাত আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ করবেন।

সালাত শুধুমাত্র আনুষঙ্গিকতা পালনের মধ্যেই বর্তমানে সীমাবদ্ধ নয়; তার সঙ্গে আরও প্রার্থনারীতি যুক্ত হয়েছে। এগুলোর প্রথমটি হচ্ছে ঃ দু'আ যা আমরা নামাযের শেষে দু'হাত উর্ধ্বে তুলে পাঠ করে থাকি। এটা সালাতের মূল অংশ

নয়। কিন্তু এটা বিধিবদ্ধভাবে পালন করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সমস্বরে মুনাজাত বা কুরআন শরীফের কোন অংশ পাঠ। এটাকে ইংরেজীতে 'লিটানী' বলা হয়ে থাকে। ইয়াহূদীদের প্রার্থনা গৃহে এবং খ্রীস্টানদের গীর্জায় লিটানী পরিচালিত হয়। আরেকটি করণীয় বিষয় হচ্ছে যিকির। যিকির হচ্ছে আল্লাহ্‌র কাছে আত্মনিবেদনের একটি বিশেষ পদ্ধতি। কিন্তু এটাও অনেক সময় অনেকে নামাযের পর একটি করণীয় হিসেবে করে থাকে। কিন্তু একান্ত পালনীয় কিছু নয়। তবে মনে রাখতে হবে যে সালাতের অনুষঙ্গে এগুলো এসেছে মাত্র; কিন্তু সালাতের অংশ হিসেবে এগুলো কোন করণীয় নয়। সালাত হচ্ছে সর্বোত্তম ইবাদত। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন ঃ "আমি আল্লাহ্ এবং আমি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই। অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর।" (কুরআন শরীফ ঃ ২০ ঃ ১৪)

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন পয়গম্বরগণের আমল অতিক্রম করে পূর্ণাঙ্গ ইসলামে এসে সালাত পূর্ণতা পেয়েছে। সালাত এখন সামগ্রিকভাবে এবং চূড়ান্তরূপে বিধিবদ্ধ এবং পদ্ধতিগত দিক থেকে এর কোন পরিবর্তন নেই।

সহায়ক গ্রন্থাদি

১. **কুরআন শরীফ** ঃ সালাত সংক্রান্ত প্রবন্ধটির লিখবার সময় আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত অনুবাদ আল-কুরআনুল করীম পরীক্ষা করেছি এবং কিছু সংখ্যক অনুবাদ ব্যবহার করেছি। দু-এক ক্ষেত্রে মুহাম্মদ আসাদকৃত ইংরেজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা "The Message of the Quran"—এরও সহায়তা নিয়েছি।

২. **তফসীর ইবনে কাসীর** ঃ সালাত সংক্রান্ত বিষয়ের তাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের জন্য, তফসীরটি আমার বিশেষ উপকারে এসেছে। হাফেয ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর কৃত তাফসীরের বাংলা অনুবাদ করেছেন ডক্টর মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান। প্রকাশক তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, বাসা ৫৮, সড়ক ২৮, গুলশান, ঢাকা।

৩. **সহীহ আল-বুখারী** ঃ বুখারী শরীফের কিতাবুস সালাত অধ্যায়টি আমার যথেষ্ট প্রয়োজনে এসেছে। আমি অনুবাদের জন্য আধুনিক প্রকাশনী প্রকাশিত বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ড ব্যবহার করেছি।

৪. **'A Shi'ti Anthology** : Seyyed Hossein Nasr, Muhammadi Trust of Great Britain and Northern Ireland, 1980 গ্রন্থটির তৃতীয় অধ্যায় সালাত এবং মুনাজাত সংক্রান্ত। এ অংশটি আমার সাহায্যে এসেছে।

৫. 'The Essential Talmud' : Adin Steinsaltz : Basic Book, Harper Collins, 1976, গ্রন্থটির 'Prayers and Benediction' অধ্যায়টি আমার প্রয়োজনে এসেছে।

৬. মুজাদ্দেদ আলফেসানীর **'মকতূবাত'** সালাত সংক্রান্ত অনেক বিশ্লেষণ আছে। সে রকম একটি বিশ্লেষণ আমি আমার প্রবন্ধে গ্রহণ করেছি।

সালাত ও যাকাত এবং উহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক*

অধ্যাপক শাইখ আবদুর রহীম

সালাত ও যাকাত কাকে বলা হয় তা সকলেই জানেন ও বোঝেন। তবুও আলোচনার খাতিরে এ সম্পর্কে দুটো কথা বলতে হয়। আল্লাহ্ তা'আলার উপাসনা-আরাধনার যে বিশিষ্ট আকার ও রূপ ইসলামে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে তাকে বলা হয় সালাত। এই সালাতে দৈহিক ও বাচনিক কতকগুলো ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করতে হয়। আর ধন সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত খাতে ব্যয় করাকে বলা হয় যাকাত। ইসলামের এই অনুষ্ঠান দুটো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আজকের উদ্দেশ্য নয় বলে এতটুকুই বলেই ক্ষান্ত হলাম। আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সালাত ও যাকাতের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ। কাজেই এ দুটো বিধানের মূলে কি রহস্য রয়েছে তা আলোচনা করার প্রয়োজন আছে এবং তা খুঁজে দেখবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এই প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে মূল বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার আগে কয়েকটি ইসলামী তত্ত্বের ও সত্যের কথা বলতে হয়। তা হচ্ছে এই ঃ ইসলামে যাবতীয় সৃষ্টি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ সৃজনবাদ স্বীকৃত হয়েছে। মানুষ সম্বন্ধে এই সত্য ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম নর আদম ও প্রথম নারী হাওয়াকে প্রত্যক্ষভাবে পয়দা করেন। তাদের থেকে প্রজনন প্রক্রিয়া যোগে যাবতীয় মানুষকে পয়দা করে চলেছেন প্রত্যক্ষভাবে। এই প্রজনন ক্রিয়া যোগে সন্তান উৎপাদনের মালিকও স্বয়ং আল্লাহ্—পিতামাতা নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "বলো তো তোমরা যে গর্ভাশয়ের মধ্যে বীর্য নিক্ষেপ করে থাক তার ব্যাপার কি? তোমরাই কি উহা পয়দা করে থাক, না আমিই সৃজনকারী? (সূরা আল ওয়াকিআহ ৪৮ ঃ ৪৯) আবার বলো তো! তোমরা ক্ষেতে যে বীজ বুনে থাক তার ব্যাপার কি? তোমরা কি তা থেকে শস্য উৎপাদন করে থাক, না আমি শস্য উৎপাদনকারী (ঐ ঃ ৬৩-৬৪) তারপর বলো তো তোমরা যে পানি পান করে থাক তার ব্যাপার কি? তোমরাই কি তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমিই তা নামিয়ে থাকি? (ঐ ঃ ৬৮-৬৯)। কাজেই ইসলামী মতে সব মানুষই হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ মখলূক এবং আল্লাহ্ হচ্ছেন প্রত্যেকের মালিক। মানুষের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার এই মখলূক খালিকের সম্বন্ধের দরুন মানুষের পক্ষে আল্লাহ্ সম্পর্কে কতিপয় বিশ্বাস

---

* [প্রবন্ধটি ইফা পত্রিকা ১৯৭১ সন ১০ বর্ষ ২য় সংখ্যা থেকে সংগৃহীত]

ও কতিপয় ধারণা পোষণ করা এবং তাঁর উদ্দেশ্যে কতিপয় কার্য সম্পাদন করা অবধারিত হয়ে ওঠে।

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রকৃতির মধ্যে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করার প্রবৃত্তি অবিচ্ছেদ্যভাবে নিহিত করে রেখেছেন বলে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে অপর মানুষ সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ আচরণ ও ব্যবহার অবশ্য পালনীয় হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের এই দ্বিবিধ সম্পর্কের গুরুত্ব মানুষ যাতে যথাযোগ্যভাবে উপলব্ধি করতে পারে সেইজন্য আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদের অন্ততঃ পঞ্চাশ জায়গায় "আমানূ ওয়া আমিলুস সালিহাতে" বলে ঈমানের সঙ্গে সঙ্গে আমল সালিহ এর উল্লেখ করেন।

দ্বিতীয়ত ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামে যে সকল বিধান প্রবর্তন করেন তাঁর মধ্যে মানুষের ঐ দ্বিবিধ সম্পর্কের প্রতি যথোপযোগী লক্ষ্য ও দৃষ্টি রাখা হয়েছে। বৃহত্তর মানুষ গোষ্ঠীর পক্ষে অকল্যাণ বা অসুবিধাজনক কোন কিছুই ইসলামে প্রবর্তিত হয় নাই।

তারপর মানুষ বলতে কি বুঝায় সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে হয়। কোন কিছুর সত্তা বুঝাতে ও বুঝতে হ'লে তাকে কতকগুলো গুণের সমষ্টি রূপেই বুঝাতে ও বুঝতে হয়। গুণ বাদ দিয়ে কোন কিছু সম্বন্ধেই জ্ঞান লাভ সম্ভব হয় না—শুধু জ্ঞানই বলি কেন, কোন কিছুরই স্পষ্ট ধারণা জন্মে না। এই সূত্রটিকে দার্শনিক ও মুতাযিলীগণ আল্লাহ্ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার ব্যাপারে সাধারণ নীতি হিসাবে প্রয়োগ করার প্রয়াস পান। এর বিরুদ্ধে আমার বলবার কিছু নেই;. তবে তারা এই নীতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বিভ্রান্তি উৎপাদন করেন। বিষয়টি আজকের আলোচ্য নয় বলে এখানেই ক্ষান্ত হলাম। যা হোক আমার বক্তব্য এই যে নৈয়ায়িক ও যান্‌তিবীগণ মানুষের সত্তা বুঝাবার জন্য Man is rational animal "ইন্‌সান হাইওয়ানে নাতেক" ইত্যাদি প্রকার সংজ্ঞা দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারেন, এমন কি আত্মতৃপ্তিও লাভ করতে পারেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা সাধারণ লোকেরা তার মধ্যে মানুষ সম্পর্কে কোনই তথ্যের সন্ধান পাই না। মানুষ বলতে আমরা যা বুঝি তা হচ্ছে এই—তার বিশেষ আকারের একটা দেহ রয়েছে, বিশেষ ধরনের একটা প্রাণ রয়েছে, আরো রয়েছে বিবেক বুদ্ধি এবং সর্বোপরি তার রয়েছে এমন একটা অন্তর বা মন যার মধ্যে থাকে অনুভূতি ও উপলব্ধি। এতৎসঙ্গে দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিকদের মতে তার মধ্যে থাকে 'আত্মা' বা 'রূহ'। 'আত্মা' প্রসঙ্গে দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিকদের উল্লেখ এই জন্য যে আত্মার সঙ্গে বিবেক বুদ্ধি দিয়ে বুঝবার অথবা অভয় দিয়ে উপলব্ধি করবার মত ক্ষমতা আমাদের অসাধারণ লোকের নেই। আত্মার অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করে থাকি একেবারে চোখ-মুখ বন্ধ করে। এই কারণেই আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞাসার উত্তরে বলা হয়; "রূহ হচ্ছে-আল্লাহ্‌র অন্যতম পরিচালন বিশেষ; আর তোমাদের খুব

কমই 'ইল্‌ম' দেওয়া হয়েছে" (বনি ইসরাইল, ৮৫ আয়াত) অর্থাৎ রূহ সম্পর্কে মানুষের বিশেষ কোন জ্ঞান সম্ভব নয়। সে যাই হোক আল্লাহ্ খালিক ও মানুষ মখলুক। এর তাৎপর্য এই যে মানুষের দেহ, প্রাণ, বিবেক বুদ্ধি ও অন্তর এবং এইগুলির ক্রিয়াকলাপ সবের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ্ এবং একমাত্র আল্লাহ্ই।

মানুষের মৌলিক ও মানুষের সাথে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত গুণগুলো নিয়ে মানুষ গঠিত। ইল্‌ম, ধন-সম্পদ ইত্যাদির অধিকারী হওয়া মানুষের সত্তার অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলো হচ্ছে তার অর্জিত সহকারী পরোক্ষ গুণবিশেষ।

আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের এই খালিক-মখলূকের সম্পর্কের অভিব্যক্তি ও প্রকাশ কিভাবে করতে হবে তা আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন এই বলে—"আমি মানুষকে ও জিনকে আমার ইবাদত ও গোলামী করবার জন্যই পয়দা করেছি, তাছাড়া অন্য কোন কাজের জন্য নয়" (আয যারিয়াত ঃ ৫৬) অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে রাসূল, তোমার পূর্বে আমি যাকেই রাসূল করে পাঠিয়েছি তারই নিকটে আমি ওহী যোগে এই বাণী পৌঁছে দিয়েছি যে, আমি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই; কাজেই তোমরা আমার ইবাদত ও গোলামী কর" (আল-আম্বিয়া ঃ ২৫)। এ থেকে জানা গেল যে কায়মনবাক্যে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করাই হচ্ছে মানুষের একমাত্র কর্তব্য। তারপর এই ইবাদত ও গোলামীর স্বরূপ কি হবে তা আল্লাহ্ তা'আলা মোটামুটিভাবে এবং তাঁর রাসূল বিস্তারিতভাবে আমাদের জানিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ্ আল্লাহ্ তা'আলার গোলামীর এই কাজগুলোকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করেন। সেগুলো হচ্ছে ঈমান, সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ্জ।

মানুষের অন্তর ও মনের খালিক ও মালিক আল্লাহ্। কাজেই মানুষকে তার মনের মধ্যে আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন সব বিষয়ের বিশ্বাস রাখতে হবে যা আল্লাহ্ তা'আলার খালিক হওয়ার সাথে খাপ খায়। আবার মানুষ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার গোলাম। কাজেই আল্লাহ্ সম্পর্কে মানুষ তার মনের মধ্যে এমন কোন ধারণাকেই স্থান দিতে পারবে না যা তার গোলামীর পরিপন্থী হয়। এই হচ্ছে ঈমানের মূল মন্ত্র। ঈমান মুজমাল বলুন আর ঈমান মুফাস্‌সাল বলুন সবই হচ্ছে এরই ব্যাখ্যা। এই ঈমান হচ্ছে ইসলামের মূল। এই ঈমান যার মধ্যে আছে সেই মুসলিম এবং এই ঈমান যার মধ্যে নেই সে মুসলিম নয়।

তারপর সালাত ও যাকাতের কথা। ইসলামে এই অনুষ্ঠান দুটি ও আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে মানুষের গোলামী প্রকাশের প্রতীকরূপে প্রবর্তিত হয়েছে। সালাতে মানুষ মুখে আল্লাহ্‌র গোলামী স্বীকার করে, "হে আল্লাহ্ আমি একমাত্র তোমারই গোলামী করি এবং একমাত্র তোমারই কাছে আমার সকল প্রয়োজনে সাহায্য প্রার্থনা করি।" সে রুকুতে, বুকে, সিজদাতে মুখমণ্ডল ভূমিতে প্রণত করে দৈহিকভাবে গোলামী প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মুখে বলে, "আমার মহান রব সকল দোষ, সকল ত্রুটি সকল অপূর্ণতা থেকে কত মুক্ত!" সালাত সম্পাদনকারী যে কেবলমাত্র

বাহ্যতঃ মৌখিক ও দৈহিকভাবে গোলামী স্বীকার করেই ক্ষান্ত হয় তা নয় বরং সেই সঙ্গে তার অন্তরের মধ্যে আল্লাহ্র উদ্দেশে গোলামীর ভাব ও অবস্থা আনবারও চেষ্টা করে। এইভাবে সালাত হয়ে থাকে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে মানুষের গোলামীর পরিপূর্ণ ও চরম অভিব্যক্তি। এই দিকে ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহ্সানের ব্যাখ্যায় বলেন, তুমি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তোমার গোলামী চাক্ষুষ ও প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাচ্ছ। সালাত এর এই হাকিকত ও স্বরূপের কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক বিনা কারণে সালাত পরিত্যাগ করে সে কাফিরের কাজ করে।" সালাত পরিত্যাগকারীর উদাহরণ এইরূপ—মালিক তার যে গোলামকে ক্ষিধে পেলে খেতে দেন, কাপড় ছিড়লে কাপড় দেন এবং গোলামের যখন যা প্রয়োজন হয় সে চাইলেই, এমন কি না চাইলেও তাকে তাই দেন এবং সে গোলাম লোকের সামনে বলে বেড়ায় আমার প্রয়োজনীয় সব কিছুই যখন যা দরকার হয় আমার মালিক আমাকে দিয়ে থাকেন। তারপর ঐ গোলামকেই যখন তার মালিক বলে, "আমার কাছে এসে কিছুক্ষণ গোলামের মত দাঁড়াও, গোলামের মত বস, গোলামের মত কথা বল, গোলামের মত আচরণ কর; তাহলে মালিকের ঐ নির্দেশ অমান্যকারী গোলামই হচ্ছে সালাত পরিত্যাগকারীর উপমা। বস্তুতঃ মালিক আর কোন গোলামকে যেভাবে গোলামী প্রকাশ করতে নির্দেশ দেন সেই গোলাম যদি সেইভাবে গোলামী প্রকাশ করতে অলসতা বা কুণ্ঠা বোধ করে তবে ঐ মালিক ঐ গোলামকে কোনক্রমেই নিজের গোলাম বলে স্বীকার করে না। প্রকৃতপক্ষে ঐ গোলাম হয় নিজের প্রবৃত্তির গোলাম। এই কারণেই সালাত ত্যাগকারীকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ আখ্যা দেন। সালাত-এ মানুষের জন্মগত ব্যাপারগুলি সম্পর্কে গোলামীর ব্যবস্থা রয়েছে, তার অর্জিত বিষয়গুলি সম্পর্কে গোলামীর ব্যবস্থা সালাতে নেই। সেই অর্জিত বিষয়গুলি সম্পর্কে গোলামীর ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে যাকাতে। এটা সর্ববাদীসম্মত যে, গোলাম স্বয়ং যেমন তার মালিকের সম্পত্তি তেমনি সে যা কিছু অর্জন করে সে সব তার মালিকের সম্পত্তি। গোলাম গোলামই, সে মালিকের অনুমতি বা নির্দেশ ছাড়া কোন কিছুরই মালিকানা সত্ব লাভ করতে পারে না। মানুষের অর্জিত ধন-সম্পদ, জ্ঞান-বিদ্যা ইত্যাদির প্রতি এই নীতি প্রয়োগ করলে তাৎপর্য কি দাঁড়ায় তা দেখা যাক। আস্মান ও যমীনে যা কিছু আছে সবেরই মালিক আল্লাহ্। আল্লাহ্ তাঁর যে গোলামকে এ থেকে যা দেন সে তাই পায়। তার বেশীও পায় না তার কমও সে পায় না। মালিক যাকে যা দেওয়া বরাদ্দ করে রেখেছেন সে যাতে তা লাভ করতে পারে মালিক তারও ব্যবস্থা ও উপায় করে দেন। গোলাম মানুষ সেই ব্যবস্থা ও উপায় অবলম্বন করে তা অর্জন করে আর মনে করে যে, সে তার বুদ্ধি জ্ঞান, কৌশল ইত্যাদি দিয়ে ঐ সব অর্জন করলো।

ফলে ঐ গোলাম মানুষ তার অর্জিত সব কিছুর মালিক নিজেকেই জ্ঞান করে। ইসলামের দৃষ্টি ভংগিতে মানুষের এই ধারণা ভুল। ইসলামে সব কিছুরই মূল মালিক আল্লাহ্। তিনি তাঁর সম্পদের যা কিছু তাঁর কোন গোলামের অধিকারে ন্যস্ত করেন তার মালিক আল্লাহ্ই থাকেন এবং তার ঐ গোলাম মানুষ হয় ঐ সম্পদের তত্ত্বাবধানকারী খাজানচী মাত্র। মূল মালিক আল্লাহ্। তার নিজ সম্পদ থেকে যা কিছু তার যে খাজানচী মানুষের হাতে ন্যাস্ত করেন সেই খাজানচী মানুষ তা মূল মালিক আল্লাহ্র নির্দেশ মত ব্যয় করতে বাধ্য। মূল মালিক বড় দয়ালু রাহমানুর রাহীম। তিনি নির্দেশ দিলেন, তার গোলামের হাতে বেশ কিছু সম্পদ বেশ কিছু কালের জন্য জমা থাকলে ঐ সম্পদের সব নয়—সামান্য অংশ মাত্র কয়েক প্রকার লোককে নিঃস্বার্থভাবে দান করবার জন্য। একেই বলা হয় যাকাত। এই যাকাত হচ্ছে ফরয, অবশ্য পালনীয় কিন্তু শুধু যাকাতের সম্পদ দ্বারা সব সময়ে সব খুঁটিনাটি অভাব মেটানো সম্ভবপর হয় না। এই জন্য যাকাত ছাড়াও নফল দানের জন্য ইসলামে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

ইসলামী দৃষ্টিভংগি মতে মানুষ ও আল্লাহ্র মধ্যে গোলাম মালিকের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে সালাত ও যাকাতের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করলাম এবং সেই সংগে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের দিকেও ইংগিত করলাম। কুরআন মজীদে মানুষ ও আল্লাহ্র মধ্যে গোলাম মালিক সম্পর্ক ছাড়া আর একটি সম্পর্কেরও সন্ধান পাওয়া যায় তা হচ্ছে মহব্বত ও ভালবাসার সম্পর্ক—প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের সম্পর্ক। কুরআন মজীদের কোন কোন আয়াতে আল্লাহ্ নিজেকে মু'মিনদের বন্ধু বলে ঘোষণা করেছেন (আল বাকারা ঃ ২৫৮)। আবার কোন কোন আয়াতে মু'মিনদের নিজের বন্ধু বলে স্বীকার করেছেন (আন্ আনফাল ঃ ৩৪)। মানুষকে প্রেমিকের স্থানে এবং আল্লাহকে প্রেমাস্পদের স্থানে ধারণা করে ইসলামে রুকন পাঁচটির ব্যাখ্যা এইভাবে করা যায়। আল্লাহ্ সম্পর্কে ঈমান ও জ্ঞান মানুষের অন্তরে বদ্ধমূল হলে তার অন্তর স্বভাবতঃ আল্লাহ্র প্রতি অনুরাগ দেখা দেয়। পার্থিব অনুরাগের প্রথম অবস্থায় দুনিয়ায় প্রেমিক মাত্রেরই যে অবস্থা হয় আল্লাহের প্রেমিকের সেই অবস্থা প্রকাশ পায় সালাতের মধ্যে। অনুরাগের প্রথম অবস্থায় মানুষ প্রেমাস্পদের গুণপনা বর্ণনায় শতমুখ হয়ে ওঠে, তার হৃদয়গ্রাহী আলোচনা শুনতে ভালবাসে এবং সেখানেই সে আকুল আগ্রহে যোগ দিয়ে থাকে। এমনকি সে কখনো কখনো প্রেমাস্পদের নাম উচ্চারিত হতে শুনেই ভাবেও তন্ময় হয়ে ওঠে। সালাতেও প্রেমিক মানুষের সেই অবস্থা ঘটে। সে আল্লাহ্র গুণপনা বর্ণনায় আত্মহারা হয়ে ওঠে; ভাবে বিভোর ও বিহ্বল হয়ে তাকে সামনে উপস্থিত ভেবে তাঁর সামনে ঝুঁকে পড়ে, তাঁর সামনে ভূলুণ্ঠিত হয়ে নিজ প্রেম নিবেদন করে। এ করতে করতে তার মনে যখন এই ভাব জাগে যে সে তার প্রেমাস্পদের

অনুরাগ ও দৃষ্টি আকর্ষণে অক্ষম হয়ে গেলো তখন সে অনুরাগের দ্বিতীয় ধাপে পা রাখে। মানুষের পার্থিব অনুরাগের দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে প্রেমাস্পদের নিকট উপহার, সওগাত, উপঢৌকন পাঠান। তাই আল্লাহ্-প্রেমিক মানুষ তখন প্রেমাস্পদ আল্লাহ্র অনুরাগ ও ভালবাসা আকর্ষণের জন্য এই দ্বিতীয় উন্নততর পন্থা অবলম্বন করে এবং খুঁজে বেড়ায় কি ভাবে নিজ অর্থ ধন সম্পদ ব্যয় করলে তাঁর মন পাওয়া যাবে, তখন সে যাকাত দিতে এবং প্রেমাস্পদের অনুমোদিত সকল খাতে অর্থ ব্যয় করতে আরম্ভ করে। এই ভাবে আল্লাহ্র প্রেমিক মানুষের কার্যকলাপে যাকাত নিজ আধিপত্য বিস্তার করে বসে। এ করেও যখন তার মনে একথা জাগে যে, না, এতেও তো তার মন পাওয়া গেল না। তখন সে হতাশে বিদগ্ধ হয়ে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে এবং পানাহার সে ভুলেই যায়। তখন তার অবস্থা আধা পাগলের মত হয়ে ওঠে। ঘরে খাবার থাকতেও খায় না, শুলে ঘুম আসে না বলে রাত জেগে প্রেমাস্পদের গুণ গানে লিপ্ত হয়। আল্লাহ্র প্রেমিক মানুষ এমনি করে তৃতীয় ধাপে রমযানের সিয়াম পালনে এবং রমযানের রাত্রির কিয়াম পালনে আত্মনিয়োগ করে। এই কঠোর সাধনা ও তিতিক্ষায় সম্পূর্ণ একটি মাস অতিবাহিত করার পরে আল্লাহ্র প্রেমিক যখন উপলব্ধি করে যে, দুনিয়ার সব কিছু ছেড়ে ছুঁড়ে কেবলমাত্র তাঁরই শরণাপন্ন না হলে তাঁর কৃপা দৃষ্টি লাভ করা সম্ভব নয় তখন দুনিয়ার সাধারণ প্রেমিক মানুষ শেষ অবলম্বন হিসাবে যা করে থাকে তাই করতে মানুষ অগ্রসর হয়। মানুষ যেমন সবশেষে প্রেমাস্পদের দুয়ারে গিয়ে মাথা কুটে মরতে থাকে তেমনি আল্লাহ্র প্রেমিক মানুষ আল্লাহের দুয়ারে গিয়ে তাই করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে। মক্কার কা'বা ঘরকে আল্লাহের ঘর বলা হয়। তখন আল্লাহের প্রেমিক মানুষ প্রেমে উদভ্রান্ত হয়ে পাগলের বেশে একটি মাত্র সাদা খোলা লুঙ্গি খোলা মাথায় আল্লাহের ঘরের চার পাশে পাগলের মত বোঁ বোঁ করে ঘুরতে থাকে; একবার এ পাহাড়ে যায় আবার ও পাহাড়ে যায়, একবার এ মাঠে, একবার ও মাঠে দৌড়াদৌড়ি করে আর সর্বত্রই চিৎকার করতে থাকে; খাদিম হাযির, খাদিম হাযির, হে আল্লাহ্ খাদিম হাযির, তুমিই যে আমার একমাত্র প্রেমাস্পদ। তোমার খিদমতে হাযির সকল প্রশংসার যোগ্য ও সকল সম্পদের মালিক তুমিই—রাজ ক্ষমতাও তোমারই। তুমিই আমার একমাত্র প্রেমাস্পদ।

কুরআন মজীদের যে ৩৬টি আয়াতে সালাত ও যাকাতের এরূপ উল্লেখ করা হয়েছে তা তিনটি তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। প্রথম তালিকা ঃ একটি আয়াতে সালাত ও যাকাত শব্দযোগে সালাত ও যাকাতের আদেশ। দ্বিতীয় তালিকা ঃ ১৮টি আয়াতে সালাত ও যাকাত শব্দযোগে মু'মিনদের প্রশংসা, মু'মিনদের সফলতার উল্লেখ পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের নিজ উম্মাতদের নির্দেশ দানের উল্লেখ ইত্যাদি। তৃতীয় তালিকা ঃ ৯টি আয়াতে সালাত শব্দের সাথে যাকাত শব্দ ব্যবহার না করে বরং অন্য শব্দ যোগে যাকাতের উল্লেখ।

প্রথম তালিকায় যে ৯টি আয়াত পাওয়া যায় তন্মধ্যে ছয়টিতে রয়েছে, "সালাত যথাযথভাবে সম্পাদন কর এবং যাকাত দান কর।" (২ ঃ ৪৩, ৮৩, ১১০; ৪ ঃ ৭৭; ২৪ ঃ ৫৬; ৭৩ ঃ ২০) দুইটিতে রয়েছে (২২ ঃ ৭৮; ৫৮ ঃ ১৩) এবং একটিতে রয়েছে নবী (সা)-এর বিবিদের প্রতি আদেশ ঃ "হে নবীর বিবিগণ, তোমরা সালাত যথাযথভাবে সম্পাদন কর ও যাকাত দান কর (৩৩ ঃ ৩৩)।

দ্বিতীয় পর্যায়ে কমপক্ষে যে ১৮টি আয়াত পাওয়া যায় তার মধ্যে ১১টিতে মুমিনদের বিবরণ প্রসঙ্গে (২ ঃ ১৭৭, ২৭৭; ৪ ঃ ১৬২; ৫ ঃ ৫৫; ৯ ঃ ৭১; ২২ঃ ৪১; ২৩ ঃ ২-৪; ২৪ ঃ ৩৭; ২৭ ঃ ৩; ৩১ ঃ ৪; ৯৮ ঃ ৫); দুইটিতে কাফিরদের আক্রমণ করা হইতে বিরত হওয়ার শর্ত হিসাবে (৯ ঃ ৫, ১১;) একটিতে মসজিদের পরিচালন ভার প্রসঙ্গে (৯ ঃ ১৮;), একটিতে পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ দান সম্পর্কে (২১ ঃ ২৭); একটি মূসা (আ), কাওমকে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ দান প্রসঙ্গে (৫ ঃ ১২); একটিতে ঈসা (আ)-এর উক্তির মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ বর্ণনার মধ্যে (১৯ ঃ ৩১) এবং একটিতে ইসমাঈল (আ)-এর পরিবারের প্রতি ইসমাঈল (আ)এর নির্দেশ দানের মধ্যে (১৯ ঃ ৫৬) সালাত ও যাকাতের একত্র উল্লেখ রয়েছে।

তৃতীয় তালিকায় কমপক্ষে যে নয়টি আয়াত পাওয়া যায় তার মধ্যে যাকাত শব্দের পরিবর্তে 'ইউনফেকুন' চারটিতে (২ ঃ ৩); ৮ ঃ ৩; ২২ ঃ ৩৫, ৪২; ইউনফেকুন রয়েছে একটিতে (১৪ ঃ ৩১); 'ইউনফেকুন' রয়েছে দুইটিতে (১৩ ঃ ২২, ৩৫ ঃ ২৯); একটিতে রয়েছে নাতএমুল মিস্‌কিন (৭৫ ঃ ৪৪) এবং একটিতে রয়েছে 'ওয়াফি আমওয়ালিহিম' (৭০ ঃ ২৪)। এই ৩৬টি আয়াতে বিভিন্নভাবে সালাতের সঙ্গে যাকাতের উল্লেখ ছাড়া লিইউনফিক, ফালইউনফিক, ইউন্‌ফাকু ওয়ানফাকু তানফুকু প্রভৃতি শব্দযোগে আল্লাহের অনুমোদিত পথে যাকাত ও সকল দান খয়রাত দানের জন্য মু'মিনদের যেভাবে উৎসাহিত উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে তাতে যাকাতের গুরুত্ব চরমভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

গোলাম—মালিক ও প্রেমিক—প্রেমাস্পদের ভিত্তি ছাড়া আরও কয়েকভাবে যাকাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করা হয়ে থাকে। তা হচ্ছে মানুষের মনের অন্যতম কাল রোগ ধন-লিপ্সা ও কৃপণতার উচ্ছেদ ও বিনাশ সাধন করে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলির ভারসাম্য রক্ষা করা এবং বৃহত্তম মানুষ সমাজের কল্যাণ সাধন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য শাহ ওলীউল্লার 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' ২য় খণ্ড ৩০-৩১ পৃ: দ্রষ্টব্য। ইমাম গায্‌যালীর মতে যাকাত হচ্ছে আল্লাহের প্রতি মু'মিনের অনুরাগের পরীক্ষা। তিনি মানুষ আল্লাহের মধ্যে মহব্বত ও ভালবাসার উপর ভিত্তি করে যাকাত সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ইহ্‌য়াউল উলূম, মিসরীয় ছাপা ১৩২২ প্রথম খণ্ড ১৫৪ পৃঃ।

ইসলামিক একাডেমীর উদ্যোগে ১৮ই জুন, ১৯৬৭ ইং তারিখে একাডেমী সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সিমপোজিয়ামে পঠিত।

যাকাতের তাৎপর্য ও বিধান*

মুহাম্মদ মূসা

যাকাত ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম রুকন বা স্তম্ভ। আরবী শব্দ যাকা, য়ায্কূ, যাকাআ, যাকআ অর্থ বর্ধিত হওয়া, পরিশুদ্ধ করা বা হওয়া। অতএব যাকাত অর্থ পরিবৃদ্ধি, পরিশুদ্ধি, কোন জিনিসের উত্তম অংশ। কুরআন মজীদে শব্দটি বিভিন্ন গঠনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সূরায় ব্যবহৃত হয়েছে এবং তিনটি অর্থ প্রাধান্য পেয়েছে।

'তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহ না থাকলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতে (যাকা) পারত না, কিন্তু আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র (ইয়ুযাক্কী) করেন।' (২৪ ঃ ২১)। এ নিবন্ধে শব্দটি ইসলামী আইনের একটি বিশেষ পরিভাষা 'যাকাত' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সম্পদের যাকাত হিসেবে এই শব্দের মধ্যে উপরোক্ত সব অর্থই বিদ্যমান। যেমন যাকাতদাতার মালের মধ্যে যতটুকু পরিমাণ যাকাত আছে তার মালিক মূলত যাকাত পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তিগণ। অতএব সে তার মাল হতে অন্যের অংশ (যাকাত) পৃথক করে দিয়ে তাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করলো। যাকাত প্রদানের দ্বারা বাহ্যত মালের ঘাটতি হলেও পরিণামে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, পার্থিব জগতে এবং আখিরাতে তো অবশ্যই।

'আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমরা যে যাকাত প্রদান করে থাকো, তাই বৃদ্ধি পায়, ঐগুলোই সমৃদ্ধিশালী' (৩০ ঃ ৩৯)। "আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তার কোন নির্দিষ্ট মালের নির্ধারিত অংশের স্বত্ব অর্পণ করাকে যাকাত বলে" (ফিকহুল ইসলামী, ২খ, ৭৩০)। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির মালিকানাভুক্ত নিসাব পরিমাণ কোন নির্দিষ্ট মাল পূর্ণ এক চান্দ্র বৎসর তার মালিকানায় থাকার পর সে এর থেকে যে নির্দিষ্ট অংশ তার প্রাপকদেরকে প্রদান করে সেই নির্দিষ্ট অংশকে যাকাত বলে। আল্লামা ইয়ুসুফ আল-কারদাভী বলেন, 'শরীআতের দৃষ্টিতে যাকাত শব্দটি মানুষের ধন-সম্পদে আল্লাহ্ কর্তৃক ফরযকৃত সুনির্দিষ্ট অংশ' বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। যাকাত পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদেরকে ঐ ফরযকৃত সুনির্দিষ্ট অংশ প্রদান করাকেও যাকাত বলে'। (ইসলামের যাকাত বিধান, ১/৪৮)

---

* [প্রবন্ধটি ইফা পত্রিকা ১৯৯৬ সন ৩৬ বর্ষ ১ম সংখ্যা থেকে সংগৃহীত]

উপরোক্ত সংজ্ঞায় 'নির্দিষ্ট ব্যক্তি' হলো যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি, 'নির্দিষ্ট মাল' অর্থ যাকাত আরোপযোগ্য নিসাব পরিমাণ মাল, 'নির্ধারিত অংশ' অর্থাৎ নিসাব পরিমাণ মাল হতে যাকাত বাবদ বাধ্যতামূলকভাবে প্রদত্ত অংশ, 'স্বত্ব অর্পণ' অর্থ যাকাত বাবদ প্রদেয় অংশ যাকাত প্রাপকের মালিকানায় সোপর্দ করা।

যাকাত বাধ্যতামূলক

যাকাত ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম এবং মহান আল্লাহ্র ফরযকৃত একটি বাধ্যতামূলক দেয়। কুরআন মজীদে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিরাশি বার যাকাতের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

সূরা তাওবার ৬০ নং আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় যাকাত ফরয করা হয়েছে এবং তা ব্যয়ের খাতসমূহ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যদিও ইসলামের সূচনাকাল হতেই এর প্রচলন করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় হিজরীতে রোযা ফরয হওয়ার পর একই বছরের শাওয়াল মাসে যাকাত ফরয হয়েছে, তথাপি এর পূর্ণাংগ ও সুশৃংখল ব্যবস্থা মক্কা বিজয়ের পর ক্রমান্বয়ে গড়ে ওঠে। নবম হিজরীতে যাকাতের বিধান পূর্ণাংগরূপে কার্যকর করা হয়। কুরআন মজীদের বহু স্থানে বলা হয়েছে, "তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও।" মহানবী (সা) বলেন, 'ইসলামের মূল ভিত্তি পাঁচটি ঃ এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ্জ আদায় করা এবং রমযানের রোযা রাখা' (মিশকাত)। যাকাত ফরয সম্পর্কে আরো বহু হাদীস বিদ্যমান। নীচে তার কয়েকটি পেশ করা হল।

'আমাকে এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, আমি যেন মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে থাকি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত পরিশোধ করে।'

একবার হযরত জিবরীল (আ) মানুষের বেশে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! ইসলাম কি?' তিনি বলেন, 'ইসলাম এই যে, আপনি আল্লাহ্র ইবাদত করবেন এবং তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবেন না, বিধিবদ্ধ নামায কায়েম করবেন, বাধ্যতামূলক যাকাত পরিশোধ করবেন।' ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই) কলিমাসহ প্রেরণ করেছিলেন। লোকেরা তা গ্রহণ করলে পর তাদের প্রতি নামায ফরয করা হয়। তারা তাও পালন করতে থাকলে তাদের উপর রোযা ফরয করা হয়। তারা এটাও সত্যরূপে গ্রহণ করলে তাদের উপর যাকাত ফরয করা হয়।

অতএব যাকাত একটি বাধ্যতামূলক কর্তব্য এবং আর্থিক ইবাদত। কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যাকাত প্রদান না করলে তার নিকট হতে রাষ্ট্র তা বল প্রয়োগে আদায় করবে। যাকাত প্রদান না করা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। মহান আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা) যাকাত আদায়ের জন্য উৎসাহিত করেছেন এবং কৃপণতা বশতঃ তা পরিশোধ না করার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ "যারা স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্যদানা, যা সাতটি শীষ উদ্গত করে, প্রতিটি শীষে এক শত শস্যদানা। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। যারা স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে, অতঃপর যা ব্যয় করেছে তার কথা বলে বেড়ায় না এবং কষ্টও দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকটে আছে। তাদের কোন ভয় নাই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না" (২১ ঃ ২৬১-১)।

"তোমরা যে ধন-সম্পদ ব্যয় করো তা তোমাদের নিজেদের জন্য এবং তোমরা তো কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই ব্যয় করো। যে সম্পদ তোমরা ব্যয় করো তার পূর্ণ পুরস্কার তোমাদের দেয়া হবে, তোমাদের প্রতি অবিচার করা হবে না" (২ ঃ ২৭২)।

"যারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না" (২ ঃ ৯)।

"এবং যারা নামায কায়েমকারী, যাকাতদাতা এবং আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার, তাদের অচিরেই আমি মহাপুরস্কার দান করবো" (৪ ঃ ১৬২)।

"আর আমার দয়া তো প্রতিটি বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং আমি এটা তোমাদের জন্য নির্ধারিত করবো যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনাবলীতে ঈমান রাখে" (৭ ঃ ১৫৬)।

"আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্র পথে খরচ করে না, তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পাশ এবং পিঠ চেপে ধরে ছেঁক দেয়া হবে; সেদিন বলা হবে, এই তোমাদের নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করা সম্পদ। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তা আস্বাদন করো" (৯ ঃ ৩৪-৫)।

"আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন মনে না করে যে, ওটা তাদের জন্য মঙ্গলজনক। না, ওটা তাদের জন্য অমঙ্গলজনক। তারা যা নিয়ে কৃপণতা করবে তা কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি হবে" (৩ ঃ ১৮০)।

মহানবী (সা) বলেন, "যে ব্যক্তি সাওয়াবের আশায় যাকাত দিবে সে তার সওয়াব অবশ্যই পাবে। যে ব্যক্তি তা পরিশোধ করতে নারায হবে আমরা অবশ্যই আদায় করবো এবং তার মালের অর্ধেক (জরিমানা স্বরূপ) বাজেয়াপ্ত করবো। এটা আমাদের প্রাচুর্যময় সুমহান আল্লাহ্‌র সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহের অন্যতম" (ইসলামের যাকাত বিধান)।

"যে জাতি যাকাত দিতে অস্বীকার করবে, আল্লাহ্ তাদেরকে কঠিন দুর্ভিক্ষে নিমজ্জিত করবেন।"

আল্লাহ্ যাকে সম্পদ দান করেছেন, সে তার যাকাত না দিলে কিয়ামতের দিন এ মাল একটি বিষধর অজগর সাপে রূপান্তরিত করা হবে এবং তার দু'চিবুকে ছোবল মারতে থাকবে এবং বলতে থাকবে ঃ আমি তোমার সেই সম্পদ। অতঃপর তিনি (নবী সা) এই আয়াত পাঠ করেন ঃ "আর আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন মনে না করে যে, এটা তাদের জন্য মঙ্গলজনক। না, এটা তাদের জন্য অমঙ্গলজনক। তারা যা নিয়ে কৃপণতা করবে, তা কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি হবে" (আল ইমরান ঃ ১৮০)।

কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যাকাতের বাধ্যতামূলক হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলে রাষ্ট্রকে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে যতক্ষণ না তারা নতি স্বীকার করে।

যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কে সকল যুগের এবং সব দেশের মুসলিম উম্মাহ একমত। সুতরাং যাকাত অস্বীকারকারী মুরতাদ বলে গণ্য হবে। যাকাত প্রদান অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নেতৃত্বে সাহাবীগণের যুদ্ধ সর্বজনবিদিত। এ প্রসংগে তাঁর ভাষণ নিম্নরূপ ঃ 'আল্লাহ্‌র শপথ! আমি যুদ্ধ করবো সেসব লোকের বিরুদ্ধে যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে। কেননা যাকাত হলো মালের (মধ্যে প্রাপ্য) অধিকার। আল্লাহ্‌র শপথ! তারা যদি একটি উটও দিতে অস্বীকার করে, যা রাসূল (সা)-এর যুগে তারা দিতো, তবে আমি তাদের এই অস্বীকৃতির দরুন তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করবো।"

এ পর্যায়ে মহান আল্লাহ্ বলেন, যারা যাকাত দেয় না তারা হলো সেসব লোক যারা আখিরাতের প্রতিও অবিশ্বাসী (৪১ ঃ ৭)।

যাদের উপর যাকাত ফরয

প্রাপ্তবয়স্ক এবং বুদ্ধি-জ্ঞান সম্পন্ন মুসলিম নারী ও পুরুষের মালের উপর কতিপয় শর্তসাপেক্ষে যাকাত ফরয করা হয়েছে। কোন অমুসলিম ব্যক্তির উপর যাকাত ধার্য করা যাবে না-এ বিষয়ে উম্মতের ঐকমত্য (ইজ্‌মা) প্রতিষ্ঠিত

রয়েছে। কারণ যাকাত এক প্রকারের ইবাদত যা কবুল হওয়ার প্রথম শর্ত হলো ইসলাম গ্রহণ। ইসলাম গ্রহণের পরই কোন ব্যক্তির উপর ইসলামের বিধান মান্য করা বাধ্যতামূলক হয়। অপ্রাপ্তবয়স্ক কোন বালক, বালিকা এবং পাগলের মালের উপরও যাকাত ফরয নয়। কারণ তাদের উপর শরী'আতের বিধান পালনের কোন দায়িত্ব নেই। মহানবী (সা) বলেন, 'তিন ব্যক্তির আমল লেখা হয় না— নাবালিগ, যতক্ষণ না বালিগ হয়... এবং পাগল, যতক্ষণ না সুস্থ বিবেক সম্পন্ন হয়' (আবূ দাউদ, নাসাঈ)। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, 'তাদের মাল হতে সাদাকা (যাকাত) গ্রহণ করো। এ দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করো' (৯ঃ ১০৩)। কিন্তু নাবালিগ ও পাগলের কোন গুনাহ্ নেই। তাই তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করার প্রশ্নও নেই। অবশ্য মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাব মতে নাবালিগ ও পাগলের মালে যাকাত ধার্য হবে এবং তা তাদের অভিভাবকগণ পরিশোধ করবেন (ফিকহুল ইসলামী, ২খ, ৭৩৯)। কারণ মহানবী (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সম্পদশালী ইয়াতীমের অভিভাবক, সে যেন ঐ সম্পদ ব্যবসায়ে খাটায় এবং এমনভাবে ফেলে না রাখে যে, যাকাত দিতে দিতে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে" (মিশকাত, ৪/১৬৩, নং ১৬৯৭)।

যে সব শর্তসাপেক্ষে উপরোক্ত ব্যক্তির মালের উপর যাকাত ধার্য হয় তা হলো ঃ (১) মালের উপর পূর্ণ একটি (চান্দ্র) বছর তার পূর্ণ মালিকানা বিদ্যমান থাকতে হবে, (২) মাল এমন প্রকৃতির হতে হবে যার উপর যাকাত ধার্য হতে পারে, (৩) মাল নিসাব পরিমাণ বা নিসাবের মূল্যের সমপরিমাণ হতে হবে এবং (৪) ঐ নিসাব পরিমাণ মাল তার মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে হবে। মালিকানা বলতে 'কোন বস্তু ও ব্যক্তির মধ্যকার শরী'আ সম্মত যোগসূত্রকে বুঝায়, যা ব্যক্তিকে ঐ বস্তু নিঃশর্তভাবে ভোগ ব্যবহারের অধিকার দেয় এবং অপর লোকের হস্তক্ষেপে বাধা দেয়' (ইসলামের যাকাত বিধান ১/১৯০)। নগদ অর্থ, সোনা-রূপা, ব্যবসায়িক পণ্য, সায়েমা বা পালিত পশু, কৃষিজ পণ্য ইত্যাদির উপর যাকাত ধার্য হয়। ওয়াক্ফ সম্পত্তি, সরকারী সম্পত্তি, নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহার্য জিনিস, বাড়ি-ঘর ইত্যাদির উপর যাকাত ধার্য হয় না। কৃষিজ ফসল, ফলমূল ইত্যাদির ক্ষেত্রে পূর্ণ এক বছর মালিকের দখলে থাকা শর্ত নয়। তা যখন আহরিত হয় তখন তার উপর যাকাত (উশর) ধার্য হয়।

কোন ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পর কমপক্ষে যে পরিমাণ মাল তার মালিকানায় বিদ্যমান থাকলে তার উপর যাকাত প্রদান ফরয হয়, সে পরিমাণ মালকে 'নিসাব' বলে। বিভিন্ন মালের নিসাব বিভিন্ন ধরনের। যেমন রৌপ্যের নিসাব 'বায়ান্ন তোলা', স্বর্ণের নিসাব 'সাড়ে সাত তোলা' এবং নগদ টাকার নিসাব সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের বাজার দরের 'সম-পরিমাণ'।

ঐ মালের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত হিসাবে প্রদান করতে হবে। এ হিসাবে অতিরিক্ত মালের উপর যাকাত ফরয হবে। যাকাত নগদ অর্থ দ্বারাও পরিশোধ করা যায় এবং সংশ্লিষ্ট মাল দ্বারাও পরিশোধ করা যায়। বছরের শুরুতে ও সমাপ্তি নিসাব বিদ্যমান থাকা জরুরী। মাঝখানে কোন সময় এই পরিমাণ না থাকলেও যাকাত বাধ্যকর হবে। বছরের শুরুতে নিসাব পরিমাণ মাল বিদ্যমান থাকলে এবং শেষে না থাকলে বা এর বিপরীত হলে যাকাত প্রদান বাধ্যকর হবে না। অবশ্য ইমাম শাফিঈর মতে ব্যবসায়িক পণ্যের ক্ষেত্রে বছরের শেষ প্রান্তে নিসাব বিদ্যমান থাকলেই যাকাত পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক হবে শুরুতে বা মাঝখানে মওজুদ থাকা জরুরী নয়।

কোম্পানীর শেয়ার ও সঞ্চয়ের যাকাত

কোন কোম্পানী বা যৌথ মূলধনী কারবার প্রতিষ্ঠানে অংশীদারগণের প্রদত্ত মূলধনের অংশকে 'শেয়ার' বলে এবং কোম্পানী কর্তৃক অংশীদারগণকে প্রদত্ত সনদপত্র 'শেয়ার সার্টিফিকেট' বলে। শেয়ার যদি ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত করা হয়ে থাকে তবে তার বাজার দর অন্যথায় সার্টিফিকেটে লিপিবদ্ধ মূল্য অনুযায়ী যাকাত প্রদান করতে হবে। কোম্পানী স্ব উদ্যোগে শেয়ার হোল্ডারগণের যাকাত পরিশোধ করলে তারা দায়মুক্ত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে তাদের অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হবে (নযরিয়ায় মিলকিয়াত ২/২৯)।

ব্যাংক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয়ী হিসেবে রক্ষিত অর্থের যাকাত প্রদান বছর শেষে বাধ্যতামূলক হবে। প্রাইজবন্ড, বীমা পলিসি, পোষ্টাল সেভিংস সার্টিফিকেট, ডিপোজিট পেনশন স্কীম ও অনুরূপ নিরাপত্তামুলক তহবিলে জমাকৃত অর্থের যাকাত প্রতি বছর যথানিয়মে পরিশোধ করতে হবে। এ জাতীয় অর্থ বা সম্পদ মালিকের দখলে আছে বলে গণ্য হবে (ইসলামের যাকাত বিধান ১/৬১৭-৮)। চাকরীজীবির প্রভিডেন্ট ফান্ডে সঞ্চিত অর্থ তার কর্তৃত্বে সোপর্দ না করা পর্যন্ত তার উপর যাকাত ধার্য হবে না। ইমাম মালিক (র)-এর মতে এ প্রকৃতির মালের অতীত বছরগুলোতে যাকাত প্রদান করতে হবে না।

যৌথ মালিকানাভুক্ত মালের যাকাত

কোন মালের একাধিক মালিক থাকলে এবং তাদের প্রত্যেকের অংশ পৃথকভাবে চিহ্নিত বা বন্টিত না থাকলে এ মালকে 'যৌথ মালিকানাভুক্ত মাল' বলে। এ প্রকৃতির মালের যাকাতের ক্ষেত্রেও একক মালিকানাভুক্ত মালে যাকাত বাধ্যতামূলক হওয়ার শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে (বাদাই ২/২৮)। কিন্তু ইমাম শাফীঈ (র)-এর মতে মালিকগণের যাকাত ফরয হওয়ার যোগ্যতা বিদ্যমান থাকলে (অর্থাৎ উভয়ে বালিগ ও মুসলিম হলে) তাদের যৌথ সম্পত্তির যাকাত যৌথভাবে আদায় করা যাবে। কারণ মহানবী (সা) বলেন, যাকাত পরিশোধের ভয়ে বিচ্ছিন্ন মালকে

একীভূত এবং একীভূত মালকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।'

ব্যাংকের রিজার্ভ ফাণ্ডও শেয়ার হোল্ডারগণের যৌথ সম্পত্তি। এই ফাণ্ডের উপর যাকাত আরোপে প্রধানত তিনটি বাধা আছে ঃ শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে অমুসলিম ব্যক্তিও থাকতে পারে, নাবালিগ, পাগল ও যাকাত ফরযহীন ব্যক্তিও থাকতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহে এবং পাকিস্তানে সরকারীভাবে রিজার্ভ ফান্ড হতে যাকাত ওয়াসিল করা হয়ে থাকে। পাকিস্তানের যাকাত অধ্যাদেশে বলা হয়েছে যে, যাদের উপর যাকাত ফরয নয় তাদের অংশ সাধারণ দান হিসেবে গণ্য হবে। ফকীহ্গণের মতামতের ভিত্তিতে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ইমাম শাফীই (র)-এর মত গ্রহণ করা হয়েছে।

তৈজসপত্র, অলংকার, বাড়িঘর ও বন্ধকী মালের যাকাত

সাংসারিক কাজে ব্যবহৃত জিনিসপত্র যেমন হাঁড়ি-পাতিল, থালা-বাটি, বিছানা-পত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার ইত্যাদির উপর যাকাত ধার্য হবে না। তবে ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মতে অলংকারপত্রের যাকাত আদায় করতে হবে (আবূ দাউদ, যাকাত)। মূল্যবান পাথর যেমন হীরক, মণিমুক্তা ইত্যাদির তৈরী অলংকারের উপর যাকাত ধার্য হবে না। এ বিষয়ে সকল মাযহাবের ফকীহগণ একমত (মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, ১৮৭)। বাড়ি-ঘর, দালন-কোঠা ও যানবাহনের উপর যাকাত ধার্য হবে না। তবে এগুলো ভাড়ায় খাটিয়ে যে আয় পাওয়া যাবে, তা মালিকের অন্যান্য আয়ের সাথে যুক্ত হবে এবং যথা নিয়মে এর উপর যাকাত ধার্য হবে (ইসলামের যাকাত বিধান, ১/৫৪২)। বন্ধকী মাল বন্ধকমুক্ত হয়ে মালিকের দখলে ফিরে আসার পর এর উপর যাকাত ফরয হবে।

ঋণ ও যাকাত

কোন ব্যক্তির ঋণমুক্ত হওয়াও তার উপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত। তার ঋণের অংক বিয়োগ করার পর নিসাব পরিমাণ মাল না থাকলে তার উপর যাকাত ফরয হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র) সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, কোন ব্যক্তির গ্রহণ করা ঋণ নিসাব পরিমাণ হলেও তার উপর যাকাত ধার্য হবে না। তবে ঋণদাতাকে তার প্রদত্ত ঋণ ফেরত পাওয়ার পর যথারীতি এর যাকাত দিতে হবে (আল-মুহাল্লা, ২য় খণ্ড, ১০১)। যে ঋণ ফেরত পাওয়ার আশা নেই সে সম্পর্কে ইমাম আযম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র) বলেন, কখনো ঐ ঋণ ফেরত পাওয়া গেলে অতীতের বছরগুলোর এমন কি ফেরত পাওয়ার বছরের যাকাত প্রদান করতে হবে না। বরং পরবর্তী বছর হতে যাকাত পরিশোধ করতে হবে (যাকাত বিধান, ১/১৯৯)। ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসায়ের জমি, দালান-কোঠা, যন্ত্রপাতি ও পণ্য ক্রয় করা হলে

কেবল পণ্য ক্রয় বাবদ যতটুকু ঋণ খরচ হয়েছে তা থেকে ততটুকু বিয়োগ করার পর ঐ পণ্যের উপর যাকাত ধার্য হবে।

ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত

ব্যবসায়ের অভিপ্রায়ে উৎপাদিত বা ক্রয়কৃত পণ্য দ্বারা বাস্তবে ব্যবসায়ী কার্য সম্পাদিত হলে ঐ পণ্যকে 'ব্যবসায়িক পণ্য' বলে। অতএব ব্যক্তিগত বা পারিবারিব প্রয়োজনে কিছু পণ্য উৎপাদন বা ক্রয়ের পর তা দিয়ে ব্যবসা করার অভিপ্রায় বা নিয়াত করলেই তা ব্যসায়িক পণ্য হবে না, যতক্ষণ না এর সাথে ব্যবসায়িক কার্যক্রম যুক্ত হয় (বাদাই, ২/১২)। ব্যবসায়িক পণ্যের উপর যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে ঐকমত্য বিদ্যমান রয়েছে। মহান আল্লাহ্‌র বাণী, "হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করি তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় করো" (২ ঃ ২৬৭)।

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী (র) বলেন, "তোমরা তোমাদের চেষ্টা-সাধনায় যা উপার্জন করো তা ব্যবসা হোক, শিল্প হোক, স্বর্ণ-রৌপ্য ভিত্তিক কারবার হোক—তা থেকে যাকাত দাও।" ইমাম বুখারী (র) যাকাত অধ্যায়ে 'উপার্জন ও ব্যবসায়ের যাকাত' অনুচ্ছেদ দাঁড় করিয়েছেন উপরোক্ত আয়াতের ভিত্তিতে। আবূ বকর আল-জাসসাস ও ইবনুল আরবীর মতে "তোমরা যা উপার্জন করো" দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে উপার্জন বুঝানো হয়েছে (ইসলামের যাকাত বিধান, ১/৩৮৪-৫)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! ব্যবসায় কাজে অনর্থক কথা ও অপ্রয়োজনীয় শপথ করা হয়ে থাকে। অতএব তোমরা তার যাকাত পরিশোধ করে পরিচ্ছন্ন করে নাও" (মিশকাত ৬/২০)। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন--"আমরা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে যা কিছু তৈরি করি তার যাকাত পরিশোধের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে আদেশ করতেন" (আবূ দাউদ, ২/৩৬৮-৯)।

হানাফী মাযহাবসহ জমহূর ফিকাহ্‌বিদগণের মতে যাকাত ফরয হওয়াকালে প্রচলিত বাজার দর অনুযায়ী ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্য নিরূপিত হবে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে যে পদ্ধতিতে মূল্য নিরূপণ করলে গরীব-দুঃখীগণ অধিক লাভবান হতে পারে সে অনুযায়ী মূল্য ধার্য করা উচিত। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে যাকাত পরিশোধের উদ্দেশ্যে বছর শেষে হিসাব করার দিনের বাজার মূল্যের হিসেবে পণ্যের দাম নির্ধারণ করতে হবে (বাদাই, ২/২১)।

ব্যবসায়িক পণ্যের নিসাব স্বর্ণ ও রৌপ্যের নিসাবের সমপরিমাণ অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের সম-পরিমাণ ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্য হলে তার প্রতি চল্লিশ টাকায় এক টাকা যাকাত ধার্য হবে। ব্যবসায়ের কেবল আবর্তনশীল মূলধনের যাকাত প্রদান করতে হবে। ব্যবসায়ের স্থাবর সম্পত্তি,

যেমন দালান-কোঠা, জমি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির উপর যাকাত ধার্য হবে না। ফকীহ্গণ আরো বলেন যে, পণ্যদ্রব্য রাখার পাত্র, দাড়ি-পাল্লা ইত্যাদির উপরও যাকাত ধার্য হবে না। (ইসলাম কা কানূন মাহাসিল, পৃ. ৯৬-৭)। মসজিদ, মাদ্রাসা বা অনুরূপ জনকল্যাণমূলক কাজের উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি দ্বারা ব্যবসা করা হলেও তার উপর যাকাত ধার্য হবে না। যেসব মালের উপর সাধারণত যাকাত ধার্য হয় না, সেসব মাল ব্যবসায়িক পণ্য হলেও তার উপর যাকাত ধার্য হবে। যেমন পাথর, হীরক, মণিমুক্তা, আসবাবপত্র, তৈজসপত্র, কাঠ, বই-পুস্তক, যন্ত্রপাতি, যানবাহন ইত্যাদি। যাকাতের হিসাব কালে মোট সম্পত্তি হতে ঋণের মতো স্ত্রীর মোহার ও খোরপোষ বাবদ প্রাপ্য এবং সরকারকে প্রদেয় বকেয়া খাজনা বিয়োগ হবে (বাদাই, ২/৭-৬)।

পশুর যাকাত

প্রতিটি প্রজাতির গবাদি পশুর সংখ্যা স্বতন্ত্রভাবে নিসাব পরিমাণ হলে তার যাকাত প্রদান ফরয হবে। যেমন উটের সংখ্যা ন্যূনপক্ষে পাঁচটি, গরু-মহিষের সংখ্যা ত্রিশটি এবং ছাগল-ভেড়া-মেষের সংখ্যা চল্লিশটি। অন্যান্য সম্পদের ন্যায় পশুগুলো ওদের মালিকের দখলে পূর্ণ এক বছর বিদ্যমান থাকলেই যাকাত ধার্য হবে। যেসব পশু বছরের অধিকাংশ সময় মুক্তভাবে বিচরণ করে খাদ্য গ্রহণ করে সেসব পশুর উপর যাকাত ধার্য হবে। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে, যেমন দুধ, গোশত, চর্বি, মাখন উৎপাদন ও প্রজননের উদ্দেশ্যে পালিত গবাদি পশুর উপরও যাকাত ধার্য হবে। কিন্তু কৃষিকর্ম, ভারবহন বা বাহন হিসেবে ব্যবহারের জন্য পালিত পশুর উপর যাকাত ধার্য হবে না। যাকাতের বেলায় গরু ও মহিষকে এক প্রজাতি এবং ছাগল, ভেড়া ও মেষকে এক প্রজাতি গণ্য করা হবে।

১. উটের যাকাতের হার

ক. ৫টি হতে ৯টি পর্যন্ত ১টি বকরী
খ. ১০টি হতে ১৪টি পর্যন্ত ২টি বকরী
গ. ১৫টি হতে ১৯টি পর্যন্ত ৩টি বকরী
ঘ. ২০টি হতে ২৪টি পর্যন্ত ৪টি বকরী
ঙ. ২৫টি হতে ৩৫টি পর্যন্ত ১ বছর বয়সের ১টি মাদি উট
চ. ৩৬টি হতে ৪৫টি পর্যন্ত ২ বছর বয়সের ১টি মাদি উট
ছ. ৪৫টি হতে ৬০টি পর্যন্ত ৪ বছর বয়সের ১টি মাদি উট
জ. ৬১টি হতে ৭৫টি পর্যন্ত ৫ বছর বয়সের ১টি মাদি উট
ঝ. ৭৬ টি হতে ৯০ পর্যন্ত ২ বছর বয়সের ২টি মাদি উট
ঞ. ৯১টি হতে ১২০টি পর্যন্ত ৪ বছর বয়সের ২টি মাদি উট
ট. ১২০-এর অধিক সংখ্যকে প্রতি চল্লিশটি উটে দু'বছর বয়সের ২টি মাদি উট; প্রতি ৫টি উটে ৪ বছর বয়সের ১টি মাদি উট।

২. গরু ও মহিষের যাকাতের হার

ক. ৩০টি হতে ৩৯টি পর্যন্ত ১ বছর বয়সী ১টি গরু বা মহিষ (নর বা মাদি)

খ. ৪০টি হতে ৫৯টি পর্যন্ত ২ বছর বয়সী ১টি গরু বা মহিষ (নর বা মাদি)

গ. ৬০টি হতে ৬৯টি পর্যন্ত ১ বছর বয়সী ২টি গরু বা মহিষ (নর বা মাদি)

ঘ. ৭০টি হতে ৭৯টি পর্যন্ত ১ বছর বয়সী ১টি গরু ও ২ বছর বয়সী ১টি গরু বা মহিষ

ঙ. ৮০টি হতে ৮৯টি পর্যন্ত ১ বছরের ২টি গরু বা মহিষ

চ. ৯০টি হতে ৯৯টি পর্যন্ত ১ বছর বয়সী ৩টি গরু বা মহিষ

ছ. ১০০টি হতে ১০৯টি পর্যন্ত ১ বছর বয়সী ১টি ২ বছরের ১টি গরু বা মহিষ

জ. ১১০টি হতে ১১৯টি পর্যন্ত ১ বছর বয়সী ২টি ও ২ বছরের ১টি গরু বা মহিষ

ঝ. ১২০টি যাকাত ১ বছর বয়সী ৪টি বা দু বছরের ৩টি গরু বা মহিষ

ঞ. ১২০-এর অধিক সংখ্যকের জন্য (ক) হতে (ছ) পর্যন্ত বর্ণিত পন্থায় যাকাত আদায় করতে হবে।

মহিষের যাকাত গরুর যাকাতের নিয়মে পরিশোধ করতে হবে। শুধু গরু বা মহিষে নিসাব পূর্ণ না হলে এবং উভয়ের সমন্বয়ে নিসাব পূর্ণ হলে উপরোক্ত নিয়মে যাকাত আদায় করতে হবে। মহানবী (সা) বলেন, 'প্রতি ত্রিশটি গরুর জন্য পূর্ণ এক বছর বয়সের একটি নর বা মাদী বাচ্চা এবং প্রতি চল্লিশটি গরুর জন্য পূর্ণ দু' বছর বয়সী (মুসিন্না) একটি নর বা মাদী বাচ্চা দিতে হবে' (আবূ দাউদ, ২/১৫৭২)।

৩. ছাগল, ভেড়া ও মেষের যাকাতের হার

ক. ৪০টি হতে ১২০টি পর্যন্ত ১টি বকরী/ভেড়া/মেষ।

খ. ১২১টি হতে ২০০টি পর্যন্ত ২টি বকরী/ভেড়া/মেষ।

গ. ২০১টি হতে ৩৯৯টি পর্যন্ত ৩টি বকরী/ভেড়া/মেষ।

ঘ. ৪০০টি হতে ৪৯৯টি পর্যন্ত ৪টি বকরী/ভেড়া/মেষ।

ঙ. ৫০০টি হতে ৫৯৯টি পর্যন্ত ৫টি বকরী/ভেড়া/মেষ।

চ. অতঃপর প্রতি ১০০টির জন্য ১টি বকরী/ভেড়া/মেষ।

(হাদীস দ্রঃ আবূ দাউদ, ২খ/১৫৬৭, ১৫৬৮, ১৫৭২; বাদাই, ২খ/২৮)।

যাকাত বাবদ প্রদত্ত মালের মান

যাকাত এমন মাল দ্বারা পরিশোধ করতে হবে যার আর্থিক মূল্য আছে এবং যা শরী'আতে মাল হিসেবে স্বীকৃত। পশুর যাকাত সংশ্লিষ্ট পশু দ্বারা পরিশোধ করা হলে তা অন্তত মধ্যম শ্রেণীর হতে হবে এবং নগদ অর্থের দ্বারা পরিশোধ করার ক্ষেত্রে তার পরিমাণ মধ্যম মানের পশুর বাজার দরের সমান হতে হবে।

কৃষিজ বা ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত নগদ অর্থে পরিশোধ করার ক্ষেত্রে তার পরিমাণ যাকাত বাবদ যতটুকু প্রদান বাধ্যকর হয়েছে তার বাজার দরের সমান হতে হবে। এক জাতীয় মালের যাকাত অপর মাল দ্বারা পরিশোধ করার ক্ষেত্রে যাকাত বাবদ সংশ্লিষ্ট মালের যে পরিমাণ প্রদান বাধ্যকর হয়, ঐ প্রদত্ত মালের মূল্য যাকাত বাবদ প্রদেয় সেই মালের মূল্যের সমান হতে হবে।

যাকাত প্রদানের অভিপ্রায়

যাকাতদাতার যাকাত প্রদানকালে বা মাল হতে যাকাতের অংশ পৃথক করাকালে তার অভিপ্রায় থাকতে হবে যে, সে তার যাকাত পরিশোধ করছে। অভিপ্রায়হীনভাবে সমস্ত মাল দান করলেও যাকাত আদায় হবে না। এ বিষয়ে ফকীহগণের মতৈক্য রয়েছে। মহানবী (সা) বলেন, 'কাজের ফলাফল তার অভিপ্রায় (নিয়ত) অনুযায়ী বিচার্য'। ইমাম মালিক ও আহমদ (র) বলেন, অন্তরে অভিপ্রায় (নিয়ত) বিদ্যমান থাকাই যথেষ্ট।

যাকাত পরিশোধের সময়

যাকাত ফরয হওয়ার সংগে সংগেই তা পরিশোধ করা ফরয হয়। এ বিষয়ে ফকীহগণ একমত এবং হানাফী মাযহাবের এটাই গৃহীত মত। এ মাযহাব মতে কোন ব্যক্তি যাকাত পরিশোধে যথা বিলম্ব করলে আদালতে কোন বিষয়ে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বে অগ্রিম পরিশোধ করলে তা ধর্তব্য হবে না। যাকাত ফরয হওয়ার পর কিন্তু পরিশোধের নির্দিষ্ট সময় আসার পূর্বে অগ্রিম যাকাত প্রদান করা যায়। আব্বাস (রা) তাঁর মালের অগ্রিম যাকাত পরিশোধ করতে চাইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার অনুমতি প্রদান করেন [মুসনাদ আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইব্ন মাজা]।

যাকাত আদায়ের অধিকার

তিনটি অবস্থা বিদ্যমান থাকলে রাষ্ট্র যাকাতদাতাদের নিকট হতে যাকাত আদায় করতে পারবে ঃ (১) রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব এবং নাগরিকদের জান-মালের নিরাপত্তা বজায় রাখার ক্ষমতা বিদ্যমান থাকলে; (২) কোন ব্যক্তির উপর যাকাত প্রদান ফরয হলে এবং (৩) যে মালের উপর যাকাত ধার্য হবে সে মাল ও তার মালিক বা তার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকলে। মালিক বা প্রতিনিধির উপস্থিতি এজন্য প্রয়োজন যে, হয় তো সে ইতোপূর্বে যাকাত পরিশোধ করছে বা এমন অবস্থা বিদ্যমান আছে যার ফলে ঐ ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয হয়নি এবং তা যাকাত আদায়কারী রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধির জানা নেই (বাদাই, ২/৩৬)।

জনগণের নিকট হতে যাকাত আদায় ও বণ্টনকারী কর্তৃপক্ষ হচ্ছে রাষ্ট্র ও তার প্রতিনিধি। এ বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। মহানবী (সা)

ও খুলাফায়ে রাশিদার শাসনামল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যাকাত আদায় ও বণ্টনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা থাকলে যাকাতদাতাগণ নিজ নিজ দায়িত্বে তা প্রকৃত প্রাপকদের মধ্যে বণ্টন করবেন।

যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ

মহান আল্লাহ্ সূরা তাওবার ৬০ নম্বর আয়াতে যাকাত ব্যয়ের সর্বমোট আটটি খাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন ঃ 'যাকাত তো কেবল ফকীর, মিস্কীন ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ উদ্দেশ্যে তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণে জর্জরিত ব্যক্তিদের জন্য, আল্লাহ্র পথে এবং মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'

উপরোক্ত আয়াত অনুসারে যাকাত ব্যয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় খাত হলো ফকীর (নিঃস্ব) ও মিসকীন অভাগ্রস্ত। শব্দ দু'টির অর্থ নির্ধারণে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ আছে। কুরআন মজীদেও শব্দ দু'টির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, কোথাও এরা একই অর্থ আবার কোথাও ভিন্নতর অর্থ প্রকাশক। যেসব 'শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের (ফাক্র) ভয় দেখায়' (২ ঃ ২৬৮)। 'আর যদি তা গোপনে করো এবং অভাগ্রস্তদেরকে (ফুকারা) দাও' (২ ঃ ২৭১)। 'এবং যে ব্যক্তি বিত্তহীন (ফকীর) সে যেন সংগত পরিমাণে ভোগ করে' (৪ ঃ ৬)। এবং যার মালিকানায় কোন সম্পদ নেই তাকে মিসকীন বলে অর্থাৎ ফকীরের তুলনায় অধিক দুঃস্থ (কিতাবুল ফিক্হ, ৬/৬২২)। হাম্বলী মাযহাব মতে যার মালিকানায় মোটেই কোন সম্পদ নেই বা সাংবাৎসরিক ভরণ-পোষণের অর্ধেক পরিমাণ মালও নেই তাকে ফকীর বলে এবং যার নিকট পূর্ণ বছরের বা অর্ধেক সময়ের ভরণ-পোষণের সমপরিমাণ সম্পদ নেই, তাকে মিসকীন বলে (কিতাবুল ফিক্হ, ৬খ)।

শাফিঈ মাযহাব মতে যার মূলতই কোন সম্পদ বা হালাল উপার্জন নেই বা থাকলেও তার অর্ধবছরের ভরণ-পোষণের চাইতেও কম, তাকে ফকীর বলে এবং যার অর্ধ বছরের ভরণ-পোষণের সমপরিমাণ সম্পদ বা হালাল উপার্জন আছে, তাকে মিসকীন বলে (পূর্বোক্ত)।

অতএব হানাফী ও মালিকী মতে যারা ফকীর ও মিসকীন, তাঁরা শাফিই ও হাম্বলী মতে পর্যায়ক্রমে মিসকীন ও ফকীর। এ প্রসংগে মহানবী (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের দ্বারে ঘুরে ভিক্ষা চায়, যাকে তুমি এক বা দুই গ্রাস খাবার বা একটি দু'টি খেজুর দিয়ে বিদায় কর, সে মিসকীন নয়। বরং মিসকীন সেই ব্যক্তি যে সাবলম্বী হওয়ার মতো সম্পদ পায় না, লোকেরাও তাকে (অভাবগ্রস্ত হিসেবে) চিনতে না পারার কারণে সাহায্য সহায়তা করে না এবং সেও (দারিদ্র পীড়িত হওয়ার পরও) মানুষের নিকট ভিক্ষা চাইতে দাঁড়ায় না।' অর্থাৎ মিসকীন বলতে একজন দরিদ্র ভদ্রলোককে বুঝায়; যাকে স্বীয় আত্মসম্মানবোধ অপরের নিকট

সাহায্য লাভের জন্য হাত বাড়াতে দেয় না এবং যার বাহ্যিক অবস্থা দেখেও তাকে অভাবগ্রস্ত মনে হয় না। সে ফকীর ব্যক্তির তুলনায় অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। হযরত উমর ফারূক (রা)-এর মতে ফকীর বলতে মুসলিম দরিদ্র ব্যক্তি এবং মিসকীন বলতে আহলে কিতাব দরিদ্র ব্যক্তি বুঝায়। তাঁর মতে আহলে কিতাবকেও যাকাতের অর্থ দিয়ে সাহায্য করা যেতে পারে। কিন্তু তাঁর এই মত কোন মাযহাবেই গ্রহণযোগ্য হয় নাই। কারণ সকল মাযহাবেই যাকাত লাভের যোগ্য হওয়ার জন্য কোন ব্যক্তির মুসলমান হওয়া অন্যতম শর্ত।

যাকাত বিভাগের কর্মচারী

সরকার যেসব লোককে যাকাতদাতাদের নিকট হতে যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োগ করেন তারা যাকাত বিভাগের কর্মচারী হিসেবে গণ্য। এই বিভাগের কর্মচারীকে অবশ্যই মুসলিম, সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, নির্ভরযোগ্য, যাকাতের বিধান সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও দায়িত্ব পালনে দৈহিকভাবে সবল হতে হবে। অতএব কোন অমুসলিম ব্যক্তিকে এ বিভাগে নিয়োগ করা বৈধ নয় (আল-মাওসূআ ২৩/৩-৭)। হানাফী মাযহাব মতে কোন কর্মচারীকে তার মৌলিক প্রয়োজনের সম-পরিমাণ বা তার কাজের অনুপাত অনুযায়ী যাকাত হতে দেয়া হবে। তবে তার পরিমাণ তার আদায়কৃত যাকাতের অর্ধেকের বেশী হতে পারবে না। শাফিঈ মতে সে যে পরিমাণ যাকাত সংগ্রহ করবে তার এক-অষ্টমাংশ পাবে; কিন্তু তার পরিমাণ তার সংগৃহীত পরিমাণের সমান বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এর বেশী বাড়ালে তা বায়তুল মাল হতে প্রদান করতে হবে। অবশ্য সরকার ইচ্ছা করলে তার পূর্ণ বেতন বায়তুল মাল হতেও প্রদান করতে পারে (মাওসূআ, ২৩/৩১৮)। হানাফীগণ আরো বলেছেন যে, যাকাতদাতাগণ স্ব উদ্যোগে নিজ নিজ যাকাত সরকারী তহবিলে জমা দিয়ে গেলে তা থেকে ঐ বিভাগের কর্মচারীদের বেতন দেয়া যাবে না। কর্মচারী সম্পদশালী হলেও যাকাতের অংশ পাবে, এটা তার জন্য বেতনতুল্য (বাদাই, ২/৪৪; ইসলামের যাকাত বিধান, ২/৫১)

মু'আল্লাফাতুল কুলূব

ইসলামের প্রতি যাদের আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে যাকাত দেয়া হয়, তাদেরকে 'মুআল্লাফাতুল কুলূব' বলে। কেবল এ খাতেই অমুসলিম ব্যক্তিকে যাকাত প্রদান করা বৈধ। মহানবী (সা) নেতৃস্থানীয় কুরায়শ পৌত্তলিকদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য যাকাত প্রদান করেছিলেন। হানাফী মাযহাব মতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পরপরই এ খাতে যাকাত ব্যয় রহিত হয়ে গিয়েছে এবং এ বিষয়ে ইজমা-এর দাবি করা হয়েছে (ফাতহুল কাদীর, ২/১৪. আল-মুগীন, ৬/৪২৭)। মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাব মতে এ খাতটি যথাপূর্ব কার্যকর আছে। ইসনা আশারী ও যায়দীয়া মাযহাবেরও এই একই মত তবে ইমাম

শাফিঈ (র)-এর মতে এই খাতে যুদ্ধলব্ধ মাল হতে ব্যয় করতে হবে, যাকাত হতে নয়। কারণ যাকাতে কাফিরদের অংশ রাখা হয় নাই (ইসলামের যাকাত বিধান, ২/৭৭-৮)। এখানে যাকাত ব্যয়ের কারণ (ইল্লাত) হলো 'মন জয় করা'। এ কারণটি পাওয়া গেলে অর্থাৎ 'মন জয় করার মতো লোক বিদ্যমান থাকলে' উক্ত খাতে যাকাত ব্যয় করা যাবে (ইসলামের বিধান, ২ খণ্ড)।

দাসমুক্তি

ইসলামের সুদূর প্রসারী ব্যবস্থাধীনে দাস-প্রথার বিলুপ্তি ঘটায় এ খাতে যাকাত ব্যয়ের প্রয়োজন আর নেই।

গারিম বা ঋণগ্রস্ত

গারিম (ঋণগ্রস্ত) বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যার ঋণের পরিমাণ তার মালিকানাধীন সম্পদের অধিক বা সমান যা ঐ মাল দ্বারা পরিশোধ করলে তার কাছে নিসাব পরিমাণ মাল থাকে না। এরূপ ব্যক্তিকে যাকাত প্রদান করে ঋণমুক্ত করা সরকার ও যাকাতদাতাদের কর্তব্য (বাদাই, ২/৪৫)। যাকাত হতে সাহায্য লাভের যোগ্য বিবেচিত হওয়ার জন্য ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির মুসলিম হওয়া অত্যাবশ্যক। কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলে এবং তা পরিশোধের ব্যবস্থা না থাকলে ইমাম মালিকের মতে তা পরিশোধের জন্য যাকাত প্রদান করা যাবে, এমন কি তার কাফন-দাফনের খরচও সঙ্কুলান করা যাবে। ইমাম নাওয়াবী এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাবেরও অনুরূপ একটি মত দেখা যায়। হানাফী মতে এ খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে না। শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাবেরও অনুরূপ একটি মত পাওয়া যায় (মাওসূআ, ২৩/৩২২, ৩২৮)।

আল্লাহ্‌র পথে

'সাবীলিল্লাহ্' কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক। যেসব কাজ দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তোষ ও নৈকট্য লাভ করা যায়, সেসব কাজই এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব আল্লাহ্‌র রাস্তায় চেষ্টা সাধনায় রত ব্যক্তি দরিদ্র হলে এ খাত হতে যাকাত গ্রহণ করতে পারে। আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে রত বেতনভুক বা স্বেচ্ছাসেবী সৈনিকের যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য এ খাত হতে যাকাত প্রদান করা যাবে, সে ধনবান হলেও, কিন্তু হানাফী মতে ধনী হলে দেওয়া যাবে না। যার মালিকানায় পঞ্চাশ হাজার দিরহাম আছে সে ধনী হিসেবে গণ্য (মাওসূআ)। মালিকীদের মতে এ খাত হতে যাকাত লাভের জন্য কোন ব্যক্তিকে মুসলিম, বালিগ, পুরুষ ও যুদ্ধে সক্ষম এবং তার উপর যুদ্ধ ফরয হতে হবে।

মালিকী মতে যেসব সৈনিক সরকারী তহবিল হতে নিয়মিত বেতন পায় এবং সেটা তার ভরণ-পোষণের জন্য পর্যাপ্ত হলে সে এ খাত হতে যাকাত পাবে

না। শাফিঈগণের দুটি মতের একটি হলো, সরকারী তহবিল দুর্বল হলে যাকাত প্রদান করা যাবে (আল-মুগনী ৬/৪৩৬; ইব্‌ন আবিদীন, ২/৬১, ফাতহুল কাদীর ইত্যাদি)। মালিকী মতে 'আল্লাহ্‌র পথে' কথাটির অর্থ যেহেতু 'আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ ও তৎসংশ্লিষ্ট কার্যাবলী' তাই উক্ত খাত হতে যুদ্ধের সরঞ্জাম ক্রয়, যুদ্ধ প্রস্তুতি, যেমন পরিখা খনন, সেনানিবাস নির্মাণ, গুপ্তচরকে প্রদান (অমুসলিম হলেও) ইত্যাদি যাবতীয় কার্যক্রমে অর্থ ব্যয় করা যাবে। এমন কি শত্রুপক্ষকে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে যুদ্ধ হতে নিরস্ত্র করা সম্ভব হলে সে উদ্দেশ্যে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে (ইসলামের যাকাত বিধান, ২খ., ১৩১-২)। শাফিঈ মতে কেবল যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় করা বৈধ। অন্য সকল ফকীহ্‌র মতে ঐসব কার্যক্রমে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা বৈধ নয় (মাওসূআ, ২২/৩২৩)।

ইমাম আহমদ (র)-এর মতে হজ্জযাত্রীকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা বৈধ, কিন্তু অন্য সকল মাযহাব অনুযায়ী পথিমধ্যে তার রসদপত্র ও পথখরচা শেষ হয়ে গেলে কেবল সে অবস্থায় তাকে যাকাত দেয়া বৈধ হবে। ইবনে কুদামা এই শেষোক্ত মতকে হাম্বলী মাযহাবের সঠিক মত বলেছেন (মুগনী, ৬/৭৩৮, শামী, ২/৬৭, বরাতে মাওসূআ, ২২/৩২৩-৪)।

ইবনুস সাবীল (পর্যটক)

সফরকালে পথিমধ্যে পর্যটকের রসদপত্র ও রাহা খরচ নিঃশেষ হয়ে গেলে এবং তা সংগ্রহের কোন ব্যবস্থা না থাকলে সে যাকাত গ্রহণ করতে পারবে, নিজ আবাসে সে সম্পদশালী হলেও। হানাফী ফকীহদের মতে শ্রম বিনিয়োগ করে অর্থ উপার্জনের সুযোগ থাকলে তার যাকাত গ্রহণ না করাই উত্তম (শামী, ২/৬১, দাসূকী, ১/৪৯৭-৮-এর বরাতে মাওসূআ, ২৩/৩২৫)। মহানবী (সা) বলেন 'সৈনিক ও পর্যটক ব্যতীত ধনী ব্যক্তির জন্য যাকাত হালাল নয়' (বাদাই, ২/৪৬)। যে ব্যক্তি সফরে যেতে চায় তদুদ্দেশ্যে তাকে যাকাত প্রদান করা যাবে না। তবে কোন ব্যক্তির অন্যত্র মাল থাকলে এবং তা সংগ্রহের জন্য সেখানে যাওয়ার খরচপত্র না থাকলে সে ক্ষেত্রে তাকে যাকাত দেয়া যাবে (মাওসূআ, ২৩/৩২৫)।

যাকাত লাভের অযোগ্য ব্যক্তিগণ

ধনী ব্যক্তি যাকাত লাভের অযোগ্য। মহানবী (সা) বলেন, 'সম্পদশালীর জন্য যাকাত গ্রহণ বৈধ নয়' (লা তাহিল্লুস সদাকা লিগানিঈ; মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, (পৃ. ১৯৪)। অনন্তর হযরত মু'আয (রা)-কে ইয়ামানে পাঠানোর সময় মহানবী (সা) বলেছিলেন—'যাকাত ধনীদের নিকট থেকে সংগ্রহ করে তা গরীবদের মধ্যে বন্টন করতে হবে' (আবূ দাউদ, যাকাত, বাব যাকাতিস সাইমা)। সম্পদশালীর পুত্র-কন্যা তার কারণে ধনী গণ্য হবে এবং তাদেরকেও যাকাত

দেয়া বৈধ নয়। তবে সম্পদশালীর নিঃস্ব ও উপার্জনে অক্ষম বালিগ পুত্র ও স্বামীহীনা কন্যাকে যাকাত দেয়া বৈধ (হিদায়া ও ফাতহুল কাদীরের বরাতে ইসলামে যাকাত বিধান, ২/২১৬-৭)। ইমাম আযম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র)-এর একটি মত অনুযায়ী সম্পদশালীর দরিদ্র স্ত্রীকে যাকাত প্রদান বৈধ; যদিও স্বামী তার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে। অনুরূপভাবে সম্পদশালী সন্তানের দরিদ্র পিতার জন্যও যাকাত গ্রহণ বৈধ, যদিও সন্তান তার ব্যয়ভার বহন করে। কারণ শুধু ভরণপোষণ প্রাপ্তির দ্বারা কোন ব্যক্তিকে ধনী গণ্য করা যায় না (বাদাই, ২/৪৭)। আবূ ইউসূফের অপর মত হলো-আদালত কর্তৃক স্ত্রীর খোরপোষ নির্ধারিত না হয়ে থাকলে কেবল সেই অবস্থায় তার যাকাত গ্রহণ বৈধ (পূর্বোক্ত বরাত)।

ইমাম. শাফিঈ (র)-এর মতে সুস্থ-সবল ও কর্মক্ষম দরিদ্র ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ বৈধ নয়, যদি বেকার সমস্যা না থাকে। মহানবী (সা) বলেন, 'তাতে (যাকাতে) সম্পদশালী ও উপার্জনে সক্ষম ব্যক্তির জন্য কোন অংশ নেই'। কিন্তু হানাফী মতে যে কোন দরিদ্র ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ বৈধ। উক্ত মাযহাবের মূলনীতি হল ঃ নিসাব পরিমাণ মালের অনুপস্থিতি যাকাত পাওয়ার অধিকারী সৃষ্টি করে'। অতএব নিসাবের কম পরিমাণ মালের ধনী নয়, বরং গরীব। আর গরীবের জন্য যাকাতে অংশ রাখা হয়েছে।

দরিদ্র পিতামাতা, সন্তান, স্বামী বা স্ত্রীকে যাকাত দেয়া যাবে না। তাদেরকে প্রয়োজনবোধে অন্য খাত হতে সাহায্য করতে হবে। কারণ সন্তান ও পিতা-মাতা এবং স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কে এতো গভীর ও দৃঢ় যে, এরা যেন একই দেহভুক্ত। অবশ্য মালিকী মাযহাব মতে এরা পরস্পরকে যাকাত দিতে পারে (বাদাই, ২/৪৮)।

কুরায়শ গোত্রের বনূ হাশিমও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের কারণে যাকাত লাভের অযোগ্য। মহানবী (সা) বলেন, 'হাশিম বংশীয়গণের জন্য যাকাত গ্রহণ হারাম।' আব্বাস (রা), আলী (রা), জাফর (রা) ও আকীল (রা)-এর বংশধর এবং হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের বংশধর বনূ হাশিমের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম কারখী (র) অনুরূপ উল্লেখ করেছেন (বাদাই, ২/৪৯)।

অমুসলিম ব্যক্তিও যাকাত পাওয়ার অযোগ্য। কারণ হাদীসে বলা হয়েছে—'তাদের সম্পদশালীদের নিকট থেকে তা আদায় করে তাদের গরীবদের মধ্যে পুনরায় বণ্টন করা হবে'। এ হাদীসে ধনী-গরীব দ্বারা মুসলিম ধনী-গরীব নির্দেশ করা হয়েছে। কারণ অমুসলিম ধনীদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করা হয় না বা যাকাত কেবল মুসলিমদের উপরই ফরয। উমর ফারূক (রা)-এর মতে আহলে কিতাব (ইয়াহূদী-খ্রীস্টান) সম্প্রদায়কে যাকাত দেয়া বৈধ। তাঁর মতে

আয়াতে মিসকীন বলতে আহলে কিতাব মিসকীন বুঝানো হয়েছে। তিনি তাঁর খিলাফতকালে দামিশকের আল-জাবিয়া নামক এলাকায় কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত খ্রীস্টানদের কাছে গিয়ে তাদের জন্য যাকাত ও খাদ্য সংগ্রহ করে দেয়ার নির্দেশ দেন। এ মত ফকীহরা অনুসরণ করেন নি। তবে অমুসলিমদেরকে যাকাত ব্যতীত অন্য সকল খাত হতে সাহায্য ও দান-খয়রাত করা বৈধ (বাদাই, ২/৪৯)।

যেসব কর্ম বা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলে উপকৃত হয় তাতে যাকাত ব্যয় করা যাবে না। যেমন মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আশ্রয়কেন্দ্র, রাস্তাঘাট ইত্যাদি নির্মাণের জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে না। যাকাত প্রধানত ব্যক্তির দুরবস্থা ও সমূহবিপদ দূরীভূত করার জন্যই ব্যয়িত হতে হবে (বাদাই, ২/৩৯)।

একজনকে যতটুকু প্রদান করা যায়

হানাফী ফকীহদের মতে কোন একক ব্যক্তিকে পর্যাপ্ত পরিমাণ যাকাত দেয়া বৈধ হলেও দু'শত দিরহামের বেশী দেয়া মাকরূহ। তবে সে ঋণগ্রস্ত হলে বা তার পরিবার-পরিজন থাকলে মাকরূহ নয়। হযরত উমর (রা) বলেন, 'যখন দাও স্বচ্ছল বানিয়ে দাও' (যাকাত বিধান, ২/৩৫)। তিনি যাকাত বণ্টনকারী কর্মচারীদেরকে নির্দেশ দেন—'যাকাত পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে তা পুনঃপুনঃ বণ্টন করো, এক একজন একশটি করে উট পেয়ে গেলেও' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ)। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন- 'যাকাত দিয়ে কোন ব্যক্তিকে স্বচ্ছল বানিয়ে দেয়া আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়' (বাদাই ২/৪৮)।

যাকাত স্থানান্তর

হানাফী মাযহাব মতে যে এলাকা হতে যাকাত আদায় করা হবে তা সেখানকার গরীবদের মধ্যে বণ্টন করাই সাধারণ নিয়ম। তবে যাকাত স্থানান্তর করার মধ্যে মুসলিম জনগণের সামগ্রিক কল্যাণ নিহিত থাকলে তা অন্যত্র বণ্টন করা যাবে। মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাবের মতও প্রায় অনুরূপ (দুররুল মুখতার ওয়া হাশিয়া ইবনে আবিদীন, ২/৯৩-৪)।

ফসলের যাকাত (উশর)

ফল ও ফসলের যাকাতকে 'উশ্‌র' বলে। আশারা (দশ) শব্দ থেকে উশ্‌র (দশমাংশ)-এর উৎপত্তি। কৃষিভূমি ও বাগানের উৎপাদিত ফসল ও ফলের এক-দশমাংশ যাকাত হিসেবে দিতে হয় বলে এই নামকরণ করা হয়েছে। অন্যান্য বস্তুর ন্যায় উশ্‌র প্রদানও ফরয। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন করো এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপন্ন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় করো' (২ ঃ ২৬৭)। 'তার ফল আহার করো এবং ফসল তোলার দিনে ওর দেয় প্রদান করো এবং অপচয় করো না' (৬ ঃ ১৪১)।

মহানবী (সা) বলেন, 'বৃষ্টির পানিতে সিক্ত জমির (ফসলের যাকাত) এক-দশমাংশ এবং সেচ ব্যবস্থার সাহায্য সিক্ত জমির (ফসলের যাকাত) বিংশতিতমাংশ।'

'যে জমি বৃষ্টি, নদী বা কূপের পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয় বা যে জমিতে পানি সেচের আদৌ প্রয়োজন হয় না সে জমির যাকাত হলো উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ। আর যে জমিতে পানি সেচের প্রয়োজন হয় সে জমির যাকাত উৎপন্ন ফসলের বিশভাগের এক ভাগ' (আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযা ও মুসলিম)।

উশ্‌র ফরয হওয়ার শর্তাবলী হলো ঃ উশ্‌রদাতাকে মুসলমান হতে হবে, উৎপাদিত ফসলের উপর তার মালিকানা বিদ্যমান থাকতে হবে এবং জমি উশরযোগ্য হতে হবে। অতএব অমুসলিম ব্যক্তির উপর উশর ধার্য হবে। এমন কি কোন অমুসলিম ব্যক্তি উশরযোগ্য জমি ক্রয় করে তা চাষাবাদ করলেও তার উপর উশর ধার্য হবে না (বাদাই, ২/৫৪)। কোন ব্যক্তির জমির মালিক হওয়া জরুরী নয়, বরং উৎপাদিত ফসলের মালিক হলেই যাকাত দিতে হবে। এমন কি কেউ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি চাষাবাদ করলেও তাকে তার অংশের ফসলের উশর প্রদান করতে হবে।

কোন মুসলিম ব্যক্তি সরকারের অনুমতি নিয়ে পতিত বা অনাবাদী জমি আবাদযোগ্য করলে এবং তা উশরী ভূমির নিকটতর হলে, কোন এলাকার অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের মালিকানাধীন জমি, মুসলিম সেনাবাহিনী কোন এলাকা জয়ের পর তা মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করলে ইত্যাদি প্রকৃতির জমি উশরী জমি হিসেবে গণ্য হবে। যে জমি সম্পর্কে পূর্বে উশরী ছিলো কি না সে সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না, সেই জমিও উশরী জমি গণ্য হবে (বাদাই, ২/৫৭-৫৮)।

মালিকানাভুক্ত ও মালিকানাবিহীন সকল প্রকার উশরী জমিতে উৎপাদিত ফসলে যাকাত ধার্য হবে। হানাফী মাযহাব মতে কর আরোপিত জমির ফসলের যাকাত নেই। কেননা মহানবী (সা) বলেছেন 'কোন মুসলমানের জমিতে একই সংগে উশর ও খাজনা একত্র হতে পারে না' (বাদাই, ২/৫৭)। ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে একই জমিতে উভয়টি ধার্য হতে পারে। কারণ তা দুই প্রকারের দেয় (যেমন যাকাত ও আয়কর দুই প্রকৃতির দেয়)। একই জমিতে বছরে একাধিকবার ফসল উৎপন্ন হলে প্রতিবারই উশর দিতে হবে। নাবালিগ, পাগল ও ইয়াতীম সকলের মালিকানাভুক্ত ফসলের উশর দিতে হবে।

যেসব ফসল ওযনযোগ্য; যেসব ফসল দ্রুত পচনশীল নয়, বরং গোলাজাত করে রাখা সম্ভব এবং যে ফল শুকিয়ে গোলাজাত করে রাখা সম্ভব তার উপর উশর ধার্য হবে। চিনি উৎপাদনের জন্য চাষকৃত আখ, তৈলবীজ ইত্যাদির উপরও উশর ধার্য হবে। যেসব উৎপাদন দ্বারা খোশবু বা ওষুধ তৈরী করা হয় তা

উশরের আওতাভুক্ত হবে না (পূর্ব আলোচনার জন্য দ্র. বাদাই, ২/৫৮-৬১)।

কোন ব্যক্তি যে পরিমাণ ফসলের মালিক হলে তার উপর উশর প্রদান বাধ্যকর হয় সেই পরিমাণ (পাঁচ ওয়াসাক বা ৯৪৮ কিলোগ্রাম) ফসলকে 'নিসাব' বলে। এর কমে উশর প্রদান বাধ্যকর হয় না, এটা ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ফসল কমবেশী যাই হোক, এর এক-দশমাংশ উশর প্রদান বাধ্যকর (বাদাই, ২/৫৯)। যাকাত লাভের যোগ্য ব্যক্তিও উশরের দায় হতে মুক্ত। মহানবী (সা) বলেন, 'খাদ্যশস্য ও খেজুরের পরিমাণ পাঁচ ওয়াসাক না হওয়া পর্যন্ত যাকাত নেই,' (নাসাঈ, যাকাত, বাব যাকাতিল হুবুব। 'পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণ ফসলে যাকাত নেই। এক ওয়াসাক ষাট সা' (আবূ দাউদ, যাকাত, ১৫৫৮-৯, বুখারী, যাকাত ২/১৩৩, মুসলিম, যাকাত, ৯৭৯, তিরমিযী, যাকাত, ৬২৬)।

ইসলামী শরী'আর ভিত্তিতে রচিত পাকিস্তানের যাকাত ও উশর অধ্যাদেশে এমন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ শস্যের মালিক হলে সে তা থেকে উৎপাদন ব্যয় বাবদ ২৫% রেয়াত পাবে, অতঃপর অবশিষ্ট শস্যের এক-দশমাংশ যাকাত (উশর) প্রদান করবে। এ অধ্যাদেশে ফসলের মূল্য নিরূপণ করে নগদ অর্থে উশর আদায়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন করও মওকূফ করা হয়েছে (অধ্যাদেশ নং ১৮ ঃ ১৯৮০ খ্রী.)।

যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহই উশর ব্যয়ের খাত এবং রাষ্ট্র বা তার প্রতিনিধি তা আদায় করবেন। যেখানে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নেই সেখানে উশ্‌রদাতাগণ নিজ নিজ দায়িত্বে তা বণ্টন করবেন।

রোযার মাস রমযান*

ড. এ. এম. রাহাত

"রোগ নিরাময়ের যতগুলো প্রতিকার বা প্রতিষেধক রয়েছে রমযানের রোযা বা উপবাসব্রত উহার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও ফলপ্রদ। মানব শরীরে উৎপন্ন এবং সঞ্চিত বিষক্রিয়ার (Toxin) উহা যম। শরীরের রক্ত প্রবাহকে রোযা পরিশোধন করে এবং সমগ্র প্রবাহ-প্রণালীকে নবরূপ দান করে। বিশুদ্ধিসাধন এবং পরিশোধনের মাধ্যমে রোযা শুধু দেহের মৌলিক শক্তিকেই নবশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে না উহা দেহজাত বিষক্রিয়াকে বিদূরিত করে—এই বিষক্রিয়াকে দেহের স্নায়ু এবং অপরাপর জীবকোষকে দুর্বল করে দেয়। এই জন্যেই সকল রোযাদারকে উপলব্ধি করতে হবে যে রমযান মাসে রোযার মাধ্যমে দেহের মধ্যে এই প্রক্রিয়া চলছে এবং দেহ নবযৌবন এবং নবশক্তি অর্জন করে।"

ইসলামের রোযা বা উপবাসব্রতের অর্থ

যুগ যুগ ধরে রোযাকে যদিও ধর্মীয় বিধান বলেই ধরে নেয়া হয়েছে, কিন্তু উহার অনুশীলন যে প্রকৃতসম্মত এবং বিজ্ঞানসম্মত উহাও মেনে নেয়া হয়েছে। ইসলামের রোযাদারের জন্যে বহুমুখী কল্যাণ এবং মংগল নিহিত আছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রোযা দ্বারা একজন মানুষ তিনি সুস্থই হোন বা রোগীই হোন দৈহিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ করে। রোজাব্রত পালন দ্বারা মানুষ শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করে ইসলামের ইহাই শিক্ষা।

কখন কেমন করে রোযা পালন করতে হবে ইসলাম বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পরিপূর্ণভাবে উহার বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা দিয়েছে। রোযা, নামায, ভিক্ষাদান, কুরআন পাঠ উহার ব্যাখ্যার আলোকস্বরূপ নির্ধারণ, আল কুরআনের অনুধাবন প্রভৃতি প্রতিটি বিষয়ে কুরআন এবং হাদিস মোতাবেক প্রদর্শিত এবং অবলম্বিত পত্রের প্রতি নির্দেশ করা আছে।

ইসলামের নির্দেশ মোতাবেক রোযাব্রত কোন কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নয়, কিন্তু অনুশাসনরূপে রোযা বিজ্ঞানের সমর্থনপুষ্ট এবং রোযাদারের দৈহিক এবং আত্মিক উভয়বিধ মংগলই সাধন করে। ইসলামের ভক্তবৃন্দ এবং সাধকগণ এই মহান অনুশাসনের পূর্ণ মর্যাদা উপলব্ধি করেই তাঁদের আত্মিক এবং শারীরিক শক্তি এবং সুস্থতার জন্যেই রমযানের কৃচ্ছ সাধন স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে গ্রহণ করেন।

---

*　[প্রবন্ধটি ইফা পত্রিকার ১৯৭৩ সন ১২ বর্ষ ২য় ও ৩য় সংখ্যা থেকে সংগৃহীত]

রমযানের তপস্যাবিদগ্ধ দেহ যে উন্নত আত্মিক শক্তি বিকাশের উৎস উহা সর্বজনবিদিত। দৈহিক নবজীবন লাভ এবং পবিত্রতা আধ্যাত্মিক নবজীবন এবং পবিত্রতার সোপান। একমাত্র রোযাব্রত, নামায, অধ্যয়ন, এবং আল কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার উপর ধ্যান-ধারণা এবং পঠন-পাঠনের মাধ্যমেই মানুষ সেই উন্নত ও সমৃদ্ধ অধ্যাত্ম রাজ্যের মহিমা উপলব্ধি করতে পারে, ভাষায় উহা প্রকাশ করা কঠিন। গভীর জ্ঞানের জন্যে এই উপলব্ধির প্রয়োজন আছে। এই অনুভূতির উৎস আছে, সোপান আছে, উহা আনন্দময় মুক্তির এক পুলকশিহরণ, উহা মানুষকে আনন্দে অভিভূত করে, প্রেমে দ্রবীভূত করে। ইহা সম্বন্ধ অনুভূতির এক অতি উন্নত স্তর, যার মধ্যে শোভা পাচ্ছে উদার এবং মহৎ সহানুভূতি; নিহিত আছে সমগ্র মানবতা এবং জড় জগতের জন্য প্রীতি এবং সমঝোতার বাণী, উন্নতি এবং অগ্রগতির আকুলতা, আল্লাহ্‌র সম্পর্কে তৃপ্তি এবং শান্তির ধারা এক মানুষ অপর মানুষের জন্যে একাত্মবোধ, আমাদের চারদিকের বিশ্ব এবং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে এক গভীর ঐক্য।

ইসলামে ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা বলতে কোন কথা নেই। ইসলামের সোনালী ঐতিহ্যের যুগে সমগ্র শিক্ষাকেই ধর্মের আলোকে আনা হয়েছিল। মসজিদে আল-কুরআন হাদীস এবং ফিক্‌হ শাস্ত্র গঠন ও পাঠনের সাথে অপরাপর শাস্ত্র অধ্যয়নের সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছিল—ইহা ইসলামেরই এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। রসায়ন শাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের উপর মসজিদে বক্তৃতা দেয়া হতো উপরোক্ত বিষয়ের সাথে সাথে। কারণ সেই স্বর্ণযুগে মসজিদ ছিল ইসলামের বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইহার এই নামকরণ সার্থকও হয়েছিল, কারণ তদানীন্তন যুগের সব রকম জ্ঞানের আলোচনা এবং অনুশীলন মসজীদসমূহ অভিনন্দন জানাতো।

রোযা উপবাস বা অনাহার নয়

সাধারণ মানুষ রোযা রাখতে বেশী পছন্দ করে না। খাদ্য বস্তুর লালসা ও আকর্ষণ তাদের কাছে এতো প্রকট যে তারা সাংঘাতিক রোগগ্রস্ত না হলে, অন্যকথায়, পিত্তশূলের ব্যথা বা বমনদোষ না হলে সে শুধু খেয়েই চলে, কম খেতে চায় না। শুধু তাই নয়, সোহাগিনী স্ত্রী, স্নেহময়ী ভগিনী বা মেয়ের সুস্বাদু এবং মজাদার রন্ধন শিল্প দ্বারা খাদক মানুষটির ভোজন-স্পৃহা আরো উত্তরোত্তর বাড়িয়ে তোলা হয়।

অনেকের অভিমত এই যে যদি তারা একদিন খেতে না পায় তবে তারা সহজে রোগে আক্রান্ত হয়, কারণ অনশনে তাদের জীবনীশক্তি নেহায়েৎ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মনে করে এজন্যই মানুষের খাওয়া অত্যাবশ্যক। অনর্গল তারা এ সব কথা বলে যায় এবং দুই এক বেলা না খেতে পারাটাকে অনাহারে মৃত্যুর প্রথম সোপান বলে আখ্যাত করে। ....ইহাই তাদের বিশ্বাস।

কিন্তু দেহ এবং দেহের খাদ্য প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্যের উপর গবেষণা চালিয়ে

বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করেছেন যে খাদ্যপ্রাণ ভোজনের সাথে সাথেই প্রয়োজন হয় না—দেহে পূর্ব হতেই খাদ্য সঞ্চিত থাকে এবং দেহের প্রয়োজন অনুসারে উহা যথা সময় সরবরাহ হয়।

অনশনের মাত্রানুসারে এই সঞ্চিত সরবরাহ কমবেশী হতে পারে। একজন মানুষ যত শীর্ণই হোক না কেন, তার দেহে কিছু পরিমাণ চর্বি বা মেদ সঞ্চিত খাদ্যরূপে বিদ্যমান থাকবেই, যখন প্রয়োজন হবে তখন দেহ এই সঞ্চিত সরবরাহ থেকে খাদ্য প্রাণ পূরণ করে নেয়। যদ্যাবধি মানব দেহে এই সঞ্চিত সরবরাহ বর্তমান থাকে ততক্ষণ অনাহারে কেউ মরে না। অনাহারে মরতে হলে একজন মানুষের তিন চার সপ্তাহ থেকে ৩ মাস পর্যন্ত সময় লাগে। তাও আবার দেহে সঞ্চিত খাদ্যসরবরাহ এবং অনশনজনিত ক্ষতিপূরণের গতির উপর উহা নির্ভরশীল। এই সিদ্ধান্ত অবশ্য যিনি শুধু পানি, কমলালেবুর রস অথবা অন্য কোনরূপ পানীয় সেবন করেন তাঁর বেলাই প্রযোজ্য। এই জন্যেই বলছি কেউ যেন রোযা রাখতে গিয়ে এই ধরনের ভয় না করেন, তা তিনি যতই দুর্বল, শীর্ণ অথবা দীর্ণই হোন না কেন, খাদ্য পরিহার দ্বারা দুর্বল হবার চাইতে তিনি বরং নবশক্তি এবং উদ্যম অনুভব করবেন।

সাধারণ মানুষের ধারণা এই যে রোযা দেহ যন্ত্রকে বিকল করে দেয়। অনাহার দেহকে দুর্বল করে সত্য, কিন্তু রোযা তা করে না। ভোজন একটা অভ্যাস মাত্র এবং অধিকাংশ মানুষই যদি দুই বেলা ভাত না খায় তখনই তারা পাকস্থলীতে বেদনা এবং কামড়ানি অনুভব করে এবং এই আরামবিহীন লক্ষণের সমস্ত দোষ চাপিয়ে দেন রোযার উপর এবং উহার প্রাকৃতিক প্রতিকার মনে করেন ভোজন। তারা ভ্রান্ত। অভ্যাসের দাসত্বই তাদের এই ক্ষুধাবৃত্তির কারণ, ইহা স্বাভাবিক ক্ষুধা নয়। এক বেলা খেতে না পেরে কেউ যদি ক্ষুধাবোধ করে এবং কোন কারণে যদি সেই ক্ষুধানিবৃত্তি করতে অসমর্থ হয় এবং কিছু সময় অতিবাহিত হয় তখনই সে অনুভব করে যে তার ক্ষুধাবোধ নেই, অচিরেই তার ক্ষুধা পালিয়ে যায়।

রমযানের প্রথম তিন চার দিন একটু কষ্টকর

রোযাব্রত পালনকারীর প্রথম এবং প্রধান কষ্ট হচ্ছে ভোজনের অভ্যাস পরিহার করা। এ জন্যেই রোযার প্রথম তিন চার দিনই সবচেয়ে বেশী কষ্ট হয়। এর সাথে এসে উপস্থিত হয় ভোজনের স্পৃহা, স্নায়ুবিক বৈকল্য, মানসিক শৈথিল্য, অনিদ্রা প্রভৃতি। আর এ সব উপসর্গ কল্পনা করেই রোযা না রাখার পক্ষে একটা অছিলা খাড়া করা হয়। অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় ইহা সত্যিকারের ক্ষুধা নয়। একে স্বাভাবিক ক্ষুধা না বলে 'ক্ষুধার ভাব' বলা যেতে পারে, অথবা আরো পরিষ্কারভাবে একে 'অভ্যাসের ক্ষুধা' বলা যেতে পারে।

একজন লোক যদি দিনে তিনবার খায় তার পরিপাক যন্ত্রে নির্দিষ্ট স্পন্দন পরিলক্ষিত হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিটি বারের জন্য খাবারের আকাঙ্ক্ষা জাগে। সেই নির্দিষ্ট

সময়ে যদি কোনরূপ খাদ্য গ্রহণ করা না হয় এবং তখন মনের গতিকে যদি অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখা যায় তখন দেখা যাবে যে খাদ্য গ্রহণের স্পৃহা তার একেবারে মরে যায়।

নিয়ম মাফিক মানব দেহের খাদ্যের প্রয়োজন দেহ যদি সেটুকু পায় এমতাবস্থায় কখনও ক্ষুধা নষ্ট হয় না। বরঞ্চ প্রতিনিয়ত এই ভোজনেচ্ছা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং পরিশেষে একটি তীব্র বেদনায় পর্যবসিত হয়। অনাহারের বেলায় এমনটি ঘটে থাকে। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ভোজন সর্বপ্রাচীন এবং দৃঢ়ভাবে সুসংগঠিত একটি অভ্যাস। তাই সহজে এই অভ্যাস পরিহার করা যায় না। দুই তিন দিনের মধ্যে এই অভ্যাস পরিবর্তনের ফলে রোযা রাখা দিন দিন সহজতর হয়ে ওঠে।

রোগের প্রতিকার হিসেবে রোযার কার্যকারিতা আর রোগের কারণসমূহের মধ্যে সম্পূর্ণ সংগতি বিদ্যমান। একাদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত মুসলিম চিকিৎসক আবু সিনাহ্ তাঁর রোগীদের জন্য তিন সপ্তাহের জন্য উপবাস ব্রত বিধান দিতেন। তিনি রোযাকে সিফিলিস এবং বসন্ত রোগের বিশেষ ঔষধ মনে করতেন। ফরাসী অধিকারের সময় মিসরের হাসপাতালগুলোতে রোযা বা উপবাস ব্রত পালনই ছিল সিফিলিস রোগের একমাত্র অমোঘ ঔষধ।

মানব দেহের রক্ত এবং শ্বেত রসপ্রবাহের অস্বাভাবিক সংমিশ্রণে সৃষ্ট রোগ এবং দেহযন্ত্রে সঞ্চিত ব্যাধি বিদূরিত করণের একমাত্র ঔষধ রোযার কৃচ্ছ্র সাধনা।

শরীরের উপর রোযার প্রতিক্রিয়া

যেই মুহূর্তে শেষ গ্রাসটি হজম হয়ে যায় এবং যেই মুহূর্তে পাকস্থলী খালি হয় উহাতে পুনর্গঠনমূলক প্রক্রিয়া শুরু হয়, ফলে দু'ই তিন দিন পরেই রোযা রাখা সহজতর হয়ে ওঠে। এর একটা কারণ হচ্ছে এই যে তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ব্যাধিগ্রস্ত পদার্থগুলোকে নির্মূল করতে শুরু করে। পরিপাক প্রণালী যখন উহার সদৃশীকরণ কার্যে বিরতি দেয়, তখন পাকস্থলী এবং অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক আবরণী (আভ্যন্তরীণ) দেহযন্ত্র থেকে জীর্ণ পদার্থগুলোকে দূরে সরিয়ে দিতে থাকে, অন্ত্রের এবং পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক আন্তআবরণী খাদ্য বস্তুকে পরিপাকের বেলায় স্পঞ্জের মতো কাজ করে।

মুখের দুর্গন্ধ এবং জিহ্বার মলিনতা দ্বারা উহা নিরূপিত হয় যে লোকটির পরিপাক যন্ত্রের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। এই বদ হজম এবং পরিপাক শক্তির অভাবে ক্ষুধাবোধ থাকে না। ফলে দেহযন্ত্রকে উহার সঞ্চিত সরবরাহের উপর নির্ভর করতে হয়। আর দেহের অপ্রয়োজনীয় ব্যাধিগ্রস্ত পদার্থসমূহ নড়ে উঠে এবং সর্বাগ্রে অপসারিত হয়।

যখনই আমাদের বিবেচনায় ধরা পড়ে যে আমাদের পরিপাক যন্ত্রের অন্তর্নালিটি ২৮ থেকে ৩০ ফিট লম্বা এবং উহার গঠন-প্রণালী পরিবর্জনকারী গ্রন্থি এবং কোষ দ্বারা গ্রথিত—তখনই আমরা অতি সুন্দরভাবে উপলব্ধি করতে পারি প্রলম্বিত বা দীর্ঘস্থায়ী সিয়াম-সাধনা উহার বিশুদ্ধিসাধনে কতটা সহায়ক হতে পারে।

ডাঃ জুয়েলশ, এম, ডি, বলেন ঃ যখনই একবেলা খাওয়া বন্ধ থাকে তখনই দেহ সেই মুহূর্তটিকে রোগমুক্তির সাধনায় নিয়োজিত করে। তাঁর বক্তব্য এবং যুক্তি খুবই মূল্যবান। তিনি বলেন ঃ খাদ্যের পরিপাক এবং সদৃশীকরণের উদ্দেশ্যে যেটুকু শক্তি ব্যয়িত হয়, খাওয়া বন্ধ রেখে আমরা যদি সেই শক্তি অন্যদিকে নিয়োজিত করি তবে দেহের অপ্রয়োজনীয় বিষাক্ত অংশ বিদূরিত করতে পারি। ভুক্তদ্রব্য পরিপাক এবং পরিবর্তন করে উহাকে ৩০ফিট নাড়ীভুঁড়ির ভেতর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যেতে বিরাট শক্তির প্রয়োজন হয়, এবং এর পুরা মাশুল দিতে হয় রক্তবাহী ধমনীকে আর হৃদপিণ্ডকে-এ কার্যসাধনের জন্য যাকে বর্ধিত শক্তি এবং দ্রুত ক্ষয় করতে হয়।

আর এই প্রাণ-শক্তি যদি সংরক্ষণ করা যায় এবং অন্যদিকে অন্য উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা যায়, বিশেষ করে, কোন রোগ নিরাময়ে ব্যবহার করা যায়, তবে আরো বেশী উপকার লাভ করা যাবে। অনেক লোক যারা অলস্য এবং গোড়ামীর আকর এবং যারা অধ্যশন বা অতিভোজন দ্বারা ওদের সংরক্ষিত জীবনী-শক্তিকে ভারাক্রান্ত করে রাখে তারা এক পা এক পা করে আত্মহত্যার দিকে এগিয়ে যায়। এই অধ্যশন ভোজনে যে বিষক্রিয়া উৎপন্ন হয় উহা সমগ্র দেহের স্নায়ুকোষকে বিষাক্ত করে দেয়, ফলে দেহে এক অস্বাভাবিক রকমের ক্লান্তিবোধ এবং জড়তা নেমে আসে।

যখন আমরা খাওয়া বন্ধ রাখি এবং দেহযন্ত্রকে বিরতি দেই তখন দেহে সংরক্ষিত জীবনশক্তির এক নব জীবনের উদ্ভব হয়। এতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় অধ্যশন বা অতি ভোজনজনিত দোষ দ্বারা আমাদের প্রয়োজনের বাইরের কত বড় শক্তির অপচয় করি। রমযানের রোযা দেহযন্ত্রের বিরতিকালে শরীরের অপ্রয়োজনীয় অংশ ধ্বংস করে দেয় এবং দেহের রোগ নিরাময়ে সংরক্ষিত প্রাণ-শক্তির সুব্যবহার হয়। রোযা থেকে জাত এ শক্তিকেই Energy, শক্তি Vigour জীবনীশক্তি Pep বা বল বলা হয়। কারণ রোযা থাকা কালেই এই মুক্ত প্রাণশক্তি দেহযন্ত্র থেকে অনাবশ্যক এবং মৃত জীর্ণ বিষাক্ত পদার্থকণাকে দ্রুত বিদূরিত করে দিয়ে সুস্থ ও সবল পেশীকে কাজ করতে দেয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ড. (Dewey) ডিউ-ই সংক্ষিপ্তভাবে অথচ বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন ঃ জীর্ণ এবং ক্লিষ্ট রুগ্ন মানুষটির পাকস্থলী থেকে খাদ্যযন্ত্র সরিয়ে ফেল-এখন কিন্তু রুগ্ন মানুষটি উপোস থাকছে না সত্যিকাররূপে উপোস থাকছে রোগটি। অথবা চলুন আমরা একটু অনুধাবন করি চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক HIPPOCRATES ডাঃ হিপক্রেট বহু শতাব্দী পূর্বে কি বলেছেন ঃ The more you nourish a diseased body the worse you make it,

Dr. Robert Brtholow, Dr. Issak Jennings, Dr. Graham, Dr. John Cowan, Dr. Sabastian kneipp. Dr. Emment Densmore, Dr. E. H Deway, Dr. Henry Tanner, Dr. Charles E. Page, Dr. Felix Oswald, Dr, Linda Burfield Hazzard, Dr. John Tilden, Dr. Keith, Dr.

Rabagliati, Dr. Augustaine, Dr. Guelpa, Dr. Henrik Stern, Dr. W. Hill, Dr. Lewis, Dr. S. Eckman, Professor F.G. Bendict. Propessor Arnold Ehret, Dr. Lust, Bernarr Macadden the world-famous physical culturist, whose book Fasting for health is oustanding, Cornaro Bacon and any medical doctors, scientists physical culturists, and naturecure doctors have written books on the subject of 'Fasting' but on account of the limited space I cannot mention all their names.

আরো এমন অনেক চিকিৎসাবিদ, শরীরচর্চাবিদ, প্রাকৃতিক চিকিৎসাবিদ আছেন যারা রোযা রমযানের উপকারিতার উপর ভুরি ভুরি বই লিখেছেন, স্থানাভাবে তাদের সবার নামোল্লেখ সম্ভব হলো না। এই ধর্মীয় অনুশাসনটির মর্যাদা এবং মহিমা বুঝাবার জন্য আমি পাঠকবর্গের নিকট এই কয়েকটি নাম উল্লেখ করলাম মাত্র!

শরীরের উপর রোযার অপরাপর প্রতিক্রিয়া পাকস্থলী এবং অন্ত্র

পাকস্থলী এবং অন্ত্রনালীর মধ্যেই সর্বাগ্রে রোযার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। উহারা রোযার মাধ্যমে পূর্ণ বিরতি বা বিশ্রাম লাভ করে। অধ্যশন বা ভুরি ভোজনের ক্লান্তি এবং অবসাদ থেকে উহারা মুক্তি পায় এবং রোযার মাধ্যমে উহারা লুপ্ত শক্তি পুনরুদ্ধারের সময় পায়। আলসার এবং তদজনিত ফুলা রোগ এবং প্রদাহ রোযার ফলে তাড়াতাড়ি উপশম হয়। পাকাশয়ের অপরিমেয় এবং বহুল অনাবশ্যক স্ফীতি এবং শিথিলতা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে এবং উহার প্রকৃত অবস্থা ধারণ করে। ব্যাধিগত ইন্দ্রিয়দৌর্বিল্য এবং অস্বাভাবিক ক্ষুধাবৃত্তি থেকে নিবৃত্তি মিলে। পরিপাকযন্ত্রে জীবাণুর পচনশীলতা দ্রুত এবং নিশ্চিতভাবে দূরীকরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে সিয়ামসাধনা। রোযার মাধ্যমে পরিপাকযন্ত্র এই ভাবে বীজাণুমুক্ত থাকে। ক্ষুদ্র অন্ত্রণালিটিও তখন বীজাণুমুক্ত থাকে। এক সপ্তাহের রোযাই অনেক সময় পাকস্থলীর এইরূপ অবস্থা আনয়নে সক্ষম হয়। মলাশয়কে জীবাণুমুক্ত করতে আরো দীর্ঘ সময় রোযা রাখতে হয়। অবশ্য অন্ত্রের পচনশীলতা অল্প সময়েই কমতে থাকে।

পাকস্থলী একটি বৃহদাকার পেশী বিশেষ ঃ শরীরের অপরাপর পেশীর মতো এরও বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। একে বিশ্রাম দেওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে এর মধ্যে খাদ্য প্রবেশ না করানো, যখনই পাকস্থলীকে খাদ্যমুক্ত রাখা হয় তখনই উহা পূর্বকৃত ক্ষতস্থান নিরাময়ে লেগে যায় এবং পূর্বাবস্থা পুনরুদ্ধারে নিয়োজিত হয়। পাকস্থলী খালি হওয়া মাত্রই উহাতে ক্ষয়পূরণ এবং পুনর্গঠন কাজ শুরু হয়ে যায়। কারণ তখন রুগ্ন এবং জীর্ণ জীবকোষগুলোর স্থলে সুস্থ সবল জীবকোষের আমদানী হয়—উহাই প্রকৃতির নিয়মিত স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া প্রতিনিয়মিত রুগ্ন এবং মৃত জীবকোষকে সুস্থ এবং সবল জীবকোষ পরিণত করা। জীবকোষ অণুকোষের এই যে পরিবর্তন এবং পরিপুষ্টি সাধন ইহা দ্বারা পেশীগুলোও পরিপুষ্ট হয়—আবার পেশীর এই পুষ্টি সাধনে

পাকস্থলী প্রতিনিয়ত নূতনরূপ লাভ করে—এই জন্য পাকস্থলীকে "চির নবীন" আখ্যা দেওয়া যেতে পারে এই জন্যই পাকস্থলী দীর্ঘ দিন যাবত খাদ্য-বস্তু হজম করতে সক্ষম হয় অবশ্য একে অতিরিক্ত খাটানো হয়।

প্লীহা, যকৃত, এবং মূত্রাশয় বা কিড্‌নি

রোযার বিশুদ্ধি সাধন এবং পরিশোধন ক্রিয়া থেকে যকৃত এবং মূত্রশায় বিস্ময়কর উপকারিতা লাভ করে যদিও তাদের উপর বর্তিত এবং আরোপিত কার্যের তালিকা দিবার অগ্রভাগেই কার্য সম্পাদন শুরু হয়। রোযার ফলে অস্বাভাবিকভাবে প্লীহার বর্ধিত অংশ আপনা আপনি কমে আসে। যকৃতের ফোঁড়া রোযা বা উপবাসব্রত যাপনের ফলে চিরদিনের জন্য সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হতে দেখা গেছে। এর জন্য এক মাসের মতো উপবাসের প্রয়োজন হয়। মূত্রাশয়ের নানা প্রকারের উপসর্গ রোযায় নিরাময় হয়। এগুলো কিছুই অসম্ভব বা আশ্চর্য মনে হবে না যখন আমরা বুঝি দেহজ বিষক্রিয়া রমযানের রোযায় দহন করে ফেলে, রমযান মাসে যকৃত সম্পূর্ণ বিশ্রাম বোধ করে এবং মূত্রাশয়েও কোন উত্তেজনার কারণ ঘটে না।

ফুসফুস

ফুসফুস যেহেতু রক্ত পরিশোধনের প্রধান এবং প্রত্যক্ষবাহন রোযার প্রথম সওগাত লাভ করে তাই এই ফুসফুস। ফুসফুসে কোন প্রতিবন্ধক বা বাধা সৃষ্টি হলে রমযানের রোযা উহা দ্রুত দূর করে দেয়। রোযার সময়ে অবাধ গতিতে উহাতে বাতাস প্রবেশ করতে পারে, ফলে মানুষ একটি পরিচ্ছন্ন মুক্তি অনুভব করে, ভাল করে কথা বলবার এবং গান গাইবার শক্তি আসে; সুর প্রলম্বিত এবং গভীর হয়। ফুসফুসে কাসি, লোবার নিউমনিয়া, কঠিন কাসি, সর্দি এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা স্বল্পস্থায়ী রোযায়ই নিরাময় হয়। ফুসফুসে রোগের চিকিৎসকগণ উপবাসকেই বেশি বিধান দিচ্ছেন। এমনকি যক্ষারোগ পর্যন্ত রোযায় ভালো হয়। কারণ অন্তর্নালীতে অস্বাভাবিক পরিমাণের পচন এবং গলন-ক্রিয়া ফুসফুসের ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মাতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী রোযায়, মাঝে মাঝে, কিন্তু স্বল্পস্থায়ী অবিরাম এবং সবিরাম রোযা দ্বারা সুফল পাওয়া গেছে।

যৌন প্রক্রিয়া

রোযা-ভংগের পর একটু পুষ্টিকর এবং উপাদেয় খাদ্য সংযোজিত হলে রোযা দেহের যৌনাংগসমূহকে শুধু সক্রিয়ই করে না, বরং নানান দিক দিয়ে সক্ষম এবং সুঠাম করে তোলে। রক্ত প্রবাহ স্নায়ু, প্রক্রিয়া, রক্ত সঞ্চালন এবং দেহের গ্রন্থিসমূহের উপ রোযার সুফল ও প্রতিক্রিয়া সর্বাধিক। মানুষ এবং প্রাণী উভয়ের দেহ নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে যে রোযা দেহের অনুকোষ এবং গ্রন্থিসমূহের নবযৌবন শক্তি প্রবাহিত করে দেয় এবং বার্ধক্যকে যৌবণে পরিণত করে। রোযার অবসানে দৈহিক কার্যকলাপ উহার সাক্ষ্য বহন করে।

মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র

রোযায় মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্র সর্বাধিক উজ্জীবিত হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উহার প্রমাণ পাওয়া গেছে। মানসিক এবং স্নায়ুবিক বৈকল্যে রোযার উপকারিতা দেখে 'থ'খেয়ে যেতে হয়। পক্ষাঘাত এবং আধা পক্ষাঘাত রোযায় অতি দ্রুত সেরে যায়। স্নায়ুবিক দৌর্বল্য, এমন কি অনেক সময় উন্মত্ততা রোযায় ভাল হয়। ধ্যান-ধারণা রোযায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সহজ হয়। মস্তিষ্কের অবসাদ বিদূরিত হওয়ায় সুদীর্ঘ অনুচিন্তন এবং গভীর ধ্যান সম্ভব হয়। কারণ মুক্ত রক্তপ্রবাহ স্নায়ুবিক যন্ত্রের অবগাহন ঘটায় এবং মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম অনুকোষগুলো জীবাণুমুক্ত ও সবল হয় এবং এই অবস্থা মস্তিষ্কে অধিক শক্তি এবং স্নায়ুশক্তি প্রদান করে। মনের উপরও রোযার প্রভাব অসীম। কারণ মনই মস্তিষ্ককে নব নব অভিব্যক্তি প্রকাশে ব্যবহার করে আর মস্তিষ্কের সমুন্নত এবং সমৃদ্ধ অবস্থাই সূক্ষ্ম মন এবং কল্যাণকামী দৃষ্টিভংগির জনক।

দুঃখবাদ বা PESSIMISM

MAX NORDEN-এর মতে দুঃখবাদ বা PESSIMISM-এর বাড়ীঘর হচ্ছে মানবদেহ। DR. ALEX HEIG বলেন ঃ

"রোযা হতে মানুষের মানসিক শক্তি এবং বিশেষ বিশেষ অনুভূতিগুলো উপকৃত হয়—স্মরণশক্তি বাড়ে, মনোসংযোগ এবং যুক্তি শক্তি পরিবর্ধিত হয়। প্রীতি, ভালবাসা, সহানুভূতি, অতীন্দ্রিয় এবং আধ্যাত্মিক শক্তির উন্মেষ ঘটে"। রোযার এই সব সুফল রোগীর মনে নব আশার সঞ্চার করে-পক্ষান্তরে দৈহিক বলও তারা লাভ করে। তাদের মানসিক শক্তির এতটা বিকাশ ঘটে যে তাদের মনে নব বল নব আশা এবং নব উদ্যম সৃষ্টি হয় এবং যে কোন অসম্ভবকে সম্ভব করার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে। রোযার ফলে কতকগুলো সূক্ষ্ম অনুভূতির বিকাশ ঘটে এবং ঘ্রাণশক্তি ফিরে পায়, অনেককে দেখা গেছে রোযা রাখার আগে যারা চশমা ব্যবহার করতো রোযার পরে দৃষ্টিশক্তি আরো তীব্র হয়েছে। অনেক স্থলে রোযার ফলে অন্ধতা ঘুচে গেছে। শ্রবণশক্তি, রোযা রাখার ফলে অনেক সময় শতগুণ বেড়ে গেছে। অনেক রকম আধা বধিরতা রোযায় সেরে গেছে। ইহা এজন্যে সম্ভব যে রোযায় অভ্যন্তরীণ কানের পর্দা আবিলতামুক্ত হয়, কানে তখন বায়ুর অনুপ্রবেশ সহজ হয়। এবং কর্ণ-কটাহে বায়ুর মুক্ত অনুরণন সম্ভব হয়। সর্দিজনিত বধিরতা রোযায় নিরাময় হয়। রোযা খাদ্যে অরুচি এবং অনিচ্ছা বিদূরিত করে। অস্থি ফুলা এবং দন্তরোগ রোযায় নিরাময় হয়। রোযা শরীরের রক্তের প্রধান পরিশোধক। দেহের রক্তের পরিশোধন এবং বিবশুদ্ধিসাধন দ্বারা দেহ প্রকৃত পক্ষে উহার জীবনী শক্তি লাভ করে।

যারা রুগ্ন তাদেরকেও আমি রোযা রাখতে বলি। আপনার রোগ সাধারণ বা সাংঘাতিক হোক, স্বল্পস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী হোক, আপনার শরীরের রক্ত সঞ্চালন এবং জলীয় প্রবাহ যদি সঠিক এবং সুনিয়মিত রাখা যায়, তবে আপনা আপনি, নীরোগ জীবন যাপন করিতে সক্ষম হবেন। দেহ যখন জীবাণু এবং বিষমুক্ত থাকে এবং দেহ-যন্ত্র এবং ধমনী চালু থাকে সেটাকেই স্বাস্থ্য বলা হয়।

অনুবাদ ঃ অধ্যাপক মহিউদ্দীন আহমদ

কুরবানী ঃ ইতিহাস ও তাৎপর্য*

সৈয়দ আজীজুর রহমান

ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবনের সমন্বয় এবং যুগপৎ উৎকর্ষ সাধনের অবিরাম ও নিরলস প্রচেষ্টাই হচ্ছে ইসলামী জীবনাদর্শের মূল লক্ষ্য। ইসলামী জীবন-বোধ যেমন প্রতিনিয়ত আখেরাত-সচেতন করে তোলে, তেমনি ইহলৌকিক জীবনেও সাফল্য অর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। পরিপূর্ণ ইসলামী জীবনাদর্শের প্রতীক হযরত রাসূল-ই-আকরম (সা) পার্থিব জীবনে যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন তার যেমন কোন নযীর নেই তেমনি আধ্যাত্মিক জগতের মহিমান্বিত আসনে তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই।

কিন্তু এই মহান জীবনাদর্শের অনুসরণের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় দৃশ্যমান জগতের প্রত্যক্ষ ধন-সম্পদের অধিকার ও ভোগবিলাসের লালসা আর সন্তান-সন্ততি স্ত্রী-পরিজনের স্নেহ-মমতা-জনিত মায়ার বাঁধন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই সমস্ত উপকরণাদি থেকে মন ও মননকে উর্ধ্বে তুলে এক নিরাকার সত্তার সন্ধানে অধ্যাত্মজগতে একনিষ্ঠ বিচরণ করে পরোক্ষ পারলৌকিক জীবনে সাফল্য লাভ অত্যন্ত দুরূহ নয় কি?

এই অতীব সংগ্রামী জীবন-পদ্ধতিতে অভ্যস্ত ও পারদর্শী হওয়ার জন্য তাই প্রয়োজন অনুশীলনের। প্রয়োজন একাগ্রচিত্তে নিয়মতান্ত্রিক জীবন-যাপনের। ত্যাগ ও তিতিক্ষার মাধ্যমে পার্থিব সম্পদ ও ভোগবিলাস পরিহার করার প্রবণতা সৃষ্টির এই অনুশীলনীর প্রধান লক্ষ্য।

সালাত, রোযা, হজ্জ, যাকাত এবং সৎকাজে আহ্বান ও অসৎকাজ পরিহারের যে নির্দেশমালা তা এই জীবনব্যবস্থায় অভ্যস্থ হওয়ার সোপান-স্বরূপ। হজ্জ এবং ঈদুল আযহার এক অপরিহার্য অঙ্গ—কুরবানী ত্যাগ ও তিতীক্ষার এক উজ্জ্বলতম নিদর্শন। হযরত মুহাম্মদ (সা) প্রবর্তিত অন্যান্য নিয়মাবলীর সাথে এর উৎপত্তি অনেক গভীরে। বস্তুতপক্ষে আদম (আ)-এর সৃষ্টির সাথে সাথে ইসলামী জীবনাদর্শের রূপরেখা তৈরী হয়েছে আর তা পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিগ্রহ করেছে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা (সা)-এর জীবদ্দশায়।

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে দীন মনোনীত করলাম।" (৫ ঃ ৩)

---

* [প্রবন্ধটি ইফা পত্রিকার ১৯৮৫ সন ২৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা থেকে সংগৃহীত]

আল্লাহ্‌র অনুগত সকল মানবগোষ্ঠীর পিতা বলে বর্ণিত হযরত ইব্‌রাহীম (আ) এই কুরবানীর প্রবর্তক, যেমন তিনি পবিত্র কা'বাগৃহের প্রতিষ্ঠাতা। আর রাসূল (সা)-এর আবির্ভাব তাঁরই দোয়ার ফলশ্রুতি।

"স্মরণ কর যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কাবা ঘরের প্রাচীর তুলছিল তখন তারা বলেছিল ...' 'হে আমার প্রতিপালক! আমাদের দু'জনকে তোমার একান্ত অনুগত কর আর আমাদের বংশধর থেকে তোমার একান্ত অনুগত এক উম্মত তৈরী কর। আমাদের ইবাদতের নিয়মপদ্ধতি দেখিয়ে দাও আর আমাদের প্রতি ক্ষমা পরবশ হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু।' হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে এক রাসূল প্রেরণ কর যিনি তোমার আয়াত তাদের কাছে আবৃত্তি করবেন; তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন আর তাদের পবিত্র করবেন। তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (বাকারা ২ ঃ ১২৭-২৯)

আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাঁর শর্তহীন আনুগত্য ও প্রেমের অগ্নীপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ)-কে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কুরবানী করতে উদ্যোগী হয়ে।

"সে বলল, আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম, তিনি আমাকে অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করবেন; হে আমার প্রতিপালক ঃ আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দাও। তারপর আমি তাকে এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুখবর দিলাম। তারপর তখন পিতার সাথে কাজ করার মত তার বয়স হ'ল তখন ইবরাহীম বললো, 'বাছা! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ করছি, এখন তোমার অভিমত কি বল?' সে বলল 'হে আমার পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে তাই করুন। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্য্যশীল পাবেন।" (৩৭ ঃ ৯৯-১০২)

যখন তারা দু'জন আনুগত্য প্রকাশ করল ও ইবরাহীম তার পুত্রকে কাত করে শুইয়ে দিল তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, "হে ইবরাহীম ! তুমি ত স্বপ্নের আদেশ সত্যিই পালন করলে। এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই এ ছিল এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাকে ছাড়িয়ে নিলাম এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে।" —[৩৭ ঃ ১০৩-১০৭]

এভাবে সম্পন্ন হ'ল ইবরাহীম (আ)-এর আল্লাহ্ প্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় সফল উত্তরণ-পর্ব। আর এই সাফল্য ও সার্থকতার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতার প্রতীক হিসেবে তিনি বৎসরান্তে ১০ই জিলহজ্জ তারিখে এই কুরবানী এক নিয়মিত অনুষ্ঠানে পরিণত করলেন।

আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পবিত্র হজ্জ ও ঈদুল আযহা উপলক্ষে যে কুরবানীর প্রথা প্রবর্তন করেছেন তা নতুন কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয় বরং মুসলিম মিল্লাতের পিতৃ-পুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কুরবানীরই অনুসৃতি। রাব্বুল 'আলামীনের নৈকট্য লাভ আর তাক্‌ওয়া হাসিলের জন্য হযরত ইবরাহীম (আ)-এর

নযীরবিহীন ত্যাগ ও তিতিক্ষার অনুশীলনই কুরবানীর অন্তর্নিহিত শিক্ষা।

দুদিনের দুনিয়ার মায়াজালে জড়িয়ে মানুষ পরম প্রেমময়কে বিস্মৃত হয়ে চরম দুর্দশার মধ্যে নিপতিত হয়। একটি তুচ্ছ বাঁশী কখনও ভুলে যায় না তার উৎসের কথা। কবে একদিন ঝাড় থেকে কেটে আনা হয়েছিল বাঁশের বাঁশীটি। আজীবন সেই বিচ্ছেদ-বেদনার মূৰ্চ্ছনা কান্না হয়ে ঝড়ে পড়ে বাঁশীর সুরে সুরে। অথচ দুনিয়ার মোহ-মায়ায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে মানবসন্তান মুহূর্তে ভুলে যায় তার সৃষ্টির আদি উৎসের কথা। ক্ষণিকের এই জীবনের মায়ার বাঁধন কাটিয়ে আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া হাসিলের মধ্যেই রয়েছে যে তার প্রকৃত মুক্তি বাঁশীর কান্নার মত সেই উপলব্ধিই তো তাকে দিতে পারে প্রকৃত পথের সন্ধান।

এক অপরিসীম ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কুরবানীর অনুসরণ করে আমরা মিল্লাত-ই-ইবরাহীমে সামিল হয়েছি। হযরত ইবরাহীম (আ) প্রবর্তিত হজ্জ ও কুরবানী এই দুই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলামী জীবনাদর্শ কাল পরিক্রমায় এগিয়ে চলেছে। রাসূল (সা) প্রচারিত এক নতুন দীন না হয়ে ইসলাম দুনিয়ার মাঝে আল্লাহ্ প্রেরিত এক শাশ্বত হেদায়েতের পথ বলে চিহ্নিত হয়েছে।

লক্ষ্যণীয় যে হজ্জে অনুসৃত রীতিনীতির অনেকগুলিই হযরত ইবরাহীম ও ইসমাইল (আ)-এর পবিত্র স্মৃতিকে যুগ থেকে যুগান্তরে স্মরণীয় করে রেখেছে। নির্বাসিত মিসরীয় রাজকুমারী বিবি হাজেরার গর্ভ থেকে ধূধূ মরুভূমির মধ্যে হযরত ইসমাঈল (আ) ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় এক ফোঁটা পানির খোঁজে বিবি হাজেরা সাফা মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাত বার দৌড়েছিলেন। তাই এই পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাত বার দৌড়ান হজ্জের একটি প্রধান রীতিতে পরিণত হয়েছে। মরুভূমির মাঝে শিশু ইসমাঈলের পায়ের আঘাতে সৃষ্ট সেদিনের ঝর্ণ-ধারা সারা বিশ্বের মুসলমানের কাছে আজ এক অতি পবিত্র পানীয়ের উৎস। কুরবানীর উদ্দেশ্যে যাত্রাপথে হযরত ইসমাঈল (আ) কুমন্ত্রণাদাতা শয়তানের উদ্দেশ্যে সাত বার পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন। এই পাথর নিক্ষেপের প্রক্রিয়াটি কুরবানীর সাথে সাথে হজ্জের অপরিহার্য রীতিতে পরিণত হয়েছে। বাব-ই-ইবরাহীমে দু'রাকাত সালাত আদায়ের মাধ্যমে হাজীগণ হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

পবিত্র কা'বা ঘরের ভিত্তি স্থাপনকালে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঐতিহাসিক দোয়ার কবুলিয়াত হিসাবে আল্লাহ্‌র অফুরন্ত নিয়ামতের ভাণ্ডার সেই কুরআনী হুকুমতের দাওয়াত নিয়ে এলেন আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা (সা)। সত্য ও ন্যায়ের বাণী প্রচার করলেন শান্তির দূত--তওরাত, যাবুরের সেই প্রতিশ্রুত রাসূল। অবসান হ'ল প্রতিশ্রুত মহামানবের আগমনের যুগ-যুগান্তরব্যাপী প্রতীক্ষার আর সূচনা হ'ল মিল্লাত-ই-ইবরাহীমের জন্য কুরআনী হুকুমতের এক স্বর্ণযুগের।

উল্লেখ্য যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আওলাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় পরিষ্কার দুটি ধারা। একটি বিবি সারার গর্ভজাত সন্তান-সন্ততির ধারা অপরটি বিবি হাজেরা-তনয়

হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশ-ধারা। সারার সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে হযরত ইয়া'কুব (আ) বনি ইসরাইলের পিতৃপুরুষ। এই ধারায় এসেছেন একের পর এক নবী-রাসূল। প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পরবর্তীকালে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত সমুদয় নবীই বনি ইসরাইলের বংশোদ্ভূত। আল্লাহর এই উপর্যুপরি নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পরিবর্তে বারবার তারা বিপথগামী হয়েছে, বিরোধিতা করেছে নবীদের, হত্যা করেছে আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষদের, বারবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে করেছে আল্লাহ্‌র পবিত্র আমানতের খেয়ানত। তাই বারবার তারা চিহ্নিত হয়েছে, নিগৃহীত হয়েছে অভিশপ্ত জাতি হিসেবে।

বনী ইসরাইলের এই পৌনঃপুনিক সীমালংঘনের ফলে তাই তাদের বংশীয় ধারায় আল্লাহ্‌র নিয়ামত রুদ্ধ হ'ল হযরত ঈসা (আ)-এর নির্যাতনের সাথে সাথে। প্রতিশ্রুত আখেরী নবী এলেন বিবি হাজেরা-তনয় যবীহুল্লাহ্ হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশীয় ধারা থেকে। বোধ করি এখানেই সূচনা হ'ল ইয়াহূদীদের যুগ-যুগান্তরের ইসলাম বিরোধী তৎপরতায়।

কুরবানী তাই কেবলমাত্র হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ত্যাগ ও তিতীক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না। সেই সাথে স্মরণ করিয়ে দেয় আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতের পরিপূর্ণতায় ইবরাহীম (আ)-এর ঈপ্সিত সেই মহামানবের আবির্ভাবের কথা। স্মরণ করিয়ে দেয় আল্লাহ্‌র বিধি-নিষেধের খেলাফের জন্য বনি ইসরাইলের যুগে যুগে চরম দুর্দশায় নিপতিত হওয়ার কথা আর স্মরণ করিয়ে দেয় কুরআনী হুকুমতের সূচনায় কল্যাণধর্মী বিশ্বজনীন জীবন-ব্যবস্থার এক স্বর্ণযুগের দ্বারোদ্ঘাটনের কথা।

হজ্জ ঃ একটি পবিত্র বিশ্ব-অনুষ্ঠান*

ড. সিকান্দার ইব্রাহিমী

হজ্জ কি

দীন ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদী রুকনের মধ্যে হজ্জ একটি বিশিষ্ট রুকন। ইহা সওম ও সালাতের মত প্রত্যেকের উপর ফরয নয়। কেবল তাঁদের জন্য জীবনে একবার ফরয যাঁদের মক্কা মু'আজ্জমায় গিয়ে কা'বাঘর জিয়ারতের সহায়-সম্বল ও শক্তি আছে। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম থেকে আরম্ভ করে যুগে যুগে চলে আসছে হজ্জের এই রীতি। মহাবিজ্ঞানময় আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে হযরত ইবরাহীম (আ) পৃথিবীর জনগণকে ডাক দিয়েছিলেন কা'বা ঘরে এসে হজ্জ আদায় করতে। কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে বর্ণনা করেছেন।

وَأَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ- لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِىْ أَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوْا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَآئِسَ وَالْفَقِيْرَ-

"জনগণের মধ্যে হজ্জের ডাক দাও। তা হলে তারা পায়ে হেঁটে এবং শীর্ণ উটের পিঠে চড়ে পৃথিবীর দূর দূরান্তর থেকে আসতে থাকবে। এখানে এসে তারা দেখতে পাবে তাদের জন্য কত লাভের ব্যবস্থা রয়েছে। আর তারা নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্‌র নামে কুরবানী করবে। তা হতে নিজেরাও খাবে এবং দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদেরকেও খেতে দেবে।"[১] হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ডাকে সাড়া দিয়ে লোকজন বহু দূর দূরান্তর থেকে ছুটে আসছিল কেউ পায়ে হেঁটে আর কেউ উটের পিঠে সাওয়ার হয়ে। এতদূর থেকে লোকেরা উটের পিঠে সাওয়ার হয়ে আসছিল যে চলতে চলতে উটই শুকিয়ে গিয়েছিল।

এভাবে লোকদেরকে ডাক দেওয়ার আগে হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) পিতাপুত্র মিলে কা'বা ঘর নির্মাণ করেছিলেন এবং এ কেন্দ্রের দিকে সবাইকে

---

* [প্রবন্ধটি ইফা পত্রিকা ১৯৮৩ সন ২৩ বর্ষ ১ম সংখ্যা থেকে সংগৃহীত]

১. আল-কুরআন, ২২ ঃ ২৭

আহ্বান করেছিলেন। এ ঘটনা উল্লেখ করে কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন।

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَاعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

"আর স্মরণ কর যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল এ ঘরের ভিত্তি গড়ে তুলেছিল এবং দো'য়া করে বলেছিল, 'হে পরওয়ারদিগার, আমাদের এ কাজ তুমি কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি সবকিছু শুন এবং জান। হে পরওয়ারদিগার, আমাদের দু'জনকেই মুসলিম অর্থাৎ তোমার অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর থেকে এমন একটি জাতি তৈরী কর যারা তোমারই অনুগত হবে। আমাদেরকে তোমার ইবাদত বন্দেগী করার নিয়ম-কানূন দেখিয়ে দাও এবং আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি বড় ক্ষমাশীল ও দয়াপরায়ণ।'"[২]

পিতা-পুত্রের এ দো'য়া আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করেছিলেন এবং এ ঘরটিকে মানব জাতির জন্য একটি কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কুরআন মজীদে একথারও স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ.

"আর যখন আমি এ ঘরটিকে মানব জাতির কেন্দ্র ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল বানিয়েছিলাম এবং ইবরাহীম এর দাঁড়াবার স্থানকে জায়নামায বানানোর নির্দেশ দিয়েছিলাম। আর ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে বহিরাগত ও স্থানীয় রুকু সিজদাকারীদের জন্য আমার ঘরখানা খুব পাক সাফ করে রাখতে বলেছিলাম।"[৩]

কা'বা ঘরের প্রতিষ্ঠাতা

উপরোল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে কা'বা ঘরের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইবরাহীম (আ)। আর সাধারণত একথাই বলা হয়, 'মাসজিদুল হারাম' বা কা'বা ঘরের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইবরাহীম (আ) এবং 'মাসজিদুল আকসা' বা 'বায়তুল মুকাদ্দাস' এর প্রতিষ্ঠাতা হযরত সুলায়মান (আ)। কিন্তু সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফের একটি হাদীসের বর্ণনা মতে একথা মেনে নেয়া যায় না। হাদীসটি 'বুখারী' ও

---

২ আল-কুরআন, ২ঃ১২৭, ১২৮

৩. আল-কুরআন, ২ঃ১২৫

'মুসলিম' হতে মিশকাতুল মাসাবীহ্ গ্রন্থে উৎকলিত হয়েছে।

عن ابی ذر رضی الله عنه قال قلت یا رسول الله ای مسجد وضع فی الارض اول قال المسجد الحرام قال قلت ثم ای قال المسجد الاقصی قلت کم بینهما قال اربعون عاما ثم الارض لك مسجد فحیثما ادرکتك الصلواة فصل-

আবু যর (রা) হতে বর্ণিত আছে-- তিনি বলেন যে, আমি বললাম-ইয়া রাসূলাল্লাহ্ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন মসজিদ নির্মিত হয়েছে? তিনি বললেন, 'মাসজিদুল হারাম'। তিনি (আবু যর) বলেন— আমি আরয করলাম, তারপর কোন্‌টি? তিনটি বললেন- মাসজিদুল আকসা।' আমি বললাম, এর মধ্যে ব্যবধান কত? তিনি উত্তরে বললেন, চল্লিশ বছর। অবশ্য সমস্ত জমিনই তোমার জন্য মসজিদ। অতএব যেখানেই সালাতের সময় উপস্থিত হয়, সেখানেই আদায় কর।[৪]

মাসজিদুল হারাম বা কা'বা ঘর যে পৃথিবীতে প্রথম ঘর তা কুরআন মজীদেও পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে।

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِيْنَ-

'নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম ঘর যা জনগণের জন্য নির্মিত হয়েছে, তা হল মক্কার কা'বা ঘর যা অত্যন্ত পবিত্র বরকতময় ও বিশ্ববাসীর জন্য পথ-প্রদর্শকের কাজ করে।'[৫]

কা'বা ঘর যখন পৃথিবীতে প্রথম ঘর যা আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই বলেছেন--তখন এ ঘরের প্রতিষ্ঠাতা বা প্রথম স্থাপয়িতা হযরত ইবরাহীম (আ) হতে পারেন না। কেননা এটা ঐতিহাসিক সত্য যে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বেও পৃথিবীতে ঘরবাড়ী ছিল। আর দ্বিতীয়ত, সহি হাদীসে বলা হয়েছে যে 'মাসজিদুল হারাম' ও 'মাসজিদুল আকসা' এ দু'টি মসজিদের প্রতিষ্ঠার মধ্যে ব্যবধান চল্লিশ বছর। অথচ ইবরাহীম (আ) ও হযরত সুলায়মান (আ)–এর মধ্যে কালের ব্যবধান হাজার বছরের। সুতরাং তাঁরা কেউই এ মসজিদের কোনটিরই প্রতিষ্ঠাতা হতে পারেন না।

আসল ঘটনাটি এই যে পৃথিবীর প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ) পৃথিবীতে এসে যখন মক্কায় ছিলেন, তখন তিনি আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে সেখানে প্রথম ঘর নির্মাণ করলেন। তার চল্লিশ বছর পর যখন তিনি জেরুজালেম গেলেন, সেখানে তিনি মসজিদুল আকসা বা বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করেন। তাই এ দুটি ঘরের প্রতিষ্ঠার মধ্যে সময়ের ব্যবধান হয়ে যায় চল্লিশ বছরের। এরপর হযরত নুহ্ (আ)-এর সময়

৪. ওয়ালীউদ্দিন মুহাম্মদ, মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ, করাচী, ১৩৬৮ হি., পৃ. ৭২

৫. আল কুরআন, ৩ ঃ ৯৬

বিখ্যাত মহা প্লাবনে এ দুটি ঘরই বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এরপর যখন হযরত ইবরাহীম (আ) নবুওয়াত প্রাপ্ত হলেন এবং প্রচলিত মূর্তি পূজার অসারতা প্রমাণ করে আল্লাহ্র বান্দাদেরকে আল্লাহ্ প্রদত্ত দীনের দিকে আহ্বান করলেন, তখন তাঁর উপর যেন বালা মুসিবতের পাহাড় ভেঙে পড়ল। পিতা আজরসহ নমরূদের লোকজন তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠল। কাফির ও অহঙ্কারী বাদশাহ্ নমরূদ তাঁকে কঠিন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল। আল্লাহ্র হুকুমে এ বিপদ হতে মুক্তি পেয়ে হযরত ইবরাহীম (আ) দেশ ত্যাগ করলেন এবং মক্কা মু'আজ্জামাকে কেন্দ্র করে মূর্তি বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুললেন। এ সময়ই হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল--দুই পিতা-পুত্র মিলে কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) যে কা'বা ঘরকে পুনঃনির্মাণ করলেন তা ঠিক হযরত আদম (আ) কর্তৃক নির্মিত প্রথম ঘরেরই চিহ্নের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠল এবং এ চিহ্ন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই দেখিয়েছিলেন। কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা সে কথার উল্লেখ করেছেন।

وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ-

'এবং স্মরণ কর, যখন ইবরাহীমের জন্য এ ঘরের স্থান চিহ্নিত করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে এখানে কোন প্রকার শিরক কর না। আর আমার এ ঘরকে তাওয়াফকারী ও সালাত আদায়কারীদের জন্য পাক সাফ করে রাখ।'[৬]

তা হলে এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, কা'বা ঘরের ভিত্তি নির্মাতা, প্রতিষ্ঠাতা হযরত আদম (আ)। তারপর বিশ্বজুড়ে মহাপ্লাবনে বিধ্বস্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পর হুবহু সেই স্থানেই আল্লাহ্র দেখানো চিহ্ন ও তাঁরই নির্দেশ মত হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) ঘরটি পুনঃনির্মাণ করেন।

বিশ্ব-মুসলিম কেন্দ্র

এভাবে হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) কা'বা ঘরকে সারা বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্ররূপে গড়ে তুললেন। সুতরাং কা'বা ঘর যেমন ভৌগলিক দিক দিয়ে সমগ্র পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল, তেমনি উহা তাওহীদী আন্দোলনেরও কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল। আর এর নির্মাণের উদ্দেশ্যই ছিল যে পৃথিবীর দূর-দূরান্ত থেকে তাওহীদী জনতা এখানে সমবেত হয়ে একাত্মতা ঘোষণা করে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের আদর্শ কায়েম করবে। তারা আবার এ বিশ্ব সম্মেলন থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়বে এবং তাওহীদের আদর্শ পৃথিবীতে কায়েম রাখবে।

হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) যে আদর্শ রেখে গেলেন, তাঁদের অনুসারীরা ও বংশধররা তা কিছুকাল যাবত ধরে থাকলেও পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর

৬ আল-কুরআন, ২২ : ২৬

মধ্যেই তারা আবার মূর্তিপূজা আরম্ভ করল এবং এই কা'বা ঘরের মধ্যেই মূর্তি স্থাপন করে পূজা করতে আরম্ভ করল। এমন কি হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর মূর্তিও তারা তৈরী করল এবং পূজতে আরম্ভ করল। তারা আল্লাহ্ আছেন বলে বিশ্বাস করত কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন কাজের মধ্যে বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রভাব আছে বলে মনে করত। আর এ কারণেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজে তারা দেব দেবীর-পূজা দিত।

কা'বা ঘর তৈরী করার সময় হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে দো'য়া করে বলেছিলেন।

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

'হে পরওয়ারদিগার, তুমি সেই জাতির প্রতি এমন একজন নবী পাঠাইও যিনি তাদের কাছে তোমার বাণী পড়ে শুনাবেন। তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দিবেন এবং তাদের চরিত্র সংশোধন করবেন।'[৭] এই দো'য়া আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে কবুল হয়েছিল। তাই এ বংশেই দীন ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী রাহমাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম জন্মগ্রহণ করলেন।

তাওহীদী আন্দোলন

চল্লিশ বছর বয়সে নবূওয়াত প্রাপ্তির পর তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর তাওহীদী আন্দোলন পুনর্জীবিত করলেন। আস্তে আস্তে লোকজন তাওহীদী পতাকাতলে সমবেত হতে লাগল। দীর্ঘ ২১ বছর দৃঢ়ভাবে তোওহীদী আন্দোলন চালানোর পর কা'বাঘরে রক্ষিত সমস্ত মুর্তি ধ্বংস করে এ ঘরকে একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ইবাদতের কেন্দ্রে পরিণত করলেন। তিনি লোকদেরকে তাওহীদের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্য কা'বা ঘরের দিকে আহবান করলেন। আল্লাহ্র বাণীর ঘোষণা শুনিয়ে তিনি বললেন-- হজ্জ করা যার উপর ফরয অর্থাৎ কা'বা ঘর পর্যন্ত গিয়ে হজ্জের অনুষ্ঠানে যোগদান করার শক্তি সামর্থ্য যার আছে, সে যদি হজ্জ না করে তা হলে সে ইহূদী হয়ে মরুক বা নাসারা হয়ে মরুক, তাতে কিছু আসে যায় না।'

আল্লাহ্ ও রাসূলের এ সমস্ত বাণী থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে হজ্জ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান এবং হজ্জের সফরও একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সফর। কেননা এ সফরে মানুষ সব রকম স্বার্থত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যেই নিজের সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, বাড়ী-ঘর এবং নিজের আরাম-আয়েশ সব কিছু ত্যাগ করে একটি দীর্ঘ সফরে বের হয়। এ সফর মানুষ সুষ্ঠুভাবে তখনই আন্‌জাম

---

৭. আল-কুরআন, ২ঃ ১২৯

দিতে পারে যখন মানুষের মধ্যে আল্লাহ্-প্রেম এবং খালিক'-মালিকের প্রতি ভয় ও আগ্রহ জেগে উঠে। আর এ অবস্থাতেই মানুষ বলতে পারে, 'লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক, লা শরীকা লাকা লাব্বায়েক। ইন্নাল্ হাম্দা ওয়ান্নি'মাতা লাকা আল-মুল্কা লা শরীকা লাকা- 'হে আল্লাহ্, আমি হাযির হয়েছি। তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি। তোমার কোন শরীক নেই। তুমি, এক আল্লাহ্র কাছে আমি হাজির হয়েছি। যত প্রশংসা আর যত নি'য়ামত, সব তোমারই এবং তুমিই সব কিছুর মালিক।'

বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব সম্মেলন

এভাবে একই সময়ে একই বেশে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের, বিভিন্ন বর্ণের ও বিভিন্ন বয়সের মানুষ একত্রিত হয়ে যখন আল্লাহ্র ঘর তাওয়াফ করে এবং বিশাল আরাফাত ময়দানে সমবেত হয়ে একাত্মতা ঘোষণা করে, তখন মুসলিম ভ্রাতৃত্বের পূর্ণ আদর্শ বিশ্বের মানুষের সামনে জেগে ওঠে। এরপর সমস্ত হজ্জ যাত্রীরাই আরাফাত থেকে মুজদালিফায় পৌছেন। আর সাফা মারওয়ার মধ্যে দৌড়িয়ে বিবি হাজেরা ও তাঁর পুত্র স্নেহের আদর্শ পুনর্জীবিত করেন। তাঁরা মিনাতে গিয়ে পশু কুরবানী করে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র কুরবানীর ও ত্যাগের আদর্শ মানসপটে জাগিয়ে তোলেন।

উপরের আলোচনায় একথা পরিষ্কার বুঝা গেল যে, হজ্জ এমনি একটি অনুষ্ঠান যার মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবী হতে আগত মুসলমানরা নিদিষ্ট সময়ে নির্দষ্ট নিয়ম-কানুনের মধ্য দিয়ে সমবেত হন নির্দিষ্ট স্থানে। এতে যেমন তাওহীদে বিশ্বাসী বিশ্বের ইসলামী জনতা একই সঙ্গে, একই বেশে ও একই উদ্দেশ্যে মহান খালিক-মালিক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে হাজির হয়ে পূর্ণ আত্মসমর্পণের আদর্শ কায়েম করতে পারেন, তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের লাখো লাখো হজ্জযাত্রী একে অন্যের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বন্ধন মযবুত করতে পারেন। আর এর মাধ্যমেই বিশ্ব-মুসলিম সমাজ গড়ে উঠতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁদের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিগণ সেখানে একত্রে সমবেত হয়ে পরস্পর মত বিনিময় করতে পারেন—পারেন পৃথিবীর বিভিন্ন সমস্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করে ইসলামী বিধানের আলোকে তার সমাধান বের করতে—পারেন অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে জোর আওয়ায তুলতে।

এভাবে আল্লাহ্র বিধান মতে একটি বিশ্ব মুসলিম খিলাফত কায়েম হতে পারে। বস্তুত এরকম একটি বিশ্ব মুসলিম খিলাফতের জন্যই আল্লাহ্ তাঁর সেরা সৃষ্টি মানবজাতি সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন কুরআনের ভাষায়[৮] إِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ

---

৮. আল-কুরআন, ২ঃ৩০

خَلِيْفَةً [নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে খলীফা বা প্রতিনিধি বানাতে চাই]। তাই হযরত আদম (আ) থেকে আরম্ভ করে যত নবী রাসূল এসেছেন, সকলেই পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র খিলাফত কায়েম করতে চেয়েছেন। বিশ্বনবী রাহমাতুল্লিল আলামীন সর্বশেষে এসে সমগ্র বিশ্বের জন্য এক ইসলামী খিলাফত কায়েম করে গেছেন; যা তাঁর অনুসারী ও অনুগামী সাহাবা-ই-কিরাম কায়েম রেখেছেন বহুদিন যাবত। তারপর আবার মানুষের চিরশত্রু আযাযীল শয়তানের ধোঁকায় পড়ে মুসলমানরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا [তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জু একত্রিত হয়ে আঁকড়ে ধর আর বিচ্ছিন্ন হয়ো না][১]—এ আয়াতের স্পিরিট গ্রহণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। যার ফলে পৃথিবীর মুসলমানদের মধ্যে নেমে এসেছে চরম অশান্তি।

হজ্জের এ বিশাল বিশ্ব ইজতেমার মাধ্যমেই সেই ঐক্য গড়ে উঠতে পারে। এই বিরাট ইজতেমা বা বিশ্ব সম্মেলন প্রত্যেক বছর একবার অনুষ্ঠিত হওয়ায় বিশ্ব মুসলিম জনতার মধ্যে কোন রকম ভুল বুঝাবুঝি হলে তা নিরসন করার সুযোগ পাওয়া যায়—পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজনের আচরণের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হওয়া যায়। এত বিরাট ইজতিমা প্রত্যেক বছরই নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত হয় অথচ এর জন্য বিশেষ কোন নোটিশ দিতে হয় না। ঢাক-ঢোল পিটাতে হয় না বা তেমন বিশেষ প্রচার-প্রোপাগাণ্ডাও করতে হয় না। কখন, কোথায়, কিভাবে অনুষ্ঠিত হবে সে সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত নিতে হয় না। আর আল্লাহ্-প্রদত্ত এ রকম ব্যবস্থা আছে বলেই বিনা দ্বিধায় সকলেই এটা মেনে নেয়। এ রকম আল্লাহ্-প্রদত্ত ব্যবস্থা না থাকলে এত সহজে এ পর্যায়ের একটা বিশ্ব মুসলিম সম্মেলন কিছুতেই অনুষ্ঠিত হতে পারত না।

এভাবে হজ্জের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে তাঁরা এ কথাই প্রমাণ করে দেন যে হযরত ইবরাহীমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলমানরা আজ সারা বিশ্বে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পূর্ণ আত্মসমর্পণের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও সৌন্দর্য্য হাসিল করতে চান। আর তা হাসিল করার যে একমাত্র পথ তাওহীদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী আইন-কানুন মেনে চলা, তা তাঁরা সমগ্র পৃথিবীর লোককে দেখিয়ে দিতে চান। এ রকম একটি সফরের সব নিয়ম পদ্ধতি মেনে চলে এ পবিত্র বিশ্ব সম্মেলনে যোগদান করে হজ্জ যাত্রীরা এটাই প্রমাণ করেন যে তাঁরা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের হুকুম মেনে নিতে গিয়ে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত।

---

১ আল-কুরআন, ৩ ঃ ১০৩

বিদ্'আত ঃ তাত্ত্বিক পর্যালোচনা*

ড. মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক খতিবী

আহমদ আলী

[প্রতিপাদ্যসার ঃ বিদ্'আত বহুল আলোচিত বিষয়। এর সংজ্ঞা নিরূপণ ও প্রকারভেদ নিয়ে পূর্বসুরী ও উত্তরসুরী ইমাম ও আলিমগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। এজন্য বর্তমান যুগেও বিদ'আত সম্পর্কে নানা ধরনের বিভ্রান্তি দেখা যায়। এ প্রবন্ধে কুরআন, হাদীস এবং ইমাম ও নির্ভরযোগ্য আলিমগণের অভিমতের আলোকে বিদ্'আত সম্পর্কে যথাযথ দৃষ্টিকোণ এর পরিচয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।]

বিদ্'আত ঃ আভিধানিক অর্থ

বিদ্'আত (بدعة) শব্দটি فعلة এর ওযনে اسم نوع (ক্রিয়ার প্রকৃতি জ্ঞাপক বিশেষ্য)। এটি بدع ধাতু হতে উদ্ভুত। এর মূল অর্থ ঃ পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে নতুনভাবে কোন বস্তু বা বিষয় আবিষ্কার করা। যেমন বলা হয় ঃ بدع الشيئ يبدعه بدعا وابتدعه অর্থাৎ সে নতুনভাবে বস্তুটি আবিষ্কার করল। আর এ অর্থের নিরিখেই নতুনভাবে খননকৃত কূপকে বলা হয় "ركى بديع"।[1] আল্লাহ্ তা'আলাও পবিত্র কুরআনে শব্দটি এ অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন ঃ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَاكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ[2] (অর্থাৎ আর বৈরাগ্য, সে তো তারা নিজেরাই নতুনভাবে উদ্ভাবন করেছে; আমি এটা তাদের উপর ফরয করিনি; কিন্তু তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য এটা অবলম্বন করেছে।) এ ছাড়া প্রত্যেক কিছুর মধ্যে যেটি প্রথম তাকেও 'بدع' বলা হয়।[3] যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ"[4] (অর্থাৎ আপনি বলুন, আমি সর্বপ্রথম

---

* [প্রবন্ধটি ইফা পত্রিকা ২০০০ সন ৩৯ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা থেকে সংগৃহীত]

১. ইবন মনযূর, আবুল ফজল জামালুদ্দীন মুহাম্মদ, 'লিসানুল আরব', নাশরু আদবিল হাওযা, কুম, ইরান, ১৪০৫ হি. ৮ম খণ্ড পৃ. ৬।

২. আল-কুরআন, ৫৭ ঃ ২৭।

৩. ইবন মনযূর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

৪. আল-কুরআন, ৪৬ ঃ ৯।

রাসূল নই।) বলা হয় যে, ابتدع فلان بدعة (অর্থাৎ সে এমন একটি পথের সূত্রপাত করল, যে পথ দিয়ে তার পূর্বে আর কেউ বিচরণ করেনি।) অতি সুন্দর ও অভিনব বিষয়কেও "أمر بديع" বলা হয়, যেন এর পূর্বে এ ধরনের কোন বিষয় আদৌ অস্তিত্ব লাভ করেনি।

মোটকথা, আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন কোন কিছু উদ্ভাবন করাকে বলা হয় "ابتداع"। আর নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ের প্রকৃতি ও স্বরূপকে বলা হয় "بدعة"। তবে মাসদার (ক্রিয়ামূল)-কে ইসমে মাফ'উল (কর্মবাচক বিশেষ্য) অর্থে ব্যবহার করার যে নিয়ম আরবী ভাষায় প্রচলিত রয়েছে সে অনুযায়ী কখনো "بدعة" দ্বারা নতুন উদ্ভাবিত বিষয়কে বুঝানো হয়। আবার কখনো নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ের আলোকে সম্পাদিত আমলকেও "بدعة" বলা হয়। এ অর্থের নিরিখে সেই আমলকেও "بدعة" বলা হয় যে আমলের সমর্থনে শরী'আতে কোন দলীল নেই।[৫] বিশিষ্ট ভাষাবিদ আবুল ফাত্‌হ আল-মুতাররিযী বলেন ঃ "بدعة" শব্দটি ابتداع থেকে গৃহীত ইসমে মাসদার, যেমন رفعة শব্দটি ارتفاع থেকে এবং خلفة শব্দটি اختلاف থেকে গৃহীত ইসমে মাসদার। ابتداع এর অর্থ নতুন উদ্ভাবন। তবে পরবর্তীকালে ধর্মে নতুন সংযোজিত বিষয়ের জন্য এর একচ্ছত্র ব্যবহার শুরু হয়। আল্লামা বিরকলী (র) বলেন ঃ بدعة এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে যে কোন নতুন উদ্ভাবিত বিষয়, চাই তা স্বভাব জাতীয় হোক কিংবা ইবাদত জাতীয়।[৬] আল্লামা ইবনু হাজার (র) বলেন ঃ بدعة এর মূল অর্থ পূর্ব নমুনা ছাড়াই নতুনভাবে উদ্ভাবনকৃত বিষয়।[৭]

পারিভাষিক অর্থ

শরী'আতের দৃষ্টিতে বিদ্'আত হল ঃ "ইসলামের প্রাথমিক তিন যুগের (সাহাবায়ে কেরাম, তাবি'ঈন ও তাবি'তাবি-ঈনের আমল) পর দীনের মধ্যে নতুনভাবে সংযোজন কৃত বা বিয়োজনকৃত এমন বিষয় যা বাহ্যতঃ শর'ঈ বিধি-বিধানের মত মনে হয়, অথচ শরী'আতের স্বীকৃত চার মূল উৎসের কোন একটিতেও এর কোন ভিত্তি নেই। কোন বাণীর মধ্যেও নেই, কর্মের মধ্যেও নেই এবং স্পষ্টাকারেও নেই, ইংগিতাকারেও নেই। অধিকন্তু এর অনুসরণের পেছনে উদ্দেশ্য হচ্ছে মাত্রাতীতভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা এবং তাঁর নিকট থেকে উত্তম প্রতিদান লাভ করা। বিদ্'আতের শর'ঈ সংজ্ঞা

৫. **শাতিবী**, আবূ ইসহাক **ইবরাহীম**, **আল-ই'তিসাম**, দারুল-ফিকর, মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীসা, রিয়াদ, (তারিখ বিহীন), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬।

৬ আহমদ, সালেহ, **আমানিউল হাজ্জাহ**, সিলেট, বাংলাদেশ, ১৪০৮ হি., পৃ. ৭১।

৭. ইবন হাজার আল-আসকালানী, আহমদ বিন আলী, **ফাতহুল বারী**, দারুল মারিফা, বৈরুত (তারিখ বিহীন), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫৩।

সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর উক্তি উল্লেখ করা হল ঃ

১. আল্লামা বিরকলী বলেন ঃ

"البدعة هى الزيادة فى الدين والنقصان منه الحادثان بعد الصحابة بغير إذن الشارع به لاقولا ولا فعلا ولا صريحا ولااشارة"

সাহাবায়ে কেরামের পর দীনের মধ্যে নতুনভাবে সৃষ্ট এমন সংযোজন ও বিয়োজন যে সম্পর্কে শারে' তথা আল্লাহ্ ও রাসূলের কোন ধরনের অনুমতি নেই। না তাঁর বাণীর মধ্যে, না তাঁর কর্মের মধ্যে, না স্পষ্টভাবে, না ইংগিতাকারে[৮]। আল্লামা নাবলূসী এ সংজ্ঞার মধ্যে সাহাবায়ে কিরামের সাথে তাবি'ঈন ও তাবি তাবি'ঈনকেও যোগ করেছেন। তাঁর সংজ্ঞা অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরাম, তাবি'ঈন ও তাবি তাবি'ঈনের পর দীনের মধ্যে নতুনভাবে সৃষ্ট সংযোজন ও বিয়োজনই হচ্ছে বিদ্'আত।

২. আল্লামা শাতিবী (র) বিদ্'আতের দুটি সংজ্ঞা উল্লেখ করেন ঃ

البدعة هى عبارة عن طريقة فى الدين مخترعة تضاهى الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة فى التعبد لله

বিদ্'আত হচ্ছে দীনের মধ্যে শর'ঈ বিধানের অনুরূপ নতুন উদ্ভাবিত রীতি যা অনুসরণের পেছনে উদ্দেশ্য হয়ে থেকে মাত্রাতীতভাবে আল্লাহ্র ইবদত করা।[৯] এ সংজ্ঞা মতে বিদ্'আতের মধ্যে মানুষের আচার-আচরণ عادات অন্তর্ভুক্ত হবে না।

البدعة طريقة فى الدين مخترعة تضاهى الشريعة يقصد بالسلوك ما يقصد بالطريقة الشرعية

বিদ্'আত হচ্ছে দীনের মধ্যে শর'ঈ বিধান সদৃশ যে কোন নতুন উদ্ভাবিত রীতি, যা অনুসরণের পেছনে তাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যা শরঈ বিধান পালনে হয়ে থাকে।[১০] এ সংজ্ঞা মতে বিদ্'আতের মধ্যে আচার-আচরণও অভ্যাসাদিও অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩. আল্লামা রাগীব ইস্পাহানী (র) বলেন ঃ

---

৮. আবুল হাসান, মুহাম্মদ, 'তানযীমুল আশতাত', ইসলাহী কুতুবখানা, দেওবন্দ, ইউ.পি. ১৯৮০, পৃ. ১২৩।

৯. শাতিবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭।

১০. প্রাগুক্ত।

"البدعة فى المذهب إيراد قول لم يستن قائلها وفاعلها فيه بصاحب الشريعة وأماثلها المتقدمة وأصولها المتقنة"

দীনের মধ্যে বিদ্'আত হচ্ছে এমন কোন মতের প্রবর্তন করা যার প্রবক্তা ও আমলকারী সে ক্ষেত্রে শরী'আতভাষ্যকার, দীনের উত্তম পূর্বসুরী ও শরী'আতের সুদৃঢ় উৎসসমূহের কোনটিরও অনুসরণ করেনি।[১১]

৪. আল্লামা ইবন হাজার (র) বলেন ঃ

"البدعة هى اعتقاد ما احدث على خلاف المعروف عن النبى لا بمعاندة بل بنوع شبهة"

বিদ্'আত হচ্ছে রাসূল (সা) থেকে প্রাপ্ত সুপরিচিত বিষয়াদির বিপরীত নতুনভাবে উদ্ভাবনকৃত বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা; তবে তা কোন ধরনের অবাধ্যতার বশবর্তী হয়ে নয়; বরং কোন ধরনের সন্দেহে নিপতিত হয়ে উদ্ভাবন করা হয়।[১২]

৫. আল্লামা আইনী (র) বলেন ঃ

البدعة فى الاصل إحداث أمر لم يكن فى زمن رسول الله

মূলতঃ বিদ্'আত হচ্ছে এমন নতুন কিছু সৃষ্টি করা যা আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা) যুগে ছিল না। আল্লামা নববীও প্রায় এ ভাষায় বিদ্'আতের সংজ্ঞা পেশ করেছেন।[১৩]

৬. আল্লামা শুমুন্নী (র) বলেন ঃ

"البدعة ما احدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله من علم او عمل او حال بنوع شبهة واستحسان وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما"

রাসূল (সা) থেকে বর্ণিত হক তথা তাঁর বাণী, কর্ম ও অবস্থার পরিপন্থী নতুনভাবে উদ্ভাবনকৃত বিষয় হচ্ছে বিদ্'আত, যাকে সন্দেহ কিংবা উত্তম বিবেচনা পূর্বক উদ্ভাবন

---

১১. ইস্পাহানী, হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-রাগীব, **আল-মুফরাদাতু ফি গরীবিল কুরআন**, কারখানায়ে তেজারতে কুতুব, করাচী, পাকিস্তান, (তারিখ বিহীন), পৃ. ৩৯।

১২. ইব্‌ন হাজর, **'নুযহাতুন নযর ফী তাওযীহি নুখবাতিল ফিকর'**, ইয়াসির নাদীম এন্ড কোম্পানী, দেওবন্দ, ইউ.পি. (তারিখ বিহীন), পৃ. ৫৬।

১৩. আইনী, বদরুদ্দীন, আবূ মুহাম্মদ মাহমুদ, **উমদাতুল কারী**, দারু এহয়ায়িত্ তুরাসিল আরবী, বৈরুত, (তারিখ বিহীন), ১১শ খণ্ড, পৃ. ১২৬।

করে একটি সঠিক দিন ও সঠিক পথ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।[১৪]

৭. আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র) বলেন ঃ

ان البدعة الشرعية هى احداث أمر ليس له ثبوت بواحد من الأصول الاربعة الدينية زاعما أنه من الدين ومظنة للاثابة من الله والتحسين

শরঈ বিদ্'আত হচ্ছে দীনের বিষয় মনে করে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাওয়াব লাভের প্রত্যাশায় এমন কিছু নতুনভাবে উদ্ভাবন করা যা সম্পর্কে দীনের চার উৎসের কোন একটিতেও কোন প্রমাণ নেই[১৫]।

বিদ্'আতের প্রদত্ত সংজ্ঞাসমূহ গভীরভাবে লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হবে যে, এগুলোর মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই; বরং এগুলোর মর্ম এক ও অভিন্ন, যদিও এগুলোর ভাষা ভিন্ন ভিন্ন। তবে কেউ কেউ যে বলেছেন; বিদ্'আত হচ্ছে 'যা নবী করীম (সা)-এর আমলে ছিল না' আর কেউ বলেছেন ঃ 'যা সাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিল না' আর কেউ বলেছেন ঃ 'যা ইসলামের প্রাথমিক তিন যুগে ছিল না' প্রভৃতি সংজ্ঞায় বাহ্যতঃ দ্বন্দ্ব দেখা যায়, যেমন প্রথমোক্ত সংজ্ঞা দ্বারা বুঝা যায়, সাহাবায়ে কেরামের নতুন অনুসৃত রীতি ও আমলসমূহ বিদ্'আত এবং দ্বিতীয় সংজ্ঞা দ্বারা বুঝা যায় তাবি'ঈন ও তাবে'তাবি'ঈনের নতুন অনুসৃত রীতি ও আমলসমূহ বিদ্'আত, অথচ তৃতীয় সংজ্ঞা দ্বারা বুঝা যায়, সাহাবা, তাবিঈন ও তাবি' তাবিঈনের নতুন অনুসৃত রীতি ও আমলসমূহ বিদ্'আত নয়। প্রকৃতপক্ষে এসবের মধ্যে কোন বিরোধ ও দ্বন্দ্ব নেই। কেননা রাসূল (সা)-এর আমলে কোন রীতি ও আমল থাকা ও না থাকার মর্ম হচ্ছে শর'ঈ ভাবে থাকা ও না থাকা। বাস্তবে থাকা ও না থাকা এখানে উদ্দেশ্য নয়, শরঈভাবে থাকার অর্থ হচ্ছে বৈধতার প্রমাণ دليل جواز বিদ্যমান থাকা। অতএব, নবী করীম (সা)-এর আমলে তথা কুরআন ও সুন্নায় যে সব বিষয়ের বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায় না, সেগুলোই হল বিদ্'আতে শরঈ। আর নবী করীম (সা)-এর আমলে তথা কুরআন ও সুন্নায় যে সব বিষয়ের বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যাবে সেগুলো বিদ্'আতে শরঈ' নয়, যদিও সেগুলো বাস্তবে নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পরেই অস্তিত্ব লাভ করে থাকে। সাহাবায়ে কেরাম, তাবি'ঈন ও তাবি' তাবি'ঈনের আমলসমূহ কুরআন ও সুন্নাহ্র বাস্তব রূপ। তাঁরা কেবল কুরআন ও সুন্নাহ্র নির্দেশনা মুতাবিক

---

১৪. ইবন আবেদীন, মুহাম্মদ আমীন, **রাদ্দুল মুখতার আলা দুররিল মুখতার**, আল-মাতবাআতুল উসমানিয়া, ১৩২৪ হি. পৃ. ৫২৪।

১৫. আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

তাঁদের জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সমাধা করতেন। তাই তাঁদের আমলসমূহ শরী'আতে নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য। এজন্যই হযরত মহানবী (সা) সাহাবায়ে কেরামসহ তাবিঈন ও তাবি'তাবি'ঈন এর আমলসমূহের অনুসরণের জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ "أوصيكم باصحابى. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم"[১৬] (আমি তোমাদেরকে আমার সাহাবীদের, অতঃপর তাদের অনুগামীদের (তাবি'ঈন), অতঃপর তাদের অনুগামীদের (তাবি'তাবি'ঈন) অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছি।) এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, শরী'আতে সাহাবায়ে কেরাম, তাবি'ঈন ও তাবে' তাবিঈনের নতুন আমলসমূহের বৈধতার প্রমাণ রয়েছে। তাই তাঁদের নতুন রীতি ও আমলসমূহকে শরী'আতের দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ্'আত আখ্যা দেয়া যাবে না, যদিও আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এসব বিদ্'আত। অতএব উপরোক্ত বক্তব্য তিনটির মধ্যে পরস্পর কোন দ্বন্দ্ব নেই।

বিদ্'আতের শরঈ সংজ্ঞা বিশ্লেষণ

বিদ্'আতের শর'ঈ সংজ্ঞার মধ্যে উল্লিখিত প্রত্যেকটি বক্তব্য বিশেষ অর্থবহ এবং বিশ্লেষণের দাবী রাখে। 'ইসলামের তিন যুগের পর' কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে সব বিষয় ঐ যুগসমূহে নতুনভাবে উদ্ভাবিত হয়েছে এবং সর্বসাধারণের নিকট সমাদৃত হয়েছে, যেমন সাহাবায়ে কেরামের যুগে কুরআন সংকলন, মদপায়ীদের দণ্ড নির্ধারণ ও রমযান মাসে রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি এবং তাবি'ঈন ও তাবে'তাবি'ঈনের যুগে হাদীস সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করণ প্রভৃতি বিদ্'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা মূলতঃ এসব নতুন উদ্ভাবন নয়; বরং শরী'আতে এসবের ভিত্তি রয়েছে। তাই সেসবও সুন্নতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। হযরত মহানবী (সা) বলেন ঃ "عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين"[১৭] (তোমরা আমার সুন্নত এবং সঠিক পথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নতকে আঁকড়ে ধর।) এতে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) খুলাফায়ে রাশিদীনের অনুসৃত রীতি ও আমলকেও সুন্নত আখ্যা দিয়েছেন। তাছাড়া পূর্বোল্লিখিত রিওয়ায়াত "أوصيكم بأصحابى الخ" দ্বারাও বুঝা যায় যে, তাঁদের অনুসৃত নতুন রীতি ও আমলের অনুসরণ করা আমাদের জন্য ওয়াজিব। উল্লেখ্য, ঐ যুগসমূহে প্রয়োজন ও উপলক্ষ থাকা সত্ত্বেও যেসব বিষয় ও আমল তাঁরা সম্পাদন করেননি, সেগুলো

---

১৬. তিরমিযী, আবূ ঈসা মুহাম্মদ, **জামিউত্ তিরমিযী**, কুতুবখানা রশীদিয়া, দেওবন্দ, ইউ.পি. (তারিখ বিহীন), ২খ খণ্ড, পৃ. ৩৯।

১৭. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৬।
ইব্‌ন মাজা, আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ, **সুনান ইবনে মাজা**, নূর মুহাম্মদ আসাহ্হুল মাতাবে, করাচী, (তারিখবিহীন), ১ম খণ্ড, পৃ. ৫।

বর্তমানে সম্পাদন করা বিদ্'আত রূপে পরিগণিত হবে। যেমন তাঁদের যুগে অনারব শ্রোতৃমণ্ডলীর উপকারার্থে আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় জুম'আর খুতবা প্রদানের প্রয়োজন ও উপলক্ষ ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় কোন খুতবা প্রদান করা বিদ্'আত হবে।

'দীনের মধ্যে নতুনভাবে সংযোজনকৃত বা বিয়োজনকৃত' দ্বারা বুঝা যায়, মানুষের অভ্যাস ও স্বভাব عـادات বিদ্'আতে শরঈর আওতায় পড়ে না। অভ্যাস ও স্বভাব বলতে এমন সববিষয় বা কাজকে বুঝানো হয় যা দ্বারা ইহজাগতিক প্রয়োজন পূরণ করা একান্ত উদ্দেশ্য হয়। যেমন বর্তমানে বিভিন্ন ডিজাইনের পোশাক পরিধান করা এবং নানা ধরনের আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করা। শর'ঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এ জাতীয় নতুন অভ্যাস ও আচরণকে বিদ্'আত বলা যাবে না। কেননা এসব ধর্মের মধ্যে কোন প্রকারের নতুন উদ্ভাবন বা নতুন সংযোজন (إحــداث فى الديـن) নয়; বরং এসব হচ্ছে ইহজাগতিক বিষয়াদিতে নতুন সৃষ্টি, উদ্ভাবন (إحداث فى الدنيا)। তবে সে সব অভ্যাস ও রীতি যেগুলো মানুষ শর'ঈ বিধান মনে করে পালন করে, সেগুলোও বিদ্'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে। (দ্র. শাতিবীর ২য় সংজ্ঞা)

উপরন্তু, এ বক্তব্য দ্বারা শর'ঈ বিদ্'আত থেকে সে সব বিষয়ও বের হয়ে যাবে যা মূলতঃ ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নতুন উদ্ভাবন, কিন্তু ইসলামের প্রাথমিক যুগসমূহে ঐগুলোর কোন প্রয়োজন ছিল না বলে ঐ যুগের লোকজন সেগুলো উদ্ভাবন করেননি। তবে পরবর্তীতে প্রয়োজন দেখা দেয়ায় এগুলোর উদ্ভাবন জরুরী হয়ে দেখা দেয়। যেমন ঃ ইলমে নাহভ, সরফ, লুগাত, ফিক্হ ও উসূল প্রভৃতি বিদ্যার রচনা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, গ্রন্থাদি প্রণয়ন করা, যুদ্ধের জন্য নতুন নতুন অস্ত্র তৈরী করা ও আধুনিক বিভিন্ন সমর কৌশল অবলম্বন করা ইত্যাদি। এ জাতীয় বিষয় ধর্মের মধ্যে নতুন উদ্ভাবন إحــداث فى الديـن নয়; বরং বলা যায়, এসব ধর্মের প্রয়োজন ও স্বার্থে নতুন উদ্ভাবন (إحــداث للديـن)। নিষিদ্ধ হচ্ছে ধর্মের মধ্যে নুতন উদ্ভাবন; ধর্মের প্রয়োজন ও স্বার্থে নুতন উদ্ভাবন নিষিদ্ধ নয়।[১৮] অতএব দীন ও শরী'আতের প্রয়োজনে যেসব নুতন উদ্ভাবন করা হবে সেসব শর'ঈ বিদ্'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে না; বরং সুন্নাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে, যদিও আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এসবকেও বিদ্'আত নামে অভিহিত করা যায়।

'বাহ্যতঃ শর'ঈ বিধানের মত মনে হয়'—এ উক্তি দ্বারা বুঝা যায়, যে সব আমল, রীতি ও স্বভাব শর'ঈ বিধি-বিধানের সাথে সাদৃশ্য রাখে না, উপরন্তু কেউ সে সব শর'ঈ বিধান মনে করে আমলও করে না, সে সব বিদ্'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

---

১৮. আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

পক্ষান্তরে যে সব আমল, রীতি ও স্বভাব শর'ঈ বিধি-বিধানের মতই মনে হয় এবং আমলকারীও শর'ঈ বিধান মনে করে আমল করে সেগুলো বিদ্'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ ধরনের রীতি ও আচার-আচরণ বিভিন্ন হতে পারে। যেমন ঃ

ক. নতুন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা। যেমন ঃ প্রখর রৌদ্রতাপের মধ্যে দাঁড়িয়ে রোযা রাখার মানত করা, ইবাদতের জন্য বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করা এবং কোন কারণ ছাড়াই এক ধরনের আহার ও পোশাক পরিধান করা প্রভৃতি।

খ. সুনির্দিষ্ট ধরন ও অবস্থাকে বাধ্যতামূলক করে নেয়া। যেমন-সম্মিলিতভাবে সমস্বরে যিকির করা।

গ. নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট আমলকে বাধ্যতামূলক করে নেয়া। অথচ শরী'আতে এ বাধ্যবাধকতার কোন ভিত্তি নেই। অনেকেই শা'বানের ১৫ তারিখ দিনে রোযা রাখা ও রাত্রিতে জাগ্রত থাকার বাধ্যবাধকতাকে এ ধরনের আমল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১৯]

'শরী'আতের চার উৎসের কোন একটিতেও এর ভিত্তি নেই'—এ অংশ দ্বারা বুঝা যায়, যে সব কাজে কোন ধরনের সংযোজন ও বিয়োজনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুমতি রয়েছে—তাঁর বাণীর মধ্যে হোক, বা কর্মের মধ্যে হোক, স্পষ্টাকারে, বা ইংগিতাকারে হোক—সেসব শর'ঈ বিদ্'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

"من قال فى ركوعه سبحان ربى العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه وذالك ادناه ومن قال فى سجوده سبحان ربى الاعلى ثلاثا فقد تم سجوده وذالك ادناه"

যে ব্যক্তি রুকুতে তিন বার سبحان ربى العظيم বলবে তার রুকু পূর্ণ হয়ে যাবে। আর এটি সর্বনিম্ন মাত্রা। তদ্রূপ যে ব্যক্তি সিজ্দায় তিন বার سبحان ربى الاعلى বলবে তার সিজ্দা পূর্ণ হয়ে যাবে। আর এটি সবনিম্ন মাত্রা।[২০] হযরত আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত ঃ

قال رسول الله صلى الله وسلم من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ومن صلى اربعا كتب من العابدين ومن صلى ستا كفى ذالك اليوم ومن صلى ثمانيا كتب من القانتين ومن صلى ثنتى عشره ركعة بنى الله

---

১৯. শাতিবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯।

২০.. তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৬০।

بيتا فى الجنة من ذهب (الطبرانى)

"রাসূল (সা) বলেছেন, যে দু' রাক'আত যুহার নামায পড়বে তাকে গাফিলদের মধ্যে শামিল করা হবে না, আর যে চার রাক'আত পড়বে তাকে আবিদদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে। আর যে ছয় রাক'আত পড়বে, তা ঐদিনের জন্য যথেষ্ট হবে। আর যে আট রাক'আত পড়বে, তাকে বিনয়ী আবিদগণের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে। আর যে বার রাক'আত পড়বে, আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতের মধ্যে তার জন্য একটি স্বর্ণের প্রাসাদ নির্মাণ করবেন।"[২১] উল্লিখিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, যুহার নামাযের মধ্যে রাক'আত সংখ্যায় বৃদ্ধি-ঘাটতির ব্যাপারে শা'রের অনুমতি রয়েছে। এতএব এ বৃদ্ধি-ঘাটতি বিদ্'আত নয়। এ ছাড়া উল্লিখিত বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, সর্বজন স্বীকৃত হক মাযহাবসমূহের বিভিন্ন মতামতের ভিত্তিতে ইবাদতসমূহে সৃষ্ট বৃদ্ধি-ঘাটতিও বিদ্আ'তের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন ইমাম আযম আবূ হানীফার মতে ইকামতের শব্দগুলো দু'বার উচ্চারণ করা শাফিঈ মতের আলোকে বৃদ্ধি, আর ঐগুলোকে একবার উচ্চারণ করা হানাফী মতের আলোকে ঘাটতি স্বরূপ। তদ্রূপ সালাতুল কসূফে শাফিঈ মতানুযায়ী প্রতি রাক'আতে দু'রূকু, দু' সিজদা ও দু'বার ফাতিহা পাঠ হানাফী মতের আলোকে বৃদ্ধি এবং হানাফী মতানুযায়ী প্রতি রাক'আতে এক রূকু, এক সিজ্দা ও একবার ফাতিহা পাঠ শাফিঈ মতের আলোকে ঘাটতি স্বরূপ। এ ধরনের বৃদ্ধি-ঘাটতি দীনের মধ্যে নতুন উদ্ভাবন বা বিদ্'আত নয়। কেননা এগুলো শার'ঈ দলীল থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায়, শরী'আতের আদিষ্ট বিষয়াদির পালন বর্তমানে যে সব উপায় উপকরণ ও মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল, সেগুলোর উদ্ভাবন শার'ঈ বিদ্'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ, শরী'আতের মূলনীতি হচ্ছে ঃ যা ব্যতীত ওয়াজীব واجب আদায় করা সম্ভব নয়, তাও ওয়াজিব। আর যার উপর আদিষ্ট বিষয়ের مأمور به পালন নির্ভরশীল, তাও আদিষ্ট।[২২] অতএব, শরঈ দলীল দ্বারা যখন কোন আদিষ্ট বিষয় প্রমাণিত হবে, তখন এর সাথে সাথে সে বিষয়টিও বিধিসম্মত প্রমাণিত হবে যার উপর আদিষ্ট বিষয়টি নির্ভরশীল হবে। এভাবে তা বিধানগতভাবে দীনের মূল কাজেরই অন্তর্ভুক্ত হবে, দীনের মধ্যে নতুন উদ্ভাবন হিসাবে বিবেচিত হবে না। এ প্রেক্ষিতে শরী'আতের বিভিন্ন আদেশ ও নিষেধ যথা ইলম্ অর্জন, ইল্মের সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রসার, দীনের বিজয় ও শত্রুদের দমন এবং আত্মার পরিশুদ্ধি ও পবিত্রতা প্রভৃতির সুষ্ঠু আনজাম বর্তমানে বিভিন্ন উপায় ও

---

২১. উসমানী, শাব্বীর আহমদ, **ফাতহুল মুলহিম**, মাকতাবাতুল হিজায, করাচী (তারিখবিহীন), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৭।

২২. আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল, যদিও পূর্বসুরীগণ তাঁদের যুগের চাহিদা ও পরিবেশের প্রেক্ষিতে সে সব মাধ্যম ও উপায় অবলম্বনের প্রতি মুখাপেক্ষী ছিলেন না। যেমন ইলমের সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য বর্তমানে বিভিন্ন বিদ্যার সংকলন, গ্রন্থাদি রচনা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা অতীব প্রয়োজন। তাই এসব বিদ্‌'আতে শর'ঈর অন্তর্ভুক্ত হবে না; বরং দীনের কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে।

"এর অনুসরণের পেছনে উদ্দেশ্য হচ্ছে মাত্রাতীতভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা এবং তাঁর নিকট থেকে উত্তম প্রতিদান লাভ করা"—এ বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায়, যে সব নতুন উদ্ভাবিত বিষয় শর'ঈ বিধি-বিধানের মত মনে হয়, কিন্তু এর পেছনে আল্লাহ্‌র ইবাদত করার এবং তাঁর নিকট থেকে উত্তম প্রতিদান লাভ করার উদ্দেশ্য নিহিত থাকবে না, সে সব বিদ্‌'আতরূপে পরিগণিত হবে না। যেমন ধন-সম্পদ ও আয়-উপার্জনের উপর নির্দিষ্ট হারে আরোপিত কর। এটি যাকাতের বিধানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ জন্য এটি শর'ঈ বিদ্‌'আত হিসেবে পরিগণিত হবে না। তদ্রূপ এ বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায়, যে সব নতুন পথ, রীতি ও স্বভাব শরী'আতের কোন বিধানের পরিপন্থী নয়, উপরন্তু সেসবের অনুসরণের পেছনে যদি আল্লাহ্‌র ইবাদত ও সাওয়াব অর্জন উদ্দেশ্য না হয়, তা হলে তা বিদ্‌'আত রূপে বিবেচিত হবে না। বরং সেগুলো কেবলমাত্র পার্থিব প্রথা ও রীতি হিসাব বিবেচিত হবে।

উল্লেখ্য, বিদ্‌'আতের মধ্যে যেমন কর্মের সাথে সম্পৃক্ত নতুন উদ্ভাবন بدعة فعلية অন্তর্ভুক্ত, তেমনি পরিহারমূলক নতুন উদ্ভাবনও بدعة تركية এর অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন কোন গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া কেবল অতি ধার্মিকতা অবলম্বন করতে গিয়ে হালাল ও মুবাহ্ বস্তু বর্জন করা। এটি বিদ্‌'আরূপে বিবেচিত হবে। যদিও বর্জনের পেছনে অতি ধার্মিকতা অবলম্বন করতে গিয়ে হালাল ও মুবাহ বস্তু বর্জন করা। এটি বিদ্‌'আতরূপে বিবেচিত হবে। যদি এ বর্জনের পেছনে অতি ধার্মিকতা উদ্দেশ্য না হয়, তা হলে বর্জনকারীকে এ বর্জন বা বর্জনেচ্ছার কারণে অর্থহীন পরিত্যাগকারী আখ্যা দেয়া যেতে পারে। এ বর্জনকে বিদ্‌'আত বলা যাবে না।[২৩] মোটকথা, আচার-আচরণ, নতুন পার্থিব রীতি-নীতি ও আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বিদ্‌'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ সেগুলো ইবাদত ও সাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা হয় না। তবে শর্ত হচ্ছে ঐগুলো কোন শর'ঈ বিধানের পরিপন্থী হতে পারবে না। তদ্রূপ নবী করীম (সা), সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন ও তাবি'তাবি'ঈন থেকে যা প্রমাণিত হয়েছে—তা তাঁদের কথার মাধ্যমে হোক বা কাজের মাধ্যমে হোক, স্পষ্টভাবে হোক বা ইংগিত করে হোক—তা শর'ঈ বিদ্‌'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে

---

২৩. শাতিবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২-৪৩।

না। এভাবে ধর্মের কার্যাদি পালনের যাবতীয় মাধ্যম ও উপায়-উপকরণ যেসব নবী করীম (সা), সাহাবায়ে কিরাম, তাবি'ঈন ও তাবে' তাবি'ঈনের যুগসমূহে প্রয়োজন ও উপলক্ষ না থাকায় অস্তিত্ব লাভ করেনি, কিন্তু পরবর্তীতে প্রয়োজন ও উপলক্ষ দেখা দেয়ায় অস্তিত্ব লাভ করেছে, সেসবও বিদ্'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন ঃ প্রচলিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, প্রকাশনা সংস্থা, বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুদ্ধের নানা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, সূফীয়ায়ে কেরামের আত্মশুদ্ধির বিভিন্ন তরীকা ও পদ্ধতি। এ সব ধর্মের মধ্যে নতুন উদ্ভাবন احداث فى الدين নয়; বরং ধর্মের প্রয়োজনে নতুন উদ্ভাবন। إحداث للدين বিদ্'আত ধর্মের মধ্যে নতুন উদ্ভাবনেরই নাম। ধর্মের জন্য তথা ধর্মের প্রয়োজন ও স্বার্থে নুতন উদ্ভাবন বিদ্'আত নয়।

বিদ্'আতের শর'ঈ সংজ্ঞার উৎস

হযরত মহানবী (সা) বলেন ঃ

"من احدث فى أمرنا هذاما ليس منه فهورد"

যে আমাদের এ দীনে এমন কিছু নতুন উদ্ভাবন করবে যা দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।[২৪]—এ মহান বাণী থেকে বিদ্'আতের শর'ঈ সংজ্ঞা গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে أمر দ্বারা দীন বুঝানো উদ্দেশ্য। এর দ্বারা বুঝা যায়, বিদ্'আত শব্দটি যে কোন নতুন বিষয় বা বস্তুর জন্য প্রযোজ্য নয়; বরং কেবলমাত্র দীনের মধ্যে নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ের জন্য প্রযোজ্য। ফলে আহার্য, পানীয় ও যানবাহন প্রভৃতি মুবাহ বিষয়ে স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন বিদ্'আতরূপে পরিগণিত হবে না। এ ছাড়া এমন অনেক প্রথা ও রীতি যা সওয়াবের নিয়তে করা হয় না, তাও বিদ্'আতে শরী'আর অন্তর্ভুক্ত হবে না, যদিও আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ্'আতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কেউ এ স্বাচ্ছন্দ্য ও রীতিসমূহ দীনের কাজ মনে করে অবলম্বন করে না। এসব কোন ক্রমেই ধর্মের মধ্যে নতুন উদ্ভাবন (إحداث فى الدين) হিসেবে বিবেচিত হবে না। আর "ما ليس منه" দ্বারা বুঝা যায়, কুরআন ও হাদীসে যে সব বিষয়ের ভিত্তি রয়েছে তা স্পষ্টাকারে হোক বা ইংগিতাকারে—সেসবকেও বিদ্'আত বলা যাবে না। এ প্রেক্ষিতে শরী'আতের সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত বিধানসমূহ, বিভিন্ন নস থেকে উৎপাদিত বিধানসমূহ এবং সাহাবী, তাবি'ঈন ও তাবে তাবি'ঈনের নীতি প্রভৃতি শর'ঈ বিদ্'আত থেকে বহির্ভূত হবে। কেননা শরী'আতে এর প্রত্যেকের ভিত্তি রয়েছে। এভাবে "ما

২৪. বুখারী, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, আল-সহীহ, মাকতাবায়ে মুস্তাফায়ী, দেওবন্দ ইউ.পি. (তারিখবিহীন), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭১।
মুসলিম, আবুল হুসাইন, আল-সহীহ, দারুল ইশাআতিল ইসলামিয়া, কলকাতা (তারিখবিহীন), ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৭।

"ليس منه" দ্বারা আরো বুঝা যায়, যে সব উপায়-উপকরণ ও মাধ্যম দীনের বিধান পালনের জন্য প্রয়োজন, সেসবও বিদ্'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে না; বরং দীনের সহায়ক হিসেবে সাব্যস্ত হবে।[২৫]

বিদ্'আতের প্রকারভেদ ঃ পর্যালোচনা

বিদ্'আতের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অনেক বিশিষ্ট আলিমের মতে বিদ্'আতের কোন প্রকার নেই। একে হাসানাহ, সাইয়িআহ, ওয়াজিবা, মুন্দুবা ও মাকরূহা প্রভৃতি প্রকারে বিভক্তি করা যুক্তিসংগত নয়। বরং বিদ্'আতে শর'ইয়াহ সবটিই সাইয়িয়াহ তথা খারাপ ও নিন্দনীয়। তাঁদের দৃষ্টিতে হযরত মহানবী (সা)-এর বাণী ঃ "كل بدعة ضلالة" (প্রতিটি বিদ্'আত ভ্রান্ত) ব্যাপকতাজ্ঞাপক। এর মর্ম হচ্ছে বিদ'আত বিদ'আতই। এর সব কটিই খারাপ ও ভ্রান্ত। এ মত পোষণকারীদের মধ্যে ইমাম মালিক (৯৩-১৭৯ হি.), আবূ ইসহাক ইবরাহীম আশ্-শাতিবী (মৃ. ৭৯০ হি.) ও মুহাম্মদ ইব্ন ওয়ালিদ আত্ তারতুশী (৪৫১-৫২০) হানাফী মতালম্বীদের মধ্যে আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ আশ শুমুন্নী (৮০১-৮৭২ হি.) ও বদরুদ্দীন মাহমুদ আইনী (৭৬২-৮৫৫ হি.), শাফিঈ (র) মতাবলম্বীদের মধ্যে আহমাদ ইব্ন হুসাইন আল বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হি.) ও হাফিয আহমদ ইব্ন হাজর আল আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হি.), এবং হাম্বলী মতাবলম্বীদের মধ্যে আবদুর রহমান ইবন রজব (৭৩৬-৭৯৫ হি.) ও আহমদ ইব্ন তাইমিয়া (৬৬১-৭২৮ হি.) প্রমুখ আলিম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অপরপক্ষে অন্য কতিপয় আলিম বিদ্'আতকে হাসানাহ্, সাইয়িআহ্, ওয়াজিবা, মন্দুবা ও মাকরূহা প্রভৃতি প্রকারে ভাগ করেছেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস আশ-শাফি'ঈ (১৫০-২০৪ হি.) ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে ইয্যুদ্দীন ইব্ন আবদুস সালাম (৫৭৭-৬৬০ হি.), ইয়াহইয়া ইব্ন শারফ আন নববী (৬৩১-৬৭৬ হি.) ও আবূ শামা আবদুর রহমান ইবন ইসমাঈল (৫৯৯-৬৬৫ হি.), মালিকী মতাবলম্বীদের মধ্যে আহমাদ ইবন ইদরীস আল কারাফী (মৃ. ৬৮৪ হি.) ও আবদুল বাকী ইবন ইউসুফ আয যুরকানী (১০২০-১০৯৯ হি.), হানাফী মতাবলম্বীদের মধ্যে মুহাম্মদ আমীন ইব্ন আবিদীন (১১৯৮-১২৫২ হি.), হাম্বলী মতাবলম্বীদের মধ্যে ইউসুফ ইবন আবদুর রহমান ইবনুল জাওযী (৫৮০-৬৫৬ হি.) ও জাহিরী মতাবলম্বীদের মধ্যে আলী ইব্ন আহমদ ইব্ন হাযম (৩৮৪-৪৫৬ হি.) প্রমুখ আলিম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২৬] তাঁদের মতে সব ধরনের বিদ্'আত

২৫. **ইব্ন মাজা**, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩ (দ, পাদটীকা)।

২৬. **আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়া**, ওযারাতুল আওকাফ ওয়াশ্শুয়ুনিল ইসলামিয়া, কুয়েত, ১৯৮৬, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২১-২৩।

খারাপ ও নিন্দনীয় নয়; বরং তন্মধ্যে কোনটি ভাল, কোনটি খারাপ, আবার কোনটি ওয়াজিব ও কোনটি হারাম এবং কোনটি মুবাহ ও কোনটি মাকরূহ। এমন অনেক রিওয়ায়াত রয়েছে, যা দ্বারা বুঝা যায়, বিদ্'আতের শর্তমুক্ত ও ব্যাপকতামূলক ভ্রান্তি বর্ণনাকারী রিওয়ায়াতসমূহে শর্তহীনতা ও ব্যাপকতা উদ্দেশ্য নয়; বরং সেগুলো শর্তযুক্ত ও সীমাবদ্ধ। উপরন্তু এ ধরনের অনেক রিওয়ায়াতও পাওয়া যায়, যা দ্বারা বুঝা যায়, কতিপয় বিদ্'আত ভাল ও উত্তম আর কতিপয় বিদ্'আত খারাপ ও নিন্দনীয়।"

ইমাম শাফিঈ বলেন ঃ "বিদ্'আত দু'প্রকার। এক ঃ কুরআন, সুন্নাহ, আসর ও ইজমার পরিপন্থী যে কোন নতুন উদ্ভাবিত বিষয়। এটি গুমরাহমূলক বিদ্'আত। দুই ঃ কুরআন, সুন্নাহ আসার ও ইজমার পরিপন্থী নয়, এমন যে কোন নতুন উদ্ভাবিত কল্যাণমূলক বিষয়। এটি নিন্দনীয় নয়।"[২৭]

ইয্যুদ্দীন ইব্ন আবদুস সালাম বলেন ঃ "বিদ্'আত পাঁচ প্রকার। এক ঃ ওয়াজিব। যেমন ঃ কুরআন ও হাদীস বুঝার জন্য ইলমে নাহভ চর্চা করা ওয়াজিব। কেননা শরী'আত সংরক্ষণ করা উম্মতের উপর ওয়াজিব। আর শরী'আত সংরক্ষণ নাহভ চর্চা ছাড়া সম্ভব নয়। তাই এটি ওয়াজিবের অন্যতম পূর্বশর্তে পরিণত হয়। আর শরী'আতের মূলনীতি হচ্ছে ওয়াজিবের পূর্বশর্তও ওয়াজিব। দুই ঃ হারাম। যেমন ঃ কাদরিয়া, জাবরিয়া, মুরযিয়া ও খাওয়ারিজ প্রভৃতি ফিরকাসমূহের কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী মতবাদসমূহ। তিন ঃ মান্দুব। যেমন ঃ জামা'আতের সাথে তারাবীহ নামায আদায়ের সুবন্দোবস্ত করা, মাদ্রাসা ও সরাই প্রতিষ্ঠা করা। চার ঃ মাকরূহ। যেমন ঃ মসজিদের সাজসজ্জা ও কুরআন শরীফের অংগসজ্জা। পাঁচ ঃ মুবাহ। সুস্বাদু আহার্য, সুপেয় পানীয়, পরিপাটি পোশাক ও সুন্দর বাসস্থান প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রশস্ততা অবলম্বন।"[২৮] প্রধান প্রধান দলীল এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হল ঃ

১. হযরত মহানবী (সা) বলেন ঃ

"من سن سنة حسنة كان له اجرها واجر من عمل بها ولا ينقص ذالك من اجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيئا"

---

২৭. ইবন হাজার, **ফাতহুল বারী**, ১৩ খণ্ড, পৃ. ২৫৩।

২৮. ইবন আবদুস সালাম, ইয্যুদ্দীন, **কাওয়ায়িদুল আহকাম**, মাতবাআতুল ইস্তিকামাহ, পৃ. ১৭২।

"যে ব্যক্তি কোন ভাল রীতি প্রবর্তন করবে সে তার প্রতিদান পাবে। উপরন্তু যারা সে অনুযায়ী আমল করবে তাদের সাওয়াবও সে লাভ করবে। এ অবস্থায় তাদের সাওয়াবে কোন প্রকারের হ্রাস করা হবে না। আর যে কোন খারাপ রীতি প্রবর্তন করবে, সে তার পাপের বদলা পাবে। উপরন্তু যারা সে অনুযায়ী আমল করবে, তাদের পাপেরও সে ভাগী হবে; এ অবস্থায় তাদের পাপে কোন প্রকারের হ্রাস করা হবে না।"[২৯] এ হাদীসের মধ্যে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যে কোন ভাল রীতি প্রবর্তন করল, সে একটি মহান কর্ম সম্পাদন করল। এ থেকে বুঝা যায় প্রত্যেক বিদ্'আত খারাপ নয়; বরং এমন অনেক বিদ্'আতও রয়েছে যা ভাল ও হিদায়াত লাভের উপলক্ষ। কেননা এ হাদীসে হুযূর (সা) উম্মতের দিকেই সুন্নাত প্রচলনের সম্বন্ধ করেছেন। নিজের দিকে এ প্রচলনের নিসবত করেননি। অতএব প্রতীয়মান হয় যে, من سن দ্বারা বলা উদ্দেশ্য নতুন রীতি প্রচলনকারী; শরী'আতের সুপ্রতিষ্ঠিত সুন্নাতের উপর আমলকারী নয়।

২. হযরত মহানবী (সা) বলেন ঃ

"ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح" (منسد احمد بن حنبل)

"মুসলমানগণ যা ভাল মনে করে, তা আল্লাহ্র নিকটও ভাল। আর মুসলমানগণ যা খারাপ মনে করে, তা আল্লাহ্র নিকটও খারাপ।"[৩০] এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, কিছু নতুন উদ্ভাবিত বিষয় ভাল আর কিছু নতুন উদ্ভাবিত বিষয় মন্দ।

৩. হুযূর (সা) বিলাল ইবন হারিস (রা)-কে বলেন ঃ

"من ابتدع بدعة ضلالة لايرضى الله ورسوله كان عليه مثل اثم من عمل الخ"

"যে ব্যক্তি এমন কোন ভ্রান্ত বিদ্'আত সৃষ্টি করবে যাতে আল্লাহ্ ও রাসূল সন্তুষ্ট নন, তার উপর সে সব লোকের পাপের সমপরিমাণ পাপও বর্তাবে, যারা সে অনুযায়ী আমল করবে।"[৩১] এ হাদীসে بدعة এর সাথে ضلالة শর্ত যোগ করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায়, বিদ্'আত সামগ্রিকভাবে নিন্দনীয় নয়; বরং সে বিদ্'আতই নিন্দনীয় হবে যা গুমরাহীর উপলক্ষ হবে এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের (সা) অপছন্দনীয় হবে।

---

২৯. মুসলিম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪১।

৩০. মোল্লা আল-কারী, আলী, মিরকাতুল মাফাতীহ, দিল্লী (তারিখবিহীন), ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৬।

৩১. তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৬।

৪. অন্য এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, নিয়মিত তারাবীহ নামায জামা'আতের সাথে আদায়ের সুবন্দোবস্ত হতে দেখে হযরত উমর (রা) বলেন ঃ "نعمت البدعة هذه"[৩২] (এটি কতই না উত্তম বিদ্'আত!) এ রিওয়ায়াত দ্বারাও বুঝা যায়, কিছু বিদ্'আত উত্তম ও প্রশংসনীয়।

৫. হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

"دخلت انا وعروة بن الزبير المسجد فاذا عبد الله بن عمر جالس الى حجرة عائشة واذا ناس يصلون فى المسجد صلوة الضحى فسألناه عن صلواتهم فقال بدعة"

"একদা আমি ও উরওয়া ইবন যুবাইর মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) হযরত আয়িশা (রা)-এর হুজরা মুবারকে বসে আছেন আর কিছু লোকজন মসজিদে (জামা'আতের সাথে) চাশতের নামায আদায় করছে। তা দেখে আমরা তাঁকে লোকদের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ এটি বিদ্'আত।"[৩৩] এ রিওয়ায়াত দ্বারাও বুঝা যায়, প্রতিটি বিদ্'আত মন্দ ও নিন্দনীয় নয়।

৬. অন্য এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত রয়েছে, হযরত উমর ইবন আবদুল আযীয (র) বলেন ঃ

"تحدث للناس اقضية بقدر ما احدثوا من الفجور"

"মানুষ যে পরিমাণ নতুন নতুন পাপ ও অন্যায় সৃষ্টি করবে, তাদের জন্যে সে পরিমাণ নতুন নতুন ফায়সালাও সৃষ্টি হবে।"[৩৪]

উপরোক্ত রিওয়ায়াতসমূহ থেকে স্পষ্টরূপে বুঝা যায়, সব ধরনের বিদ্'আত খারাপ নয়; বরং কিছু বিদ্'আত ভাল, আর কিছু বিদ্'আত মন্দ। এ মতের পৃষ্ঠপোষকগণ হযরত মহানবী (সা)-এর বাণী "كل بدعة ضلالة" সম্পর্কে বলেন ঃ এতে ব্যাপকতা উদ্দেশ্য নয়; বরং এটি সাইয়িআহ-এর সাথে নির্দিষ্টকৃত। এর মর্ম হচ্ছে প্রত্যেক মন্দ বিদ্'আতই গুমরাহীর উপলক্ষ। ইমাম নববী (র) বলেন ঃ "كل بدعة ضلالة عام مخصوص" হাদীসখানা 'আম' (ব্যাপক) হলেও মন্দ বিদ্'আত দ্বারা 'খাস' (নির্দিষ্ট)।[৩৫]

---

৩২. বুখারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৯।

৩৩. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৮।

৩৪. শাতিবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮১।

৩৫. মোল্লা আল-কারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৬।

বিদ্‘আতের বিভাজন সম্পর্কে প্রথমোক্ত মত অধিকতর শক্তিশালী ও যুক্তিনির্ভর। বিভিন্ন বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী দলীল এ মতের পক্ষে জোরালো সাক্ষ্য বহন করে। এর কয়েকটি প্রধান দলীল উল্লেখ করা হল ঃ

১. ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। হযরত মহানবী (সা)-এর ওফাতের পূর্বেই একে পরিপূর্ণতা দান করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন ঃ

"اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا"

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম।"[৩৬] অতএব কেউ এতে নতুন কিছু সংযোজন করবে, এটা ধারণাতীত ব্যাপার। কেননা নতুন সংযোজন আল্লাহ্ তা‘আলার দুর্বলতার প্রমাণ বহন করে যা সংযোজনকারী পূরণ করেছে; উপরন্তু তা দ্বারা বুঝা যায়, শরী‘আত অপূর্ণাঙ্গ রয়ে গেছে—যা আয়াতের মর্মের পরিপন্থী।[৩৭] ইমাম মালিক (র) বলেন ঃ "যে ইসলামের মধ্যে নতুন কোন বিষয় উদ্ভাবন করল এবং মনে করল যে তা উত্তম, তা হলে সে (প্রকারান্তরে) ধারণা করল যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) রিসালাতের সাথে খেয়ানত করেছেন (!)।[৩৮]

২. আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন ঃ

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ

"নিঃসন্দেহে এটি আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথে চল এবং অন্যান্য পথ চলো না। তা হলে সে সব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।"[৩৯] এ আয়াতে সামগ্রিকভাবে সকল বিদ্‘আতীর নিন্দা করা হয়েছে। কুরআনে এ ধরনের আরো অনেক আয়াত রয়েছে।

৩. হযরত মহানবীও (সা) সামগ্রিকভাবে বিদ্‘আতের নিন্দায় বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে ইবন সারিয়া বর্ণিত হাদীস অন্যতম। তিনি বলেন ঃ

---

৩৬. আল-কুরআন, ৫ ঃ ৩।

৩৭. আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়া, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৩।

৩৮. শাতিবী, প্রাগুক্ত ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯।

৩৯. আল-কুরআন, ৬ ঃ ১৫৩।

"وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يارسول الله كانها موعظة مودع فما تعهد الينا فقال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة الامر وان كان عبدا حبشيا فانه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة"

"একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে ভাবগর্ভ উপদেশ দিলেন। এতে আমাদের চোখ অশ্রুসজল ও অন্তঃকরণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তখন এক ব্যক্তি বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ যেন বিদায়কালীন উপদেশ। আপনি আমাদেরকে কি নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন? হুযূর (সা) বললেন ঃ তোমাদের প্রতি আমার ওসীয়ত হলো, তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে এবং শাসকদের কথা শুনবে ও মেনে চলবে, যদিও তিনি হাবশী গোলাম হন। তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে, তারা অচিরে অসংখ্য মতবিরোধ দেখতে পাবে। তখন তোমাদের মধ্যে কর্তব্য হবে যে, আমার সুন্নাত ও সঠিক পথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা এবং তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা। আর তোমরা নতুন উদ্ভাবিত বিষয়াবলী থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা নতুন উদ্ভাবিত প্রতিটি বিষয়ই বিদ্'আত। আর প্রতিটি বিদ্'আতই ভ্রান্ত ......"[৪০]

৪. সামগ্রিক বিদ্'আতের নিন্দায় সাহাবীগণেরও বহু উক্তি রয়েছে, তন্মধ্যে হযরত মুজাহিদের রিওয়ায়াত অন্যতম। তিনি বলেন ঃ

"دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد إذن فيه ونحن نريد أن نصلى فيه فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصل فيه"[৪১]

"একদা আমি ইবন উমরের সাথে এক মসজিদে প্রবেশ করলাম। এ অবস্থায় সেখানে আযান দেয়া হল, আর আমরা সেখানেই নামায আদায়ের মনস্থ করলাম।

৪০. তিরমিযী, প্রাগুক্ত ঃ ৯৬।
ইব্‌ন মাযা, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫।

৪১. হায়সামী, নূরুদ্দীন, মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ, বৈরুত, ১৯৬৭, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০২।

ইত্যবসরে মুয়াজ্জিন নামাযের জন্য পুনর্বার তাগাদা দিলেন। ফলে ইবনে উমর (রা) মসজিদ থেকে বের হয়ে বললেন ঃ 'এই বিদ্'আতীর নিকট থেকে আমাকে নিয়ে যাও' আর তিনি সেখানে নামায আদায় করলেন না।"

ইমাম শাতিবী (র) "الاعتصام" এর মধ্যে এ মতকে বিভিন্ন দলীল দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর কয়েকটি দলীল সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হল ঃ

১. বিদ্'আতের নিন্দায় বর্ণিত সকল রিওয়ায়াতই শর্তমুক্ত (مطلق) ও ব্যাপ্তিমূলক (عام)। এ ধরনের রিওয়ায়াতের সংখ্যা প্রচুর হওয়া সত্ত্বেও কোন রিওয়ায়াতেও এ ধরনের কোন বক্তব্য আসেনি যা দ্বারা বুঝা যায়, কিছু বিদ্'আত উত্তম ও হিদায়াতের উপলক্ষ। বরং এর বিপরীত কোন কোন রিওয়ায়াতে এ ধরনের বক্তব্যও এসেছে যা সকল ধরনের বিদ্'আত নিন্দিত হওয়ার বিষয়কে শক্তিশালী করে। হুযূর (সা) বলেনঃ "شر الامور محدثاتها" وكل بدعة ضلالة" (অর্থাৎ ঃ সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে নতুন উদ্ভাবিত বিষয়। আর প্রত্যেকটি বিদ্'আতই ভ্রান্ত।) যদি নতুন কোন উদ্ভাবিত রীতি ও আমল উত্তম ও প্রশংসনীয় হত, তা হলে কোন না কোন রিওয়ায়েতে তা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হত। আর প্রত্যেক রিওয়ায়াত থেকে যখন প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সকল বিদ্'আতই নিন্দনীয় ও গুমরাহীর উপলক্ষ, তখন এরপরে বিদ্'আতকে হাসানা ও সাইয়িআহ প্রভৃতি প্রকারে বিভক্ত করাও এক প্রকার নতুন উদ্ভাবন তথা বিদ্'আত এবং বিভিন্ন রিওয়ায়াতের পরিপন্থী কাজ হিসাবে বিবেচিত হবে।

২. শরী'আতের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে যখন ব্যাপকতামূলক নীতিবাক্য (قاعده كليه) বা ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক শর'ঈ দলীল (دليل شرعى كلى) বিভিন্ন জায়গায় পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হবে এবং এর মৌলিক (اصولى) ও শাখাগত (فروعى) দিকসমূহের বিবরণগুলো প্রতিটি জায়গায় এভাবে বর্ণিত হবে যে, কোথাও তা শর্তযুক্ত হওয়ার বা সীমিত হওয়ার বক্তব্য না থাকে, তা হলে তা নীতিবাক্য বা শর'ঈ দলীল-এর ব্যাপকতা বহাল থাকার প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

"وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى" "কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না।"[৪২] এ আয়াত আন'আম, ইসরা, ফাতির, যুমর ও নাজ্‌ম প্রভৃতি সূরায় পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হয়েছে। এ আয়াতে وَازِرَةٌ শব্দটি অনির্দিষ্ট সূচক শব্দ (نكره) যা না-বোধক শব্দ لا এরপরে এসেছে। কা'য়দা আছে, কোন অনির্দিষ্ট সূচক শব্দ যদি 'না'-বোধক অব্যয়ের পরে আসে, তা ব্যাপকতার অর্থ প্রদান করে এবং তা কোন ধরনের শর্তযুক্ত হওয়ার (تقييد) বা সীমাবদ্ধ হওয়ার (تخصيص) সম্ভাবনা রাখে না। এ বিষয়টিও এ

৪২. আল-কুরআন, ৬ ঃ ১৬৪, ১৭ ঃ ১৫, ৩৫, ১৮, ৩৯ ঃ ৭, ৫৩ ঃ ৩৮।

জাতীয়। হযরত মহানবী (সা) নানা সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন হাদীসে ان كل। بدعة ضلالة" ان كل محدثة بدعة এ ধরনের বক্তব্য পুনঃপুনঃ উল্লেখ করেছেন। এসব দ্বারা বুঝা যায়, সব ধরনের বিদ্‌'আত নিন্দনীয়। কোন রিওয়ায়াতে এ ধরনের কোন বক্তব্য দেখা যায় না যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এগুলো শর্তযুক্ত (مقيد) বা সীমিত (مخصوص)। তদুপরি কোথাও এর ব্যাপকতার পরিপন্থী কোন কিছু পরিলক্ষিত হয় না। অতএব এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হাদীসের বক্তব্য তার ব্যাপকতা (عموم) ও শর্তহীনতার (عدم تقييد) ওপর বহাল রয়েছে।

৩. সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈন তথা সকল সৎ ও ন্যায়পরায়ণ পূর্বসুরীগণ কোন ধরনের শর্তযুক্ত করা বা কোন ধরনের সীমিতকরণ ছাড়াই সাধারণভাবে বিদ্‌'আত নিন্দনীয় হওয়ার ওপর একমত পোষণ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, প্রতিটি বিদ্‌'আতই নিন্দনীয় ও খারাপ।[৪৩]

সর্বোপরি, যদি বিদ্‌'আতকে হাসানা (ভাল) ও সাইয়িআহ (মন্দ) দু'ভাগে বিভক্ত করার অবকাশ থাকে, তা হলে এ বিভক্তির ছিদ্রপথ ধরে কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী অনেক মন্দ ও খারাপ বিষয় শরী'আতে অনুপ্রবেশ করবে। উপরন্তু অনেকের মধ্যে প্রত্যেক বিদ্‌'আতকেই হাসানা হিসেবে ব্যাখ্যা করার চরম প্রবণতা সৃষ্টি করবে। এভাবে দীন ও শরী'আত ক্রমে বিদ্‌'আতের বেড়াজালে এভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়বে যে, বিদ্‌'আতের আগাছা থেকে দীন ও শরী'আতের মূল রূপ পৃথক করে নেয়াও কষ্টকর হয়ে পড়বে।

বর্ণিত হয়েছে, একদা হযরত হুযায়ফা (রা) দু'টি পাথর নিয়ে একটিকে অপরটির উপর রাখলেন। অতঃপর সাথীদের প্রশ্ন করলেন, তোমরা পাথর দু'টির মাঝখানে কোন আলো দেখতে পাচ্ছ? তখন তাঁরা বললেন : আবূ আবদুল্লাহ্! আমরা পাথর দু'টির মাঝখানে সামান্যটুকু আলোই কেবল দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন : যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ, বিদ্‌'আত এভাবেই প্রকাশ লাভ করবে যে, এর মাঝে সত্যের আলো কেবল পাথর দু'টির মধ্যবর্তী আলোর মতই ম্রিয়মান অবস্থায় দেখা যাবে। আল্লাহ্র শপথ, বিদ্‌'আতের এভাবে প্রাধান্য ও ছড়াছড়ি হবে যে, কেউ যদি এর কোন অংশও ছেড়ে দেয়, তা হলে লোকেরা বলাবলি করবে যে, তুমি সুন্নত পরিত্যাগ করেছ।[৪৪]

ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকেও বর্ণিত আছে, তিনি বললেন :

"ما يأتى على الناس من عام الا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا

---

৪৩. শাতিবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪১-১৪৫।

৪৪. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৮।

فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن" "سن"

"লোকদের কাছে এমন সময় আসবে যখন তারা নতুন নতুন বিদ্'আত সৃষ্টি করবে এবং এক এক করে সুন্নাতগুলোকে নিষ্প্রাণ করে দেবে। অবশেষে বিদ্'আতসমূহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এবং সুন্নতসমূহ্ বিলুপ্ত হয়ে যাবে।"[৪৫]

যাঁরা বিদ্'আতকে বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করেছেন এবং যে সব দলীল দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন যে, সর্বপ্রকারের বিদ্'আত নিন্দনীয় নয়, বরং কিছু ভাল ও কিছু মন্দ; তাঁদের সে দলীলগুলোর জবাব উল্লেখ করা হল ঃ

প্রথম দলীলের জবাব

হাদীসে سن দ্বারা নতুন কোন সুন্নাত প্রবর্তন করা, উদ্ভাবন করা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং এর মর্ম হচ্ছে যে, যে সুপ্রতিষ্ঠিত সুন্নাতে নববীর উপর আমল করবে, অতঃপর তাকে দেখে অন্যরা তার অনুসরণ করবে, তার জন্য হাদীসে বর্ণিত প্রতিশ্রুতি প্রযোজ্য হবে। অন্য এক রিওয়ায়াত এ ব্যাখ্যাকে শক্তিশালী করবে। ইমাম তিরমিযী থেকে বর্ণিত, হযরত মহানবী (সা) বলেন ঃ

"من احيا سنة من سنتي قد اميتت بعدى فانه له من الاجر مثل من عمل بها من غير ان ينقص ذالك من اجورهم شيئا"

"যে আমার এমন কোন সুন্নতকে পুনরুজ্জীবিত করবে যা আমার পরে নিষ্প্রাণ তথা অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে সে তাদের আমলেরও সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবে যারা তাকে সুন্নাত অনুযায়ী আমল করবে। এমতাবস্থায় তাদের সওয়াবে কোন প্রকারের হ্রাস করা হবে না।"[৪৬] "من احيا سنتي" দ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝা যায়, "من سن سنة حسنة" এর মধ্যে সুন্নাত দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত সুন্নাতে নববীই বলা উদ্দেশ্য; নতুন কোন উদ্ভাবিত কথিত সুন্নাত বা রীতি উদ্দেশ্য নয়। এছাড়া উপরোক্ত হাদীস-এর বর্ণনার প্রেক্ষাপটও উক্ত ব্যাখ্যাকে জোরালো সমর্থন করে। মুসলিম শরীফে বর্ণিত রয়েছে ঃ

"لما جاءت عليه الصلوة والسلام ناس من مضر حرض المؤمنين على التصدق فجاءه رجل من الانصار بصرة كادت كفه

---

৪৫. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৫।

৪৬. আল-খতীব আল-তিবরিযী, ওয়ালীউদ্দীন ইব্ন মুহাম্মদ, **মিশকাতুল মাসাবীহ**, কলকাতা, (তারিখবিহীন), পৃ. ৩০।

تعجز عنها بل عجزت ثم تتابع الناس حتى رأى كومان من طعام وثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن فى الاسلام" (الحديث)

"যখন মুদার গোত্রের কিছু লোক দরবারে রহমতে হাযির হল তখন হযরত (সা) মু'মিনদেরকে সাদাকা পেশ করার জন্য অনুপ্রাণিত করলেন। ফলে একজন আনসারী এমন একটি ভরপুর থলে নিয়ে দরবারে হাযির হলেন যা বহন করতে তাঁর হাত প্রায় অক্ষম হয়ে পড়েছিল। অতঃপর লোকজন তাঁকে দেখে একের পর এক সাদাকা পেশ করতে লাগলেন। অবশেষে দেখা গেল, খাবার ও পোশাকের দুটি স্তূপ জমা হল। তখন হযরত (সা) বললেন ঃ যে ইসলামের মধ্যে এমন কোন সুন্নাত জারী করবে ...."[৪৭] (আল হাদীস)। উল্লিখিত রিওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায়, যে প্রেক্ষাপটে রাসূল (সা) হাদীসখানা বলেছেন, তা হচ্ছে আনসারী ব্যক্তির সাদকা। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ সাদাকা ইতোপূর্বে শরী'আতের বিধিবদ্ধ সুন্নাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। আনসারী কেবল সেই সুন্নত মুতাবিক আমল করেছেন এবং অন্যদের মাঝে সদকা প্রদানের মনোবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলেছেন। অতএব হাদীসের অর্থ এই নয় যে, "যে পূর্বে ছিল না এ ধরনের নতুন কোন রীতি প্রবর্তন করল।" যদি মেনে নেয়া হয় যে, হাদীসের মধ্যে "سن" শব্দ দ্বারা নতুন রীতি প্রবর্তন করার কথা বলা উদ্দেশ্য, তা হলে এ রিওয়ায়াত বিদ্'আতের নিন্দায় বর্ণিত শর্তবিহীন ব্যাপকতামূলক অনেক হাদীসের পরিপন্থী হবে। আর কা'য়দা হচ্ছে ঃ যখন ব্যাপকতামূলক দলীল (دليل عموم) ও নির্দিষ্টকরণমূলক দলীল (دليل تخصيص) পরস্পর বিরোধপূর্ণ হয়, তখন নির্দিষ্টকরণমূলক দলীল গ্রহণযোগ্য হয় না।[৪৮]

দ্বিতীয় দলীলের জবাব

এ হাদীস মূলতঃ এক মাওকূফ[৪৯] হাদীসের অংশবিশেষ। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) তা বর্ণনা করেন। পূর্ণ রিওয়ায়াত হল ঃ

"ان الله نظر فى قلوب العباد فاختار محمدا فبعثه برسالته ثم نظر فى قلوب العباد فاختار له اصحابا فجعلهم انصار دينه

৪৭. নবভী, ইয়াহইয়া ইবন শরফ, রিয়াযুস সালিহীন, আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, বৈরুত, ১৯৯২, পৃ. ১১৯।

৪৮. আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

৪৯. মাওকুফ ঃ সাহাবীদের কথা, কর্ম ও মৌন সমর্থনকে মাওকুফ বলা হয়।

ووزراءه فيه فما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح" (مسند احمد بن حنبل)

"আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের অন্তঃকরণসমূহে দৃষ্টি দিলেন এবং মুহাম্মদ (সা)-কে তাঁদের মধ্য থেকে বাছাই করে নিলেন এবং তাঁকে তাঁর মহান বার্তা দিয়ে পাঠান। অতঃপর পুনরায় তিনি বান্দাদের অন্তরসমূহে দৃষ্টি দিলেন। এবারে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য কিছু সাথী বাছাই করে নিলেন। তিনি তাঁদেরকে তাঁর দীনের সাহায্যকারী বানালেন। অতএব মুসলমানগণ যা ভাল মনে করবে, তা আল্লাহ্র নিকটও ভাল এবং মুসলমানগণ যা খারাপ মনে করবে, তা আল্লাহ্র নিকটও খারাপ।"[৫০] এতে المسلمون এর ال টি নিঃসন্দেহে জাতিবাচক নয়। অন্যথায় এর সাথে "تفرق امتى على ثلث وسبعين فرقة كلهم فى النار الا فرقة واحدة" "আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে মাত্র একটি দল ব্যতীত অন্য প্রত্যেকটি দল জাহান্নামে গমন করবে।"[৫১] রিওয়ায়াতে সুস্পষ্ট বিরোধ সংঘটিত হবে। কেননা মুসলমানদের প্রত্যেকটি দলই নিজের মতকে ভাল মনে করে। এতে এমন কথা আবশ্যক হয়ে পড়বে যে, মুসলমানদের কোন দলই জাহান্নামে গমন করবে না। এছাড়া হতে পারে, একটি বিষয়কে কোন মুসলমান ভাল মনে করবে আবার অন্য মুসলমান ঠিক ঐ বিষয়টিকে খারাপ মনে করবে। এতে ভাল-মন্দের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করা দুরূহ হয়ে পড়বে। অতএব (المسلمون) এর মধ্যকার ال টি হয়ত عهد (নির্দিষ্টতা সূচক)-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ অবস্থায় معهود (নির্দিষ্টকৃত) হবে পূর্বে উল্লেখিত اصحاب। ফলে হাদীসে বর্ণিত মুসলমান দ্বারা কেবল সাহাবীগণ বলাই উদ্দেশ্য হবে। অথবা ال টি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সকল মুসলমানকে শামিল استغراق করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ অবস্থায় মুসলমান দ্বারা সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ মুজতাহিদগণ বলা উদ্দেশ্য হবে। যে কোন শব্দ যখন কোন শর্ত ছাড়া সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়, তখন তা দ্বারা শব্দের অন্তর্গত পরিপূর্ণ গুণসম্পন্ন একটি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর মুসলমানদের মধ্যে পরিপূর্ণ গুণসম্পন্ন হচ্ছেন সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ মুজতাহিদগণ। অতএব হাদীসের মর্ম দাঁড়ায় ঃ সাহাবায়ে কিরাম বা মুজাতাহিদ ইমামগণ যা ভাল মনে করেন, তা আল্লাহ্র নিকটও ভাল। আর তাঁরা যা খারাপ মনে করেন আল্লাহ্র নিকটও তা খারাপ। এছাড়া ال টি استغراق حقيقى (অর্থাৎ সকল মুসলমানকে

---

৫০. ইবন হাম্বল, আহমদ, আল-মুসনাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৯।

৫১. ইবন মাযা, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৭।
তিরমিযী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯২।

বুঝানো)-এর জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। এ অবস্থায় হাদীসের মর্ম হবে ঃ সকল মুসলমান যা ভাল বা খারাপ মনে করে, আল্লাহ্‌র নিকটও তা সে ভাবে বিবেচিত হবে। আর যে বিষয় মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেবে, সে বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক তিন যুগের মুসলমানগণের বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

কারো কারো মতে, হাদীস মারফূ[৫২] অর্থাৎ মহানবী (সা)-এর উক্তি। এ মতের পৃষ্ঠপোষকগণের মধ্যে ইমাম রাযী ও আল্লামা আইনী প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আল্লামা আলা'ঈ এ হাদীস এর উপর বিশদ আলোচনা পর্যালোচনা করার পর বলেন ঃ কোন হাদীস গ্রন্থে আমি এটি মারফূ হিসেবে দেখতে পাইনি, এমন কি দুর্বল সনদেও দেখিনি। এটি ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এরই উক্তি।[৫৩]

তৃতীয় দলীলের জবাব

এ হাদীস ضلالة এর শর্তটি নির্দিষ্টকরণের (احترازى) জন্য ব্যবহার করা হয়নি; বরং বিদ্‌'আতের প্রকৃতরূপ বর্ণনার জন্য বৃদ্ধি করা হয়। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

"لَا تَأْكُلُوا الرِّبَوٰا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً"

"তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না।"[৫৪] এর মধ্যে اضعافا مضعفة এর শর্তটি নির্দিষ্টকরণের জন্য ব্যবহার করা হয়নি; বরং সূদের তৎকালীন অবস্থার বিবরণ প্রদানের উদ্দেশ্যে বৃদ্ধি করা হয়।[৫৫]

৪র্থ ও ৫ম দলীলের জবাব

হাদীস দু'-এর বিদ্‌'আত দ্বারা আভিধানিক বিদ্‌'আত বলাই উদ্দেশ্য, বিদ্‌'আতে শরঈ উদ্দেশ্য নয়।[৫৬] কেননা সাহাবায়ে কিরামের আমলসমূহ শর'ঈ অর্থে বিদ্‌'আত হতে পারে না। অধিকন্তু আমাদের প্রেক্ষিতে আভিধানিক বিদ্‌'আতের ব্যবহারও সেগুলোর জন্য প্রযোজ্য নয়। শরী'আতে তাঁদের আমলসমূহকে সুন্নাতে নববীর অংশ হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। কারণ হুযূর (সা) আমাদেরকে তাঁর সুন্নাতের সাথে সাথে খুলাফায়ে রাশিদীন ও মহান সাহাবীগণের সুন্নাত অনুসরণেরও নির্দেশ দিয়েছেন। আর উপর্যুক্ত রিওয়ায়াতসমূহে বিদ্‌'আত দ্বারা উদ্দেশ্য এ নয় যে, প্রকৃতপক্ষে এ আমলসমূহ বিদ্‌'আত; বরং উদ্দেশ্য হল বিদ্‌'আত যদি হাসানা (উত্তম) হয়, তা হলে

---

৫২. মরফূ' ঃ মহানবী (সা) এর কথা, কর্ম ও মৌন সমর্থনকে মরফূ' বলা হয়।

৫৩. আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

৫৪. আল-কুরআন, ৩ ঃ ১৩০।

৫৫. শাত্বিবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৮।

৫৬. বিন্নূরী, মুহাম্মদ ইউসুফ, মাআরিফুস সুনান, এইচ. এম. সাঈদ কোম্পানী, করাচী, ১৩৯৮ হি. ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৪।

এই হল হাসানা। নওফল ইবন আয়াস হুযলী (রা)-এর বর্ণিত রিওয়ায়াত এর জোরালো সমর্থন করে। তিনি বলেন ঃ হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ

"لئن كانت هذه البدعة لنعمت البدعة هى"

"যদি এটি (সালাতুত্ তারাবীহ্) বিদ্'আতই হয়, তা হলে এটি উত্তম বিদ্'আতই হবে।"[৫৭] (কানযুল উম্মাল, ৪/২৮৪) ইমাম শাতিবী (র) বলেন ঃ মূলগত ভিত্তিতে নয়, কেবল বাহ্যিক অবস্থার উপর ভিত্তি করেই হযরত উমর (রা) আমলটিকে উত্তম বিদ্'আত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা হুযূর (সা)-ও বিশেষ প্রেক্ষিতে এ আমল ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং ঘটনাক্রমে হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগেও তা সংঘটিত হয়নি।[৫৮]

ষষ্ঠ দলীলের জবাব

এ হাদীস অত্যন্ত দুর্বল। আল্লামা শাতিবী (র) বলেন ঃ হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-এর বর্ণনা কোথাও আমি বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হতে দেখিনি।[৫৯]

কোন কোন ফকীহ ও আলিমের বক্তব্যে বিদ্'আতের যে বিভক্তি লক্ষ্য করা যায়, তা মূলতঃ আভিধানিক বিদ্'আতেরই প্রকারভেদ; বিদ্'আতে শর'ঈয়ার প্রকারভেদ নয়। শায়খ আহমদ শিহাবুদ্দীন ইবন হাজর মক্কী (র) বলেন ঃ "তারাবীহ্ নামায প্রসংগে হযরত উমর (রা)-এর উক্তি نعمت البدعة هى এর মধ্যে আভিধানিক বিদ্'আতই উদ্দেশ্য, বিদ্'আতে শর'ঈ উদ্দেশ্য নয়। কেননা বিদ্'আতে শর'ঈ গুমরাহীর উপলক্ষ। আর যে সব আলিম বিদ্'আতকে হাসানা ও সাইয়িআহ্ প্রভৃতি প্রকারে ভাগ করেছেন, তা মূলত ঃ আভিধানিক বিদ্'আতেরই প্রকারভেদ। আর যাঁরা বলেছেন, প্রতিটি বিদ্'আতই নিন্দনীয় ও গুমরাহীর উপলক্ষ, তাঁরা এ বিদ্'আত দ্বারা বিদ্'আতে শর'ঈকে বুঝিয়েছেন।"[৬০]

হাফিয ইবন রজব (র) বলেন ঃ "কোন কোন পূর্বসুরীর বক্তব্যে কোন কোন বিদ্'আতকে যে উত্তম বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে আভিধানিক বিদ্'আতই উদ্দেশ্য, বিদ্'আতে শর'ঈ উদ্দেশ্য নয়।"[৬১]

এ জবাব যদিও ইবন আবদুস সালাম ও অন্যান্য কারো কারো বক্তব্যের জন্য পুরোপুরি প্রযোজ্য হয়, কিন্তু অনেকের বক্তব্যও রয়েছে যার সাথে এ জবাব সংগতিপূর্ণ

৫৭. উসমানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৯।

৫৮. শাতিবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৫।

৫৯. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৮।

৬০. আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

৬১. প্রাগুক্ত।

নয়। তাঁদের মধ্যে মোল্লা আলী কারী, যুরকানী ও আল্লামা নববীর উক্তিসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মোল্লা আলী কারী "من سن فى الاسلام" রিওয়ায়াতের ভিত্তিতে كل بدعة এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন ঃ "كل بدعة سيئة ضلالة" (অর্থাৎ ঃ প্রতিটি মন্দ বিদ্‌'আতই ভ্রান্ত।) এর দ্বারা বুঝা যায়, বিদ্‌'আতের প্রকারভেদটি তাঁর নিকট বিদ্‌'আতে শর'ঈরই প্রকারভেদ। অন্যথায় তিনি বিদ্‌'আতকে 'সাইয়্যিআহ' এর সাথে খাস করতেন না। কেননা হাদীসে বিদ্‌'আত দ্বারা বিদ্‌'আত শর'ঈই উদ্দেশ্য। আভিধানিক বিদ্‌'আত নয়।[৬২]

আল্লামা নববী (র) বলেন ঃ বিদ্‌'আতের আভিধানিক অর্থ—পূর্বের উদাহরণ ব্যতীত নতুনভাবে কৃত যে কোন আমল। শরী'আতের দৃষ্টিতে বিদ্‌'আত হচ্ছে ঃ রাসূল (সা)-এর যুগে ছিল না, এ ধরনের নতুন কিছু উদ্ভাবন করা। এরপর তিনি বলেন ঃ হযরত মহানবী (সা)-এর বাণী كل بدعة ضلالة নির্দিষ্টকৃত ব্যাপকতাজ্ঞাপক (عام مخصوص)[৬৩]। অর্থাৎ এ এক ব্যাপকতাজ্ঞাপক বক্তব্য যা থেকে কোন কোন বিদ্‌'আতকে নির্দিষ্ট করে নেয়া হয়েছে। তাঁর প্রথমে বিদ্‌'আতের আভিধানিক ও শর'ঈ অর্থ বর্ণনা করা, অতঃপর হাদীসে উল্লিখিত বিদ্‌'আতকে খাস বা নির্দিষ্টকৃত বলে উল্লেখ করা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, তিনি বিদ্‌'আতে শর'ঈকে হাসানা ও সাইয়িআহ প্রভৃতি প্রকারে বিভক্তি করার প্রবক্তা।

আল্লামা যুরকানী (র) বলেন ঃ "বিদ্‌'আতের আভিধানিক অর্থ পূর্বের নমুনা ছাড়া নতুনভাবে সম্পাদিত আমল। শরী'আতেও একে এ অর্থেই ব্যবহার করা হয়। এটি ওয়াজিব, হারাম ও মুবাহ প্রভৃতি প্রকারে বিভক্ত।"[৬৪] তাঁর কথা দ্বারাও স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, তিনি শর'ঈ বিদ্‌'আতকেই বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করেছেন।

মোদ্দাকথা, এই বিশিষ্ট মনীষীগণের বক্তব্যসমূহের সাথে উল্লিখিত জবাব সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এজন্যে আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী (র) বলেন ঃ যাঁরা كل بدعة ضلالة এর মধ্যকার বিদ্‌'আতকে সাইয়্যিআহ (মন্দ)-এর সাথে খাস করেছেন এবং একে বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করেছেন, তাঁরা এ শব্দের ব্যবহারে ভুল করেছেন। তাঁরা এর শর'ঈ অর্থ থেকে বের হয়ে আভিধানিক অর্থের দিকে চলে গিয়েছেন। উপরন্তু তাঁরা এর আভিধানিক অর্থকেই শর'ঈ অর্থ হিসেবে সাব্যস্ত করে ফেলেছেন।[৬৫]

---

৬২. মুল্লা আল-কারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৬।

৬৩. প্রাগুক্ত।

৬৪. উসমানী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৯।

৬৫. আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

আমার মতেও উল্লেখিত পূর্বসুরীদের দিকে ভুলের নিসবত করা অধিকতর শ্রেয় ঃ কেননা এ বিভক্তি ও একটি নতুন উদ্ভাবন এবং বিদ্'আত প্রসংগে ইতোপূর্বে বর্ণিত রিওয়াতসমূহের স্পষ্টতঃ পরিপন্থী। অতএব, বিভিন্ন বিশুদ্ধ ও অকাট্য দলীলের জোরালো সমর্থনের প্রেক্ষিতে বলা যায়, যে সব বিশ্লেষক ও আলিম বিদ্'আতকে বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত না করে সকল প্রকারের বিদ্'আতকে নিন্দনীয় বলে উল্লেখ করেছেন, তাঁদের সে মতটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও শক্তিশালী।[৬৬]

উল্লেখ্য, শর'ঈ বিদ্'আতের কতকগুলো রয়েছে প্রকৃত বিদ্'আত (بدعة حقيقية) আর কিছু রয়েছে আপেক্ষিক বিদ্'আত। (بدعة اضافية) যে সব বিদ্'আতের সমর্থনে শরী'আত তথা কুরআন, হাদীস, ইজমা ও গ্রহণযোগ্য কিয়াসে কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না, সেগুলোকে প্রকৃত বিদ্'আত বলা হয়। যেমন ঃ বৈরাগ্য অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহ্র সান্নিধ্য অর্জনের চেষ্টা করা, প্রয়োজনের পরেও শরী'আতের কোন বাধা না থাকা অবস্থায় বিয়ে পরিত্যাগ করা প্রভৃতি। আপেক্ষিক বিদ্'আতের দু'টি দিক থাকে। একদিক থেকে শর'ঈ দলীলের সাথে এর সম্পর্ক থাকে। এ ভিত্তিতে একে বিদ্'আত বলা যায় না। অন্য দিক থেকে প্রকৃত বিদ্'আতের মত শর'ঈ দলীলের সাথে এর কোন সম্পর্ক থাকে না। এর ভিত্তিতে একে বিদ্'আত বলা হয়। অর্থাৎ, এ ধরনের আমলের মূলগত ভিত্তি থাকে; তবে এর ধরন ও কর্মপদ্ধতির শর'ঈ কোন ভিত্তি থাকে না। অতএব এটি মূলগত ভিত্তির নিরিখে বিদ্'আত নয় বরং ধরন ও কর্মপদ্ধতির নিরিখে বিদ্'আত। এই পরস্পর বিপরীত দু'ধরনের সম্পর্কের কারণে একে আপেক্ষিক বিদ্'আত বলা হয় যেমন ঃ সম্মিলিতভাবে সমস্বরে যিকর করা এবং শরী'আতের কোন ইংগিত ছাড়াই নির্দিষ্ট ইবাদতকে নিজের উপর বাধ্যতামূলক করে নেয়া।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলাম পরিপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত শাশ্বত জীবন বিধান। দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, রাসূলে কারীম (সা) সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন ও তাবি' তাব'ঈনের পরে যুগে যুগে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার পরিপন্থী অসংখ্য বিদ্'আত ও কুসংস্কার অনুপ্রবেশ করেছে, যা ইসলামের সৌন্দর্য ও ঐতিহ্যের বিপরীত ক্ষতিকর ভূমিকা রেখেছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই সব বিদ্'আত ও কুসংস্কার 'হাসানা' এর মনমাতানো লেবাস পরেই ইসলামে অনুপ্রবেশ করেছে এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অতএব, দীন ও শরী'আতের সঠিক ও নিখুঁত রূপ বজায় রাখার স্বার্থে কথিত 'হাসানা'র নামে প্রচলিত সবপ্রকারের বিদ্'আতকেই নিন্দনীয় ও খারাপ হিসেবে চিহ্নিত করতে আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে।

---

৬৬. **আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়াহ্**, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩২, শাতিবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৬।

ফাত্ওয়া ঃ তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ*

গাজী ওমর ফারুক

মোঃ মহিব্বুল ইসলাম

ভূমিকা

ইসলাম সর্বজনীন মানবতার ধর্ম এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এতে রাষ্ট্র, সমাজ ও জীবনের সকল দিক মওজুদ রয়েছে। ফাতওয়া শরীয়াহ্ বা ইসলামী আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ পরিভাষা। ইসলামী নীতিমালার গতিশীল, চিরন্তন ব্যাখ্যা ও ফয়সালার লক্ষ্যেই ফাতওয়ার উৎপত্তি। মানব জীবনে উদ্ভূত সমস্যার নিরসনের ইসলামী আইনের যৌক্তিক ভারসাম্যপূর্ণ ও বাস্তবানুগ কল্যাণকর সিদ্ধান্তই ফাতওয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং এর প্রয়োজনীয়তা শরীয়তে আবহমান কাল থাকবে। পবিত্র কুরআনে ফাতওয়া চাওয়া ও দেয়ার বিষয় বর্ণিত রয়েছে।[১]

তবে বর্তমান যুগে বিশেষ করে বাংলাদেশে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে ফাতওয়ার অপপ্রয়োগ হতে দেখা যাচ্ছে। ফলে মুসলিম জনগোষ্ঠিসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ফাতওয়া সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে ও এর পবিত্রতা প্রশ্নের আওতায় আসছে। ফাতওয়া সম্পর্কে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। এ প্রচেষ্টায় ফাতওয়া সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় আলোচনার উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধের অবতারণা করা হয়েছে।

সংজ্ঞা

'ফাতওয়া' আরবী শব্দ যা 'আল-ফুতিয়্যা' শব্দ হতে গৃহীত। 'ফাতাওয়া' বহুবচন এবং একবচন হলো ফাত্ওয়া। এর অর্থ কোন বিষয়ে রায় বা মতামত দেয়া। এ ছাড়াও এর অন্য অর্থ হচ্ছে বদান্যতা, অনুগ্রহ, দানশীলতা, মনুষ্যত্ব ও শক্তি প্রদর্শন ইত্যাদি। এ শব্দটি ইসলামের ক্ষেত্রে হতে হবে, এমন নয়। অন্যান্য ক্ষেত্রেও হতে পারে। যেমন পবিত্র কুরআনে সূরা 'নামল্' এ বর্ণিত আছে, 'সাবা' দেশের রানী বিলকিস হযরত সুলায়মান (আ)-এর চিঠির জবাব দিতে পরামর্শ চেয়ে বলেছিলেন, 'তোমরা আমাকে ফাতওয়া দাও।'

---

* [প্রবন্ধটি ইফা পত্রিকা ২০০০ সন ৩৯ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা থেকে সংগৃহীত]

১. সূরা আন-নিসা ঃ ১২৭।

ফাতওয়া সম্পর্কে প্রখ্যাত ইসলামী আইনবিশারদ ও পণ্ডিতগণ বিভিন্নভাবে মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইবনুল আছির বলেন, "কোন বিষয়ের অনুমতি বৈধতা বর্ণনা করে দেয়ার নামই ফাতওয়া।[২]

লিসানুল আরব গ্রন্থে ফাতওয়া শব্দটি প্রতিষ্ঠিত ও মযবুত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[৩]

আল মাওরিদ অভিধানে ফাতওয়াকে "A formal legal opinion or advisory opinion"[৪] বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

A popular Dictionary of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ "Fatwa is a technical term used in Islamic law to indicate a formal legal judgement or view."[৫]

The Oxford Encyclopedia of the Modern Literally "Fatwa is derived from the root fata which includes in its Sematic field the meaning youth newness, clarification and explanation. Its development as a technical term originated from the Quran, where the word is used in two verbal form meaning asking for a definitive answer and giving a definitive answer."[৬]

ইসলামী বিশ্বকোষে উল্লেখ আছে, 'ফাতওয়া শব্দটির অর্থ অনুগ্রহ, বদান্যতা, দানশীলতা, মনুষ্যত্ব ও শক্তি প্রদর্শন।[৭]

ফাতওয়া ও মাসাইল গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'যে কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়াকে ফাত্ওয়া বলা হয়। চাই সে প্রশ্ন শরীয়াতের কোন হুকুম সম্পর্কিত হোক কিংবা পার্থিব কোন সমস্যার ব্যাপারে হোক'।[৮] যেমন হযরত ইউসুফ (আ) বন্দী থাকা অবস্থায় তাঁর নিকট মিসরের শাসনকর্তার পক্ষ থেকে একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা

---

২. আন-নিহায়া, দারুল মারিফা, বৈরুত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯৯।

৩. **লিসানুল আরব** (অক্ষর 'ফা' দ্রষ্টব্য), দারুল মারিফা, বৈরুত।

৪. Dr. Rohi Balabaki, **Al Mawrid : A Modern English Arabic Dictionary**, Dar-el-Islam Lil Malayin, Baiurt, p. 815.

৫. Ian Richard Netton, **A Popular Dictionary of Islam**, Curzon Press, London, 1992, p. 82

৬ John L. Espozito (ed), **The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World** : Vol. 2, p. 8.

৭. **ইসলামী বিশ্বকোষ**, ১৪শ খণ্ড, ঢাকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ৫৫৪।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫।

জানতে চাওয়া হয়েছিল। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "(হে পরিষদবর্গ) তোমরা আমাকে আমার স্বপ্নের যথাযথ উত্তর বা ফাতওয়া দাও।" (সূরা ইউসুফ ঃ ৪৩)

এসব আভিধানিক অর্থ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ফাতওয়া শব্দটি আইনগত মতামত, পরামর্শ বা কোন প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফাতওয়া শব্দটি ইসলামী আইনের পরিভাষা হওয়ায় ইসলামী আইনবিদগণও এ সম্পর্কে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞা বা মতামত ব্যক্ত করেছেন। যেমন ঃ

১. আল্লামা ইমাম রাগীব (র) বলেন ঃ "কুরআন সুন্নাহ দ্বারা জটিল বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধান দেয়ার নামই ফাতওয়া।"[৯]

২. মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ "Fatwa is formal and legal opinion concerning the provision of Islamic law given by a Muslim Jurist."[১০]

৩. আল মু'জামুল ওয়াসিত গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ "শরীয়াতের জটিল মাসাইল ও আইন সম্পর্কিত প্রশ্নের যথাযথ জবাব প্রদান করার নামই ফাতওয়া।"[১১]

৪. 'উসুলে ইফতা' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ "ফাতওয়া বলতে দীনী কোন সমস্যার সমাধানকে বুঝায়।"[১২]

৫. Short Encyclopaedia of Islam গ্রন্থে ফাতওয়ার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "A Fatwa is a formal legal opinion given by a mufti or canon lawyer of standing in answer to a question submitted to him either by a judge or by a private individual."[১৩]

৬. Khurshid Bibi vs Md. Amin [P.L.D. (91) 1967] মামলায় পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্ট মন্তব্য করে যে, ফাতওয়া হলো বিচারক ও মুফ্তীগণের সুস্পষ্ট অভিমতসমূহের সমাহার।[১৪]

---

৯. সূরা ইউসুফ ঃ ৪৩।

১০. ইমাম রাগীব, **আল-মুফরাতাদাত**, দারুল ফিক্‌র, বৈরুত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭।

১১. **মুজামু লুগাতুল ফুকাহায়ে**, ইদারাতুল কুরআন ওয়া উলুম আল ইসলামিয়া, করাচী, পৃ. ৩৩৯।

১২. ড. ইবরাহীম মাদকুর, **আল মু'জামুল ওয়াসিয়ত** কুতুবখানায়ে হুসাইনিয়া, দেওবন্দ, ভারত, ২য় সংস্করণ ১৯৭২, পৃ. ৬৭৩।

১৩. H.A.R. Gibb and Others, **Short Encyclopaedia of Islam** : The Royal Netherland Academy, Netherland, p. 102.

১৪. আলিমুজ্জমান চৌধুরী, **ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও বাংলাদেশ মুসলিম আইন**,

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায়, একজন ফকীহ বা মুফতী বা শরীয়াহ্ আদালতের বিচারক কর্তৃক কুরআন সুন্নাহ ও নির্ভরযোগ্য ফিক্হ গ্রন্থের মাধ্যমে শরীয়াহ্ ও পার্থিব জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান কল্পে প্রদত্ত রায়কে ফাতওয়া বলা হয়।

ফাতওয়ার ভিত্তি

পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতে ফাতওয়া প্রসঙ্গ এসেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "(হে নবী) তারা আপনাকে নারীদের (উত্তরাধিকার ও মোহ্রানা পাবার অধিকার রয়েছে কি না এ সম্পর্কে) বিধান জিজ্ঞেস করে। আপনি তাদের বলে দিন, "তোমাদের জিজ্ঞাসিত বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্ ইসলামের স্পষ্ট বিধান দিচ্ছেন।"[১৫]

আলোচ্য আয়াতে 'ইয়াসতাফ্তু' শব্দটি ফাতওয়া শব্দ থেকে উদ্ভূত যার অর্থ Legal opinion. অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, "(হে রাসূল) মানুষ আপানার কাছে ফাতওয়া জানতে চায়। অতএব আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ তোমাদিগকে 'কালালাহ্' এর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ দিচ্ছেন।"[১৬]

এ আয়াতেও ফাতওয়া হতে রূপান্তরিত 'ইয়াসতাফ্তু' শব্দটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রায় বা উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে স্পষ্ট বিধান ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ব্যাপারে রাসূল (সা) বলেন ঃ "বৈধ বলে ফাতওয়া দেওয়া সত্ত্বেও সে বিষয়ে যদি তোমার অন্তরে কোন সন্দেহের সৃষ্টি হয়, তবে সেটা গুনাহ্।"[১৭]

তিনি আরো বলেন, "ফাতওয়া দেওয়ার ব্যাপারে ঐ ব্যক্তিই দুঃসাহসী যে জাহান্নামের শাস্তির বেপরওয়া।"[১৮]

হাদীস দুখা'না থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, ফাতওয়া বা রায় দেয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। কারণ রায় বা ফাতওয়া সঠিক না হলে গুনাহ্গার হতে হবে।

ফাতওয়ার প্রকৃতি

ফাতওয়া কুরআন ও সুন্নাহ স্বীকৃত শরীয়ার একটি আইনগত পরিভাষা এবং এর প্রকৃতিও একটু ভিন্নতর, যেমন ঃ ফাতওয়া ওহী ভিত্তিক। অর্থাৎ কুরআন,

---

ঢাকা, মহানগর ল্য' বুক সেন্টার, ১৯৯৮, পৃ. ২৮।

১৫. **সূরা আন-নিসা** ঃ আয়াত ১২৭।

১৬. **সূরা আন-নিসা** ঃ আয়াত ১৭৬।

১৭. **ফাতওয়া ও মাসাইল** (সম্পাদিত) ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ২১৬।

১৮. মওলানা তাকী উসমানী, **উসূলে ইফতা**, ইদরাতুল কুরআন ওয়া উলুম আল ইসলামিয়া, করাচী, ১৯৮৫, পৃ. ১২৪।

সুন্নাহ্‌র প্রকাশ্য ভাষ্যের তথা স্পষ্ট হুকুমের নিরিখে যে সকল ফাতওয়া প্রদান করা হয়, তা ওহী ভিত্তিক ফাতওয়া। ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য মুসলিমের জন্য এরূপ ফাতওয়া অলংঘনীয়।

দ্বিতীয়ত ফাতওয়া ইজতিহাদ ভিত্তিক অর্থাৎ কুরআন সুন্নাহ্‌য়, শরীয়াহ্ ও পার্থিব বিষয়ে স্পষ্ট সমাধান না পাওয়া গেলে ফকীহ্ বা মুফতীগণ ইজতিহাদের মাধ্যমে যে ফাতওয়া প্রদান করেন তা ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিক ও অন্যান্য স্থানের সকল মুসলমানের জন্য অবশ্য পালনীয়।

ফাতওয়ার বৈশিষ্ট্য

ফাতওয়ার সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন ঃ

১. ফাতওয়ার বিষয়বস্তু অবশ্যই ইবাদত, মু'আমালাত, উকূবাত বা শাস্তি ইত্যাদি সম্পর্কে হতে হবে।

২. ফাতওয়া অবশ্যই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হতে হবে। অন্যথায় ফাতওয়া বলে বিবেচিত হবে না।

৩. মুফতীকে অবশ্যই মুসলমান ও কুরআন সুন্নাহ্‌র পূর্ণ অনুসারী হতে হবে।

৪. ফাতওয়া অবশ্যই লিখিত হতে হবে।

৫. কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের পরিপন্থী হবে না অর্থাৎ কোন অবস্থায় ইসলামের মৌলনীতির পরিপন্থী হবে না।

৬. ফাতওয়া ব্যক্তিগত, দলীয় বা রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়।

৭. ইহা অবশ্যই জনকল্যাণমূলক নীতির পরিপন্থী হওয়া উচিত নয়।

৮. সর্বোপরি ফাতওয়ার উদ্দেশ্য হবে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে নব উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে ইসলামী নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করা।[১৯]

ফাতওয়ার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ফাতওয়ার উৎপত্তি কখন থেকে শুরু হয়েছে, তা সঠিকভাবে পাওয়া যায় নি। যুগে যুগে আল্লাহ্ পাক পৃথিবীতে মানব জাতির কল্যাণার্থে অসংখ্য নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। এ সব নবী রাসূল পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমস্যার সঠিক সমাধান দিয়েছেন এবং সমাধানের ক্ষেত্রে তাঁরা ফাতওয়া শব্দটি ব্যবহার

---

১৯. Masud Mahmud Khalid, **Adab-al-Mufti**, Ashrafia Publishers, Lahore, p. 89; Barbara D. Metalf Berkely, **The Muslim Understanding of Vlues : Characteristic and Role of a Mufti**, 1985, p. 247.

করেছেন। হযরত ইউসুফ (আ) মিসরের কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় তাঁর কাছে মিসরের শাসনকর্তার পক্ষ থেকে একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে ফাতওয়া শব্দটি ব্যবহার করা হয়। (সূরা ইউসুফের ৪৩তম আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য) হযরত সুলায়মান (আ)-এর সময় সাবা দেশের রানী বিলকিস তাঁর মন্ত্রীপরিষদের কাছে যখন পরামর্শ চেয়েছিলেন তখন তিনি 'আফতুনী' অর্থাৎ 'আমাকে ফাতওয়া দাও' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। এ ছাড়াও শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর যুগে ফাতওয়ার প্রচলন ব্যাপকভাবে চালু হয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ "লোকেরা আপনার কাছে মহিলাদের বিষয়ে ফাতওয়া জানতে চায়। আপনি বলুন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে ফাতওয়া বলে দিচ্ছেন। (সূরা নিসা ঃ ১২৭)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইহজীবনকালে ফাতওয়া

মহানবীর যুগে তিনি প্রথম ফাতওয়া দান করেন। কোন ঘটনা পরিস্থিতি বা উদ্ভূত কোন সমস্যার সমাধানে নবী (সা) যখন কোন ফাতওয়া প্রদানের আবশ্যকতা অনুভব করতেন, তখন আল্লাহ্ পাক এর সমাধান কল্পে পবিত্র কুরআনের এক বা একাধিক আয়াত নাযিল করে আইন প্রবর্তন করতেন। নবী (সা) আইন সম্বলিত এসব আয়াতের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে ফাতওয়া প্রদান করতেন। পবিত্র কুরআনে ফাতওয়া সম্পর্কিত আয়াত ঃ "(হে নবী) তারা আপনাকে নারীদের (উত্তরাধিকার ও মোহরানা পাওয়ার অধিকার আছে কি না) সম্পর্কে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করে। আপনি তাদের বলে দিন, তোমাদের জিজ্ঞাসিত বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্ তোমাদের ফাতওয়া দিচ্ছেন। (আন-নিসা ঃ ১২৭) অন্যত্র বলা হয়েছে, "(হে রাসূল সা.) মানুষ আপনার কাছে ফাতওয়া জানতে চায়। অতএব বলে দিন, আল্লাহ্ তোমাদের কালালাহ্‌র ব্যাপারে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ফাতওয়া দিচ্ছেন।" (আন-নিসা ঃ ১৭৬)

এছাড়াও নবী করীম (সা) আল্লাহ্ প্রদত্ত ইলহাম বা আল্লাহ্‌র ইঙ্গিতের সাহায্যে ইজতিহাদের মাধ্যমে ফাতওয়া প্রদান করতেন। একজন সাহাবী নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে রাসূল! আমরা সমুদ্র ভ্রমণে গিয়ে থাকি। সমুদ্রের পানি লবণাক্ত; আমাদের সাথে যে পানোপযোগী পানি থাকে, তা ওযূর জন্য যথেষ্ট নয়। এ অবস্থায় সমুদ্রের লবণাক্ত পানি দ্বারা ওযূ করা যায় কি?' জবাবে নবী করীম (সা) বললেন, 'সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং উহার মৃত বস্তুও হালাল।'[২০]

২০. আবদুল ওহাব খাল্লাফ, অনুবাদ, মাওলানা ছমির উদ্দিন, **ইসলামী আইনের সংক্ষিপ্ত**

বস্তুত ওহীর মাধ্যমে বা নবী করীম (সা)-এর মাধ্যমে যে সব ফাতওয়া প্রচলিত হয়েছে তা মুসলমানদের মেনে চলা প্রয়োজন। সাহাবায়ে কিরাম এ সব ফাতওয়া গুরুত্ব সহকারে সংরক্ষণ করেছেন। নবী করীম (সা)-এর যুগে কোন সাহাবীর ফাতওয়া প্রদানের অধিকার ছিল না। তবে রাসূলের হিজরত পরবর্তী সময়ে মুসলমানদের সংখ্যা ও ইসলামের পরিধি বিস্তৃতি হতে থাকলে রাসূলের একার পক্ষে সব অঞ্চলের সমস্যা সমাধানে ফাতওয়া প্রদান করা সম্ভব ছিল না। তাই ক্ষেত্র বিশেষে কোন কোন সাহাবীকে নবী (সা) ফাতওয়া প্রদানের অনুমতি দিয়েছেন। একদিন নবী করীম (সা) আমর ইবনে আস (রা)-কে একটি বিষয় মীমাংসা করতে বললেন। আমর ইবনে আস অবাক হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনার বর্তমানে আমার পক্ষে কোন বিষয়ে ফাতওয়া প্রদান করা কি উচিত হবে? জবাবে রাসূল (সা) বললেন, এতে কোন দোষ নেই। সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলে দ্বিগুণ নেকী আর ভুল হলে একটি নেকী পাবে। এ ছাড়াও নবী করীম (সা) মু'আয ইবনে জাবালকে ইয়ামনে বিচারকরূপে প্রেরণ কালে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে মু'আয, কোন্ আইনের দ্বারা তুমি সেখানে বিচার ফয়সালা করবে? মু'আয (রা) বললেন, আল্লাহ্র কিতাবের দ্বারা। রাসূলুল্লাহ (সা) আবার জিজ্ঞেস করলেন, যদি তাতে না পাও? তিনি বললেন, রাসূলের সুন্নাহ দ্বারা। অতঃপর রাসূল (সা) আবার জিজ্ঞেস করলেন, যদি তাতেও না পাও? তখন মুআয (রা) বললেন, আমি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নিজ বিবেক ও প্রজ্ঞা দ্বারা গবেষণা করে সিদ্ধান্ত নেব। রাসূলুল্লাহ (সা) জবাব শুনে বললেন ঃ আমি সেই আল্লাহ্র প্রশংসা করছি যিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে এমন সিদ্ধান্তে পৌছার ক্ষমতা দিয়েছেন যাতে আল্লাহ্র রাসূল সন্তুষ্ট হতে পারেন।[২১]

সাহাবায়ে কিরামের যুগ

সাহাবায়ে কিরামের যুগ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পর ১১ হিজরী হতে ৯৩ হিজরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সে যুগেও ফাতওয়ার ধারা অব্যাহত ছিল। সে সব ফাতওয়ারও লিখিত রূপ পাওয়া যায়। সাহাবায়ে কিরামের প্রদত্ত ফাতওয়ার কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে। এক মহিলার মোহরের উল্লেখ ছাড়াই বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পূর্বেই স্বামী মারা যান। তখন ঐ মহিলার মোহর কত ধার্য হবে, তা নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। হযরত আবদুল্লাহ্

ইতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৬, পৃ. ৭।

২১. প্রাগুক্ত, ৪ : শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলবী ঃ মত বিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়, অনুবাদ ঃ আবদুস শহীদ নাসিম, ১ম প্রকাশ, ৯১, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

ইবনে মাসুউদ (রা)-এর নিকট এ ব্যাপারে ফাতওয়া চাওয়া হলে তিনি উপস্থিত সাহাবাগণকে বলেন, এ ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত বিবেক ও প্রজ্ঞা দিয়ে ইজতিহাদ করা ছাড়া কোন পথ নেই। কারণ কুরআন ও সুন্নাহ্য় এ ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট হুকুম পাওয়া যাচ্ছে না। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানে যদি সঠিক হই, তবে প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্র। আর যদি ভুল করি, তবে তা আমার ও শয়তানের ঘাড়ে পড়বে। উপস্থিত সাহাবীগণ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের কথার কোন প্রতিবাদ করেন না। ইবনে মাসউদ সে ক্ষেত্রে 'মোহরে মিসাল' এর রায় দেন।[২২]

সাহাবীগণের এ কাজ দ্বারা ফাতওয়া দেওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। রাসূল (সা)-এর ওফাতের পর খুলাফায়ে রাশেদাসহ অন্যান্য যে সকল সাহাবায়ে কিরামের দেয়া ফাতওয়াসমূহ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে, তাঁদের সংখ্যা প্রায় ১৪৯ জন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন মহিলা সাহাবীও ছিলেন। ফাতওয়া প্রদানকারী এসব সাহাবীগণকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ ক. মুকাস্সিরীন খ. মুতাওয়াস্সিতীন এবং গ. মুকিল্লীন।[২৩]

তাবিঈগণের যুগ

খুলাফায়ে রাশেদার যুগে এবং এর পরবর্তী যুগে মুসলিম রাষ্ট্রের পরিধি অনেক গুণ বেড়ে যায়। বহু নতুন দেশ ও জাতির মধ্যে ইসলাম প্রসার লাভ করে। ফলে স্বাভাবিকভাবে নিত্যনতুন প্রশ্ন ও সমস্যার সৃষ্টি হয়। তখন ফাতওয়া দেওয়ার দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই তাবিঈগণের ওপর পড়ে। কিন্তু তাবি'ঈগণের মধ্যে অনেকেই শুধু ফাতওয়া প্রদানের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা পছন্দ করেন নি; বরং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে ইজতিহাদী শক্তি দ্বারা সমাজের নতুন নতুন সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত হন। ফলে তাবিঈগণের কার্যপ্রণালী দু' ধারায় চলতে থাকে। প্রথম দল সাধারণত হাদীস সংগ্রহ, সংরক্ষণ সংকলন ও এর শুদ্ধতা নিরূপণ করতেন এবং কখনো কখনো প্রয়োজনে ফাতওয়াও প্রদান করতেন। তবে হাদীসের দিকে বেশি মনোযোগ দিতেন। দ্বিতীয় দলের আলিমগণ ফিকহ্ ও ফাতওয়ার কাজে বেশি ব্যস্ত ছিলেন। তবে হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণেও তাঁদের ভূমিকা কম নয়। এ পর্যায়ের তাবিঈ আলিমগণ বর্তমান ও ভবিষ্যত অবস্থার প্রতি সুদূর প্রসারী দৃষ্টি দেন। তাঁরা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, ধীরে ধীরে মুসলমানরা কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে বিভিন্ন নতুন নতুন সমস্যার সমাধান উদ্ঘাটনের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। তাই তাঁরা কুরআন হাদীসের

---

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৪; সাইয়িদ আমীমুল এহসান, **আদাবুল মুফতী**, ইদারায়ে রাশীদিয়া, ঢাকা, পৃ. ৮।

২৩. আল্লামা মোল্লা জিওন, **নূরুল আনওয়ার**, কুতুবখানায়ে হুসাইনিয়া, দেওবন্দ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৭৮, পৃ. ২৪৬।

আলোকে মাসআলা-মাসাইল উদ্ভাবন করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে ফিকাহ্ বিদ্যার প্রতিটি অধ্যায়ে বহুবিধ মাসআলা-মাসাইল ও ফাতওয়া রচিত ও সংকলিত হয়। এমন কি ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ফাতওয়ার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠি হয়। তন্মধ্যে সাতটি কেন্দ্র প্রসিদ্ধ ঃ মক্কা, মদীনা, কূফা, বসরা, সিরিয়া, মিসর ও ইয়ামন।[২৪]

মুজতাহিদ ইমামগণের যুগ

তাবিঈ যুগের পরে ইসলামের আরও ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে। এ যুগে ইসলামী সমাজ ইউরোপের সুদূর স্পেন থেকে শুরু করে আফ্রিকার উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাংশ এবং পূর্বে চীন ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সুদূরতম এলাকা উত্তরে সাইবেরিয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে এবং দক্ষিণে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে মুসলিম জনবসতি গড়ে ওঠে।[২৫]

এ যুগেই আবির্ভূত হন ইসলামী আইনবিদ্যা বা ফিক্হর বিশিষ্ট ইমাম ও মুজতাহিদগণ। ইসলামী আইনে ফাতওয়ার ক্রমবিকাশে মুজতাহিদ ইমামগণের এ যুগকে সোনালী যুগ বলা হয়। এ যুগের বিস্তৃতি হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরু থেকে হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত। এ যুগের মুজতাহিদ ইমামগণের অনুসারীবৃন্দ আজ সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে আছেন। বর্তমান বিশ্বে এমন কোন মুসলিম দেশ পাওয়া যাবে না যেখানকার মুসলমানগণ এ ইমামগণের নীতি ও ফাতওয়া কিছু না কিছু অনুসরণ করছেন না। এ যুগে ইসলামী আইনবিদ্যা বা ফিকহ্ একটি সুস্পষ্ট রূপ নেয়। ফিকাহ্র এ যুগে চার জন মুজতাহিদ ইমাম মুসলিম বিশ্বে ফাতওয়া প্রদানের জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁরা হলেন ঃ

ক. ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) (৮০-১৫০ হি.)

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) নিজ মুখে প্রায় ৮৩ হাজার মাসাইল ও ফাতওয়া বর্ণনা করেন। এর মধ্যে ৩৮ হাজার ছিল ইবাদত সম্পর্কিত এবং ৪৫ হাজার মু'আমালাত বা পারস্পরিক লেন-দেন সম্পর্কিত। শামসুল আয়েম্মা আল্লামা কুদূরী (র) বলেন ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র) প্রায় ৬ লক্ষ মাসাইল ও ফাতওয়া বর্ণনা করেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা, কিয়াসের ভিত্তিতে বিবেক বুদ্ধির আলোকে ফাতওয়া প্রদান করতেন। এ জন্য তাঁকে 'আহ্লু আর-রাঈ' বলা হয়। এ মতের স্বপক্ষে ছিলেন ইরাকের অধিকাংশ ফকীহ্গণ।[২৬]

---

২৪. আবু সাঈদ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্, ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৩৮।

২৫. ফাতওয়া ও মাসাইল, পৃ. ২১৭।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯।

খ. ইমাম মালিক (র) (৯৫-১৭৯ হি.)

ইমাম মালিক (র) ফিকহ্র উৎকর্ষতায় ও তৎকালীন মুসলিম সমাজে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে ফাতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাঁর ফাতওয়ার সংকলন 'আল মুদাওয়ানা' গ্রন্থে ৩৬ হাজার মাসাইল ও ফাতাওয়া সন্নিবেশিত হয়েছে।[২৭]

গ. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) (১৬৪-২৪১ হি.)

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) ফাতওয়ার ক্রমবিকাশ ও উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। আবূ বকর খালাল আহমদ ইবন হাম্বলের মাসাইল ও ফাতাওয়ার সমষ্টি ৪০ খণ্ডে সংকলিত করেছেন।

ঘ. ইমাম শাফী (র) (১৫০-২০৪ হি.)

ইসলামী আইনে ফাতওয়ার ক্রমবিকাশ ও উৎকর্ষতায় ইমাম শাফী (র)-এর অবদান সন্দেহাতীতভাবে বিপুল। ফাতওয়া সংক্রান্ত তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'কিতাবুল উম্মু' সাত বিরাট খণ্ডে রচিত। তাঁর রচিত অন্য একখানা গ্রন্থ 'রিসালা'। এ গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি ইসলামী আইনে 'ফাতওয়া' প্রদানকে একটি সুগঠিত নিয়মাবলীর আওতায় আনেন। ইমাম শাফী (র) ইসলামী আইনে ফাতওয়া প্রদানের সবগুলো প্রত্যয় এবং ধারণাকে প্রাথমিক স্তর থেকে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করেন। সর্বশেষ তিনি নব বিন্যস্ত প্রত্যয়ের আলোকে ইসলামী আইনে 'ফাতওয়া' প্রদানে রীতির সুষম অবস্থান নির্দিষ্ট করেন। এভাবে হিজরী চতুর্থ শতকের মধ্যেই ইসলামী আইনে 'ফাতওয়া' পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে এবং পরবর্তী যুগসমূহের জন্য উপরোক্ত চারজন ইমাম পথ প্রদর্শক রূপে পরিগণিত হন।

আধুনিক যুগ

মুজতাহিদ ইমামগণের পর ইজতিহাদের পরিবর্তে তাকলীদের উপর ভিত্তি করে ফাতওয়া প্রদানের রীতি প্রচলিত হয়। তাকলীদ-পরবর্তী যুগকে আধুনিক যুগ বলা হয়। উসমানী খিলাফত আমল থেকেই এ যুগের সূচনা। উসমানী খিলাফত আমলে প্রায় ১৩৮৬ হিজরী সনে চার মাযহাবের তাকলীদের গণ্ডির ভেতর হতে বের হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে 'ফাতওয়া' প্রদানের রীতির সূচনা হয়। এ সময় ফাতওয়া সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে 'মাজাল্লাতু আল আহকাম আল আদালিয়াহ্' নামক গ্রন্থ রচিত হয়, যা ফাতওয়ার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

১৯২৯ খ্রী. ও ১৯৩৬ খ্রী. মিসরে তাকলীদের ধারা মুক্ত হওয়ার প্রয়াস চালানো হয় এবং এ সিদ্ধান্তে তৎকালীন ইসলামী আইনবিদগণ উপনীত হন যে,

২৭. ফিক্হ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ পৃ. ৩৯-৪৪।

'মাসালিহ্ মুরসালাহ্' জনকল্যাণমূলক বিধান ও প্রগতিশীল ইসলামী জীবন যাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে সকল মুসলিম ফকীহ্গণের অভিমতকেই ফাতওয়া প্রদানের ভিত্তিরূপে গণ্য করা উচিত। এ ধারার গোড়াপত্তনে অন্যতম পথিকৃৎ মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)। প্রসঙ্গত যে স্ত্রীর স্বামী লাপাত্তা বা নিরুদ্দেশ, সেই স্ত্রীর দ্বিতীয় বিয়ের জন্য তিনি হানাফী মাযহাবের পরিবর্তে মালিকী মাযহাবের মূলনীতির আলোকে ফাতওয়া প্রদান করেন।[২৮]

বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার একবিংশ শতাব্দীর দ্বার প্রান্তে এসে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের জীবনে উদ্ভূত নানা সমস্যার সমাধানে ফাতওয়া দানের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ও.আই.সি)-এর একটি বিশেষ অঙ্গ সংস্থা 'দারুল ইফ্তা' ব্যাংকিং বীমা ট্রান্সমিশন (তথ্য বিনিময়) বাণিজ্যিক লেন-দেন ইত্যাদি বিষয়ে যুগোপযোগী ফাতওয়া প্রদান করে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে দিক নির্দেশনা দিচ্ছে। সুতরাং বলা যায় পূর্ণাঙ্গ ইসলামের প্রাথমিক যুগে ফাতওয়ার সূচনা হয়ে এর ক্রমবিকাশ ধারা বর্তমান যুগ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

ফাতওয়া প্রদানের যোগ্যতা

ফাতওয়া প্রদান ইসলামী আইনে এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। যিনি ফাতওয়া প্রদান করেন, ইসলামী পরিভাষায় তাঁকে মুফতী বলা হয়। আল্লামা খতীবে বাগদাদী (র) 'আল-ফিক্হ ওয়াল মুতাফাক্কিহ' নামক কিতাবে বলেন, "যে সকল মুফতীকে আল্লাহ্ তা'আলা ফাতওয়ার যোগ্যতা দান করেছেন, শুধু তাঁরাই ফাতওয়া দেবেন।"

আল্লামা খতীবে বাগদাদী (র)-এর ভাষ্যমতে ফাতওয়া প্রদানের জন্য একজন মুফতীর নিম্নরূপ যোগ্যতা থাকা আবশ্যক।[২৯]

১. মুফতীকে অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান হতে হবে। কারণ ইসলাম ও মুসলমানের ওপর শরয়ী ব্যাপারে কর্তৃত্ব খাটানোর অধিকার কোন অমুসলমানের নেই, কুরআন সুন্নাহ্য় তাঁর যত বড় দখলই থাক না কেন।

২. আল-কুরআনের সহী পঠন (সাত কারী ১৪ রিওয়ায়াত অনুযায়ী)-সহ এর আভিধানিক পারিভাষিক ও আইনগত অর্থ সম্পর্কে স্পষ্ট ও বিস্তারিত জ্ঞান থাকতে হবে।

৩. আল-কুরআন থেকে আইন প্রণয়নের ৪টি পদ্ধতি। যথা ঃ

---

২৮. গাজী শামছুর রহমান, **ইসলামী আইনতত্ত্বের বিকাশ ও পরিচিতি**, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ১২।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

ক. ইবারাতুন্‌নাস্‌

খ. ইশারাতুন্‌নাস্‌

গ. দালালাতুন্‌নাস্‌

ঘ. ইকতিদাউন্‌নাস্‌। এসব সহ কুরআনুল কারীমের প্রসিদ্ধ যে কোন তাফসীর গ্রন্থে গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

৪. উসূলে তাফসীর, নাসিখ্‌, মানসুখ ও অন্যান্য আহকাম সম্পর্কে উচ্চ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

৫. হাদীসের সনদ, মতন ও উসূলে হাদীস সম্পর্কে উচ্চ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।

৬. ফিকহ্‌, উসূলে ফিকহ্‌ ও ফিকহী পরিভাষা তথা হালাল, হারাম, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব, মাকরূহ ও মুবাহ ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল হতে হবে।

৭. আরবী ভাষা, ব্যাকরণ ও অলংকার বিদ্যা সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।

৮. সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি সমান দৃষ্টি এবং সবার জন্য তাঁর দ্বার সদা উন্মুক্ত থাকা আবশ্যক।

৯. মুফতীর এমন যোগ্যতা থাকতে হবে যাতে তিনি অতীত ও বর্তমানের লিখিত দীনী কিতাবসমূহ বুঝতে পারেন এবং এর থেকে যাবতীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ করে ফাতওয়া প্রদানে সক্ষম হন। কেননা বলা হয়ে থাকে, যে ব্যক্তি তাঁর সময়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়, সে জাহিল।"

১০. কোন যোগ্যতা সম্পন্ন অভিজ্ঞ মুফতীর নিকট থেকে ফাতওয়া এবং সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী শিক্ষা করা তাঁর জন্য অপরিহার্য।

১১. একজন মুফতী আমল-আখ্‌লাক, তাক্‌ওয়া-পরহেযগারী, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, আত্মচেতনা, দৃঢ়চিত্ততা, ন্যায়পরায়ণতা, ইবাদতের প্রতি অনুরাগ, অসাধারণ প্রতিভা, কর্মদক্ষ ও জ্ঞানী হবেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি সকলের জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ হবেন।[৩০]

১২. তিনি শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী হবেন এবং মাকরূহ তাহরীমী ও মাকরূহ তানযীহী করা থেকে বিরত থাকবেন।

১৩. সর্বোপরি একজন মুফতীর প্রচলিত আইন ও প্রথা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা থাকতে হবে।

---

৩০. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৫৫৭।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আযম আবূ হানীফার উক্তি উল্লেখযোগ্য 'বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আমরা যে অভিমত ব্যক্ত করছি, সেগুলোর উৎস সম্পর্কে যে ব্যক্তি জ্ঞান রাখে না, তার জন্য ফাতওয়া দেয়া যুক্তিসঙ্গত নয়।'

এ আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, ফাতওয়া প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যোগ্যতা না থাকলে এ কাজ করার আদৌ সুযোগ থাকে না। হাতুড়ে ডাক্তারের মত অযোগ্য তথাকথিত মুফতী মানুষের ঈমান আমল নষ্ট করে দিতে পারে। তাই ফাতওয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করে অনেক মুসলিম রাষ্ট্র (সৌদি আরব, ইরান, মিসর, জর্দান, সুদান ও লিবিয়া) সরকারীভাবে মুফতী নিয়োগ করে থাকে।

ফাতওয়া প্রদানের পদ্ধতি

ইসলামী আইনবিদ্যা বা ফিকাহ্ বিশ্লেষণ করলে ফাতওয়া প্রদানের নিম্নরূপ পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া যায়।

১. মৌখিকভাবে

ফাতওয়া প্রদানের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক ফাতওয়া প্রদানের যোগ্য মুফতীরূপে তালিকাভুক্ত হলে তাঁরা ইবাদত সম্পর্কিত বিষয়ে মৌখিকভাবে ফাতওয়া প্রদান করতে পারেন। তবে ফাতওয়া সম্পর্কিত সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করে লিখিতভাবে ফাতওয়া প্রদান শ্রেয়।

২. লিখিতভাবে

ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক যে সকল মুফতী ফাতওয়া প্রদানের জন্য নিয়োগ প্রাপ্ত তাঁরা যদি বিচারক হন এবং তাঁরা যদি কোন বিষয়ে ফাতওয়া প্রদান করেন, তা অবশ্যই লিখিত হতে হবে। বিচারক ছাড়া অন্যান্য মুফতীগণও মু'আমালাত উকুবাত বা শরীয়তের যে কোন হুকুম সম্পর্কিত বিষয়ে ফাতওয়া প্রদান করলে তা অবশ্যই লিখিতভাবে দিতে হবে।[৩১]

ফাতওয়া প্রদানের শর্তাবলী

ফাতওয়া প্রদানের শর্ত প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী (র) নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করেন ঃ

১. মৌখিকভাবে ফাতওয়া দেওয়ার বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয নয়। অবশ্য লিখিতভাবে ফাতওয়া প্রদানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয আছে। তবে লিখিত ফাতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রেও পারিশ্রমিক গ্রহণ না করাই উত্তম।[৩২]

---

৩১. **The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World**, p. 10.

৩২. আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী, **কুররাতুল উয়ূন আল আখিয়ার**, দারুল মারিফা,

২. যেখানে নিজের চেয়ে অন্য কোন অভিজ্ঞ মুফতী রয়েছেন সেখানে ফাতওয়া দেওয়ার ব্যাপারে অগ্রগামী হওয়া উচিত নয় বরং অভিজ্ঞ ব্যক্তির হাওয়ালা করে দেয়াই শ্রেয়। উক্ত অভিজ্ঞ মুফতীর অনুমতি ও পরামর্শ সাপেক্ষে প্রথমোক্ত ব্যক্তি নিজেও দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

৩. যখন লিখিত আকারে মুফতীর নিকট ফাতওয়া চাওয়া হয়, তখন মুফতী প্রথমত প্রশ্নটি ধীরস্থিরভাবে পড়ে লক্ষ্য করে দেখবেন যে, প্রশ্নটি উত্তরযোগ্য কি না বা এর উত্তর দেওয়া হলে কোন ভুল বুঝাবুঝি বা কোন অবান্তর ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কি না! যদি প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া অপ্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয় বা এর উত্তর দেওয়া হলে ভুল বুঝাবুঝি বা ফিত্না-ফাসাদ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে, তবে এর উত্তর দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন।

৪. প্রশ্নকারীর প্রশ্নপত্রে যদি কোন অস্পষ্টতা থাকে, তবে প্রশ্নকারীর দ্বারা স্পষ্টভাবে লিখে নেবেন। আর সে যদি এতে অপরাগ হয় তবে মুফতী তার থেকে মৌখিক বিবরণ শুনে নিজে প্রশ্নপত্র ঠিক করে নিতে পারেন।

৫. প্রশ্নকারীর একাধিক প্রশ্ন থাকলে ফাতওয়া প্রণয়নের সুবিদার দিগে লক্ষ্য রেখে প্রশ্নগুলোর ক্রমিক নম্বর নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৬. সহজ ও সরল ভাষায় ফাতওয়া লিপিবদ্ধ করাই শ্রেয় এবং শেষে তথ্যসূত্র বা গ্রন্থ নির্দেশিকা উল্লেখ করতে হবে।

৭. প্রশ্নটি যদি ইসলামের মৌলিক বিষয় বা শুধুমাত্র উসূলে দীন বা অবশ্য পালনীয় ইবাদত সম্পর্কীয় হয়, তবে উত্তরে সরাসরি কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিতে হবে।

৮. শান্ত মনে ধীরস্থিরভাবে ও সুস্থ পরিবেশে ফাতওয়া প্রদান করতে হবে।

ফাতওয়ার আইনগত ভিত্তি

ফাতওয়া ইসলামী আইন তথা শরীয়াহ্র অনুশাসনের বহিঃপ্রকাশ। ফাতওয়া কুরআন সুন্নাহ্র আলোকে স্বীকৃত। তাই এটা ইসলামী আইনের এক মৌলিক উৎস হিসেবে বিবেচিত। ইসলামী আইনে ফাতওয়ার আইনগত অবস্থান এরূপ যে, ফাতওয়ার প্রথমোক্ত বিষয়বস্তু অর্থাৎ ইবাদত সম্পর্কিত কোন ফাতওয়া প্রদত্ত হলে মুসলমানগণ তা নিজ দায়িত্ব ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনুসরণ করবেন। অন্যথা করা আইন সিদ্ধ নয়।

কিন্তু ফাতওয়ার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয় মু'আমালাত ও উকুবাত সম্পর্কিত কোন ফাতওয়া প্রদত্ত হলে তা মান্য করার অনুকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকলে মুসলমানরা তা অনুসরণ করবে। অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান না

বৈরুত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩-৪৪।

থাকলেও তা পালন করার জন্য সর্বান্তঃকরণে সদা সচেষ্ট থাকতে হবে। কোন অবস্থায় ফাতওয়া মান্য করার আন্তরিকতায় সামান্যতম ঘাটতি প্রকাশ করা যাবে না।

ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থায় ফাতওয়ার অবস্থান

ফাতওয়ার অবস্থান ইসলামী আইন ব্যবস্থায় অত্যন্ত সুদৃঢ়। ফাতওয়া কুরআন সুন্নাহ্ দ্বারা স্বীকৃত এবং ফিকাহ্ বা ইসলামী আইনের একটি বিশেষ আইনগত পরিভাষা। তদুপরি ফাতওয়ার অভিব্যক্তি ও সংজ্ঞাই ইসলামী আইনে ফাতওয়ার অবস্থান নির্দেশ করে। এর উদ্দেশ হলো বিচারক বা ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দান এবং এর মাধ্যমেই বিচারক শরীয়াহ্ আদালতে মোকদ্দমার বিচার করে থাকেন যার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সুনিয়ন্ত্রিতভাবে জীবন পরিচালিত করেন। পূর্বে প্রতিটি শরীয়াহ্ আদালতে বিচারকের পাশাপাশি মুফতী নিয়োগ করা হতো। মুফতীদের রায় বিচারকরা নির্বাহ করতেন। ফাতওয়া ইসলামী বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারের একটি অংশ। উপমহাদেশে মোগল আমলেও এ ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের যাতাকলে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলো অমুসলিমদের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণে চলে গেলে তাদের আইন-কানূনের দ্বারাই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য বিয়ে, তালাক ও উত্তরাধিকার আইনগুলো 'মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের' আওতায় গন্ডিবদ্ধ করে ফেলা হয়। কিন্তু মুসলিম মনীষীরা এ ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকেন নি। শরীয়াতের আলোকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঈমানের দাবী নিয়ে যথাযথ ভূমিকা পালন করছেন। যেহেতু মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবন ও কর্মের অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ের মীমাংসা প্রচলিত আইন আদালতে সম্ভব নয় এবং তা শরীয়তের সকল বিধি-বিধান সম্পর্কেও অভিজ্ঞ নয়, সেহেতু ইসলামী জ্ঞানে অভিজ্ঞ আলিম বা মুফতীদের পরামর্শ মুসলমানরা সর্বদা গ্রহণ করে আসছে। তবে যেখানে সেখানে যখন তখন ফাতওয়া চাওয়া বা দেয়া উভয়ই ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর। তাই বিচ্ছিন্নভাবে প্রচলিত পদ্ধতি বন্ধ করে ইসলাম সম্মত বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সকল মুসলমানের দায়িত্ব। সরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত আইন ও বিচার ব্যবস্থা খুবই ব্যয়বহুল এবং জটিল প্রক্রিয়া। এ কারণে প্রচলিত আইন ব্যবস্থা খুব অল্প সংখ্যক লোকের সমস্যা মেটাতে পারে। এ জন্য মসজিদ ও ধর্মভিত্তিক সালিস ও বিচার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। কিন্তু এক সমাজে দু'ধরনের বিচার ব্যবস্থা চালু থাকতে পারে না। এতে অনেক সময় সমস্যার সৃষ্টির হয়।

আমাদের প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত ফাতওয়ার মাধ্যমে শরীয়াহ্র কোন দন্ডবিধি প্রয়োগ করা উচিত নয়। ফাতওয়া বাস্তবায়নের

জন্য চাই ইসলামী সমাজ এবং এর মাধ্যমেই ফাতওয়ার আইনগত দিকটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

ফাতওয়া অনুসরণ করা প্রকারান্তরে কুরআন সুন্নাহ অনুসরণ করার শামীল আর ফাতওয়া অমান্য করা কুরআন সুন্নাহ অমান্য করার নামান্তর। ফাতওয়া ইসলামী শরীয়াহ্‌র নির্যাস মৌলিক বিষয় যা ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট। যে ব্যক্তি কুরআন সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে কোন বিষয়ে প্রদত্ত ফাতওয়াকে মান্য করল, সে ইসলামকে মান্য করল এবং যে এরূপ ফাতওয়া অস্বীকার করল, সে ইসলামকে অস্বীকার করল।

এ আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ফাতওয়া ইসলামী আইনের এক মৌলিক নীতি যা মান্য করলে মুসলমানীত্ব রক্ষা হয় এবং অস্বীকার করলে কুফরী সৃষ্টি হয়।

বর্তমান সময়ে ফাতওয়ার প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান সময়ে ফাতওয়ার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। এটা কোনক্রমে অস্বীকার করা যাবে না। শরীয়াতের সকল বিষয় তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ফাতওয়ার দিক নির্দেশনা এক অনন্য অপরিহার্য বিষয়। একজন মুসলমানের কাজ হলো তার যাবতীয় কাজকর্ম কুরআন-সুন্নাহ মুতাবিক পরিচালিত করা। কিন্তু মানুষের নিজের কর্মময় জীবন এত ব্যস্ত যে প্রত্যেকের জন্য নিজ নিজ সমস্যার শরয়ী সমাধান পবিত্র কুরআন থেকে গবেষণার মাধ্যমে বের করা দুরূহ ব্যাপার। এ জন্য প্রয়োজন দেখা দেয় যাঁরা শরীয়াহ্ তথা কুরআন-সুন্নাহ্ ও ফিকহ্ এ অভিজ্ঞ তাঁদের মাধ্যমে ফাতওয়া গ্রহণ করা।

নতুন নতুন ঘটনার ভিন্নতার নিরিখে ফাতওয়া পরিবর্তিত হতে বাধ্য। মূলত ইসলামী নীতিমালা গতিশীল ও ক্রমবিকাশমান করার লক্ষ্যেই এর জন্ম। আল্লাহ্‌র বাণী অলংঘনীয় বিধায় ধর্মীয় ও জাগতিক ব্যাপারে একটি জীবন্ত সূত্রের কার্যকারিতা রক্ষার জন্য ফাতওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ধর্মপ্রাণ মানুষের জন্য অনুসৃত সিদ্ধান্তটি হওয়া চাই ধর্মীয় বিধি-বিধান ও মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যশীল। অন্যথায় সিদ্ধান্ত জানা, বুঝা ও অনুসরণ করা সংশ্লিষ্টদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে অনেক অসামঞ্জস্যশীল সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য ক্ষতিকরও প্রমাণিত হয়েছে। অতএব দেখা যায়, ফাতওয়ার প্রয়োজনীয়তা সবার জন্য অনস্বীকার্য। সূচনা থেকেই ফাতওয়া মুসলিম সমাজ ব্যবস্থাকে পাপাচার থেকে মুক্ত রাখতে সাহায্য করে আসছে। পাপবোধকে জাগ্রত রাখা এবং পাপাচার থেকে সমাজকে মুক্ত রাখার ব্যাপারে ফাতওয়ার অসামান্য ভূমিকা অনস্বীকার্য।

তাই সকল ধরনের সমাজ ব্যবস্থায় ফাতওয়া বা ধর্মীয় সিদ্ধান্তের প্রয়োজন পড়ে। ফাতওয়ার প্রয়োজন যেমন ইসলামের সেকালে ছিল, এখনও তেমনি আছে এবং অপরিহার্যরূপে থাকবে।[৩৩]

বাংলাদেশে ফাতওয়ার ব্যবহার

গতিশীল ইসলাম ধর্মে ইসলামী আইনে যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কুরআন-সুন্নাহ্র ভিত্তিতে ফাতওয়া দেয়ার রীতি প্রচলিত হয়েছিল, বাংলাদেশে অনেকাংশে তা উপেক্ষিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এর অপব্যবহার করা হচ্ছে।

কুরআন-সুন্নাহ্র সামান্য জ্ঞান থাকলেই ফাতওয়া প্রদান করা যায় না। এমন কি ফিকহ্ অধ্যয়ন করলেই ফাতওয়া প্রদান করা যায় না বরং ফাতওয়া প্রদানের জন্য মুফতী হওয়ার মত প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করা আবশ্যক। এ সত্যটুকু উপলব্ধি না করে কুরআন হাদীস ও ফিক্হর কিছু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনকারী আলিম, হাফিযে কুরআন, যারা মাদ্রাসা, মসজিদ, মক্তব প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত, যাদের মুফতী হবার মত ন্যূনতম যোগ্যতা আছে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট বিচার-বিশ্লেষণের অবকাশ রয়েছে, এরূপ ব্যক্তিবর্গ গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ফাতওয়া দিয়ে এর অপব্যবহার করছে। ফলে শরীয়তের এক মৌলিক বিষয় সমালোচিত হচ্ছে বিভিন্ন মহলে।

মূলতঃ ইসলামের মর্মবাণী সঠিকভাবে উপলব্ধি না করে, নিজেদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে অনেকে বিভিন্ন কলাকৌশলে ভুল ফাতওয়া দিয়ে সঠিক ফাতওয়ার মূল্যবোধকে প্রকারান্তরে উপেক্ষা করছে। ফলে উলামায়ে কিরাম ও শ্রদ্ধেয় মুফতীগণের সম্পর্কেও বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক সময় শরীয়াত সম্পর্কে খুব সীমিত জ্ঞান বা অজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা রায় নেয়া বা গ্রাম সালিসকে ফাতওয়ার প্রলেপ দিয়ে ইসলামের বিচার ব্যবস্থার অবমূল্যায়ন করা হয়। এতে সাধারণ মানুষের মনে ফাতওয়া সম্পর্কে বিরূপ ধারণা ও ধর্মীয়-সামাজিক মূল্যবোধেরও অবক্ষয় ঘটে।

বস্তুত ফাতওয়া ইসলামী আইনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং তা মান্য করা মুসলমানদের অপরিহার্য। বাংলাদেশে ফাতওয়ার সঠিক ব্যবহার ও প্রয়োগের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. ইসলামী শিক্ষার প্রসার

বর্তমান সমাজের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সঠিক ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে ফাতওয়ার অপপ্রয়োগ রোধ করা যেতে পারে।

---

৩৩. মুহাম্মদ জোসন আলী, **ইসলামী দণ্ডবিধির রূপরেখা**, ইসলাম প্রচার ও গবেষণা কেন্দ্র, কক্সবাজার ১৯৯৫, পৃ. ৯।

২. ফাতওয়া প্রদানের নির্দিষ্ট ধারা প্রতিষ্ঠা

ফাতওয়া প্রদানের কোন আইনগত স্বীকৃতি বা নির্দিষ্ট ধারা না থাকায় এর অপপ্রয়োগ হচ্ছে। হাফিযে কুরআন, মসজিদের ইমাম বা সাধারণ কোন মৌলভী হলে কুরআন-সুন্নাহ, তাফসীর, ফিকহ্ ইত্যাদিতে বিশেষ বিজ্ঞ হবেন, এমন না-ও হতে পারে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে কখনো কখনো এ রকম ব্যক্তিদের দ্বারা শরীয়তের কোন মাসআলার ফাতওয়া নিয়ে বা গ্রাম্য সালিসের রায়কে ফাতওয়া বলে প্রচার করা হয়, যার ফলে সমাজে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। এভাবে নিজের অজান্তে কিছু ইমাম ফাতওয়া দিয়ে ইসলামের ক্ষতি সাধন করেছেন এবং জনমনে ভুল ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে। ফাতওয়া সম্পর্কে একটি বিধিবদ্ধ নিয়ম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ ভুল ধারণার অপনোদন করা সম্ভব।

৩. ফাতওয়ার বোর্ড প্রতিষ্ঠা

ফাতওয়ার অপপ্রয়োগ রোধে ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ও ফাতওয়া প্রদানের যোগ্যতা সম্পন্ন মুফতীদের সমন্বয়ে একটি জাতীয় ফাতওয়া বোর্ড গঠন করা যেতে পারে। এ বোর্ড উদ্ভূত কোন সমস্যা সমাধানে আইনানুগ ফাতওয়া প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করবে। অবশ্য জাতীয় প্রয়োজনে প্রতিনিধিত্বশীল মুফতীর সমন্বয়ে প্রতিটি জেলা ও থানায় এর শাখা সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

৪. ফাতওয়া সম্পর্কে গণমাধ্যমসমূহে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার

ফাতওয়ার সঠিক মূলবোধ ও আইনগত দিক গণমাধ্যমসমূহে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রচার করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে সাধারণ জনগণ ফাতওয়া সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করতে পারে।

এ আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলামী আইনে ফাতওয়াকে প্রকৃত অর্থে জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য সমন্বিত জাতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক।

ইসলামে তালাক ব্যবস্থা*

ডঃ মাযহার উদ্দীন সিদ্দিকী

ইসলামী বিধান অনুযায়ী বিবাহ এমন কোন চিরস্থায়ী সম্বন্ধ নয়, যা কোনো অস্বাভাবিক দুর্ঘটনা ব্যতীত ছিন্ন করা যায় না। যেহেতু ইসলাম বিবাহকে একটি চুক্তির মর্যাদা দান করেছে, তাই তা বাতিল করারও অনুমতি দিয়েছে, যদি চুক্তির শর্ত প্রতিপালিত না হয়। স্বামী এবং স্ত্রীর পরস্পরকে নির্বাচন করার যে অধিকার দেয়া হয়েছে, তার যৌক্তিক দাবীই হচ্ছে, তারা একে অন্য থেকে আলাদা হওয়ার অধিকারও রাখে। এ সম্পর্কে জনৈক আমেরিকান গ্রন্থকার মার্গারেট মেড লিখেছেন ঃ

"নির্বাচনের স্বাধীনতার সাথে সাথে স্বাভাবিক ভাবেই স্বামী-স্ত্রীর এ অধিকারও থাকা উচিত যে, তারা অভিজ্ঞতার পর নিজ মত পরিবর্তন করতে পারবে। মানবীয় কর্মকাণ্ডের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে যদি অতীতের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করা যায়, তবে বৈবাহিক জীবনকে এ নীতি থেকে আলাদা করা হবে কেন? অনুরূপ বৈবাহিক সম্পর্কের মূলতত্ত্ব যদি স্বামী-স্ত্রীর প্রেমাসক্তির মধ্যে নিহিত থাকে, তবে যখন উভয় পক্ষের প্রেমাবেগ খতম হয়ে যাবে, তখন ঐ সম্পর্কের ভিত্তিও নষ্ট হয়ে যাবে। যে পক্ষ এরপরও অন্য পক্ষকে আঁকড়ে থাকবে, সে অন্যের উপর যুলুম করবে এবং তার স্বাধীনতায় অহেতুক বাদ সাধবে।"

তালাক মূলত একটি খারাপ ও অবৈধ কাজ, যা নীতি-নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার পরিপন্থী—এ ধারণা খ্রীস্টানদের সৃষ্ট। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, এ মতবাদ শুধু অকার্যকরই নয়, বরং এর ফলে বহু রকম সামাজিক অনিষ্টের সৃষ্টি হয়। অধিকন্তু খ্রীস্টান জাতি-গোষ্ঠীগুলোর বর্তমান ইতিহাস থেকে জানা যায়, এ মতবাদ যে কেবল সেখানেই কার্যকর করা যায়নি তা নয়, বরং তার প্রতিক্রিয়া এতই শক্তিশালী হয়েছে যে, খ্রীস্টান দেশগুলোতে এখন তালাকের আধিক্যের দরুন পরিবার কাঠামোর স্থায়িত্ব বিদায় হতে চলেছে এবং পারিবারিক জীবনের শান্তি শেষ হয়ে গেছে।

---

* [প্রবন্ধটি ইফা পত্রিকা ১৯৯১ সন ৩০ বর্ষ ৩য় সংখ্যা থেকে সংগৃহীত]

রোমান ক্যাথলিক বিশ্বাস অনুযায়ী যৌন-সহবাসের পর বিবাহ একটি স্থায়ী সম্পর্কের রূপ ধারণ করে এবং পরবর্তীকালে এ সম্পর্ক ছিন্ন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেননা, বিবাহ হচ্ছে গির্জা ও মাসীহের ঐক্যের প্রকাশ। গির্জা ও মসীহের ঐক্য যেমন অবিচ্ছিন্ন, তেমনি বৈবাহিক সম্পর্কও অবিচ্ছেদ্য। তাছাড়া, প্রাকৃতিক নিয়মের মতো এটিও একটি স্থায়ী ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাদের ধারণা মতে আল্লাহ্ শুরুতেই ইরশাদ করেছিলেন যে, পুত্র মাতা-পিতা ত্যাগ করে স্ত্রীর সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হবে এবং উভয়েই একাত্ম ও একাকার হয়ে যাবে। এ মতবাদ সত্ত্বেও রোমান ক্যাথলিক গির্জাকে ব্যতিক্রমী অবস্থায় তালাকের অনুমতি দিতে বাধ্য হয়। তাঁদের মতে, দুই পক্ষের কেউ যদি এ কথা প্রমাণ করতে পারে যে, বিবাহের শুরুতেই কোনো অনিয়ম রয়ে গেছে, তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো যেতে পারে। লর্ড ব্রাইস এই অবস্থা পর্যালোচনা করতে গিয়ে তাঁর একটি পুস্তকে লিখেছেন, এই ব্যতিক্রমী অবস্থার সুযোগ গ্রহণের জন্য এতো অধিক কায়দা-কানুন বানানো হয়েছে যে, অতি সহজেই প্রতিটি বিবাহে কোনো না কোনো আইনগত ক্রটি সাব্যস্ত করে স্বামী-স্ত্রী একে অপর থেকে বিচ্ছেদ লাভ করতে পারতো। উদাহরণত, একজন স্বামী এ কথা বলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারতো যে, তার স্ত্রী তার কোনো দূর সম্পর্কের ভগ্নী হয় কিংবা যৌবনকালে তার স্ত্রীর সহোদরার সাথে তার ভালবাসা ছিল অথবা সে তার স্ত্রীর কোনো আত্মীয়ের ধর্ম-বাপ।

বহুকাল পর্যন্ত পাশ্চাত্য আইন প্রণেতাগণ বিবাহ অবিচ্ছেদ্য হওয়ার মতবাদ স্বীকার করেননি। কিন্তু শারলামিনের আমল থেকে পাশ্চাত্য দেশসমূহের আইন প্রণয়ন এই মতবাদ দ্বারা ক্রমশ প্রভাবান্বিত হতে থাকে। কেবল উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে গিয়ে রোমান ক্যাথলিক দেশগুলো তালাক বৈধ সাব্যস্ত করে। এখনো খ্রীস্টান দেশসমূহে ঐ মতবাদের এতই প্রভাব যে, দক্ষিণ কেরোলিনার আমেরিকান রাজ্যে তালাক দেয়া আইনত নিষিদ্ধ। অথচ এই রাজ্যের অধিবাসীদের অধিকাংশই রোমান ক্যাথলিক গির্জার সাথে সম্পর্ক রাখে না। বরং ধর্মত তারা প্রোটেস্ট্যান্ট।

প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের সংস্কারকগণ রোমীয় গির্জার এ মতবাদ কখনো মানেনি যে, বিবাহ একটি অবিচ্ছেদ্য ও স্থানীয় অবস্থা, যার পরিসমাপ্তি কেবল স্বামী-স্ত্রীর কোন একজনের মৃত্যুর পরই ঘটতে পারে। তারা সবাই এ কথার উপর একমত হন যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন একজন ব্যভিচারে লিপ্ত হলে এই কাজকে তালাকের একটি যুক্তিসঙ্গত কারণ সাব্যস্ত করা উচিত। এতদ্‌ভিন্ন বহু

সংস্কারক এও স্বীকার করেন যে, যদি স্বামী অথবা স্ত্রী ইচ্ছাকৃতভাবে একে অপর থেকে দীর্ঘকাল পযন্ত নিখোঁজ থাকে, তবে তালাক হতে পারে। প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কারকদের এইসব মতবাদ ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য দেশসমূহের আইন প্রণেতাগণকে প্রভাবান্বিত করা শুরু করে। সুতরাং এইসব দেশে কতিপয় আইন মঞ্জুর করা হয় যাতে বিবিধ কারণে তালাককে বৈধ সাব্যস্ত করা হয়।

খ্রীস্টবাদের বিপরীতে ইসলাম শুরু থেকেই তালাকের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়ে এমন সব ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি দিয়েছে, যখন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে এতটা বিস্বাদ ও তিক্ততা সৃষ্টি হয় যে, দু'জনেরই একে অপরের সাথে জীবন যাপন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং পারস্পরিক সমজোতারও কোন সম্ভাবনা না থাকে। এতদসত্ত্বেও ইসলাম তালাকের ক্ষেত্রসমূহ সীমিত রাখতে চায় এবং তালাকের আধিক্যকে অশুভ দৃষ্টিতে দেখে। কেননা, তুচ্ছ তুচ্ছ ব্যাপারেও যদি বিবাহ বিচ্ছেদ হতে থাকে এবং তালাকের অনুমতিকে কড়া শর্তসাপেক্ষ না করা হয়, তবে পরিবার কাঠামোর স্থায়িত্ব বিদায় নেবে এবং পারিবারিক জীবন কোন স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে না। এ জন্য তালাকের অনুমতি দিতে গিয়ে ইসলাম তাকে সীমিত করার উদ্দেশ্যে কতিপয় পাবন্দী ও শর্ত আরোপ করেছে, যাতে মানুষ বিবাহ ও তালাকের ব্যাপারটিকে খেল-তামাশা বানিয়ে না নেয়।

স্বামী এবং স্ত্রীকে ইসলামী শরীয়াতের তরফ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করা হয়েছে। যদি তাদের কেউ অনুভব করে যে, দ্বিতীয় পক্ষের সাথে তার সংসার যাপন করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়, তবে বিবাহ বন্ধন থেকে কণ্ঠমুক্ত হয়ে পুনরায় অন্যত্র বৈবাহিক জীবন শুরু করবে। কিন্তু এরই সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তালাককে একটি মন্দ কাজ সাব্যস্ত করে বলেছেন—

"হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বৈধ জিনিসের মধ্যে সবচেয়ে অপছন্দনীয় হচ্ছে তালাক।"

"সকল স্বাদ অন্বেষণকারী অধিক তালাকদাতার উপর আল্লাহ্র লানত।"

"আল্লাহ্ তা'আলা স্বাদ আস্বাদনকারী ও স্বাদ আস্বাদনকারিণীকে পছন্দ করেন না।"

"যে স্ত্রীলোক তার স্বামীর নিকট থেকে তার অত্যাচার ব্যতীত 'খোলা' গ্রহণ করবে, তার উপর আল্লাহ্, ফেরেশতা ও সকল মানুষের লানত বর্ষিত হবে।"

তালাকের ব্যাপারে নারীদের তুলনায় পুরুষদেরকে বেশী স্বাধীনতা দান করা হয়েছে। কিন্তু তাদের উপরও কয়েকটি শর্ত ও বাধ্যবাধকতা আরোপ করা

হয়েছে। প্রথমত, তারা তাদের স্ত্রীদের যে মোহর প্রদান করেছে, তা ফেরত নিতে পারবে না। যেমন কুরআন কারীমের ঘোষণা ঃ

"তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী বিবাহ করতে চাও এবং তোমরা তাকে প্রচুর অর্থও দিয়ে থাকো, তবু তা থেকে কিছুই গ্রহণ করবে না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপাচার দ্বারা তা গ্রহণ করবে? আর কিরূপে তোমরা তা গ্রহণ করবে? অথচ তোমরা একে অপরের সাথে সহবাস করেছ এবং তারা তোমাদের নিকট থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছে।" (সূরা নিসা ঃ ২০-২১)

দ্বিতীয়ত, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চায়, তবে তাকে এক এক মাসের বিরতি দিয়ে তিন তালাক দিতে হবে এবং তৃতীয় তালাকের পর স্বামী-স্ত্রী আলাদা হয়ে যাবে। একই মাসে তিন তালাক দেয়া পাপ। এই শর্তটির তাৎপর্য হচ্ছে, তিন মাসের সময়কালে হয়ত পারস্পরিক সমঝোতার কোনো উপায় বের হয়ে আসবে। কিংবা স্ত্রী ও স্বামীর ব্যবহারে এমন কোনো শুভ পরিবর্তন ঘটতে পারে, যাতে তালাকের কোনো প্রয়োজনই থাকবে না। যেমন কুরআনুল কারীমের নির্দেশ হচ্ছে ঃ

"তালাক দু'বার। অতঃপর (স্ত্রীকে) হয় ভালো মতো রেখে দিবে অথবা ভদ্রভাবে বিদায় দিবে।" (সূরা বাকারা ঃ ২২৯)

"তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ তিন রজঃস্রাবকাল প্রতীক্ষায় থাকবে। ...যদি তাদের স্বামীগণ নিষ্পত্তি করতে চায়, তবে ঐ সময়ের মধ্যে তাদেরকে তারা পুনঃ গ্রহণের অধিক হকদার।" (সূরা বাকারা ঃ ২২৮)

একই সময় তিন তালাক দিলে স্ত্রী চিরবিদায় হবে কি না এ সম্পর্কে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশের মতে, যদি একই বৈঠকে তিন তালাক দেয়া হয়, তবু তার ফল তাই হবে যা তিন মাসের বিরতিতে তিন তালাক দিলে হবে। অর্থাৎ চিরতরে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটবে। কিন্তু ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) ও ইমাম ইবন তাইমিয়া (র)-এর মতে, একই সময় তিন তালাক দিলে এক তালাক গণ্য হবে। অর্থাৎ বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটবে, যখন তিন তালাকের মধ্যে এক মাসের তফাৎ থাকবে।

প্রথম দুই তালাকের সময় স্বামী ও স্ত্রীকে এক জায়গায় থাকার তাকীদ করা হয়েছে। যাতে স্বামী যদি তাড়াহুড়া করে থাকে কিংবা নিছক সাময়িক উত্তেজনাবশত তালাক দিয়ে থাকে, তবে সে তার সিদ্ধান্ত বাতিল করে স্ত্রীর সাথে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। কুরআন হাকীম এ কথাই নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে ঘোষণা করেছে ঃ

"তালাক দুই বার। অতঃপর হয় ভালভাবে রেখে দেবে অথবা ভদ্রভাবে বিদায় দেবে।" (সূরা বাকারা ঃ ২২৯)

"তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ তিন রজঃস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকবে। ......যদি তাদের স্বামীগণ নিষ্পত্তি করতে চায়, তবে ঐ সময়ের মধ্যে তাদেরকে তারা পুনঃগ্রহণের অধিক হকদার।"

তিনমাস পরও যদি স্বামী তার সিদ্ধান্তে অটল থাকে, তবে তৃতীয় তালাক হবে শেষ ও চূড়ান্ত। এরপর যদি স্বামী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করতে চায়, তবে তা কেবল তখনই সম্ভব হবে, যখন তার স্ত্রী আবার কোনো ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর তার থেকে তালাক লাভ করবে। কিন্তু এমন যদি হয় যে, স্ত্রীলোকটির দ্বিতীয় স্বামী তাকে বিবাহ করার পর সহসা তালাক দিয়ে দিবে অথচ দু'জনের মধ্যে কোনো দৈহিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে না, তাহলে এমতাবস্থায় তাকে তার প্রথম স্বামী বিবাহ করতে পারবে না। কেননা, পুনঃ বিবাহের একটি অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে স্ত্রীলোকটির সাথে তার দ্বিতীয় স্বামীর সহবাস করা। এ সম্পর্কে হযরত আয়িশা (রা)-এর বর্ণনা এরূপ ঃ হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ রিফা'আ কারজীর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে বললো, আমি রিফাআর সাথে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম, অতঃপর তিনি আমাকে তালাক দিলেন এবং তালাককে পাকাপোক্ত ও চূড়ান্ত করলেন। তারপর আমি আবদুর রহমান ইবনে যুবায়ের সাথে বিবাহ্ সূত্রে আবদ্ধ হলাম। কিন্তু তাঁর কাছে একটি কাপড়ের টুকরো ছাড়া কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি কি রিফা'আকে আবার বিবাহ করতে চাও! সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি তাকে বিবাহ্ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত তুমি তার (দ্বিতীয় স্বামীর) স্বাদ আস্বাদন না করবে এবং সে (দ্বিতীয় স্বামী) তোমার স্বাদ আস্বাদন না করবে।"

আসলে এ শর্তটি বেঁধে দেয়ার কারণ হচ্ছে মানুষ যাতে বাইন তালাক দেয়ার ক্ষেত্রে পুরাপুরি সাবধানতা অবলম্বন করে এবং তালাকের অনুমতি থেকে অনর্থক ফায়দা না উঠায়।

তালাকের আরেকটি শর্ত হচ্ছে ঋতুস্রাবকালে তালাক না দেয়া। এ শর্তটির তাৎপর্য হচ্ছে ঋতুস্রাবকালে সাধারণত স্ত্রীলোকদের মেজাজ বড় চড়া হয়ে যায় এবং সামান্য সামান্য ব্যাপারেও তারা লড়াই-ঝগড়া শুরু করে দেয়। এরূপ দৈহিক অসুস্থতার দরুন কখনো কখনো তারা এমন সব কাজ-কারবার করে ফেলে, যার উপর তারা নিজেরাই লজ্জা অনুভব করে। এ ছাড়া এও একটি কারণ যে, ঋতুস্রাবকালে স্বামী-স্ত্রীর যৌনক্রিয়া বন্ধ থাকে। আর যেহেতু স্বামী-স্ত্রীর

যৌন আবেগ ও কামপ্রবৃত্তিই শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে প্রেম ও ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করে, তাই খুব সম্ভব ঋতুস্রাবকালে যে তিক্ততা ও বিস্বাদতা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সৃষ্টি হবে, তা যৌন সম্পর্ক পুনঃস্থাপন দ্বারা আপনা থেকেই দূর হয়ে যাবে। একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) ঋতুস্রাবকালে তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা) এই খবর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানালেন। তিনি এই খবর শুনে অত্যন্ত রুষ্ট হলেন এবং বললেন, আবদুল্লাহকে তালাক ফিরিয়ে নিতে বলে দাও এবং তার স্ত্রী যখন ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হবে, তখন তাঁকে তালাক দিতে বলো। এই ঘটনা সম্পর্কে অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইব্ন উমর (রা)-কে এই কাজের জন্য ভর্ৎসনা করেন এবং তালাকের নিম্নোক্ত পদ্ধতি বাতলে দেন ঃ

"ইবনে উমর, তুমি ভুল পথ অনুসরণ করেছো। সঠিক পথ হচ্ছে, তুমি তুহরের অপেক্ষা করবে। তারপর এক এক তুহরে এক এক তালাক দিবে। অতঃপর সে যখন তৃতীয় বার পাক হবে, তখন হয় সম্পূর্ণ তালাক দিয়ে দিবে কিংবা তাকে রেখে দিবে।"

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যদি তাকে তিন তালাক দিতাম, তবে কি আমার রুজু করার অধিকার থাকতো? নবী (সা) বললেন, "না, সে বিদায় হয়ে যেতো এবং এতে পাপ হতো।"

এতক্ষণ আমরা এ বিষয়ের উপর আলোচনা করলাম যে, স্বামীকে তালাকের ক্ষেত্রে ইসলাম কতটুকু স্বাধীনতা দিয়েছে এবং স্বাধীনতার সীমারেখা কি। উপরন্তু তার উপর কি কি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। পুরুষদের মতো ইসলাম নারীদেরকেও বিবাহ বন্ধন থেকে কণ্ঠমুক্ত হওয়ার সমান স্বাধীনতা দিয়েছে। সুতরাং যে স্বামীর ব্যবহার ভাল নয় কিংবা যে স্বামীকে তার স্ত্রী অন্য কোন কারণে অপছন্দ করে তার থেকে স্ত্রী দুইভাবে মুক্তি লাভ করতে পারে। প্রথমত, স্ত্রী ও স্বামী পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে রাযী হয়ে গেলে স্ত্রী আপনা থেকেই মুক্তি পেয়ে যায়। এ পদ্ধতিকে 'খোলা' বলা হয়। দ্বিতীয় পথ হচ্ছে, স্বামী কোন রকমই তাকে ত্যাগ করতে রাযী না হলে স্ত্রী আদালতে রুজু করতে পারে এবং আদালতের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদের হুকুম লাভ করতে পারে। বাহ্যত মনে হতে পারে, এ ব্যাপারে ইসলাম পুরুষ এবং নারীর মধ্যে সাম্যের নীতিমালা পুরাপুরি স্মরণ রাখেনি। কেননা পুরুষ তার জিহবার একটু নাড়াচাড়া দ্বারাই স্ত্রীকে বিদায় করে দিতে পারে অথচ স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষের সম্মতি লাভ করা অথবা দ্বিতীয় অবস্থায় আদালতের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। বাহ্য দৃষ্টিতে মনে হয়, এইভাবে ইসলাম নারীকে একটি বিপদে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু আসল ঘটনা হচ্ছে, নারীর ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও

তার বিচারালয়ের হস্তক্ষেপ করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে নারীর অধিকারসমূহ সর্বোত্তম পন্থায় সংরক্ষণ করা। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের সামাজিক অবস্থা এমন রয়েছে যে, পুরুষদের মতো নারীদের পক্ষে তাদের অধিকারসমূহ রক্ষা করা সম্ভবপর হচ্ছে না। এটা শুধু প্রাচ্যের পশ্চাৎপদ দেশগুলোর কথাই না, বরং পাশ্চাত্য দেশসমূহেও—যেখানে নারী সমাজ কিছুটা স্বাধীনতা লাভ করেছে এবং যেখানে অর্থনৈতিক দিক থেকেও তারা এক রকম নিরাপদ ও পরিতুষ্ট—পুরুষদের ন্যায় নারীদের পক্ষে তাদের অধিকার সংরক্ষণ দুরূহ। ইসলামের আবির্ভাবকালে নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান এতটা মযবুত ছিল না যে, তারা একাকী পুরুষদের মুকাবিলা করতে পারে। এজন্য তাদের রাষ্ট্রীয় সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা চাওয়ার নির্দেশ দান করা হয়। যাতে পুরুষ তাদের আইনগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে চাইলেও তারা একটি শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষকের সাহায্য লাভ করতে পারে। কাজেই আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার ফলে নারী তার অধিকার সংরক্ষণ আরো বেশী কার্যকর পন্থায় করতে পারে এবং সেই সব বাধাও দূর করতে পারে, যা পুরুষ তাদের আইনগত অধিকার প্রয়োগে সৃষ্টি করতে পারে।

পুরুষদের তালাকের অনুমতি দেয়ায় ইসলামের উদ্দেশ্য যেমন এ নয় যে, তালাক কোনো মন্দ কাজ নয়, অনুরূপ নারীদের পারস্পরিক সম্মতি বা আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার মাধ্যমে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার যে অধিকার দেয়া হয়েছে, তার উদ্দেশ্যও এ নয় যে, ইসলাম নারীর তালাক চাওয়াকে পছন্দের দৃষ্টিতে দেখেছে। ইসলাম এমন পুরুষ ও নারীকে প্রকাশ্যে নিন্দা করেছে, যারা তাদের তালাক বা বিচ্ছেদের অধিকারকে অপব্যবহার করে। এ সম্পর্কে হাদীসের বক্তব্য হচ্ছে এরূপ ঃ

"হযরত সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যে স্ত্রীলোক তার স্বামীর নিকট থেকে বিনা দোষে তালাক প্রার্থনা করে, তার জন্য বেহেশতের খুশবুও হারাম। আর যে নারী 'খোলা'-কে খেলা মনে করে, সে মুনাফিক।"

এসব উপদেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে, পুরুষদের মতো নারী সমাজও পারিবারিক কাঠামোর স্থায়িত্বকে অহেতুক অনাবশ্যক ক্ষতিগ্রস্ত করা থেকে বিরত থাকবে এবং কেবলমাত্র প্রকৃত প্রয়োজন বা নিরুপায় অবস্থায়ই তালাকের অধিকার দ্বারা ফায়দা উঠাবে। এই ধরনের নৈতিক উপদেশ ছাড়াও নারীদের জন্য বিচ্ছেদ লাভের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। চাই তারা তাদের স্বামীদেরকে রাযী করে 'খোলা'

হাসিল করুক এবং এটা সম্ভব না হলে আদালতে রুজু করে বিচ্ছেদ লাভ করুক। এই উভয় অবস্থায়ই স্ত্রীকে তার মোহর ত্যাগ করতে হবে। এইভাবে তালাকে স্বামী ও খোলায় স্ত্রীকে আর্থিক ক্ষতি সহ্য করতে হয়। এর ফায়দা হচ্ছে আর্থিক কুরবানীর চিন্তা তাদের জন্য একটি মস্তবড় বাধায় পরিণত হয়। স্ত্রী ও স্বামীর যদি মোহরের ক্ষতি সহ্য করতে না হতো, তাহলে তালাক ও খোলার পথ থেকে একটি বড় বাধা দূর হয়ে যেতো। এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা অধিক মাত্রায় সংঘটিত হতো।

নবী (সা)-এর আইনী মীমাংসা দ্বারা যে সব নীতিমালার উপর আলোকসম্পাত হয়, সেই অনুসারেই বিবাহ-বিচ্ছেদ বিষয়ে আদালতের কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হচ্ছে সাবিত ইবন কায়সের ঘটনা। ছাবিতের দুই স্ত্রী তালাক প্রার্থনা করলো। তাঁর এক স্ত্রীর নাম ছিল জামীলা বিনতে আবী সুলূল। সে নিম্নোক্ত ভাষায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বিবাহ বিচ্ছেদ প্রার্থনা করে ঃ

"হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার এবং তার মাথা কোনো জিনিস একত্র করতে পারবে না। আমি আমার নেকাব উঠিয়ে দেখি, সে কয়েকজন লোকের সাথে আমার দিকে হেঁটে আসছে। আমি দেখলাম, সে তাদের মধ্যে সবচেয়ে কালো বেঁটে ও কুশ্রী।"

আরেকটি রিওয়ায়াতে এরূপ ঃ

"হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ সাবিত ইবনে কায়সের স্ত্রী নবী (সা)-এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সাবিত ইবনে কায়সের চরিত্রও আমার কাছে ভাল এবং দীনের ক্ষেত্রেও তার কোন ত্রুটি নেই। কিন্তু (আমি তার সাথে থেকে তার অবাধ্যতা করে) ইসলামের মধ্যে কুফরকে আহবান করতে পারি না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি তার মোহর হিসাবে দেয়া বাগানটিকে তাকে ফিরিয়ে দেবে? সে বললো, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাবিতকে বললেন, তুমি তোমার বাগানটি ফেরত নাও এবং তাকে তালাক দিয়ে দাও।" (বুখারী)

সাবিতের আরেক স্ত্রীর ঘটনা নিম্নরূপ ঃ

হযরত হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ তিনি সাবিত ইবনে কায়সের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। (কিন্তু তাদের পরস্পরের মধ্যে অমিল দেখা দিলো) রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফজরের নামাযের জন্য যখন তার ঘর থেকে বের হলেন, তখন হাবীবাকে ঘরের দরজার কাছে দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ইনি

কে? তিনি (হাবীবা) বললেন, আমি হাবীবা বিনতে সাহল ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাসূল (সা) বললেন, তোমার কি হয়েছে! হাবীবা বললেন, আমি এবং সাবিত ইবনে কায়স এক সাথে থাকতে পারছি না। অতঃপর সাবিত ইবনে কায়স আগমন করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন, তোমার স্ত্রী হাবীবা এসেছিল এবং তুমি যা বললে সেও তাই বললো। হাবীবা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! উনি আমাকে যা মোহর বাবত দিয়েছেন, তা সবই আমার কাছে রক্ষিত আছে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাবিতকে বললেন, তুমি তাকে দেয়া মোহর ফেরত নাও। অতঃপর তিনি তার থেকে মোহর ফেরত নিলেন এবং হাবীবা তাঁর ঘরে চলে গেলেন। (আবূ দাউদ)

এই ঘটনা সম্পর্কে আবূ দাউদের আরো একটি বর্ণনা পাওয়া যায় ঃ

হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ হাবীবা সাবিত ইবনে কায়সের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। (উভয়ের মধ্যে কিছু অবর্গতা দেখা দিলো এবং) সাবিত হাবীবাকে এমন মার মারলো যে, তার হাড় ভেঙ্গে গেলো। হাবীবা সকাল বেলা নবী (সা)-এর নিকট এসে সমস্ত ঘটনা খুলে বললো। নবী (সা) সাবিতকে ডেকে এনে বললেন, হাবীবার নিকট থেকে কিছু মাল নিয়ে নাও এবং তার থেকে আলাদা হয়ে যাও। সাবিত বললেন, এটা কি ঠিক হবে ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, হ্যাঁ। সাবিত বললেন, আমি হাবীবাকে মোহর বাবত দুটি বাগান দিয়েছিলাম এবং সে দুটি এখনো হাবীবার মালিকানায় আছে। নবী (সা) বললেন, যাও, দুটি বাগানই ফেরত নিয়ে নাও এবং তার থেকে আলাদা হয়ে যাও। সাবিত তাই করলেন। (আবূ দাউদ)

হযরত উমর (রা)-এর শাসন আমলেও এই ধরনের একটি ঘটনা ঘটে। এক মহিলা বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করলেন। হযরত উমর (রা) তাকে বিবাহ বিচ্ছেদ না করার পরামর্শ দিলেন এবং আপোস রফা করতে বললেন। কিন্তু মহিলা তাতে রাযী হলেন না বরং বিবাহ বিচ্ছেদের উপর অটল রইলেন। হযরত উমর (রা) তাকে একটি অন্ধকার কোঠার মধ্যে তিন দিন পর্যন্ত আবদ্ধ করে রাখলেন। চতুর্থ দিন যখন তিনি বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, এ তিন দিন তোমার কেমন কাটলো? তিনি বললেন, আমি এই তিন দিনই স্বামীর ঘর থেকে বেশী শান্তিতে ছিলাম। এরপর হযরত উমর (রা) উভয়ের মধ্যে বিবাহ ভেঙ্গে দিলেন।

এই তিনটি ঘটনা থেকেই স্পষ্ট হয় যে, স্ত্রী যদি কোনো কারণে তার স্বামীর তরফ থেকে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং তার সাথে জীবন যাপন করতে না চায়, তবে এটিই হচ্ছে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য যথেষ্ট ও যুক্তিযুক্ত কারণ। সাবিত ইবনে

কায়সের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে কর্মপন্থা গ্রহণ করেন, তাতে প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রী যদি স্বামীর অসৌন্দর্যের দরুন তার সাথে ঘর করতে না চায়, তবে নিছক এতটুকু বিষয়ও আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে তার সপক্ষে রায় ঘোষণা করার জন্য কারণ হতে পারে। আদালতের পক্ষে কেবল এতটুকু জানা আবশ্যক, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এতখানি ঘৃণা জন্মে গেছে যে, দু'জনের মধ্যে আর সুসম্পর্ক স্থাপন সম্ভব নয়। যদি এর প্রমাণ বিদ্যমান থাকে, তবে এই ঘৃণা ও বিরক্তির পুংখানুপুংখ কারণ জিজ্ঞাসা করা জরুরী নয়। কেননা, স্ত্রী তার স্বামীকে অনেক কারণে ঘৃণা করতে পারে। যা কেউ কেউ হয়ত প্রকাশ করতেও চাইবে না। অবশ্য আদালতের এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক যে, স্ত্রীর ঘৃণা ও বিরক্তি প্রকৃত ও বাস্তব—কৃত্রিম ও বাহ্যিক নয়।

বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদনকারিণী যৌন স্বাদ অন্বেষণ ও বৈচিত্রের লালসায় এই আবেদন করছেন, না অন্য কোনো কারণে—আদালতের পক্ষে এ বিষয়টি খোঁজ করাও ঠিক নয়। নারী বিবাহ বিচ্ছেদের যে অধিকার ইসলামী আইন অনুযায়ী লাভ করেছে, তা এ শর্তযুক্ত নয় যে, তাকে যৌনাচার চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহার করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে ধর্মীয় শিক্ষার আসল প্রাণ এবং নবী (সা)-এর নৈতিক শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদ সুবিধাকে নিছক মজা চাখার উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করা। কিন্তু এই নৈতিক সম্পর্ক হচ্ছে ব্যক্তির সত্তার সাথে। কোনো ব্যক্তি এই শিক্ষা অনুযায়ী চলছে, না তার বিরুদ্ধাচরণ করছে আইনের তা দেখা উচিত নয়। তাছাড়া কোনো নারী যদি প্রকৃতই ব্যভিচারিণী ও স্বাদ অন্বেষণকারিণী হয়, তবে নিছক আদালত তার বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন প্রত্যাখান করলেই সে ব্যভিচার ও স্বাদ অন্বেষণ থেকে ফিরে থাকবে না। বরং এমতাবস্থায় আদালত যদি তার আবেদন প্রত্যাখান করে দেয়, তবে এটা তার লাম্পট্য ও যৌন অনাচারের পথে এক বাড়তি ইন্ধন যোগাবে। তাই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদ অবৈধ যৌনাচার অপেক্ষা অনেক ভাল। যা হোক, এমতাবস্থায় আদালতকে স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ ভেঙে দিতে হবে এবং এরপর তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক ঠিক তখনই স্থাপিত হতে পারে, যখন স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহের পর তাকে তালাক দিয়ে দেবে।

তালাক প্রার্থনার সময় স্ত্রীকে মোহরের কত টাকা ছেড়ে দিতে হবে, যে সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিবাহের সময় স্বামী তার স্ত্রীকে যে পরিমাণ টাকা মোহর আকারে দিয়েছিল, তার চেয়ে বেশী দাবী করার তার অধিকার নেই। বিবাহ বিচ্ছেদ যদি পারস্পরিক সম্মতির পর সংঘটিত হয়ে থাকে, তার

টাকার পরিমাণও পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমেই নির্ধারিত হবে। কিন্তু মুকদ্দমা যদি আদালতে দায়ের করা হয়, তবে আদালতকে এটা মীমাংসা করতে হবে যে, মোহরের কত অংশ—অর্ধেক, না এক-তৃতীয়াংশ, না এক-চতুর্থাংশ স্ত্রীকে ফেরত দেয়া উচিত। কোনো ফকীহের মতে, স্ত্রী যদি স্বামীর দুর্ব্যবহার বা অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তালাক দাবী করে, তবে আদালত স্ত্রীকে মোহর ফেরত দান থেকে রেহাই দিতে পারে কিংবা সম্পূর্ণ মোহরের কিছু কম ফেরত দেয়ার নির্দেশ নিতে পারে। এটা নির্ভর করে মুকদ্দমার বিশেষ অবস্থার উপর। কোনো কোনো ফকীহ এও বলেন যে, স্ত্রীর তালাক প্রার্থনা যদি যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ না থাকে এবং নিছক যৌন লিপ্সাই তাকে তালাক প্রার্থনায় উদ্বুদ্ধ করে থাকে, তবে আদালত তাকে মোহরের চেয়ে বেশী টাকা আদায় করার নির্দেশও দিতে পারে। স্বামীর দুর্ব্যবহার ও স্ত্রীর ঘৃণ্য ও অপছন্দ ছাড়া ইসলাম বিবাহ বিচ্ছেদের আরো কিছু কারণ অনুমোদন করেছে। যেমন 'খেয়ারে বুলূগ'। অর্থাৎ কোন অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়েকে বিবাহ দেয়া হলো। কিন্তু বয়প্রাপ্তা হয়ে সে তা অছন্দ করলো। অনুরূপ খোরপোশ না দেয়া, মুরতাদ হওয়া, পুরুষত্বহীনতা, সংক্রামক ব্যাধি, স্বামীর নিখোঁজ হওয়া ইত্যাদি বিষয়ও বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ হতে পারে।

অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের ব্যাপারে কুরআন তার ওয়ালী ও অভিভাবকের মতামতকে কিছুটা গুরুত্ব দিয়েছে। অর্থাৎ ওয়ালী ও অভিভাবকের এ অধিকার অবশ্যই আছে যে, তারা তাদের মতানুযায়ী অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়েকে বিবাহ দিতে পারবেন। কিন্তু কুরআন হাকীমের কোনো আয়াত থেকে এটা বুঝা যায় না যে, বয়প্রাপ্তা হওয়ার পর মেয়ের এরূপ বিবাহকে রদ বা কবুল করার অধিকার নেই। নবী (সা)-এর রায় থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যদিও নারীর পক্ষে বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে ওয়ালী বা অভিভাবকের পরামর্শ নেয়া আবশ্যক, কিন্তু সে আইনগতভাবে এই পরামর্শ মানতে বাধ্য নয় এবং ওয়ালীর কথা মানা না মানার তার পূর্ণ ইখতিয়ার আছে। যেমন আবূ দাউদ শরীফের একটি রিওয়ায়াত ঃ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ একটি কুমারী মেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে বললো, তার পিতা তাকে বিবাহ দিয়েছেন অথচ তার তা পছন্দ নয়। নবী (সা) তাকে (এ বিবাহ বহাল রাখা বা ভেঙ্গে দেয়ার) ইখতিয়ার দান করলেন। (আবূ দাউদ)

অনুরূপ বুখারী শরীফের একটি রিওয়ায়াত ঃ হযরত খান্সা বিনতে খাযাম (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ তাঁর পিতা তাঁকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দিয়েছেন অথচ তাঁর তা পছন্দ হয়নি। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন

করলেন। তিনি তাঁর বিবাহ ভেঙ্গে দিলেন।

দারা কুতনীতে হযরত জাবির (রা)-এর একটি রিওয়ায়াত আছে। একবার নবী (সা) একটি মেয়ের অমতে তার বিবাহ হওয়ায় তা ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। নাসায়ী শরীফে হযরত আয়িশা (রা)-এর এক রিওয়ায়াত বর্ণনা করা হয়েছে, একটি মেয়ে নবী (সা)-এর নিকট অভিযোগ করে যে, তার পিতা তার অমতে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট বিবাহ দিয়েছেন। নবী (সা) তাকে ঐ বিবাহ বহাল রাখা বা রদ করার ইখতিয়ার দান করলেন। অতঃপর মেয়েটি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা যে কাজ করেছেন, আমি তা মঞ্জুর করেছি। আমার উদ্দেশ্য ছিল নারী সমাজকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, তাদের পিতারা এ ব্যাপারে কোনো ইখতিয়ার রাখেন না।

এসব রিওয়ায়াতের আলোকে এ কথা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে যে, যদি কোনো অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের ওয়ালী, পৃষ্ঠপোষক বা পিতা নিজেদের ইচ্ছা মতো তাকে বিবাহ দেয় এবং বয়প্রাপ্তা হওয়ার পর সে ঐ বিবাহকে অপছন্দ করে, তবে ঐ বিবাহ বহাল রাখা বা রদ করার ব্যাপারে তার পূর্ণ ইখতিয়ার রয়েছে।

স্বামী যদি তার স্ত্রীকে খোরপোশ দিতে অস্বীকার করে, তবে আদালত দু'টি কর্মপন্থার মধ্যে একটিকে বেছে নিতে পারে। স্বামী যদি অবস্থার শিকার হয়ে এরূপ না করে থাকে, বরং খোরপোশ যোগাড় করার যোগ্যতা থাকে, তবে আদালত তাকে আইনের বলে স্ত্রী-পরিজনের অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালনে বাধ্য করতে পারে। এরপরও স্বামী অস্বীকার করলে আদালত বিবাহ বিচ্ছেদের নির্দেশ দিতে পারে। আর এমতাবস্থায় বিবাহ সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে যাবে। অবশ্য স্বামী যদি প্রকৃতই স্ত্রীর অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়, তবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মতে বিবাহ সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে দিতে হবে।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে, এমতাবস্থায় স্বামীকে তিন দিনের সময় দেয়া উচিত। আর ইমাম মালিক (র)-এর মতানুসারে তার দুই কিংবা তিন মাসের সময় পাওয়া উচিত।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো একজন মুরতাদ হয়ে গেলে বিবাহ আপনা থেকেই ভেঙে যায়। কেননা, ইসলামী আইন অনুযায়ী কোন মুসলিম নারী অমুসলিমের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারে না। অনুরূপ মুসলিম পুরুষদেরও মুশরিক ও কাফির নারীদেরকে বিবাহ করার অনুমতি নেই। অবশ্য ধর্মত্যাগী নারী যদি খ্রীস্টান বা ইয়াহূদী ধর্ম অবলম্বন করে, তবে বিবাহ ভেঙ্গে যাবে না। কেননা, ইসলাম মুসলিম পুরুষদেরকে কিতাবধারী নারীদের বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছে।

স্বামী যদি পুরুষত্বহীন হয়, তবে স্ত্রী আদালতের কাছে বিচ্ছেদ প্রার্থনা করতে

পারে। তবে রোগ চিকিৎসা যোগ্য হলে স্বামীকে এক বছরের সময় দিতে হবে—যাতে সে তার চিকিৎসা করতে পারে। জন্মগত নপুংসক হলে বিবাহ সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে যাবে। কিন্তু এমতাবস্থায় ফকীহগণ নিম্নোক্ত শর্তসমূহ আরোপ করেছেন ঃ

প্রথমত, স্ত্রী যদি বিবাহের পূর্বে স্বামীর পুরুষত্বহীনতা সম্পর্কে অনবহিত হয়ে থাকে এবং তা সত্ত্বেও বিবাহে রাযী হয়ে থাকে, তবে বিবাহ ভাঙ্গা যাবে না।

দ্বিতীয়ত, স্ত্রী যদি বিবাহের পূর্বে স্বামীর পুরুষত্বহীনতা সম্পর্কে অনবহিত থাকে, কিন্তু বিবাহের পর যখন সে জানতে পারে যে, তার স্বামী পুরুষত্বহীন, তখনও সে বিবাহ বহাল রাখতে রাযী থাকে, তবে পরবর্তীতে সে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করতে পারবে না।

তৃতীয়ত, নপুংসক স্বামী যদি চিকিৎসার পর একবারও স্ত্রীসঙ্গমে সক্ষম হয়, তবে স্ত্রীর পক্ষে বিবাহ ভাঙ্গার অধিকার থাকে না।

স্বামীর সংক্রামক ব্যাধি হলে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ দাবী করতে পারে কিনা—এ সম্পর্কে আমাদের প্রাচীন ফকীহদের তিনটি মত রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা), ইমাম আযম আবূ হানীফা (রা) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে, উন্মাদ, কুষ্ঠরোগ, ধবলকুষ্ঠ এবং এ জাতীয় অন্য কোনো ব্যাধিগ্রস্ত হলে স্বামী-স্ত্রী কারুরই বিবাহ বিচ্ছেদ দাবী করার অধিকার নেই। অন্য এক দলের মতে, যে সমস্ত রোগের দরুন স্বামী-স্ত্রীর যৌন সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়—যেমন উন্মাদনা, কুষ্ঠ, মুখে দুর্গন্ধ, সিফিলিস, গনোরিয়া ও লজ্জাস্থানের এমন দোষ যা স্ত্রী সহবাস ত্যাগ করতে বাধ্য করে। এতে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই আলাদা হওয়ার অধিকার আছে। ফকীহদের মধ্যে ইমাম মালিক (রা)-এর মত এটাই। ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতানুযায়ী উন্মাদনা, কুষ্ঠরোগ ও ধবলকুষ্ঠগ্রস্থ হলে স্ত্রী এবং স্বামীর তালাক প্রার্থনা করার অনুমতি আছে। কিন্তু যোনিপথে ক্ষতরোগ হলে যেমন সিফিলিস প্রভৃতি এবং মুখে দুর্গন্ধ ও খোস-পাঁচড়া হলে স্বামী-স্ত্রীর কারুরই তালাক প্রার্থনা করার অধিকার থাকে না। অবশ্য স্ত্রী যদি গুপ্তাঙ্গের এমন রোগে আক্রান্ত হয়, যা রতিক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে কিংবা স্বামী পুরুষত্বহীন হয়, তবে এমতাবস্থায় স্ত্রীর তালাক প্রার্থনার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, স্ত্রীর এরকম কোনো দোষেই স্বামী বিবাহ বিচ্ছেদ প্রার্থনা করতে পারে না। কিন্তু স্বামী উন্মাদ, কুষ্ঠরোগ ও শ্বেতকুষ্ঠগ্রস্ত হলে স্ত্রী বিবাহ ভাঙ্গার দাবী করতে পারে।

স্বামী নিখোঁজ হয়ে গেলে স্ত্রী বিবাহ ভাঙ্গার দাবী করতে পারে কিনা এ বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ বিদ্যমান। কুরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। অবশ্য সাহাবা-ই-কিরামের মধ্যে হযরত

উমর (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মত হচ্ছে, স্বামী নিখোঁজ হলে স্ত্রীর চার বছর অপেক্ষা করা উচিত। অন্যদিকে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) ও হযরত আলী (রা) বলেন, স্ত্রীকে স্বামীর ফিরে আসা পর্যন্ত কিংবা ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত, যতদিনে তার মৃত্যু সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। ফকীহদের মধ্যে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম শাফিঈ (র)-এর অভিমতও তাই।

এই দু'টি মতই নারীদের প্রতি সুবিচার ও ইনসাফের মূল শিক্ষার পরিপন্থী বলে কেউ ভাবতে পারে। এ দু'টি অভিমত মেনে চললে নারীদের ওপর সত্যিই যুলুম হবে। মনে হয় এই মতাবলম্বীরা বেশী সতর্কতা অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন। এ কারণে তাঁরা নারীদের আবেগ-প্রবণতা ও তাদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাকে সতর্কতার ক্ষেত্রে বিসর্জন দিয়েছেন। তাছাড়া এ অভিমতটি কুরআনের মূলনীতিরও পরিপন্থী মনে হয়। কুরআন শর্তসাপেক্ষে একাধিক বিবাহের অনুমতি দিতে গিয়ে বলেছে ঃ

"এবং তোমরা যতোই ইচ্ছা করো না কেনো তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে কখনই পারবে না। তবে তোমরা কোনো একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না ও অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রেখো না।" (সূরা নিসা ঃ ১২৯)

অনুরূপ স্ত্রীকে তালাক দিতে ইচ্ছুক পুরুষদের উপদেশ দিতে গিয়ে কুরআন বলেছে ঃ

"যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দাও এবং তারা ইদ্দতকাল পূর্ণ করে, তখন তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দেবে অথবা বিধিমতো মুক্ত করে দিবে। কিন্তু অন্যায়রূপে তাদের ক্ষতি করে সীমালংঘন উদ্দেশ্যে তাদেরকে তোমরা আটকে রেখো না। যে এরূপ করে, সে নিজের প্রতি যুল্‌ম করে।" (সূরা বাকারা ঃ ২৩১)

ঈলা সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে ঃ

"যারা স্ত্রীর সাথে সংগত না হওয়ার শপথ করে, তারা চার মাস অপেক্ষা করবে। অতঃপর তারা যদি প্রত্যাগত হয়, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা বাকারা ঃ ২২৬)

এর অর্থ এই যে, কুরআন নারীদেরকে চার মাসের বেশী সময় ধৈর্য ও প্রতীক্ষার কষ্ট দিতে চায় না। তাই স্বামী যদি চার মাস পরও শপথ না ভাঙ্গে এবং সহবাস ত্যাগে অটল থাকে, তবে বিবাহ ভাঙ্গার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে স্ত্রীর অধিকার

জন্মে যায়। এইভাবে উপরোক্ত আয়াত-ত্রয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বামী কর্তৃক তার স্ত্রীকে এক অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা এবং তালাক না দেয়া ও যৌন সম্পর্কও স্থাপন না করা কুরআন যুল্‌ম ও অত্যাচারের শামিল মনে করে।

নারী সংক্রান্ত হযরত উমর (রা)-এর একটি সিদ্ধান্ত থেকেও এ বিষয়টির উপর গভীর আলোকপাত ঘটে। বর্ণিত আছে যে, একদা রাত্রিকালে হযরত উমর (রা) অভ্যাসবশত টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। সহসা একটা তাঁবু থেকে এক মহিলার গানের আওয়াজ ভেসে আসলো। নিকটে এসে তিনি কান পেতে শুনতে পেলেন উক্ত মহিলা এই চরণ ক'টি আবৃত্তি করছেন ঃ

○ রাত্রি আমার সুদীর্ঘ আর তার প্রান্তভাগ কালো হয়ে গেছে
আমার নিদ্রা উবে গেছে। কেননা আমার বন্ধু কাছে নেই যে,
আমি তার সাথে খেলা করবো

○ আল্লাহ্‌র কসম! যদি আল্লাহ্ না থাকতেন, তবে এই তক্তপোশের
পার্শ্বগুলো নড়ে উঠতো।

○ আমার রব ও আমার হায়া আমাকে বাধা দিচ্ছে
আর আমি আমার স্বামীকে সমীহ করছি
যেন তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা না হয়।

হযরত উমর (রা) জিজ্ঞেস করে জ্ঞাত হলেন যে, তাঁর স্বামী জিহাদে গেছেন। তিনি ঘরে ফিরে এলেন এবং হযরত হাফসা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, একজন নারী কত দিনের বিরহ বরদাশ্‌ত করতে পারে? তিনি অনেক ইতস্ততের পর বললেন, ছয় মাসের বেশী বিরহ নারীর পক্ষে অসহনীয়। এরপর হযরত উমর (রা) নির্দেশ দিলেন, ছয় মাস পর পর প্রত্যেক সিপাহীর জন্য কিছু দিনের ছুটি মঞ্জুর করতে হবে। নারীর পক্ষে স্বামী থেকে ছয় মাসের বেশী দূরে থাকা যদি অসহনীয় হয়, তবে যে নারীর স্বামী নিখোঁজ হয়েছে, তাকে তার স্বামীর আগমন বা মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে কি করে বলা যেতে পারে? এ ধরনের সিদ্ধান্তের ফলে উক্ত নারীর পক্ষে ব্যভিচারের দিকে ঝুঁকে পড়া মোটেই বিচিত্র নয়। আর সম্ভবত এ কারণেই হানাফী ও শাফিঈ মাযহাবের লোকেরা এক্ষেত্রে ইমাম মালিক (র)-এর রায় গ্রহণ করেছেন। ইমাম মালিক (র) স্বামী নিখোঁজ হওয়ার ক্ষেত্রে তিনটি অবস্থান্তরকে দৃষ্টিপথে রেখেছেন এবং প্রতিটি অবস্থার জন্য একটি নির্দিষ্ট হুকুম দিয়েছেন।

এক ঃ নিখোঁজ স্বামী যদি কোনো মালামাল বা সম্পত্তি না রেখে গিয়ে থাকে, যার দ্বারা স্ত্রী তার অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারে, তবে আদালত সঙ্গে

সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের নির্দেশ দিয়ে স্ত্রীকে দ্বিতীয় বিবাহের জন্য মুক্ত করে দিবে। শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাবও ইমাম মালিকের এই রায়ের সাথে একমত। কেননা, তাঁদের মাযহাব অনুযায়ী স্ত্রীকে স্বামীর খোরপোশ না দেয়াই বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য যথেষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত কারণ।

দুই ঃ স্বামী মাল বা সম্পত্তি তো রেখে গেছে; কিন্তু স্ত্রী একেবারে উদ্ভিন্ন-যৌবনা। স্বামীবিহীন জীবন যাপন তার থেকে আশা করা যায় না। এমতাবস্থায় আদালত এক বছর, ছয় মাস কিংবা এর চেয়েও কম সময় নির্দিষ্ট করতে পারে। এই সময় পর্যন্ত সে তার স্বামীর ফিরে আসার অপেক্ষা করবে। স্বামী যদি এই সময়ের মধ্যে ফিরে না আসে, তবে বিবাহ ভেঙ্গে দেয়া হবে এবং স্ত্রী দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে। আদালত প্রয়োজন মনে করলে সঙ্গে সঙ্গেও বিবাহ ভেঙ্গে দিতে পারে। স্ত্রী স্বামী ছাড়া থাকতে পারবে না—এ কথার প্রকাশ্য স্বীকৃতি আদায় করাও আদালতের পক্ষে জরুরী নয়। এ সিদ্ধান্ত স্বয়ং আদালতই নিবে।

তিন ঃ স্বামী মাল রেখে গেছে। স্ত্রী বিনা স্বামীতেও থাকতে পারবে। তার পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। এমতাবস্থায় চারটি পথ অবলম্বন করা যেতে পারে।

(ক) স্বামী যদি মুসলিম দেশে কিংবা এমন কোনো দেশে নিখোঁজ হয়, যাদের সাথে সভ্য দুনিয়ার সম্পর্ক রয়েছে এবং যেখানে তার সন্ধান চালানোও সম্ভবপর, তবে তার স্ত্রীকে চার বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করার নির্দেশ দিতে হবে।

(খ) যদি সে যুদ্ধের ময়দানে নিখোঁজ হয়, তবে তার সম্ভাব্য সন্ধান চালানোর পর এক বছর অপেক্ষা করতে হবে।

(গ) যদি সে কোনো স্থানীয় গণ্ডগোলে নিখোঁজ হয়ে থাকে, তবে গণ্ডগোল শেষ হওয়ার পর তার সন্ধান লাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। তারপর বিনা প্রতীক্ষায় তার স্ত্রীকে মৃত্যুর ইদ্দত পালনের অনুমতি দেয়া হবে।

(ঘ) যদি সে সভ্য দুনিয়ার বাইরের কোনো দেশে গায়েব হয়ে থাকে, যে দেশের সাথে সভ্য জগতের কোনো সম্পর্ক নেই এবং তাকে তালাশ করাও সম্ভবপর নয়, তবে তার স্ত্রীকে ৭০ কিংবা ৮০ বছর এবং কারো কারো মতে ৭৫ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু এটা তখনই হবে, যখন স্ত্রীর অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের কোনো ব্যবস্থা থাকে এবং তার পাপাচারে লিপ্ত হওয়ারও কোনো আশংকা না থাকে।

উপরোক্ত বিধানাবলী থেকে একথা পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে যে, মালিকী মাযহাবও—যা এ বিষয়ে অন্যান্য মাযহাব থেকে অধিক যুক্তিসঙ্গত—স্ত্রীর প্রতীক্ষার সময় নির্ধারণে মানব প্রকৃতির আবেগ-অনুভূতি ও কামনা-বাসনার প্রতি পুরাপুরি

খেয়াল রাখেনি। কোনো নারী থেকে এই আশা করা যে, সে সত্তর-পঁচাত্তর বছর পর্যন্ত স্বামীর ফিরে আসার অপেক্ষা করবে মূলত তাকে সারা জীবনের জন্য একাকিনী থাকতে বাধ্য করার নামান্তর। এ কাজটি যে কেবল যুক্তিহীন তাই নয়, বরং মানব প্রকৃতির সম্পূর্ণ বরখেলাফ এবং বিবাহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের একদম বিরোধী। হযরত উমর (রা)-এর যুগে যখন এই মূলনীতি স্থির হলো যে, মুজাহিদদের স্ত্রীগণ ছয়মাসের অধিক একাকিনী থাকবে না, তখন এই মূলনীতিই নিখোঁজ স্বামীর স্ত্রীর উপর প্রযোজ্য হওয়া উচিত।

নিখোঁজ স্বামী ফিরে আসার পর—তালাশের পরে আসুক কিংবা বিনা তালাশে—স্ত্রী তার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে কি না এ বিষয়ে সাহাবা কিরাম ও ফকীহদের মাঝে বিবিধ মতামত পরিলক্ষিত হয়। হযরত উমর (রা) বলেন, যদি স্ত্রী.দ্বিতীয় বিবাহ না করে থাকে, তবে সে নিখোঁজ স্বামীর বিবাহে আবদ্ধ থাকবে। কিন্তু তার যদি অনত্র বিবাহ হয়ে থাকে, তবে নিখোঁজ স্বামী তাকে নিজ স্ত্রী বলে দাবী করতে পারবে না—দ্বিতীয় স্বামীর সাথে তার যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হোক বা না হোক। ইমাম মালিক (র) হযরত উমর (রা)-এর এই মতের উপরই আমল করেছেন। হযরত আলী (রা)-এর অভিমত এর বিপরীত। তাঁর মতে, প্রথম স্বামী ফিরে আসার পর স্ত্রী সে-ই পাবে। চাই সে দ্বিতীয় বিবাহ করে থাকুক এবং দ্বিতীয় বিবাহের পর তার সন্তানই হোক না কেনো। হানাফী মতাবলম্বীরা এ মতানুসারেই আমল করেছেন। হযরত উসমান (রা)-এর মত হচ্ছে, প্রথম স্বামী ইচ্ছা করলে তার স্ত্রীকে ফিরিয়েও নিতে পারে এবং ইচ্ছা করলে ছেড়ে দিয়ে তার দেয়া মোহর ফেরত নিতে পারে। সে যদি মোহর ফেরত নেয় কিংবা স্ত্রীর নিকট মোহরের দাবী ত্যাগ করে, তবে স্ত্রী তার দ্বিতীয় স্বামীর বিবাহে আবদ্ধ থাকতে পারে। দ্বিতীয় অবস্থায় স্ত্রীকে দ্বিতীয় স্বামী থেকে ভিন্ন হয়ে চার মাসের ইদ্দত পালন করতে হবে। চার মাস পর সে প্রথম স্বামীর স্ত্রী হয়ে যাবে। এছাড়া সে তার দ্বিতীয় স্বামীর নিকট থেকে মোহরও আদায় করতে পারবে।

এতক্ষণ আমরা বিশদভাবে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছি যে, ইসলাম তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কে নারী সমাজকে কি অধিকার দিয়েছে। এই ব্যাখ্যা থেকে জানা যাবে, অন্যান্য ব্যবহারিক বিষয়ের মতো এ বিষয়েও ইসলাম পুরুষ ও নারীদের মধ্যে পূর্ণ সমতা স্থাপন করেছে। নিঃসন্দেহে তালাকের ক্ষেত্রে পুরুষের যে সুযোগ বা রেয়াত আছে, তা নারীদের নেই। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলেছি, নারীদের আদালতে রুজু করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তার দ্বারা তাদের স্বাধীনতাকে সীমিত করা উদ্দেশ্য নয়, বরং তাদের অধিকারের কার্যকর সংরক্ষণই

এর লক্ষ্য। স্ত্রী যদি তার স্বামীকে ত্যাগ করতে চায়, তবে সে বিচ্ছেদ প্রার্থনার সপক্ষে এত অজুহাত সৃষ্টি করতে পারে যে, আদালতকে কোনো না কোন ভিত্তিতে তার দাবী মেনে নিতে হবে। আমাদের সমাজে নারীদের তালাক লাভের ক্ষেত্রে যে জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়, তার কারণ এ নয় যে, ইসলাম তাদের জন্য জটিলতা সৃষ্টি করেছে। বরং তার আসল কারণ হচ্ছে প্রথমত নারীদেরকে তাদের অধিকার থেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রাখা হয়েছে। তাই তারা অজ্ঞতা ও অল্পজ্ঞানের কারণে আইনের সুযোগ ও রেয়াত থেকে ফায়দা লাভ করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সত্যিকার ইসলামী শিক্ষার অভাব তাদেরকে এটাই পঙ্গু করে দিয়েছে যে, তারা তাদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারে না। ফলে তাদের মধ্যে তাদের অধিকার সংরক্ষণের প্রেরণা দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং সাহস ও মনোবল বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাই তারা পুরুষদের অত্যাচার প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে একেবারে অসহায়। তৃতীয় এবং সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, আমাদের সমাজে নারী অর্থনৈতিক দিক থেকে পুরুষদের এতই মুখাপেক্ষী যে, তারা পুরুষদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে ভয় পায়। কেননা, তার অনিবার্য ফল এই দাঁড়ায় যে, তারা জীবিকার উপায় থেকে বঞ্চিত হয়ে অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে যায়। তাই ইসলাম প্রদত্ত সমস্ত অধিকার যদি আইন ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নারীদেরকে দিয়েও দেয়া হয়, তবু তাদের বর্তমান অবর্ণনীয় দুরবস্থার কোনো রদ্‌বদল হতে পারে না, যে পর্যন্ত সত্যিকার ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে তাদের আত্মসচেতন করা না হবে এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ না হলেও মোটামুটিভাবে তারা নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াতে সক্ষম না হবে।

ইফাবাঃ/গবেষণা/২০০০-২০০১/৫৪৯১ (উন্নয়ন)-২,২৫০